আলোর উদ্দাম পথিক

সম্পাদনা

বাঁধন সেনগুপ্ত

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

আলোর উদ্দাম পথিক

(নজরুল জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য সংকলন)

সম্পাদনা

বাঁধন সেনগুপ্ত

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন, ২০৯ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ALOR UDDAM PATHIK

(An Anthology of Essays on KAZI NAZRUL ISLAM
memories of his contemporaries & poets, contribution on Music, Literature,
Drama, Film etc)

প্রকাশক :
শংকর মণ্ডল
২০৯ এ, বিধান সরণি
কলকাতা ৭০০ ০০৬

বর্ণসংস্থাপন
আই. ই. আর. ই
২০৯এ, বিধান সরণি
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ISBN 81 85800 37-5

প্রচ্ছদ : অনুপ রায

মুদ্রক :
চৌধুরী অফসেট্

নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মরণে
শতাব্দীর
বিপ্লবী ভাবনার পথিকদের উদ্দেশে

কাজী নজরুল ইসলামেব জন্মশতবর্ষ নিঃসন্দেহে বাংলা তথা ভাবতবাসী এবং বিশ্বেব মুক্তিকামী স্বাধীনতা প্রিয় মানুষেব কাছে শতাব্দী প্রান্তেব অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। সৌভাগ্যবশত কবিব যে ভাবনা, আদর্শ, প্রেরণা ও মনুষ্যত্বেব উত্তবাধিকাব আমবা অর্জন কবেছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাব যথাযোগ্য মূল্যায়ন ও মর্যাদা জাতীয় প্রেক্ষাপটে যেন আজও অনুপস্থিত। সঙ্ঘবদ্ধ ভণ্ড কিছু বাজনৈতিক দল ও নেতাদেব ভীতি আজও এই দেশেব বিশাল সংখ্যাব মানুষ বিভ্রান্ত। ফলে নজরুল কল্পিত ও অনুসৃত সম্প্রীতিব ভাবনা তথা অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা, সাম্যবাদ বিবোধী প্রার্থিত এক সাম্যবাদী ভুবনেব স্বপ্ন এখন সমাজেব প্রতিটি ক্ষেত্রেই নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অথচ মানবতাব পূজাবী কবি নজরুলেব বিশ্ববোধ ও দেশপ্রেমেব প্রকাশ অনুধাবনেব মধ্যে শতাব্দী শেষেব প্রান্তে এসেও মানবেতিহাসে এক আশাব উজ্জ্বল অ[illegible] [illegible]

দেশেব অধিকাংশ মানুষই তাব কবিতা, প্রবন্ধ, গান, নাটক, [illegible] [illegible] সাহিত্যকর্মকে প্রথম থেকেই সমাদবে বরণ করে নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমসাময়িক [illegible] কোনো কিছু লেখক ও সম্পাদক সহজ মনে নেননি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অজানা নয়। সহযাত্রীদেব সেই বিবোধ বা অসহিষ্ণুতা নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক। [illegible] [illegible] ব্যক্তিস্বার্থ। সেইসঙ্গে নজরুল [illegible] [illegible] [illegible] কট্টর মৌলবাদী ও মোহান্ধ কিছু পত্র পত্রিকা এবং উভয় সম্প্রদায়েব [illegible] [illegible] বাজনৈতিক দল। নজরুল অসুস্থ হবাব পবও সেই অসয়া বা বিবোধিতাব [illegible] [illegible]। আক্ষেপ ও লজ্জাব বিষয় হল এই যে, স্বাধীনোত্তব ভাবতবর্ষে ও অন্যত্র [illegible] মানুষ এখনও [illegible] [illegible] অবস্থাব মেতে আছেন। শতবর্ষেব দ্বাবপ্রান্তে দাঁড়িয়েও সেই [illegible] আক্রমণেব যেন বিবাম নেই। এখনও যেখানে দেশেব বিপুল সংখ্যাক মানুষ নজরুলেব বাণী, [illegible] সৃষ্টিব [illegible] সমুদ্রে অবগাহন কবে আত্মশুদ্ধিব সাধনায় উন্মুখ, সেখানে নজরুল চর্চাব আগ্রহকে [illegible] নানাভাবে নষ্ট কবাব দেশদ্রোহিতাব অশুভ প্রয়াস অব্যাহত। এমন কী, আমলাদেব একাংশ এখনও নজরুল বিবোধিতায় সক্রিয় ও তৎপব। দেশেব নিবাপত্তা ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত কবাব অপচেষ্টা যেমন এই মুহূর্তে সর্বত্র বিদ্যমান, তেমন জাতপাতেব ঊর্দ্ধে মন্দিব ও মসজিদেব সংকীর্ণ সীমাবেখাকে মানুষেব ঐক্যেব সপক্ষে ব্যাপক প্রচাব কবাব যে চেষ্টা এই শতাব্দীব গোড়ায় নজরুল কবেছিলেন তা এখন দ্রুত গুঁড়িয়ে দেবাব চেষ্টা চলছে। অথচ সেই অপচেষ্টাকে রুখতে গেলে নজরুলেব অসাম্প্রদায়িক সেই ভাবনাব ব্যাপক প্রচাব ও অনুশীলন নিঃসন্দেহে আজ একান্ত জরুবী। কবিব জন্মশতবর্ষে সেই ভাবনাকে সর্বত্র উপস্থিত কবাব দায়িত্ব আজ দেশেব সমস্ত সচেতন মানুষেব।

আসলে, সমসাময়িক অন্যান্য কবি বা লেখকদেব তুলনায় কবি নজরুল তাব স্বাতন্ত্র্যসাধনায় বিশেষভাবে চিহ্নিত। কেবলমাত্র কবিতা লিখে বা বিবৃতি দান কবেই তিনি তাব দেশপ্রেমেব কর্তব্য শেষ কবেননি। ববং আপন বিশ্বাসেব কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি ছিলেন আত্মবলিদানে প্রস্তুত। আজীবন সংসাবী থেকেও তাই তিনি ছিলেন তুচ্ছ সাংসাবিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। ফলে 'প্রেমিক' ও 'বিদ্রোহী' এই দুই সত্ত্বাব সমন্বয় একমাত্র নজরুলেব জীবনেই সম্ভব হয়েছিল। চবিত্রেব এই সমন্বয় সঞ্জাত প্রতিরূপটি বাংলা কাব্যে ইতোপূর্বে ছিল আমাদেব সম্পূর্ণ অচেনা। অচেনা সেই পথহাবা পথিকেব প্রতি টান অনুভব কবেছিলেন স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ। তাই বহুবাব নজরুলেব জীবনেব বহুবিধ সংকটে তাঁব পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই অগ্রজ কবি যিনি তাঁব চেয়ে প্রায় চল্লিশ বছবেব ছোট বিচাবাধীন এক অনুজ কবিকে তাঁব সদ্য প্রকাশিত গীতিনাট্য 'বসন্ত' উৎসর্গ কবতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। হুগলী জেলে অনশনপর্বে দেশবাসীব সঙ্গে উদ্বিগ্ন ববীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে নজরুলকে অনশনভঙ্গেব

অনুরোধ জানাতে ভোলেননি। অনুজের প্রতি অগ্রজের এসবই ছিল আশ্চর্য স্নেহ আর অনুরাগের উদাহরণ। আকর্ষণীয় নজরুলের সেই সৃষ্টিকে আবির্ভাবের পর থেকেই যে দেশবাসী সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। যদিও পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে তাকে ঘিরে তখনও ছিল অজস্র মিথ্যাচার, বিশ্লেষণের নামে কুৎসা, স্তবের নামে অন্তহীন বজ্জাতি যার মূলে ছিল সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিরোধ।

শতবর্ষেও এই কবিকে ঘিরে পুনরায় দেশবাসীর গভীর আগ্রহ ও অন্তহীন জিজ্ঞাসা। ঐতিহাসিক কারণেই এখন সারা বিশ্বের সংগ্রামী সমাজে নজরুল হয়ে উঠেছেন প্রত্যয়ের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। আজীবন তিনি ছিলেন আলোর সন্ধানী। তার সৃষ্টির ভুবনে তিনি ছিলেন আলোর উদ্দাম পথিক। সেই পথিকের প্রতি শতবর্ষে এই শ্রদ্ধাঞ্জলী তাকে বিচিত্ররূপে জানার ও চেনার সামান্য এক প্রয়াসমাত্র।

সংকলনের পঞ্চাশটি রচনায় নজরুলের প্রতিভার বহুমুখী আলোচনা স্থান পেয়েছে। কবির প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত বিশ্লেষণ, গবেষণা ও কালোত্তর ভাবনার ব্যাখ্যা ও বিকাশই এতে স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সারস্বত প্রতিনিধি তথা নজরুল চর্চায় নিবেদিত গবেষক ও লেখকদেরই এই সংকলনে অগ্রাধিকার। অথচ কলেবরের শাসনে তবু অনেকের লেখা প্রকাশ করতে অক্ষম হয়েছি যার জন্যে আক্ষেপের অন্ত নেই।

নির্বাচিত রচনাগুলিতে কবির জীবনের বহুমুখী পর্যায় তথা স্মৃতির আলোর অজস্র ঝলকানির পাশাপাশি তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা মূলতঃ স্থান পেয়েছে। নজরুল চর্চা এখন বাংলাদেশের অন্যতম গর্ব। তাই কলকাতা ও ঢাকার অধিকাংশ মূল্যবান রচনাই বলতে গেলে এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এদের মূল্যবান এই রচনাগুলি আগামী দিনে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নজরুল চর্চার সহায়ক হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

যৌবনের উদয় শিখর থেকে নক্ষত্রমালার আলো নিয়ে যারা এই নজরুল চর্চায় আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল সেই হেমন্তী, উজ্জ্বাস ও শৌভিককে আমাদের সস্নেহ ভালবাসা।

বাধন সেনগুপ্ত
সুদিন চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য সংকলন

আলোর উদ্দাম পথিক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নজরুলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুসী হলো, কিছু দাবী করেছ -- তোমার দাবী অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুস্কিল এই পঁচাত্তরে পড়তে তোমার এখনো অনেক দেরি আছে, এই জন্যে আমার শীর্ণ শক্তি ও জীর্ণ দেহের পরে তোমার দরদ নেই। কোনো মন্ত্র বলে বয়স বদল করতে পারলে তোমার শিক্ষা হোতো, কিন্তু মহাভারতের যুগ অনেক দূরে চলে গেছে। এখন দেহে মনে মানব সমাজকে চলতে হয় সায়েন্সের সীমানা বাঁচিয়ে।

অনেকদিন থেকে আমার আয়ুর ক্ষেত্রে ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়ে আসছিল। কিছুদিন থেকে তার উপরেও দেহযন্ত্রের বিকলতা দেখা দিয়েছে, এখন মূলধন ভেঙে দেহযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে, যা ব্যয় হচ্ছে তা আর পূরণ হবার উপায় নেই। তোমাদের বয়সে লেখা সম্বন্ধে প্রায় দাতাকর্ণ ছিলুম, ছোট বড় [illegible] মুষ্টি ভিক্ষাও দিয়েছি। কলম এখন কৃপণ, স্বভাব দোষে নয়, অভাববশতঃ। ছোটবড় [illegible] কাগজের পত্রপুট নিয়ে নানা অর্থী আমার অঙ্গনে এসে ভিড় করে। প্রায় সকলকে ফেরাতে হলো। আমার অনাবৃষ্টিব কুয়োর শেষ তলায় অল্প যেটুকু জল জমেছিল সেটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে। [illegible] আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কৃপণের অখ্যাতি শেষ বয়সে স্বীকার করে নিয়ে রিক্ত দানপত্র হাতে বিদায় নেব। যাবা ফিরে যাবে, তারা দুয়ো দিয়ে যাবে, কিন্তু বৈতরণীর মাঝ দরিযায সে ধ্বনি উঠবে না।

আজকাল দেখতে পাই ছোটো ছোটো বিস্তর কাগজের অকস্মাৎ উদ্গম হচ্ছে। ফুল ফসলের চেয়ে তাদেব কাঁটার প্রাধান্যই বেশী। আমি সেকেলে লোক, বয়সও হয়েছে। সাহিত্যে পরস্পর খোঁচা খুঁচির প্রাদুর্ভাব কেবল দুঃখকর নয়, আমার কাছে লজ্জাজনক বোধ হয়।

এই জন্যে এখনকার ক্ষণ সাহিত্যের কাঁচা রাস্তায় যেখানে সেখানে পা বাড়াতে আমার ভয় লাগে। সাবধানে বাছাই করে চলবার সময় নেই, নজরও ক্ষীণ হয়েছে, এই জন্যে এই সকল গলিপথ একেবারে এড়িয়ে চলাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তুমি তরুণ কবি, এই প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক, করুণা দাবী করতে পারে। অকিঞ্চনের কাছে প্রার্থনা করে তাকে লজ্জা দিও না। এই নতুন যুগে যে সব যাত্রী সাহিত্য তীর্থে যাত্রা করবে, পাথেয় তাদের নিজের ভিতর থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়— কখনো যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে পারো খুসী হব। স্বচক্ষে আমার অবস্থাও দেখে যেতে পারবে। ইতি—
১৫ই ভাদ্র ১৩৪২

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজী সব্যসাচীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

লাঙল

প্রধান পরিচালক
নজরুল ইসলাম

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র]

সম্পাদক—
শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | বুধবার, ১লা পৌষ, ১৩৩২ | বিশেষ সংখ্যা

"লাঙল"

—:•:—

যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালা মাথায় ক'রে মাটি বিক্রী করে, সেই পাথর শহর কলিকাতায় "লাঙল" চালাবার দুঃসাহস যাঁরা করেন, তাঁদের সকলেই নিশ্চিত পাগল মনে করছেন। কিন্তু এই পাষাণ শহরেই আমরা "লাঙল" নিয়ে নেমেছি। এই পাষাণের চিরে আমরা সোনা ফলাতে চাই। ব্রহ্মপুত্র স্রোত হিমালয় আটকে রেখেছিল হলধর লাঙলের আঘাতে পাহাড় চিরে সেই স্রোতকে ধরায় নামিয়ে ছিলেন। সেই জল কত প্রান্তর প্লাবন ক'রে কত তৃষিত কণ্ঠের পিপাসা মিটিয়ে বাংলা দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। "লাঙলবন্ধ" আজ বাংলার তীর্থ। মহাত্মাগণের আন্দোলন আজ নেতাদের পাষাণ-পারিপার্শ্বিকে আটকে গেছে—তাই আবার হলধরের ডাক পড়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রলোভনে শহরের সৃষ্টি হ'য়ে পল্লীমুখী বাংলার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে। শাসন এবং শোষণের সহায়তায় মধ্যবিত্ত ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় ক'রে শহরে উঠে এসেছেন। গ্রামের আনন্দ উৎসব রোগ-শোকের চাপে দূর হয়ে গেছে। শহরের নেশায় বাঙালী আজ বুঝছে গ্রাম ছেড়ে এসে তার কি নিরুপায় অবস্থাই হয়েছে। জমিদার আজ গ্রামের সকল কর্ম্মের প্রাণস্বরূপে উপস্থিত নন—তিনি শহরে এসে বাস ক'রে মদ-মাংস মেয়েমানুষ মোটর-বাগান এই পঞ্চ-মকারের সাধনায় নিযুক্ত আছেন। নায়েব গোমস্তার অত্যাচারে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত। মহাজনের হাতে জমির স্বত্ব চ'লে যাচ্ছে। গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটছে—কলকারখানায় কতক ঢুকে নিজেদের সর্ব্বনাশ করছে—আর কতক নানা হীন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করছে। দেশে চুরি, ডাকাতি ও বলাৎকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

'ধূমকেতু'র উদয়

মুজফ্ফর আহ্মদ

'ধূমকেতু'র কথা বলার আগে ক'দিন পরে পরে তা বা'র হতো আর কি তার আয়তন (সাইজ) ছিল, এই কথাগুলি আমায় পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে। এই সম্বন্ধে নানান রকম ভুল ধারণা অনেকের মনেই আছে। এখনও পত্র পত্রিকায় 'ধূমকেতু'র সাইজ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক ভুল কথা লিখছেন। নজরুল ইসলামের জীবনী বিষয়ে একখানি পুস্তকের * চারটি সংস্করণ হয়েছে। এই চারটি সংস্করণেই একই ভুল ছাপা হয়েছে। এর চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হয়েছে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, অর্থাৎ আমার 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' প্রকাশিত হওয়ার তিন বছর কয়েক মাস পরে। আমি এই চতুর্থ সংস্করণ হতে তুলে দিচ্ছি : –

"এই সময়ে তাঁর [নজরুলের] ইচ্ছে হল একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবার। শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙে নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত ক'রে তোলার জন্যে তিনি ৩২নং কলেজ স্ট্রীট থেকে তার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন (১৩২৯; ১৯২২, ১২ আগস্ট), ফুলস্কেপ সাইজ, চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম এক পয়সা।"

"অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্যে 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিক থেকে কিছু দিন অর্ধ সাপ্তাহিক হিসেবেও বেরোয়।"

আসলে নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' কিন্তু সপ্তাহে দু'বার বা'র হতো। "হপ্তায় দু'বার দেখা দেবে" এই ঘোষণা কাগজেই থাকত। 'ধূমকেতু' কখনও "সাপ্তাহিক" থেকে "অর্ধ-সাপ্তাহিক" হয়নি।

"ধূমকেতু'র প্রতি পৃষ্ঠার সাইজ ছিল লম্বায় পনের ইঞ্চি ও চওড়ায় দশ ইঞ্চি, অর্থাৎ ক্রাউন ফলিও সাইজ। এই রকম আট পৃষ্ঠার কাগজ ছিল 'ধূমকেতু'।

একখানা 'ধূমকেতু'র নগদ দাম ছিল এক আনা আর তার এক বছরের গ্রাহক হওয়ার চাঁদা ছিল পাঁচ টাকা।

'ধূমকেতু'র সারথি (সম্পাদক) ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তার কর্মসচিব (ম্যানেজার) ছিল শ্রীশান্তিপদ সিংহ। কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন আফজালুল হক সাহেব।

নজরুল ইসলামের অন্যতম চরিতকার ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিত মানসে' 'ধূমকেতু'র এই আয়তন ইত্যাদির কথাগুলি সঠিক দিয়েছেন।

নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু'র কয়েকটি সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে।

দশ বছর পরে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিকের 'ধূমকেতু' নজরুলের 'ধূমকেতু' ছিল না।

* বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান প্রণীত।

এখন আমি কিঞ্চিৎ আগেকার ঘটনাসহ 'ধূমকেতু'র জন্মকথা বলব। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাড়ী হতে নজরুল ইসলাম কুমিল্লা চলে যায়। তারপরে সে আর আমি একসঙ্গে আর কখনো থাকিনি। কুমিল্লায় সেইবারে সে একসঙ্গে তিন চার মাস ছিল। চার মাসের কিছু কমই হবে। এইবারে কুমিল্লাতে থাকার সময়েই সে তার বিখ্যাত "প্রলয়োল্লাস" কবিতা রচনা করেছিল। এই কবিতার কথা আমি পরে আলোচনা করব। কবিতাটি 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল।

'সেবকে'র বিশেষ অনুরোধে নজরুল কুমিল্লা হতে কলকাতায় ফিরে এসেছিল। 'সেবক' বাঙলা দৈনিক কাগজ ছিল। তার মালিক ও সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মুহম্মদ আক্রম খান। রাজদ্রোহের (ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-এ ধারায়) অপরাধে তখন তিনি এক বছরের কয়েদ খাটছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ইংরেজী কাগজ 'সার্‌ভেন্ট' এর নামের সঙ্গে অর্থের মিল রেখে মাওলানা আক্রম খান তাঁর কাগজের নাম 'সেবক' রেখে ছিলেন। মূলত বিরাট ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনের কাগজ ছিল 'সেবক'। যদিও এই আন্দোলনের হাজার হাজার বন্দী তখনও জেলে ছিলেন তবুও ১৯২২ সালের মে জুন মাস পর্যন্ত আন্দোলন স্তিমিত হযে গিয়েছিল। 'সেবক' আর তেমন বিক্রয় হচ্ছিল না। মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী সাহেব তখন ছিলেন 'সেবকের' প্রকৃত সম্পাদক। 'নবযুগের' প্রসঙ্গে তাঁর কথা আমি বলেছি। কাগজের বিক্রয় পড়ে যাওয়ার কথা তিনি আমায় বললেন এবং আরও বললেন যে "নজরুল ইসলামকে মাসিক একশ' টাকা বেতন দেওয়ার কথা ব'লে কুমিল্লায় তিনি পত্র লিখে দিচ্ছেন। তিনি এসে লেখা আরম্ভ করলে যদি কাগজের বিক্রয় বাড়ে," এই কথাও বললেন ওয়াজিদ আলী সাহেব। পত্র পেয়েই নজরুল কুমিল্লা হতে চলে এলো। বলা বাহুল্য, কুমিল্লায় সে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসাতেই ছিল।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল যদি কলকাতায় ফিরে না এসেও থাকে তবে জুন মাসের শুরুতে ফিরে এসে সে নিশ্চয় 'সেবকে' যোগ দিয়েছিল। ২৪শে জুন (১৯২২) তারিখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান। এই মৃত্যু নজরুলকে খুবই বিচলিত করেছিল। পরের ভোরের 'সেবকে' সে গভীর অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা মিশিয়ে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিল। আমার যতটা মনে পড়ে এত অনুভূতি দিয়ে অন্য কোনো কাগজ কবি সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লেখেনি।

নজরুল 'সেবকে' কাজ করেই যাচ্ছিল। এর মধ্যে এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত অবস্থায় একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করার কথা একজন এসে তার নিকটে তুলল। হাফিস মস্‌উদ আহ্‌মদ নামক একজন লোকের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। তার বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম জেলায়। যাঁদের পুরো কুর্‌আন মুখস্ত থাকে তাঁদের হাফিজ বলা হয়। মস্‌উদ আহ্‌মদেরও সম্ভবত কুরআন মুখস্থ ছিল। সে দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়েছিল বলে তাকে আমি খানিকটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। উত্তর প্রদেশের সাহারনপুর জিলায় দেওবন্দ মাদ্রাসায় ধার্মিক ভিত্তিতে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হতো। তবে, সেখানকার প্রত্যেক ছাত্রই যে বিপ্লবী হতো এমন কোনো কথা নয়। মস্‌উদ আহ্‌মদকে অন্য কারণে আমি পছন্দ করতাম না। বাঙালী হয়েও বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গেও সে উর্দুতে কথা বলত। এটাই ছিল কারণ যার জন্যে তার সঙ্গে আমি কখনও ঘনিষ্ঠ হইনি। মনে আছে একদিন বিকাল বেলা আমি ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিলাম। কোথা থেকে মস্‌উদ আহ্‌মদ আমার পাশে এসে দাঁড়াল এবং কেমন আছি ইত্যাদি কথা আমায় জিজ্ঞাসা করল। শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে মস্‌উদ আহ্‌মদ বাঙলায় কথা বলছে, যদিও ভালো বাঙলা বলার চেষ্টা ক'রে সে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল। সে 'সমস্যা'কে উচ্চারণ করছিল 'সমিস্যা'। তখন বুঝেছিলাম যে শিশু বয়স হতেই মস্‌উদ আহ্‌মদ মাদ্রাসায় পড়েছে, বাঙলা লেখা পড়া কখনও করেনি। তার মাতৃভাষা ছিল চাটগাঁর বিশিষ্ট বাঙলা বুলি। সে বুলিতে সে বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কখনও বলত না।

মস্‌উদ আহ্‌মদ আমার নিকটে একটি প্রস্তাব করল যে একখানা বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকা সে বা'র করতে চায় এবং তার লেখার ও চালাবার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। কাগজখানা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিক কাগজ হবে একথাও সে আমায় বলল। খালিফা ওমর যে 'সোশ্যালিজমে'র খানিকটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করতেও সে ভুলল না। সব শুনে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম টাকার কি ব্যবস্থা হবে? সে জানাল যে আড়াইশ' টাকা সে জোগাড় করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার প্রস্তাব নাকচ করে দিলাম। আমি তাকে বলে দিলাম যে আড়াইশ' টাকা মাত্র হাতে নিয়ে কাগজ বা'র করতে যাওয়া হঠকারিতা হবে। মনে হলো যে সে হতাশ হয়ে চলে গেল। আসলে সে কিন্তু হতাশ হয়নি। আমি তার প্রস্তাব নাকচ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে সোজা কাজী নজরুল ইসলামের নিকটে চলে গেল এবং একই প্রস্তাব তার নিকটেও করল। 'সেবক'-এ নজরুল সুখী ছিল না। কাজেই, মস্‌উদ আহ্‌মদের প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। একাজে তার যাওয়া উচিত কিনা এ পরামর্শ সে কারুর সঙ্গে করল না, আমার সঙ্গে তো নয়ই। কারণ, আমি মস্‌উদ আহ্‌মদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছিলেম। বন্ধুদের সে শুধু জানাল যে একখানা কাগজ সে বা'র করতে যাচ্ছে, সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি চায়। মস্‌উদ আহ্‌মদের প্রস্তাব ছিল সাপ্তাহিক কাগজের, কিন্তু নজরুল ঠিক করল যে কাগজখানা সপ্তাহে দু'বার বা'র হবে।

নজরুলই কাগজের নাম স্থির করল 'ধূমকেতু'। আফ্‌জালুল হক সাহেব মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হতে ডিক্লারেশন নিলেন। তখন ডিক্লারেশন নেওয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল। জামানত হিসাবে টাকা জমা দিতে হতো না। ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট। কুমিল্লা হতে ফিরে এসে 'সেবকে' যোগ দেওয়ার পরে নজরুল আফ্‌জাল সাহেবের সঙ্গে এ বাড়ীতেই ছিল।

বাণী চেয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (তখন পণ্ডিচেরীতে ছিলেন) এবং আরও অনেককে পত্র লিখেছিল। বাণী তাঁদের নিকট হতে এসেওছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিতায় নিম্নলিখিত কয় ছত্র পাঠিয়েছিলেন :

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এ দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্‌না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ ১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ফটোস্টাট কপি হতে উদ্ধৃত)

রবীন্দ্রনাথ একবার নজরুলকে তলওয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন তিনি সত্যই, কিন্তু কথাটা নানান জনে নানান ভাবে লিখেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এক জায়গায় কথাটা লিখেছেন। আমি নজরুলের মুখে যা শুনেছিলেম তা হচ্ছে এই যে সাক্ষাতের প্রথম দিনেই রবীন্দ্রনাথ কথাটা নজরুলকে বলেছিলেন। তখনও তিনি ভাবেননি যে নজরুল গভীরভাবে রাজনীতিক সংগ্রামে

বিশ্বাসী। নজরুল কবি, কাব্যচর্চাই তার পেশা হওয়া উচিত, তার মানে রাজনীতিতে তার যাওয়া উচিত নয়— এই সব ভেবেই তিনি তলওয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছার কথাটা বলেছিলেন। অন্তত, নজরুল তাই বুঝেছিল। রবীন্দ্রনাথ শুধু ওই কথা বলেই চুপ করে যাননি। তিনি তার সঙ্গে একটি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন ; বলেছিলেন, নজরুল শান্তিনিকেতনে চলুক। সেখানে সে ছেলেদের কিছু কিছু ড্রিল শেখাবে আর গান শিখবে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে।

কিন্তু 'ধূমকেতু'র জন্যে নজরুল যখন রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে বাণী চাইল তখন তিনি তাকে বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে সে নিজে সে পথ বেছে নিয়েছে তাকে সেই পথে যেতে দিলেই সে বিকশিত হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ যে বাণী নজরুলকে পাঠিয়েছিলেন সেটা ছিল নজরুলের প্রতি তাঁর রাজনীতিক আশীর্বাদ। তাই তিনি তাকে ব'লে দিলেন—

"জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন"।

যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প দিনের ভিতরে এবং দূরে থেকেও বুঝে নিয়েছিলেন সে কথাটা মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুলের আরও কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধু খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কোনো দিন বুঝতে পারলেন না।

১২ই আগস্ট (১৯২২) তারিখে 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা বা'র হলো। শিক্ষিত তরুণদের ভিতরে সঙ্গে সঙ্গেই তা জনপ্রিয়তা লাভ ক'রে ফেলল। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী মাথায় বহন করেই 'ধূমকেতু' বা'র হতে লাগল। ওদিকে মস্‌উদ আহ্‌মদ পুরো আড়াই শ' টাকাও দিতে পারল না। যতটা মনে পড়ে সে দু'শ টাকা পর্যন্ত দিয়েছিল। পরে আমি জানতে পেরেছিলেম যে সে পুলিশের দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিল। টাকাও তার পুলিসের নিকট হতেই পাওয়ার কথা ছিল। পুলিসই সম্ভবত টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। বাকী পঞ্চাশ টাকা মস্‌উদ আহ্‌মদ দিলেও তেমন কোনো সাশ্রয় হতো না। আর্থিক সঙ্কট শুরু হতেই শুরু হয়েছিল ; তবুও যে কাগজ চলছিল তার কারণ ছিল এই যে কাগজ নগদ বিক্রয় হয়ে কিছু কিছু পয়সা সঙ্গে সঙ্গেই এসে যাচ্ছিল ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বা অগ্রিমও টাকা দিচ্ছিল এমন ক'টা বিজ্ঞাপনও পাওয়া গিয়েছিল। 'এক্সপার্ট এড্‌ভারটাইজিং এজেন্সী' সেই সময়ে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিল 'ধূমকেতু'কে।

'ধূমকেতু'তে জনগণের কথা একেবারেই বলা হতো না, এটা মোটেই ঠিক কথা নয়। তবে 'ধূমকেতু'র মারফতে নজরুল মূলত তার আবেদন জানাচ্ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের বরাবরে। নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের খাতিরে বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছিলেন। নজরুলের আবেদন আসলে পৌঁছে যাচ্ছিল তাঁদেরই নিকটে।

'ধূমকেতু' জনগণের নিকটে পৌঁছাতে পারেনি। শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর ভিতরে তার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই 'ধূমকেতু' খুব বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও এই শ্রেণীর লোক। কাজেই, নজরুলের আবেদনে তাঁরাই নূতন ক'রে চেতনা লাভ করেছিলেন। এটা আমার অনুমানের কথা নয়। শুধু যে তরুণেরা নজরুলের নিকটে আসছিলেন তা নয়, সন্ত্রাসবাদী 'দাদা'রাও (নেতারা) এসে তাকে আলিঙ্গন ক'রে যাচ্ছিলেন। ১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান ছিল, একথা বললে বোধ হয় অন্যায় করা হবে না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দু'টি বড় বিভাগের মধ্যে 'যুগান্তর' বিভাগের সভ্যরা তো বলছিলেন, 'ধূমকেতু' তাঁদেরই কাগজ।

নজরুল যে শ্রীনিবারণ ঘটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সেকথা আগে বলেছি। কিন্তু সে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কোনো দলের সভ্য ছিল না। অতিমাত্রায় নিরুপদ্রবতা প্রচারের ফলে দেশ খানিকটা মিইয়ে গিয়েছিল। এই মিয়ানো হতে নজরুল তার লেখার ভিতর দিয়ে দেশকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলতে

চেয়েছিল। এই করতে গিয়ে সে যে ঢেউ তুলেছিল তার দোলা লাগল গিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাণে।

মহান উর্দু কবি ফজলুল হাসন হস্‌রৎ মোহানী আহমদাবাদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে কঠিন মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বাঙলার কবি নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে 'ধূমকেতু'তে লিখেছিল :

"প্রথম সংখ্যার 'ধূমকেতু'তে সারথির পথের খবর' প্রবন্ধে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করেছিলাম, যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে উঠেনি মনের চপলতার জন্য। আজও হয়ত নিজেকে যেমনটি চাই তেমনটি প্রকাশ করতে পারব না, তবে এই প্রকাশের পীড়ার থেকেই আমার বলতে না পারা বাণী অনেকেই বুঝে নেবেন -- আশা করি।

☆ ☆ ☆

"সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

"স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেন না, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোচকা পুটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।"

অনেকে হয়তো নিজেদের বৈঠকখানায় বসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিংবা হয়তো গোপন ইশ্‌তিহার ছেপে তার মারফতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু এমন দ্ব্যর্থহীন, চাঁছা ছোলা ভাষায় খবরের কাগজে ঘোষণা ক'রে বাঙলা দেশে নজরুলের মতো আর কে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে তুলে ধরেছিলেন তা আমার জন্য নেই।* লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমি ১৯২২ সালের কথা বলছি, যখন গান্ধীজী বলেছিলেন, 'ডোমিনিয়ন স্টাটাস্' পেলেই তিনি 'ইউনিয়ন জ্যাক্' (ব্রিটিশ পতাকা) উড়িয়ে দেবেন! তাছাড়া, পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী হতে উত্থিত মাওলানা হস্‌রৎ মোহানীর বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি সবেমাত্র তখন বোম্বে হাইকোর্টে হয়েছিল। ১৯২১ সালের শেষ সপ্তাহে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের ও অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন আহ্‌মদাবাদে হয়েছিল। ১৯১৬ সালে লখ্‌নউ সমঝতার পর হতে এই দু'টি সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশন একই সময়ে একই জায়গায় হয়ে আসছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির, অবশ্য ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির, তরফ হতে সর্বপ্রথম ইশ্‌তিহার বিতরিত হয়েছিল। তাতে যে

---

* কাজী নজরুল ইসলামের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এই কথার প্রতিবাদ করেছেন। (কথাসাহিত্য' আষাঢ়, ১৩৭৩)। ১৯০৭ সালের 'বন্দেমাতরম্' কাগজ হতে কিছু কিছু লেখা তুলে দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম সেই দাবী করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সে যুগে শ্রীবিপিনচন্দ্র পালও করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ শিশু বয়স হতে ইংল্যাণ্ডে, ইংরেজের কাছে মানুষ হয়েছেন। ইংরেজি তাঁর মাতৃভাষা। বাঙলা তিনি দেশে ফিরে এসে শিখেছিলেন। তাঁর ইংরেজি লেখার উপরে কোনো কথা বলতে যাওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু, তিনি তো শুধু অটোনমি ও 'সেলফ্ গভর্নমেন্ট' কথা ব্যবহার করেছেন, কোথাও তো ছোট্ট 'ইণ্ডেপেণ্ডেন্স' (পরিপূর্ণ স্বাধীনতা) কথাটা ব্যবহার করেননি। কেন না সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চিরজীবন 'অটোনমি' ও 'সেল্ফ গবর্নমেণ্ট' দাবী করতেন। কেউ তো বলেন না যে তিনি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করতেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে 'অটোনমি', 'সেল্ফ গভর্নমেন্ট' ও 'ইণ্ডেপেণ্ডেন্স' কি একার্থবোধক? আর, শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের কথা। তিনি তো বলেছেন, ভগবান যদি একই সঙ্গে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' ও পূর্ণ স্বাধীনতা' তাঁর হাতে এনে দেন তবে তিনি 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্‌কে'ই বেছে নেবেন। জনসভায় নিজের কানে তাঁর মুখের যে কথাগুলি শুনেছি সেসব এখানে বলব না, আমি যুগান্তর দলের বিশিষ্ট নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' নামক গ্রন্থখানা সকলকে একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। (লেখক)

ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেসের এই আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনেই মাওলানা হস্‌রৎ মোহানী উর্দু ভাষায় ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।* তার আগে কংগ্রেসের মঞ্চ হতে আর কখনও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতায় প্রস্তাবটি পাস হতে পায়নি। কিন্তু মাওলানা হস্‌রৎ মোহানীকে প্রস্তাবটি উত্থাপনের কারণে ফল ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আহ্‌মদাবাদের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code) ১২৪-এ ধারা (রাজদ্রোহ) ও ১২১ ধারার (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা) মোকদ্দমা রুজু হল। পুলিস সোজাসুজি তা দাযের করতে পারে না। তার আগে প্রাদেশিক কিংবা ভারত গবর্নমেন্টের মঞ্জুরী নিতে হয়। বুঝতে হবে যে পুলিস এই মঞ্জুরী পেয়েছিল। অল ইণ্ডিয়া মুস্‌লিম লীগের অধিবেশনে মাওলানা হস্‌রৎ মোহানী স ভাপতি ছিলেন। সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতার বিষযে বক্তৃতাব জন্যে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারার (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার) মোকদ্দমাটি হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রস্তাব উত্থাপনের জন্যে যে বাজদ্রোহের মোকদ্দমা হয তাতে তাঁর দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১২১ ধারার মোকদ্দমায় জুররা মাওলানা হস্‌রৎ মোহানীকে নির্দোষ ঘোষণা কবলেন। সেশন জজ্ তাদের সঙ্গে একমত হলেন না। এই ধারায সর্বনিম্ন সাজা হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সর্বোচ্চ সাজা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। অন্তত সর্বনিম্ন সাজার কথা মনে রেখেই জজ্ জুরিদেব সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কাজেই, ধরে নিতে হবে যে সেশন জজ্ হস্‌রৎ সাহেবকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজাই দিয়েছিলেন। এই রকম অবস্থায় ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের বিধানানুসারে মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাতে হয়। তাই পাঠানো হযেছিল। কিন্তু সেশন জজের জুরিদের সঙ্গে একমত না হওযাব কাবণ দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর ঝোঁক ১২১ ধারার দিকেই দিল। এইজন্যে কোনো কোনো কাগজ তখন লিখেছিল হস্‌রৎ সাহেবকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের জজেরা মত প্রকাশ করলেন যে শুধু বক্তৃতার জন্যে ১২১ ধারার প্রযোগ হতে পারে না। তাঁরা রাজদ্রোহের সাজা (দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড) বহাল রেখেছিলেন। আমি হাইকোর্টের রায়.পড়িনি। সম্ভবত পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথাটা জজেরা এড়িযে গিয়েছিলেন। ১১ই জুলাই, ১৯২২ তারিখে হাইকোর্ট মোকদ্দমার রায দিযেছিলেন। নজরুলের ওপরে উদ্ধৃত লেখার সঙ্গে মাওলানা হস্‌রৎ মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি তুলনীয়। মাওলানা হস্‌রৎ মোহানীর হাইকোর্টের মোকদ্দমা সবে শেষ হয়েছিল। আগে এইভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কোনো বৈধ কাগজে এইরূপ খোলাখুলিভাবে কেউ বলেছেন ব'লে আমার জানা নেই। গোপন ইশ্‌তিহারে অনেকেই বলে থাকতে পারেন। অনেক শক্ত বুকের পাটা ছিল বলেই নজরুল এইভাবে খোলাখুলি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতে পেরেছিল, এই বলার জন্যে হস্‌রৎ মোহানীর কঠোর সাজা হওয়া সত্ত্বেও।

'ধূমকেতু'র কল্যাণে অনেক নূতন নূতন লোকের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। অনেক সব নূতন বন্ধু নজরুল পেয়েছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সেই সময়েই হয়েছিল নজরুলের প্রথম পরিচয়। ছোট ছেলে বললেই হয়, যতটা মনে পড়ে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে তখন সে পড়ত। কিন্তু আই. এ. ক্লাসে পড়লে কি হয়, নানান বিষয়ে নৃপেনের অনেক পড়াশুনা ছিল। যাঁর সঙ্গেই তখন তার পরিচয় হয়েছে তিনিই নৃপেনকে না ভালোবেসে পারেননি। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের জীবন নিয়ে নৃপেন 'ধূমকেতু'তে লিখত। নিজের নাম দস্তখৎ করত ত্রিশূল। 'ধূমকেতু' বার করতে

* The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj or Complete Independence free from all foreign Control by the People of Ind'a by all legitimate and peaceful means."

আর বেঙ্কটবামন (বোম্বে ক্রনিকল), কুমাবানন্দ, ইয়াকুব আলী খান, অন্ধ্র দেশেব ভি. পি. আলওয়াব সবজেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবটি সমর্থন কবেছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে হস্‌বৎ মোহানীব উপস্থিত হতে কিঞ্চিৎ দেবী হওয়ায় কুমিল্লাব বসন্ত মজুমদাব প্রস্তাবটিকে আপন প্রস্তাব ব'লে মেনে নিয়েছিলেন।

গিয়ে নজরুল যাঁদের নূতন বন্ধুরূপে পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে নৃপেন ছিল নজরুলের একটি বড় পাওয়া। নৃপেন আমারও স্নেহাস্পদ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। যে অল্প সংখ্যক লোকের সঙ্গে আমি কথাবার্তায় তুমি বলতাম কিংবা এখনও বলি তাদের ভিতরে সেই ছিল একজন। সে কোনো দিন 'আপনি' কথা আমাকে উচ্চারণ করতেই দেয়নি। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে 'টক্' দিতে গিয়ে যখন নজরুলের রোগের লক্ষণ দেখা দিল, তার জিহ্বা জড়িয়ে যেতে লাগল, তখন নৃপেনই ছিল নজরুলেব পাশে। সে-ই সেদিন নজরুলকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

বাঙলা সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর আমাদের ভিতরে নেই। অকালে মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা এবং কংগ্রেসেরও নেতা শ্রীভূপতি মজুমদারও 'ধূমকেতু'কে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন, অর্থ দিযে নয়, অন্য সব রকমে। তিনি কোনো কোনো দিন 'ধূমকেতু' আফিসেই রাত্রি বাস করতেন। শ্রীমজুমদারকে বাঙলা দেশে কে না জানেন? দু'বার তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন।

আর একজন 'ধূমকেতু'কে সাহায্য করতে এসেছিলেন কলম হাতে নিযে। তাঁর নাম বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কুমিল্লার শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পুত্রের সঙ্গে তাঁকে কেউ যেন ভুল না করেন। তাঁর নাম ছিল বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তরা আসলে ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার লোক। তবে, তাঁর পরিবার স্থাযীভাবে বাকেরগঞ্জ জিলায বাস করতেন। তিনি 'ধূমকেতু'তে লিখতেন। কোন কাগজের সম্পাদকীয বিভাগের একজন লোককে যেমন প্রতিদিন লিখতে হয ঠিক সেইরকমই লিখতেন তিনি 'ধূমকেতু'তে। পরে তিনি ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়া এবং ইউনাইটেড্ প্রেস অফ ইণ্ডিয়াতেও কাজ করেছেন। শুনেছি এখন তিনি কোনো একটি ব্যবসার প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।

বলাই দেবশর্মার লেখা 'ধূমকেতু'তে ছাপা হযেছে এবং আরও অনেকের লেখা। অধ্যাপক হুমাযুন কবীর তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পডতেন প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাঁকেও 'ধূমকেতু' অফিসে আসতে দেখেছি। তাঁর লেখাও 'ধূমকেতু'তে ছাপা হয়েছে। মনে পড়ে আমিও 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে দু' একবার 'ধূমকেতু'তে লিখেছি। কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে নজরুলের তখন পুরোপুরি ছাড়াছাড়ি হযে গেছে। তবুও তাঁকে আমি একদিন 'ধূমকেতু' অফিসে আসতে যে দেখেছি তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে সময়ে নজরুল অফিসে উপস্থিত ছিল না। তাঁর ছাত্র শ্রীশান্তিপদ সিংহ ও আমার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেছিলেন। নজরুল হিন্দু দেবদেবীর কথা লিখত। 'ধূমকেতু'তেও তাই লিখছিল। তার জন্যে সেদিনই মোহিতলাল বলেছিলেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" এই ব'লে তিনি আমরা সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন কিনা কে জানে?

৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট হতে 'ধূমকেতু'র সাত আট সংখ্যা বা'র হয়েছিল। শীল ভ্রাতৃদের বাড়ীর ওই অংশটা "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি" ভাড়া নিয়েছিল। তা থেকে একখানা ঘর আফ্‌জালুল হক সাহেবকে সাহিত্য সমিতি সব্‌লেট করেছিল। এই কথা আমি আগেও বলেছি। 'ধূমকেতু'কে নিয়ে পুলিসের হাঙ্গামা হতে পারে ভেবে শীল ভ্রাতৃগণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফ্‌জালুল হক সাহেব শীলেদের ভাড়াটে ছিলেন না। এই সুযোগ নিয়ে শীলেদের যে ভাইটি উকিল ছিলেন তিনি রাগে গরগর করতে করতে একদিন এসে বললেন যে "এখান হতে আমরা 'ধূমকেতু' বার করতে দেব না।" তখন আজকার মতো এমন কোনো আইন ছিল না যে যার দ্বারা ভাড়াটের ভাড়াটে কেউ হলে তাঁরও দাবী বর্তাতে পারে। আসলে কিন্তু অন্যত্র উঠে যাওয়ার জন্যে আগে হতেই নজরুল বাড়ী খুঁজছিল। সেই কথাই বাড়ীর মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হলো। 'ধূমকেতু' বিলি করার হকারদের যিনি প্রধান ছিলেন বালিয়া জিলার সেই দুবে (তাঁর নাম কিছুতেই এখন মনে করতে পারছিনে) এর মধ্যে একটা বাড়ী বের করেও ফেলেছিলেন। দৈনিক 'নবযুগ' বিলি করার কন্‌ট্রাক্টও এই দুবেকেই

দেওয়া হয়েছিল। তার ভিতর দিয়ে আমার ও নজরুলের সঙ্গে তার একটা ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল। আমাদের বা'র করা কাগজকে তিনি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন। ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের বাড়ীটি দুবেই ভাড়া ক'রে দিয়েছিলেন, দোতলায় তিনটি খুব বড় বড় ঘর। রান্না ঘরও ছিল। যতটা মনে পড়ে পায়খানা ও স্নানের জায়গা ছিল নীচে।

প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। মেডিক্যাল কলেজের সামনেকার এই গলিতে ঢুকে বাঁ দিককার শেষ বাড়ীটি ছিল সুবিখ্যাত সাহিত্য স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। এটা একটা একমুখো গলি ছিল। বঙ্কিম চট্টোপাধ্যাযের বাড়ীটি 'ধূমকেতু' অফিসের গায়ে লাগা ছিল, না, তার একটি বাড়ী পরে ছিল তা আজ আমি মনে করতে পারছিনে। আমি অন্য সময়ে অন্য কাজে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়েছি। সেই বাড়ীতে মেয়েদের পর্দার যে ব্যবস্থা দেখলাম তা মুসলমানদেরও হার মানিয়ে দেয়।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদলেব নেতারা 'ধূমকেতু'র প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের বাডীতেই বেশী এসেছেন। এই বাড়ীতে গিযেই অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মিত্রের সহিত নজরুলের প্রথম পরিচয় হয। 'ধূমকেতু' অফিসের একেবারে গায়ে লাগা উত্তর দিকে ছিল অধ্যাপক মিত্রদের বাডী। তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইকনমিকস্ পড়াতেন। তখন তিনি নূতন যুবক। নজরুলের চেয়ে দু'চার বছরের বড় হয়তো হবেন। পরে নজরুলের লেখা একখানা পত্রে দেখেছি সে অধ্যাপক মিত্রকে বডদা ডাকত। শ্রীমিত্র বোধ হয বাড়ীতে ভাইবোনেদের বড়দা ছিলেন। তাঁর একটি ছোট বোন ছিল, এগারো বছর বয়স হবে। ওই বয়সেই সে লিখতে পারত। তার ছোট ছোট লেখা 'ধূমকেতু'তে ছাপা হয়েছে। "আনন্দময়ীর আগমনে" 'ধূমকেতুর' যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল সেই সংখ্যায় এই মেয়েটিরও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নাম দিয়ে একটি লেখা বা'র হযেছিল। "আনন্দময়ীর আগমনে'র সঙ্গে বাঙলার সরকার এই লেখাটিকেও বাজযাফ্‌ৎ করেছিল। এই মেয়েটির নাম আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এখন (মার্চ, ১৯২১) শ্রীশান্তিপদ সিংহ আমায জানিয়েছে যে তার নাম ছিল লীলা মিত্র। কুমারী লীলা বড় হয়ে বিয়ে করেছিলেন। খবর পেলাম তিনি অকালে মারা গেছেন।

একজন অন্তত লিখেছেন যে 'ধূমকেতু'র বা'র করা ও পবিচালনার পেছনে আমারও হাত ছিল। ওপরে আমি যা দেখেছি তা থেকে সকলে নিশ্চয় বুঝেছেন যে আমার কোনো হাত তাতে ছিল না। ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসে নজরুল আর আমি ঠিক করি যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিয়ে যাব। পড়াশুনা করব বলে সামান্য কিছু পুঁথি পুস্তকও কিনেছিলাম। এই অবস্থাতেই ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল তার "বিদ্রোহী" লিখেছিল। কিন্তু ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুল কুমিল্লায় চলে গিয়ে অনেকদিন সেখানে থাকল। সেই সময়ে চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ চটাচটিও হয়ে গেল। অবশ্য, এমন কোনো চটাচটি নয় যার জন্যে আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে। কুমিল্লা গিয়ে নজরুল যে 'প্রলয়োল্লাস" লিখেছিল সেটা আমার দৃষ্টিতে ঠিকই ছিল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে 'ধূমকেতু'তে লিখতে গিয়ে নিজের প্রচণ্ড আবেগের স্রোতে সে নিজেই ভেসে গেল। সে যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করবে স্থির করেছিল তার সেই বিবেককে সে লাল পোশাক পরে, লাল কালিতে লিখে, এবং মাঝে মাঝে লাল নিশানের কথা ব'লে ঠিক রাখছিল। কিন্তু নজরুল যদি গিরেফ্‌তার না হতো এবং তার 'ধূমকেতু' যদি চলতে থাকত তবে তার লেখা তাকে বদলাতে হতো। এই জাতীয় লেখা ক্রমাগত লেখা যায় না। ভিতরের আবেগ নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন নজরুলকে জনগণের দিকেই ঝুঁকতে হতো। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমায় একদিন বলেছিলেন যে তাঁর ভিতরের আবেগ সবই শেষ হয়ে গেছে। ভাবপ্রবণ লেখা তিনি আর লিখতে পারবেন না। তাঁকে বিষয় ঠিক করে দিলে, তাঁর সামনে কোনো প্রোগ্রাম খাড়া করলে, তবেই তিনি লিখতে পারবেন।

'ধূমকেতু'র ওপরে পুলিসের খুব কড়া নজর থাকাই স্বাভাবিক ছিল এবং সে নজর ছিলও। কি ধরনের লোকেরা 'ধূমকেতু' অফিসে আসেন তাঁদের ওপরেও পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি দৃষ্টি ছিল। 'ধূমকেতু'র পেছনে কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টি আছে কিনা এবং 'ধূমকেতু'কে কেন্দ্র করে কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠছে কিনা, এই সম্বন্ধে পুলিস স্থিরনিশ্চয় হতে চেয়েছিল। এই জন্যে 'ধূমকেতু' এত যে লিখছিল তবুও পুলিশ কিছু বলছিল না।

কিন্তু শাসনের জন্যে একা পুলিস তো ছিল না, পুলিসকে বাদ দিয়েও বঙ্গীয় প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্ট ছিল। গবর্নমেন্টের বাঙলা অনুবাদকের অফিসে নজরুলের লেখা ইংরাজিতে অনুবাদ হয়ে হোম ডিপার্টমেন্টের পলিটিকাল সেক্শনের অফিসারদের টেবলে চলে যেতো। তাঁরা লেখাগুলির ওপরে মন্তব্য লিখতেন। শুনেছি এমন দেশীয় অফিসাররাও সেখানে ছিলেন যাঁরা নজরুলের কবিতাগুলিকে বাজয়াফ্‌ৎ হওয়ার হাত হতে বাঁচাতে চাইতেন। 'ধূমকেতু'র লেখা নিয়ে নজরুলের কি হবে, না হবে, সেকথা নাকি তাঁরা ভাবতেন না। কাগজে লেখার জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-এ ধারানুসারে মোকদ্দমা হয়। এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ। রাষ্ট্রদ্রোহিতার যে ক'টা ধারা আইনে আছে তার কোনো একটি ধারানুসারে মোকদ্দমা করতে হলে পুলিস সোজাসুজি মামলা দায়ের করতে পারে না। তার জন্যে প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি আগে নিতে হয়। বাঙলা সরকারে এই অনুমতি দেওয়ার অধিকার ছিল বিচার (জুডিশিয়েল) বিভাগের। বাঙলা দেশে গবর্নরের এক্জেকিউটিভ কাউন্সিলে জুডিশিয়েল ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মেম্বর ছিলেন সার আবদুর রহীম। তিনি বললেন মামলা করার অজুহাত যখন আছে তখন মামলা দায়ের এখনই করা হোক। পুলিস যে আরও অপেক্ষা করতে চাইছিল সেটা তিনি শুনলেন না।

গিরেফ্‌তারের পরওয়ানা বা'র হলো সম্পাদক কাজী নজরুল ইস্‌লামের ও মুদ্রাকর প্রকাশক আফ্‌জালুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে।

মামলা মোকদ্দমায় পুলিসের মত ইত্যাদি সম্বন্ধে যে কথাগুলি আমি এখানে বলেছি সেই কথাগুলি নানান সূত্র হতে শোনা কথা। এই সম্বন্ধে আমার হাতে কোনো সঠিক দলীল কখনও আসেনি। কথাগুলি সত্যও হতে পারে, আবার সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণও হতে পারে।

গিরেফ্‌তারী পরওয়ানা বা'র হওয়ার আগে নানান রকম খবর আসতে লাগল। নজরুলের নিকটে একদিন খবর এলো মোকদ্দমার কাগজপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর একদিন খবর এলো এবার গবর্নমেন্ট মোকদ্দমা দায়ের করার অনুমতি দিতে যাচ্ছে। কেউ কেউ নজরুলকে গা ঢাকা দিতে বললেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তরফ হতে মানবেন্দ্রনাথ রায় তখন ভারতের চার্জে রয়েছেন। কবিকে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা তিনি আমায় লিখেছিলেন। আমি নজরুলকে সেই কথা মনে করিয়ে দিলাম। বল্‌লাম, "গা ঢাকাই যদি দেবে তবে ইউরোপে কেন চলে যাবে না? পাঠানোর ব্যবস্থা করা খুবই শক্ত। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।" নজরুলের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। সে পুলিসের নজর হতে সাময়িক ভাবে সরে গেল বটে, আসলে কিন্তু গা ঢাকা দিল না। সে যখন কুমিল্লা হতে ফিরে আসছিল তখন তার সঙ্গে সকন্যা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীও এসেছিলেন। তাঁরা কলকাতা অতিক্রম সমস্তিপুরে যাচ্ছিলেন। সেখানে গিরিবালা দেবীর ভাইদের বাড়ি। নজরুল পুলিসের নজর এড়িয়ে সমস্তিপুরে চলে গেল।

এর মধ্যে 'ধূমকেতু' অফিস তালাশির ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal code) ১২৪-এ ধারা অনুসারে 'ধূমকেতু'র সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম এবং তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফ্‌জালুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে গিরেফ্‌তানী পরওয়ানা বার হতে গিয়েছিল।

তারিখটা ১৯২২ সালের ৮ই নভেম্বর ছিল। কমরেড আবদুল হালীম আর আমি সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক দোকানে চা খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে 'ধূমকেতু' অফিসে গেলাম। আমরা তখন

চাঁদনীর ৩ নম্বর গুমঘর লেনে আমার ছাত্রদের বাড়ীতে রাত্রে ঘুমাতাম। ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনস্থিত 'ধূমকেতু' অফিসে গিয়ে দেখলাম অত সকালেও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসে 'ধূমকেতু'র জন্যে লিখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলি জুতোর শব্দ শোনা গেল। পুলিস এসেছে 'ধূমকেতু' অফিসে তালাশির পরওয়ানা ও কাজী নজরুল ইসলামের নামে গিরেফ্‌তারী পরওয়ানা নিয়ে। নজরুল তখন সমস্তিপুরে গিয়েছিল বলে গিরেফ্‌তার হয়নি। পুলিস আসার মুহূর্তের ভিতরে বীরেনবাবু যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আমরা তার কিছুই টের পেলাম না। পুলিস প্রথমে নজরুলকে খুঁজল। আমরা জানালাম যে তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন। তখন পুলিস আমাদের গবর্নমেণ্ট অর্ডার দেখালেন যে ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত "আনন্দময়ীর আগমনে" শীর্ষক একটি কবিতা ও "বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ" (অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মিত্রের ছোট্ট বোনটির লেখা) শীর্ষক একটি ছোট প্রবন্ধ বাজয়াফ্‌ৎ হয়ে গেছে। পুলিস এই সংখ্যার কপিগুলি নিয়ে যাবেন বললেন। তারপর বাড়ীতে তালাশি হলো। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'ধূমকেতু'র যে কয়খানা কপি পাওয়া গেল তাই নিয়ে পুলিস চলে গেলেন। আমাকে সার্চলিস্টও দিয়ে গেলেন। পুলিস চলে যাওয়ার পরে দেখলাম বীরেনবাবু হাসতে হাসতে পূব দিককার মেডিক্যাল ছাত্রদের বোর্ডিং হাউস থেকে বেরিয়ে আসছেন। 'ধূমকেতু' অফিসের বারান্দা ও মেডিক্যাল ছাত্রদের বোর্ডিং হাউসের বারান্দা কাঠের দরওয়াজার দ্বারা বিভক্ত ছিল। ছাত্রদের দিক হতেই সেটা বন্ধ হতো। বীরেনবাবু আগেই ব'লে রেখেছিলেন কিনা জানিনে, পুলিসকে আসতে দেখেই ছাত্ররা দরওয়াজাটা খুলে দিয়েছিলেন এবং বীরেনবাবু চলে গিয়েছিলেন সেই বাড়ীতে।

'ধূমকেতু'র অনেক লেখা নিয়েই নজরুলের নামে মোকদ্দমা হতে পারত, কিন্তু মোকদ্দমা হলো 'আনন্দময়ীর আগমনী"কে নিয়ে! এই কবিতাটি লেখার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সে বছর প্রথম বা'র হয়েছিল। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্ল সরকার ও শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র) ছিলেন এই পত্রিকার মালিক। মৃণালবাবু নজরুলকে ভালোবাসতেন। নজরুল তাঁর মারফ্‌তে একটা বিজ্ঞাপন বা অন্য কিছু, মনে হয় বিজ্ঞাপনই, পেতে চেয়েছিল। মৃণালবাবু তা পাইয়ে দিতে স্বীকার ক'রে বলেছিলেন যে "তার আগে তুমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যার জন্যে একটি আগমনী কবিতা লিখে দাও।" নজরুল তাই লিখেছিল "আনন্দময়ীর আগমনে"। কিন্তু এই কবিতা আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ছাপা না হয়ে কেন যে 'ধূমকেতু'তে ছাপা হয়েছিল তার কারণ আমি জানি না। খুব সম্ভব কবিতাটি পড়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষ তখন তা ছাপতে রাজী হননি। তাদের দৈনিক পত্রিকা তখনও নূতন ছিল।

কবিতাটি সরকারের বাজয়াফ্‌ৎ হয়ে যাওয়ায় নজরুলের কোনো পুস্তকে তা ছাপা হতে পারেনি। দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন নজরুলের সম্বিৎ ছিল না। ১৯২২ সালে যাঁরা কবিতাটি পড়েছিলেন তার দু'দশ ছত্র তাঁদের অনেকেরই মুখস্থ ছিল। নজরুল সম্বন্ধে নানা লেখায় এই ছত্রগুলিই উদ্ধৃত হচ্ছিল। আমার লেখা "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" যখন ছাপা হচ্ছিল তখন আমি দেখতে পেলাম যে 'ধূমকেতু'র সেই সংখ্যাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রয়েছে। তা থেকে নিয়ে পুরো কবিতাটি আমি 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' তে তুলে দিয়েছিলেম।

‘সওগাত’ ও নজরুল

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম ‘সওগাত’ আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা প্রকাশ করতে গিযে আমাকে যে সেদিন কি বিপুল বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হযেছিল, তা ভাষায প্রকাশ করা কঠিন. [illegible] আজকেব মতো মুসলমান সাহিত্যিকের সংখ্যা এত বেশি ছিল না। পত্রিকা মুদ্রণের ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল। এ-সব বাধা ছাড়াও ছিল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। ধর্মীয, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ আব মুক্তবুদ্ধিব চর্চা ছিল প্রায অসম্ভব। এই পরিবেশে লেখা সংগ্রহ করতে গিযে আমাকে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়েছিল।

এই সমযেই হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম করাচীর বাঙালী পল্টন থেকে ‘সওগাত’-এর লেখা পাঠাতে শুরু কবেন। প্রতি লেখার সাথেই তিনি দীর্ঘ পত্র পাঠাতেন। তখনকার লেখাগুলো ছিল কিছুটা উচ্ছ্বাস-ভরা, সামঞ্জস্যহীন। এসব কারণে তাঁব লেখা ‘সওগাতে’ প্রকাশ করা তখন সম্ভবপব হয নি। একজন অপরিচিত, উচ্ছ্বাসময ও আবেগপ্রবণ কবিযশপ্রার্থীর কাঁচা রচনা হিসাবেই তখন সে-সব লেখা বিবেচিত হত, এবং যথারীতি নিক্ষিপ্ত হতো কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে। কিন্তু এতেও এই কবিযশপ্রার্থী নিবৃত্ত হতেন না, তিনি লেখা পাঠাতেই থাকতেন।

একদিন নজরুলের এক চিঠি এসে হাজির। তাতে আবেগ আর অভিমানের সুর জড়ানো। ‘সওগাতে’ প্রকাশের জন্য বহু কবিতা পাঠালাম, কিন্তু একটিও ছাপা হলো না। এই সঙ্গে ‘কবিতা-সমাধি’ নামে আরেকটি কবিতা পাঠাচ্ছি, এটি ছেপে দেবেন।— যতদূর মনে পড়ে নজরুলের চিঠিতে এই ছিল আবেদন। অবশ্য তখন পর্যন্ত নজরুলের কোনো কবিতা ‘সওগাত’-এ প্রকাশিত না হলেও ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’ নামে একটি আবেগময রচনা প্রকাশিত হযেছিল। ‘সওগাত’-এর প্রথম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত এই রচনাটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ হলেও ছিল বেশ সুন্দর আব আকর্ষণীয়। এই গুণেই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘সওগাতে’। ছাপার অক্ষরে এটাই নজরুলের প্রথম গদ্যরচনা। এরপর নজরুলের দ্বিতীয় গল্প ‘স্বামী-হারা’ প্রকাশিত হয প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৬ সনের ‘সওগাত’এ। ‘কবিতা-সমাধি’ শীর্ষ কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের আশ্বিনে প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যায়।

কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

> পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম, সারা নিশি জেগে
> ভাব-শিরে মুহুর্মুহু লাঠাঘাতি’ রেগে’
> সে কি লেখা লিখিলাম মহা মহা পদ্য, অক্ষর একুন করি যোজিলাম চৌদ্দ।

মৃচ্ছকটিক আর শব্দসার ভ্রমি,
আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্প দ্রুমি।
রচিলাম কি বিকট শব্দ বাছি' বাছি,
জাহাজে বেঁধেছে যেন শত শত কাছি।
কবিদের ভাব সব 'না-বলিয়া নিয়া'
সাহিত্য-আসরে এনু গুম্ফ আস্ফালিয়া।
এ লেখা কি ব্যর্থ হয় ? তবে নাম মিছে!
"বাঃ ভাই"— বন্ধুরা কয় দন্ত সংঘ খিচে'।
চাটু-বাক্যে লুব্ধ হয়ে কবিতারাশিকে
পাঠালাম ছোট বড় সকল মাসিকে।
সম্পাদক অভদ্র সে না দেয় উত্তর ;
বিষম রুখিয়া শেষে লিখিনু, "দুত্তোর!"
টিকিট খেয়েছে মম,— যেতে দাও ; এবে
হে ভদ্র, কবিতাগুলি ফিরিয়ে কি দেবে ?"
শেষে সে সহস্র-পত্র লেখার দরুণ
'রিপ্লাই' আসিল ওহো, ভীষণ করুণ।
"অবশ্যই, কিছুও তার পাই যদি ঘেঁটে
কবিতা সমাধি-পূত পেপার বাস্কেটে!!"

'সওগাত' ২য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩২৭-এ প্রকাশিত হয় নজরুলের 'উদ্বোধন' শীর্ষক একটি গান। গানটি 'বসন্ত সোহিনী-দাদরা' তালে রচিত। এটিই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গান। গানটি এই :

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও!
অগ্নি-তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব—
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও!
নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তড়িত-বহ্নি আগে
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও!
দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি
বিনাশ জাতির দারুণ এ-লাজ দাও, তেজ দাও মুক্তি-গরব।
দুর্জয় মহা আহ্বান তব,
বাজাও!
খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে ;

শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও
দাঁড়াবার পুনঃ দাও গৌরব—
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও!
ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য,
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও!
নিবীর্য এ তেজঃ-সূর্যে
দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্যে,
শৌর্য ধৈর্য মহাপ্রাণ দাও, স্বাধীনতা দাও সত্য বিভব!
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও!

এর পর দীর্ঘদিন নজরুলের আর কোন লেখা পাওয়া যায় নি। প্রায় এক বছর পর আসে নজরুলের আরেকটি গান— নাম 'কলঙ্কী প্রিয়'। বাউলের সুরে রচিত এ গানটি প্রকাশিত হয় 'সওগাত'-এ তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৭-এ। এটি নজরুলের দ্বিতীয় মুদ্রিত গান বলে আমার ধারণা। লক্ষণীয় যে, ১৩২৬ সনে নজরুলের 'কবিতা-সমাধি' প্রকাশিত হবার পর তাঁর আর কোন কবিতা পাওয়া যায় নি। যদিও ইতিমধ্যে দুটি গান প্রকাশিত হয়েছে। ১৩২৭ সনের মাঘ মাসে তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয় নজরুলের 'রাক্ষুসী' শীর্ষক একটি গল্প। ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'বেদন-হারা' শীর্ষক একটি গল্প। একই সংখ্যায়ই প্রকাশিত হয় তাঁর 'বেদন-হারা' শীর্ষক একটি কবিতাও। ঐ বছরেরই চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'আহ্বান' শীর্ষক আরেকটি কবিতা। নজরুল তখন 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' এই নামে রচনা পাঠাতেন। তার 'কলঙ্কী প্রিয়' শীর্ষক গানটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

(গান বাউলের সুর)

মহান তুমি প্রিয়
এই কথাটির গৌরবে মোর চিত্ত ভরে দিয়ো!
অনেক আশায় বসে' আছি—
যাত্রা শেষের পর,
তোমায় নিয়েই পথের পারে বাঁধবো আমার ঘর—
হে চির সুন্দর!
পথ শেষে সেই তোমায় যেন করতে পারি ক্ষমা,
হে মোর কলঙ্কিনী প্রিয়তমা।
সেদিন যেন বলতে পারি—
এসো এসো প্রিয়- -
বক্ষে এসো, এসো আমার পূত কমনীয়।

হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! পথ ভুলেছ বলে'

চির সাথী তোমার যাবে মুখ ফিরিয়ে চলে' ?
জান ওঠে হায় মোচড় খেয়ে
চলতে পড়ি টলে-
অনেক জ্বালায় জ্বলে' প্রিয় অনেক ব্যথায় গলে।
বারে বারে নানানরূপে দলতে' আমার শেষে,
কলঙ্কিনী! হাতছানি দাও সকল পথে এসে
কুটিল হাসি হেসে।
ব্যথায় আরো ব্যথা হানাই যে সে।
তুমি কি চাও তোমার মতই কলঙ্কী এই আমি ?
এখন তুমি সুদূর হ'তে আসবে ঘরে নামি—
হে মোর প্রিয়, হে মোর কুপথ-গামী!
পথের আজো অনেক বাকী,
তাই যদি হয় প্রিয়—
পথের শেষে তোমার পাওয়ার যোগ্য করেই নিযো!
[তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২৭ পৌষ, পৃঃ ৯৩-৯৪]

প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা (কার্তিক, ১৩২৬) 'সওগাত'-এর 'বাদ-প্রতিবাদ' বিভাগে নজরুলের 'তুর্কী মহিলার ঘোমটা খোলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধধর্মী গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-রচনা।

দুই

নজরুলের সঙ্গে তখনও আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নি। চিঠিপত্রের মাধ্যমেই যেটুকু পরিচয়। তাঁর চেহারা-ছবি সম্পর্কেও কোনো ধারণা ছিল না। সে সময়ে— সম্ভবত ১৩২৬ সালেই হবে, একদিন মিলিটারী ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায়ই নজরুল এসে 'সওগাত' অফিসে হাজির হলেন। 'সওগাত' অফিস ছিল কলকাতার বহুবাজার স্ট্রীটে। ষ্টেশন থেকে তিনি সোজা 'সওগাত' অফিসেই এসে উঠেছিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, করাচী থেকে কলকাতা চলে এলাম। এখন যুদ্ধ থেমে গেছে, অতএব অফুরন্ত ছুটি। কলকাতায় থেকে মনপ্রাণ দিয়ে সাহিত্য-চর্চা চলবে। দু'এক কথার পর বললেন, আমি এখান থেকে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে যাব। নজরুল সম্পর্কে মনে তখনও কোনো উৎসাহজনক ধারণা ছিল না। তিনি যে একজন প্রতিভাশালী লেখক হবেন এমন ধারণাও মনে ঠাঁই পায় নি। সুতরাং 'সওগাত'-এ আরো লেখা দেবার তাগাদা দিই নি তাঁকে। কিছুক্ষণ আলাপ-সালাপ করে চা খাইয়েই তাঁকে বিদায় দিয়েছিলাম সেদিন। মনে পড়ে তিনি যতক্ষণ ছিলেন কথা বলতে গিয়ে ছাদ-ফাটানো প্রাণখোলা হাসি হাসছিলেন। তাঁর লেখার চেয়ে এই প্রাণখোলা ছাদ-ফাটানো হাসিই আমাকে তখন অধিক আকৃষ্ট করেছিল।

দীর্ঘদিন নজরুলের আর কোন খোঁজ-খবর পাই নি, এমন কি খোঁজ-খবর রাখার প্রয়োজনও বোধ করি নি। তিনি অবশ্য অন্যান্য কাগজে তখন বিভিন্ন ধরনের রচনা লিখে চলেছিলেন। সে সময়ে তিনি যে-ধরনের কবিতা লিখতেন সে-ধরনের কবিতা মুসলিম কাগজে প্রকাশ করাও সম্ভব ছিল না— এমন কি তার 'বিদ্রোহী' কবিতাও নয়। তিনি যেসব কাগজে এ-ধরনের কবিতা লিখতেন যেসব কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর এ-সময়কার রচনা আমরা অবশ্য আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করেছি এবং তাঁর দিকে অলক্ষ্যেই দৃষ্টি রেখেছি। স্মরণ রাখা দরকার যে, দুয়েকটি রচনা ছাড়া তখনও পর্যন্ত নজরুলের গান, কবিতা মুসলিম সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

স্বসমাজের সার্বিক জাগরণ, মুক্তিবুদ্ধির চর্চা ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশের প্রতিশ্রুতি নিয়েই 'সওগাত' আত্মপ্রকাশ করেছিল। নিজেদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং মুসলিম পুনরুজ্জীবনই ছিল 'সওগাত'-এর লক্ষ্য। কিন্তু তখনও পর্যন্ত 'সওগাত'-এর এ আন্দোলন সফল হয় নি। এ-সময়ে 'সওগাত'-এ যেসব রচনা প্রকাশিত হয় তাতে অতীতের জন্য গৌরববোধ এবং আহাজারী থাকলেও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল যাত্রাপথের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত ছিল না। সামাজিক ও আর্থিক প্রতিকূলতার দরুণ এ সময়ে 'সওগাত' পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে একদিন পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। মাঝখানে কিছু দিন 'সওগাত' প্রকাশিত হয় নি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে 'সওগাত' প্রকাশ করার সময় আমি নজরুল ইসলামকে খবর দিয়ে 'সওগাত' অফিসে নিয়ে আসি। নজরুল তখন ধর্মীয়, সামাজিক ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। আমি তাঁকে 'সওগাত'-এর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করি। মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা-চর্চার মাধ্যমে বাঙালী মুসলমান সমাজের নবজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই যে 'সওগাত'-এর লক্ষ্য একথাও তাঁকে বলা হয়। এ ব্যাপারে মুসলিম চেতনা-সমন্বিত ও চিন্তা-উদ্দীপক রচনায় আত্মনিয়োগের জন্যও তাঁকে অনুরোধ জানাই। এতে তিনি সানন্দে রাজী হন। এর ফলে আমি 'সওগাত' অফিসে বৈকালে বসবার এবং সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনা ও আড্ডার মাধ্যমে অবাধ ও মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিই। আমাদের লক্ষ্য ছিল সব রকম কুসংস্কার থেকে আলোতে যাত্রা। মুক্তবুদ্ধির চর্চা হলেই ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূর হবে, নিজেদের আত্মসম্বিৎ, ঐতিহ্য চেতনা ও মূল্যবোধ ফিরে আসবে এবং বাঙলার মুসলমানের জাতীয় প্রতিষ্ঠা হবে ত্বরান্বিত— এই ছিল আমাদের বিশ্বাস। নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে স্বদেশের পটভূমিকায় সাহিত্য-শিল্প-চর্চার পথ প্রশস্ত করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। সব রকম গোঁড়ামি ও মোল্লাবাদের বিরুদ্ধেই ছিল 'সওগাত'-এর প্রতিশ্রুত সংগ্রাম। হীনমন্যতা ও পরানুকরণ প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে মুসলমানের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনা এবং উদার আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিল সওগাতের আকাঙ্ক্ষা। নজরুল ও অন্যান্য আধুনিক সাহিত্যিকদের নিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই শুরু হয় 'সওগাত' প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে (চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)। ঐ বছরই প্রকাশিত হয় প্রথম বার্ষিক-সওগাত। এটিই ছিল মুসলিম বাংলার প্রথম বার্ষিকী (চতুর্থ বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৩)। বার্ষিক সংখ্যা 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয় নজরুলের 'বার্ষিক সওগাত' ও 'খালেদ' শীর্ষক দুটি কবিতা। 'বার্ষিক সওগাত' কবিতাটি উদ্ধৃত হল :

বন্ধু গো সাকী আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত—
দীর্ঘ দিনের বিরহের পরে প্রিয়-মিলনের রাত।
রঙ্গীন রাখী, শিরীন শারাব, মুরলী, রোবাব, বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখী, সোনালী রূপালি দিন।
লাল ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল নার্গিস-ফুলী আঁখ ;
ইস্পাহানীর হেনা-মাখা হাত, পাতলি পাতলি কাঁখ
নৈশাপুরের গুল্‌বদনীর চিবুক গালের টোল,
রাঙা-লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি শিরীন শিরীন বোল।
সূর্মা-কাজল, স্তাম্বুলী চোখ, বসোরা গুলের লালী,
নব-বোগদাদী আলিফ-লায়লা শা'জাদী জুলফ-ওয়ালী।
পাকা খর্জুর, ডাঁশা আঙ্গুর, টোকো-মিঠে কিসমিস।
মরু-মঞ্জীর আবজমজম, যবের ফিরোজা শিস।
আশা-ভরা মুখ, তাজা তাজা বুক, নৌ-জোয়ানীর গান,

দুঃসাহসীর মরণ-সাধনা জেহাদের অভিযান।
আরবের প্রাণ, ফারেশের গান, বাজু নৌ-তুর্কীর,
দারাজ-দিলীর আফগানী দিল, মুরের জখমী শির!
নীল দরিয়ার মেসেরের আঁসু, ইরাকের টুটা তখত্।
বন্দীশামের জিন্দান-খানা, হিন্দের বদবখত্।
তাঞ্জাম-ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখনি বাকী,
পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নূতন দিনের রাখী।
চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো, হাসির খাঞ্চাপোশ
---যেন অশ্রুর গড়খাই-ঘেরা দিলখোশ ফেরদৌস—
ঢাকিও বন্ধু, তব সওগাতী রেকাবী তাহাই দিয়ে,
দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই, রাতের শিশির পিয়ে।
বেদনার বানে সয়লাব্ সব, পাইনে সাথীর হাত,
আন গো বন্ধু নূহের কিশ্‌তি— "বার্ষিকী-সওগাত"!

আমার বন্ধু নজরুল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রাণীগঞ্জের ইস্কুলে তখন আমাদের ক্লাশ বসে দোতলায়.

পশ্চিমদিকে বড় বড় জানলা। সেই খোলা জানলার পথে দেখলাম, দলে দলে লোক ছুটছে রেল-লাইনের দিকে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। ইস্কুলের ছেলে— ক্লাশ ছেড়ে যেতেও পারি না। সবাই ভাবছে, ছুটি হোক, ছুটি হলেই ছুটবো ওইদিকে।

ছুটি হলো। বাইবে বেরিয়েই শুনলাম, সাঁওতালদের একটা মেয়ে নাকি কাটা পড়েছে ট্রেনের তলায়। তার মৃতদেহটা পড়ে আছে লাইনের ধারে।

ইস্কুলের ছেলেরা অনেকেই গেল দেখতে। আমার কিন্তু একা যেতে মন সরলো না। কিছুদিন ধরে কি যে হয়েছে— নজরুলের সঙ্গে দেখা না হলে বিকেলটা মনে হয় মাটি হয়ে গেল।

নজরুল পড়ে শিয়াড়শোল ইস্কুলে, আমি পড়ি রাণীগঞ্জে। এক এক সময় আফশোষ হয়— এক ইস্কুলে পড়লাম না কেন? কিন্তু উপায় নেই।

বাড়িতে বই-খাতা রেখেই ছুটলাম।

বাগানে গিয়ে দেখি, পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটের চত্বরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে নজরুল। দু'হাত দিয়ে বুক বাজাচ্ছে, গুঁক গুঁক করে ডুগি-তবলার বোল বলছে আর গান গাইছে।

আমাকে দেখেই তার সঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। উঠে বসেই বললে, অনেকক্ষণ এসেছি।

—বেশ করেছ। চল।

কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়েই দু'জনে ছুটলাম রেল-লাইনের দিকে। মুসলমানপাড়ার ভেতর দিয়ে, শেকার-সাহেবের বাঙলো পেরিয়ে, অলিতে-গলিতে এঁকেবেঁকে হাঁপাতে হাঁপাতে লাইনের ধারে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, দেখি— সব ভোঁ-ভাঁ। কেউ কোথাও নেই। গোটাকতক ছাগল চরছে শুধু লাইনের ওপর।

কাকেই-বা জিজ্ঞাসা করি?

নজরুল তো দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গান ধরে দিলে:

'আহা কি দেখালে হরি!
শ্যামের বামে রাই-কিশোরী!'

কাঠের স্লিপারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

—ও মশাই, শুনছেন?

এক ভদ্রলোক লাইন পার হচ্ছিলেন ছাতি মাথায় দিয়ে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে একটা মেয়ে কাটা পড়েছিল জানেন?

—জানি।

—কি হলো বলতে পারেন ?

পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

বাস, খতম। হয়ে গেল আমাদের অভিসার-যাত্রা।

সামনে এগেরা যাবার পাকা রাস্তা। রাস্তার দু'দিকে বড় বড গাছ। লাইন থেকে নেমে সেই রাস্তায় গিযে দাঁড়ালাম। কোথায যাব ভাবছি। নজরুল বললে, আমি আর হাঁটতে পারছি না। বসলাম।

গাছের তলায কচি কচি ঘাস গজিযেছে। শাখায-প্রশাখায পত্রে-পল্লবে মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। ছাযাস্নিগ্ধ জাযগাটি বড মনোরম। ঘাসের ওপর নজরুল শুযে পডল। শুযে শুয়ে বুক বাজিয়ে আবার শুরু হলো তার সঙ্গীতচর্চা।

গাছের তলায় দু'জন পাশাপাশি শুয়ে।

হঠাৎ মোটরের হর্নের শব্দে চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি, পথের ওপর একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছে। হুড্‌খোলা মোটর। যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি ইংরেজ। আমাদের দিকে তাকিযে কি যেন তিনি বললেন চেঁচিযে চেঁচিযে।

নজরুল বললে, আমাদের ডাকছে।

গেলাম এগিযে। কিন্তু কি যে বলছেন ভদ্রলোক, এক বর্ণ বুঝলাম না।

সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ছি। ছাপা বই পড়তে পারি। মানেও বুঝি কিছু কিছু। কিন্তু খাস ইংরেজের কথা বুঝবার ক্ষমতা তখনও হয়নি। নজরুল তাকাচ্ছে আমার দিকে, আমি তাকাচ্ছি তার দিকে। গাড়ির পেছনে কমবয়েসী যে মেযে দুটো বসেছিল, তারা তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

সাহেবের পাশে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তিনি গাড়ির দরজা খুলে নামলেন। আমাদের কাছে এসে বললেন, ছেলেসকল এসোনসোল কেটো দূর বলিতেছি।

নজরুল বলে উঠল, দে গরুর গা ধুইয়ে। তা এতক্ষণ বলতে হয় মা-ঠাকরুণ!

এবার মা-ঠাকরুণের পালা! কিছু বুঝতে না পেরে তিনি হাঁ করে তাকিযে রইলেন আমার মুখের দিকে।

বললাম, ভুল পথে চলে এসেছেন আপনারা।

নজরুল বললে, পিছু হঠে গিয়ে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধরতে হবে।

বাঙলা-জানা মেমসাহেব ভেবেছিলাম এবার সবই বুঝতে পারবেন। কিন্তু 'ভুল' কথাটা তখন তাঁর মাথায ঢুকে গেছে। এখনও আমার মনে আছে— কি বিপদেই না পড়েছিলাম সেদিন। আমি যত বলি— 'ভুল হয়েছে আপনাদের,' উনি তত বলেন, 'নো। ভুল আমার হইতে পারে না।'

তাঁর সে কী রাগ!

প্রথমে বুঝতে পারিনি তাঁর রাগের কারণটা। পরে বুঝেছিলাম।

ভদ্রমহিলা ভেবেছিলেন, আমি বুঝি তাঁর বাঙলা ভাষার ভুলের কথা বলছি।

তাঁরও দোষ নেই। যতই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, একদিক থেকে যুবতী মেয়ে দুটো খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে, আর একদিক থেকে আমাদের দুর্বোধ্য দেশী ভাষায় নজরুল টিপ্পনি কাটতে থাকে।

শেষে অতিকষ্টে গ্রামার বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ইংরেজি বলে মেমসাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হলো।— ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার বাই মিস্টেক মেমসাহেব। ইট ইজ আওয়ার রাণীগঞ্জ। ইট ইজ নট আসানসোল।

নজরুল বললে, ইউ উইল হ্যাভ টু গো ব্যাক অ্যাণ্ড ক্যাচ গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড।

এইবার বাধল আর-এক বিপদ।

কোথায় গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ? কোন্‌দিকে ?

অথচ সেই রাস্তা ধরেই তাঁরা এসেছেন।

হাত বাড়িয়ে, আঙুল বাড়িয়ে, লেফট বলে, রাইট বলে, এদিকে ঘুরে, ওদিকে ঘুরে, কিছুতেই তাদের যখন বুঝিয়ে দিতে পারলাম না, মেমসাহেব নিজেই তখন তার মীমাংসা করে দিলেন। হাতে ধরে আমাদের দু'জনকে তুলে নিলেন তাঁর গাড়িতে। পথ দেখিয়ে তাঁদের নিয়ে যেতে হবে। ধরিয়ে দিয়ে আসতে হবে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড।

গাড়িতে চড়তে পেয়ে আমাদের সে কি আনন্দ! মোটরগাড়ি তখন আমাদের ওদিকে একরকম নেই বললেই হয়।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হলো। আমরা দুজন বসেছি সুমুখের সিটে— সাহেবের পাশে। মেমসাহেব গিয়ে বসলেন পেছনে — তাঁব দুই কন্যার সঙ্গে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শহরের পথে কেরোসিনের বাতি জ্বলেছে।

গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড সেখান থেকে খুব কাছে নয়। অনেকখানি পথ। যাবার সময় না হয় মোটরে গেলাম, কিন্তু ফেরবার পথে ?

নজরুলকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, আসবে কেমন করে ?

—[illegible] হেঁটে।

—বললাম, অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।

নজরুল বললে, হোক না।

বললাম, তোমার কি! তোমাকে তো কেউ কিছু বলবে না, আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। খুব বকবে।

নজরুল বললে, তাহলে অতদূর গিয়ে কাজ নেই।

নামবার ইচ্ছা তারও ছিল না, আমারও ছিল না, কিন্তু বাধ্য হযে নামতে হলো।

ফিডার রোডের ওপর খাঁড়গুলির মাথায় গাড়ি থামালাম। বললাম, এবার আপনারা সোজা চলে যান। গিয়ে যে রাস্তায় পড়বেন, সেইটেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক-রোড। সোজা বাঁদিকে চলে যাবেন। যেখানে দেখবেন— রাস্তার দু'পাশে বড় বড় বাড়ি, দোকান-পসরা, হাট-বাজার, সেইটেই জানবেন আসানসোল।

এই বলে আমরা নামলাম গাড়ি থেকে।

এইবার ধন্যবাদ দেবার পালা। তখন আমরা ইস্কুলের ছাত্র। তখন বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি— জাতি হিসাবে ইংরেজ অতি ক্ষুদ্র।

আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে অনায়াসে গাড়ি ছুটিয়ে তারা চলে যেতে পারত। আমরা কতটুকু উপকারই-বা করেছি তাদের। তাদেরই গাড়িতে চড়ে তাদের শুধু পথ দেখিয়ে দিয়েছি।

এই কৃতজ্ঞতার ঋণটুকু তারা পরিশোধ না করে দিয়ে সেখান থেকে নড়ল না। সাহেব নামল, মেমসাহেব নামল, এমন কি মেয়ে দুটিও নামল গাড়ি থেকে। তারপর প্রত্যেকে আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে হ্যাণ্ডশেক্ করে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ!

ভদ্রমহিলা শুধু হ্যাণ্ডশেক্ করে ক্ষান্ত হলেন না। সবার শেষে দু'হাত দিয়ে তিনি আমাদের হাত দুটি ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড!

তারপর জনবিরল সেই শহরতলীর পথের ওপর দিয়ে স্বল্পালোকিত সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়িখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে আর কোনদিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না জানি। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, সম্পূর্ণ অপরিচিতা, অনাত্মীয়া এই ভদ্রমহিলা। তবু এই মুহূর্তটি আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে।

বাড়ি ফেরার পথে নজরুল বলেছিল, ইংরেজিটা শিখতে হবে।

শহরে তখন নিত্য নতন পোস্টার পড়ছে। নানারকম রঙবেরঙের বড় বড় পোস্টার আঁটা হচ্ছে

শহরের অলিতে গলিতে। কত বিচিত্র তার ছবি, কত বিচিত্র তার ভাষা।

বাঙালী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা চলছে ক্রমাগত। 'কে বলে বাঙালী যোদ্ধা নয়? কে বলে বাঙালী ভীতু? জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত কর্তব্য, আর তা পাবে একমাত্র বাংলার যুবশক্তি। ঝাঁপিয়ে পড় সিংহ-বিক্রমে। বাঙালী পল্টনে যোগ দাও!'

ইংরেজ যুদ্ধ করছে জার্মানীর সঙ্গে। আমরা তখন এইটুকুমাত্র জানি। ইংরেজের প্রতি আমরা কেউ প্রসন্ন নই, তার ওপর রাজার প্রতি ভক্তি যেটুকু থাকা প্রয়োজন তাও নেই। তবু আমরা ইংরেজের হয়ে তার শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে কেন যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করলাম নজরুলকে।

নজরুল বললে, যুদ্ধ ও কটা বিদ্যা তা জানো?

বললাম, জানি।

—সেই বিদ্যেটা আমরা শিখে নেবো।

বললাম, শেখা শেষ হলেই তো দেবে ঠেলে।

—দিক না!

—তখন জার্মানীর একটি গুলি, ব্যস্, সেইখানেই খতম।

—মরে যাব? বেশ তো! যুদ্ধ করতে করতে মরে যাওয়া— ভারবীজা। মারতে মারতে মরবো।

নজরুলের সে কি উল্লাস!

কিন্তু সত্যি বলতে কি, যতই ভাবছি আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে। নজরুল মারতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি জানি, আমি পারবো না। হাতে বন্দুক আছে বলেই জলজ্যান্ত একটা মানুষকে শত্রু কল্পনা করে নিয়ে মেরে ফেলবো — সেটা বোধ হয় আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

নজরুল বললে, তোমার দ্বারা না হলেও তার দ্বারা হবে। সে মেরে দেবে তোমাকে। আত্মরক্ষা করবার জন্যে মারতে হয়, নইলে নিজে মরবে।

সেকথা আমি কিন্তু ভেবে দেখিনি।

নজরুল যুদ্ধবিদ্যা শিখে এসে ভারতবর্ষে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে— তার এই গোপন মতলবের কথা আমাকে সে বলেছিল একদিন।

আমার কিন্তু কোনও মতলব ছিল না।

আমি যেতে চেয়েছি সঙ্গ সুখে।

নজরুল চলে যাবে রাণীগঞ্জ ছেড়ে, আর আমি এইখানে একা পড়ে থাকবো, রোজ দশটার সময় বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে যাবো, আর বিকেলে ফিরে আসবো— একঘেয়ে নির্বান্ধব এই নিরানন্দ জীবন আমি চাইনি।

তার ওপর যুদ্ধ কথাটার একটা উত্তেজনা আছে। আমি তখন অপরিণতবয়স্ক এক কিশোর। সে উত্তেজনা, সে উন্মাদনার হাত থেকে নিস্তার পেলোম না।

নজরুলের সঙ্গে নিভৃতে বসে পরামর্শ করলাম-— কেমন করে যেতে হবে। ছিনু চলে গেছে তার দেশের বাড়িতে বিয়ে-সাদি করতে, নইলে নজরুলের বোর্ডিং-এর খাটে বসে এই নিয়ে জল্পনাকল্পনা সম্ভব হতো না। তাও বেশির ভাগ দিন আমরা চলে যেতাম ক্রিশ্চানদের কবরখানায়। শহরের এত কাছে এমন নির্জন জায়গা সচরাচর পাওয়া যায় না।

বাঙালী পল্টনের পোস্টারের নিচে ছাপা থাকতো, মহকুমার সাব-ডিভিশ্যানাল-অফিসারের (এস-ডি-ও) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রাণীগঞ্জের মহকুমার-শহর আসানসোল। বেশি দূরে নয়। যাওয়াও সহজ। স্টেশনে গিয়ে টেনে চড়ে বসলেই হলো। টিকিটের দাম তখন কত ছিল আজ আর ঠিক মনে নেই।

শুধু মনে আছে এস-ডি-ও. যিনি ছিলেন তিনি সাহেব। খাস বিলেত থেকে সবে এসেছেন বাংলা

দেশে আই.সি-এস্ পাস করে।

তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাঁর ইংরেজী যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে কি হবে? তবে ভরসা এই যে, পুরো দুটি বছর ধরে আমাদের রাণীগঞ্জ ইস্কুলে প্রতি শনিবার খাস বিলেতী এক পাদরীসাহেব আমাদের বাইবেল পড়াচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে বলে আর ইংরেজী নভেল পড়ে পড়ে ইংরেজী খানিকটা রপ্ত করে ফেলেছি।

নজরুল বললে, চল তো যাই আসানসোলে, দেখা করি সাযেবের সঙ্গে, তারপর যা হয় হবে।

হাতে কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা। বললাম, পরীক্ষার কি হবে?

নজরুল তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। বলে, রেখে দাও তোমার পরীক্ষা! কী হবে পরীক্ষা দিয়ে?

আমি কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে কিছুতেই আসানসোল যেতে চাইলাম না। কাজেই কয়েকটা দিন আমাদের দেরি হয়ে গেল।

আমার মনের ভেতর তখন দুটো প্রশ্ন। কিছুতেই তার মীমাংসা করে উঠতে পারছি না। আমরা যুদ্ধে চলে যাচ্ছি— সে-কথা যতীনকে আর দিদিকে জানাবো কিনা। এ গেল প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই সর্বনাশা সংবাদ আমি জানাবো কিনা আমার মাতামহীকে। অতি শৈশবে আমার মা মারা গেছে। তারপর থেকে তিনি আমাকে মানুষ করে তুলেছেন। এ পৃথিবীতে আমিই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে— তাঁর কাছে যুদ্ধে যাওয়া মানেই চিরজীবনের জন্য যাওয়া।

যতীনকে বলতে পারি, দিদিকে বলতে পারি, কিন্তু তাঁকে আমি বলবো কেমন করে?

রাত্রে ঘুম হলো না।

পরীক্ষার ভাবনা তোলা রইলো, এখন এই ভাবনাটাই সবচেয়ে বড় ভাবনা হয়ে উঠলো।

সকালে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরোই না, পরের দিন কিন্তু চা খেয়েই চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সোজা চলে গেলাম নজরুলের বোর্ডিং-এ। গিয়ে দেখি, নজরুল তখনও তার বিছানায় শুয়ে। ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ আগে, মুখ হাত ধুয়ে এসে চা খেয়েছে একবার। আবদুল বললে, কাল অনেক রাত পর্যন্ত কি যেন লিখছিল। তাই বোধ হয় ঘুম ভাঙেনি, আবার গড়িয়ে নিচ্ছে।

মাথার বালিসটা বুকের নিচে জাপটে ধরে উপুড় হয়ে শুয়েছিল নজরুল। গায়ে হাত দিতেই চোখ চেয়ে আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো। উঠে বসেই চেঁচাতে লাগলো, আবদুল, আবদুল, দে ভাই দু' পেয়ালা চা। ধেৎ তেরি, ছিনু নেই, থাকলে এতক্ষণ পাঁচ পেয়ালা খাইয়ে দিত।

জিজ্ঞাসা করলাম, ছিনুর কথা ভাবছিলে বুঝি?

নজরুল বললে, সে হতভাগা বোধ হয় আর আসবে না। এলে দেখা হতো।

—তবে কার কথা ভাবছিলে?

বুঝতে পারলে বোধ হয়। কথাটা একটু জোরে জোরেই বলেছিলাম, কিংবা আবদুল এসেছিল চা নিয়ে।

নজরুল বললে, চা খাও।

আবদুল চলে যেতেই নজরুল বললে, আর দেরি কেন, চল, কালই যাই আসানসোল।

বললাম, না, কাল থেকে পরীক্ষা আরম্ভ।

নজরুল বললে, পরীক্ষা আর দিতে হয় না! কি হবে পরীক্ষা দিয়ে! আমি তো আজ ইস্কুলেই যাব না।

পরীক্ষা না দিলে দাদামশাই জানতে পারবে। জানাজানি হয়ে গেলেই বিপদ! লুকিয়ে পালাতে হবে। বললাম, তুমি কি জানিয়ে যাবে তোমার বাড়িতে?

—পাগল হয়েছ? আমি আর বাড়িই যাব না।

চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেছিলাম নজরুলকে, তোমার মন কেমন করছে না?

নজরুল বলেছিল, না। মন কেমন করবার মত কেউ আমার নেই।

এর ওপর আর কথা চলে না।

আমার পরীক্ষা আরম্ভ হলো। নজরুলের ইস্কুলে পরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছিল তারও পরে।

কি রকম পরীক্ষা দিলাম জানি না। সে ক'দিন নজরুলের সঙ্গে দেখাও করিনি।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো, ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি, দেখলাম নজরুল দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। বললে, কাল আসানসোল যাব।

বেলা এগারোটায় ট্রেন। কথা হলো, নজরুল আসবে আমার কাছে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে।

পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে দু'জনে গিয়ে তো নামলাম আসানসোল স্টেশনে। স্টেশন থেকে কোর্ট অনেক দূরে। আবার একটা ট্রেনে চড়ে যেতে হয়। আমাদের কিছুই জানা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলাম।

দেখা করলাম এস-ডি-ও সাহেবের সঙ্গে। বললাম, আমরা যুদ্ধে যাব। বেঙ্গলী রেজিমেন্টে নাম লেখাতে চাই।

এস-ডি-ও সাহেব ভারি খুশি। আমাদের দু'জনের কাঁধে দুটো হাত রেখে, নিয়ে গেলেন তাঁর বাংলোর ভেতর। খুব সমাদর করে বসালেন আমাদের। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট পরিষ্কার করে ইংরেজী বললেন। বুঝতে এতটুকু কষ্ট হলো না।

দু'জনকে দু'গ্লাস লেমনেড খাওয়ালেন। আমরা বসে বসে লেমনেড খাচ্ছি, সাহেব আমাদের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছেন আর কি যেন লিখছেন।

লেখা শেষ হলে বিলিতী বিস্কুটের বড় দুটি টিন আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই বিস্কুট তোমরা পথে যেতে যেতে খাবে। খাবার সময় আমাকে মনে পড়বে। এই বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, এখান থেকে তোমরা বাড়ি যাবে। তারপর তোমাদের যেতে হবে কলকাতায়। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, এই চিঠি নিয়ে তোমরা যাবে। সেখান থেকে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে করাচীতে। চিঠিখানা টাইপ করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।

আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন আদালতে। সাহেব মাঝখানে। তাঁর দু'পাশে আমরা দু'জন।

পথের দু'পাশে লোকজন সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। দুটি বাঙালী ছেলের হাত ধরে সাহেব চলেছেন হেঁটে। দেখবার মত দৃশ্যই বটে!

আদালতের সুমুখে যখন এসেছি, একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো আমাদের পাশে। তাকিয়ে দেখি, মোটর থেকে নামছেন রায়-সাহেব। আমার মাতামহ।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। যাঁকে না জানিয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছি, তিনিই একেবারে চোখের সুমুখে। রায়-সাহেব তখন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। কে জানতো আজই তাঁর এজলাসের দিন।

এস-ডি-ও সাহেবের দিকে তাকিয়ে রায়-সাহেব মনে হলো যেন আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, গুড মর্নিং! বলেই আর অপেক্ষা না করে ভেতরে চলে গেলেন।

আমি নজরুলের দিকে তাকালাম, নজরুল তাকালো আমার দিকে। কি যে হলো আমরাই বুঝলাম। এস-ডি-ও সাহেব কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, He is Mr. Chatterji, Rai Sahib, very very influential man of my subdivision Do you know him?

আমার তখন গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বললাম, ইয়েস।

নজরুলটা এ-সব ব্যাপারে একেবারে নাবালক। হঠাৎ বলে বসলো— হিজ্ গ্রাণ্ড ফাদার।

সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া! আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, হোয়াট?

রাণীগঞ্জে রইলাম মাত্র একদিন। এই একটি দিনের স্মৃতি আমি কখনও ভুলবো না! পৃথিবীতে থাকবার মেয়াদ আমাদের শেষ হয়ে গেছে— এই কথাটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সকলেই। বুঝবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওইটিই আমি চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম— জীবনের প্রতি এ বিতৃষ্ণা আমার কেন এসেছিল— সে কাহিনী এখানে অবান্তর।

নজরুলের জীবনের নিগূঢ়তম বেদনার কাহিনীও আমি জানি। সেই বেদনার সঙ্গে মিশেছিল কৈশোরের দুর্দমনীয় অ্যাডভেঞ্চারপ্রীতি। তাই সব-কিছু হাসিমুখে পরিত্যাগ করে সেও ঝাঁপ দিয়েছিল এই মারণ-যজ্ঞে।

আমাদের দু'জনের প্রীতির বন্ধন নিবিড়তর হয়েছিল বুঝি সেই কারণেই। এই সহানুভূতির জন্যই বোধকরি এক আর একের যোগফল দুই না হয়ে হয়েছিল এক।

আমার পাতানো দিদি আর যতীন, নজরুলের ছিনু আর আমার দ্বারকা— পেছনে টেনে রাখতে পারলে না আমাদের। যারা পারত, আমার মাতামহী আর নজরুলের মা— তারা রইল দূরে। নিষ্ঠুরতম ঔদাসীন্যে তাদের সঙ্গে দেখা না করে শুধু তাদের স্মৃতির আগুন বুকে জ্বালিয়ে নিয়ে আমরা একদিন ট্রেনে চড়ে বসলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে। দুগিয়া হাসতে হাসতে এসে বসলো আমাদের সঙ্গে তার মা দাঁড়িয়ে রইল ল্যাম্প-পোস্টের নীচে। দুগিয়ার মত এক সর্বহারা পাষাণের চোখেও দেখলাম অশ্রুর ধারা।

আমাদের চোখ ছিল শুকনো। পাশাপাশি বসে হাসছিলাম আমরা- – নজরুল আর আমি। সে হাসিও শুকনো। জীবনদেবতার প্রতি নিদারুণ অভিমানে যে আগুন জ্বালিয়েছিলাম আমাদের বুকে, তারই উষ্ণ উত্তাপে বোধকরি উত্তাল অশ্রুসমুদ্র শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় পৌঁছলাম পরের দিন সকালে। এর আগে নজরুল কখনও কলকাতা দেখেনি। বললাম, দ্যাখো। আর হয়ত দেখতে পাব না।

নজরুলের কেন জানি না দৃঢ় বিশ্বাস সে আবার ফিরে আসবে। বললে, না না এত তাড়াতাড়ি মরব না আমরা।

আমাদের যেতে হবে সুকিয়া স্ট্রীটে। (আজকাল কৈলাস বোস স্ট্রীট) একাত্তোর নম্বর বাড়িখানি উখরার জমিদারদের। রায়-সাহেবের কোনও বাড়িই তখন হয়নি কলকাতায়। উখরা এস্টেটেও সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই ওই এক বাড়িতেই আমাদের দু'বাড়ির কাজ চলতো।

কলেজ স্ট্রীটে ট্রাম বদল করবার জন্যে নেমেছি, দেখি আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে লোক দাঁড়িয়ে আছে। রায়-সাহেবের টেলিগ্রাম এসে পৌঁচেছে আমাদের আগেই।

সেখানে গিয়ে দেখি আমার মামা, উখরার সেজমামা ইত্যাদি অনেকেই বসে আছেন আমাদের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে।

উখরার সেজমামা (শৈলবিহারী লাল সিং হাণ্ডে) আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, খুব দেখালি বাবা!

আমার মামা একটি কথাও বললেন না। শুধু একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মা আর এই মামা— রায়-সাহেবের দুই ছেলেমেয়ে! আমার মা অনেকদিন আগেই চলে গেছে আমাকে রেখে। আমি তখন নিতান্তই ছোট— আমার সেকথা মনে নেই, কিন্তু মামা বোধকরি ভুলতে পারেননি সেকথা।

অনেকক্ষণ পরে কথা বললেন তিনি। বললেন, সব দিলে তো শেষ করে! খুব বাহাদুর! কই, এস-ডি-ওর চিঠি কার কাছে?

নজরুল তার পকেট থেকে খামের চিঠিখানি বের করে দিলে।

মামা বললেন, রাত জেগে ট্রেনে এসেছ, যাও এবার স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোওগে। বিকেলে নিয়ে যাব রিক্রুটিং আপিসে।

রাত জেগে এসেছি, সত্যিই তো, চোখ জ্বালা করছে। ভেবেছিলাম, স্নান করলেই ঘুমে চোখ

ভোরে আসবে। কিন্তু কোথায় ঘুম ?

দুগিয়া বসে বসে পা টিপছে। বারণ করলেও শোনে না। বলে, আমাকে ফেলে যেন তোমরা চলে যেও না।

দুগিয়ার সঙ্গে মজার মজার গল্প করেই সময়টা আমাদের কেটে গেল।

হেদোর উত্তর দিকের লাল বাড়িতে মল্লিক-সাহেবের রিক্রুটিং আপিস। মামা আর সেজবাবু আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন।

খাতায় নাম লিখানো হলো। দুগিয়াও বাদ গেল না। তার নাম উঠলো 'সুইপারের' খাতায়। দুগিয়ার তাতে আপত্তি নেই। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'সুইপার' মানে কি ?

আমি বললাম, ঝাড়ুদার।

নজরুল হাসতে হাসতে বললে, মেথর।

ত' হোক, তবু সে যাবে।

তার পরেই পরীক্ষার পালা।

আর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো নজরুলকে আর আমাকে। দুগিযার পরীক্ষার দরকার নেই।

পরীক্ষা যৎসামান্যই। কত ফুট লম্বা, কত ওজন, বুকের ছাতির মাপ কত।

প্রথমেই নজরুল পাশ হযে গেল।

যিনি মাপ নিচ্ছিলেন তিনি বললেন, বসুন ওই বেঞ্চে। এক্ষুণি আপনাদের পাঠিযে দেওয়া হবে ফোর্ট উইলিয়ামে। সেখানে সাজ পোশাক, বিছানা আর কিট্‌ ব্যাগ দেওয়া হবে। তারপর যেদিন টার্ণ আসবে, সেইদিন যাবেন নওশেরা।

মামা এইবার আমাকে এগিযে দিলেন।

ভদ্রলোক লিখে চলেছেন খাতায়। লম্বা— ঠিক আছে। ওজন— ঠিক আছে। শেষে এসে দাঁড়ালাম, ফিতে দিয়ে যিনি বুকের মাপ নিচ্ছিলেন, তাঁর কাছে। একবার মাপলেন, দু'বার মাপলেন, তারপর বললেন, আধ-ইঞ্চি কম। আন্‌ফিট্‌।

যিনি খাতা লিখছিলেন, তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, বাড়ি চলে যান। দিন কতক খুব সাঁতার-কাটুন, তারপর বুকের মাপ ঠিক হযে গেলে আবার এপ্লাই করবেন।

বলেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হাঁকলেন, নেক্সট।

মামা তখন আমার হাতখানা চেপে ধরেছেন। ওদিকে নজরুল উঠে দাঁড়িয়েছে।

এ কি হলো ?

নজরুল এগিয়ে এসে বললে, সে কি ? তোমার বুকের ছাতি তো—

মামা বললেন, তোমার চেযে অনেক ছোট।

তারপর যা হলো তা আর লিখবার নয়। নজরুলের মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম মনে আছে।

তার সে শুকনো চোখেও সেদিন একটুখানি জল দেখেছিলাম। আর আমার চোখে তখন অশ্রুর ধারা নেমেছে।

মামা আমাকে সেখান থেকে জোর করে টেনে আনলেন। বললেন, খুব হয়েছে! এসো।

অনেকদিন পর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় দেখি, একটা রিক্‌সায় চড়ে নজরুল এসে হাজির। চমৎকার চেহারা হয়েছে নজরুলের। মাথায় চুল রেখেছে, বুকের ছাতি হয়েছে চওড়া, পায়ে বুট জুতো, খাঁকি প্যাণ্ট, খাঁকি সার্ট,— মানিয়েছে সুন্দর। পাশ বালিশের মত একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দোতলায় উঠে এলো।

সাতদিনের মাত্র ছুটি। তিনদিন থাকবে কলকাতায়। তারপর যাবে চুরুলিয়া। ওই পথেই চলে যাবে

করাচি। এখানে আর ফিরে আসবে না।

কতদিন পরে দেখা। কথা আর আমাদের শেষ হতেই চায় না।

কত কথা শুনলাম। কত কথা বললাম। একসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করলাম। পাশের বাড়ি থেকে একটা হারমোনিয়াম চেয়ে এনে তার গান শুনলাম। ট্রামে চড়ে সারা কলকাতা চরে বেড়ালাম। তখনকার দিনের চার আনার টিকিটে বায়োস্কোপ দেখলাম। টিকিটের দাম বেশি বলে থিয়েটারটা আর দেখা হল না। গেলাম ৩২, কলেজ স্ট্রীটের দোতলায় মুসলমান সাহিত্যের পত্রিকার আপিসে। এই পত্রিকাটি নজরুল আমাকে আগেই পাঠিয়েছিল আর লিখেছিল— জনাব মুজফ্ফর আহ্মদের কথা। তিনি নাকি সবার আগে তার লেখা সাগ্রহে ছেপেছেন। চিঠি-পত্রে তাঁর সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ও হয়েছে ঘনিষ্ঠ। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করবার আগ্রহ আমারও বড় কম ছিল না।

গিয়ে দেখলাম— অপূর্ব সুন্দর একটি মানুষ। গৌরবর্ণ শীর্ণকায় সংযতবাক যে যুবকটিকে সেদিন আমি দেখেছিলাম, আজও তিনি আমার স্মৃতিপটে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেদিন তাঁরও বিশেষ কিছুই আমি জানতাম না। আমিও ছিলাম এক পরিচয়হীন আগন্তুক মাত্র। নজরুল ইসলামের একজন সহপাঠী বন্ধু। কথা যা হয়েছিল নজরুলের সঙ্গেই হয়েছিল। আমি ছিলাম তার নীরব শ্রোতা।

নজরুলের প্রতি তাঁর সেই সহৃদয় ব্যবহার, তাঁর সেই উদার দাক্ষিণ্য, তাঁর মুখের শুধু দুটি-চারটি কথা, প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি আর একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে সত্যই সেদিন মুগ্ধ করেছিল।

নজরুল চলে যাবার পর, একটি দিনের এই একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা আমি অনেকবার ভেবেছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি এই ব্যক্তিটিকে। তখন কতই-বা আমার বয়স। আর ক'টি মানুষকেই-বা এমন করে দেখেছি।

নজরুলকে যে ভালবাসে, সে আমারও প্রিয়— এই কথা ভেবেই জীবনের পাতাটা সেদিন উল্টে রেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে-পাতা আমাকে আবার খুলতে হয়েছে। লাল কালির দাগ দিয়ে এই বিশেষ দিনটিকে সবিশেষ করে রেখেছি। আর আমার জীবন সায়াহ্নে এসে দেখছি— সে-দাগ এখনও তেমনি অম্লান হয়ে রয়েছে।

তিনটি মাত্র দিন সেবার দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল।

হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম নজরুলকে। আবার কতদিন পরে দেখা হবে কে জানে।

সেখানে গিয়ে চিঠি দেবে বলেছিল— দিলে না। পুরো একটি মাস পরে বেগুনীরঙের কালিতে লেখা একখানি চিঠি পেলাম। নজরুল লিখেছে, তাদের উনপঞ্চাশ বায়ুগ্রস্ত বাঙালী পল্টন ভেঙে দেবার কথা চলছে। ভেঙেই যদি দেয় তো— 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?' আমার এই পাশ বালিশটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে সোজা উঠব গিয়ে তোমার আস্তানায়। তারপর যা থাকে কপালে!

নজরুল আসবে জেনে আনন্দও যেমন হলো, তার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে রাত্রে ভাল ঘুমও হলো না। সত্যিই তো! কি করবে সে? কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে? হঠাৎ আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো— বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলার সেই ঘরখানি। মুজাফফর আহ্মদ-সাহেব বলেছিলেন, চলে তো আসুন এইখানে। তারপর দেখা যাবে।

ছোটখাটো মানুষটি, কিন্তু তাঁর হৃদয় যে এত বড়, তখন সেকথা ভাবতে পারিনি। তাই তাঁর কথাটাকে তেমন আমল দিইনি। নজরুলের জন্য ভেবেই মরেছিলাম শুধু।

আমাদের পলিটেকনিকের কমার্স ডিপার্টমেন্ট আর বোর্ডিং হাউস সে-বাড়ি থেকে উঠে এলো রামকান্ত বোস স্ট্রীটে। (সেই পুরনো বাড়িটা ভেঙে এখন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ হয়েছে)

নজরুলকে নতুন বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখলাম। ভূপেন্দ্র বোস এ্যাভিনিউ তখন হয়নি। ট্রাম থেকে নেমে কোনদিন দিয়ে কেমন করে আসতে হবে তাও জানিয়ে দিলাম।

শেষ পর্যন্ত এলো নজরুল। পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর সে ফিরে যাবে না। চেহারা তার

আরও ভাল হয়েছে। হো হো করে হাসির জোর যেন আরও বেড়েছে।

আমাদের হোস্টেলে 'অতিথি' হয়ে থাকার কোনও আপত্তি ছিল না। গেস্ট চার্জ মাসের শেষে দিতে হয়। তার ওপর একখানা ফাঁকা সিটও পাওয়া গেছে আমাদের সিটের পাশেই। আনন্দের হাট বসে গেল আমাদের 'রুমে'। নজরুলের সেই মনমাতানো অফুরন্ত হাসি আর গান, যৌবনোচ্ছল প্রাণের প্রাচুর্য একে একে টেনে আনলে সবাইকে। প্রথমে এলো আমার সেখানকার সহপাঠী বন্ধুরা, তারপর এলেন বয়স্ক শিক্ষকেরা।

তিন-চারটে দিন আমরা হোস্টেল ছেড়ে কোথাও গেলাম না। যাবার সময়ই বা কোথায়? গঙ্গার স্নান আমার তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যালেরিয়ার কথা ভুলেই গেছি।

একদিন রাত্রে পাশাপাশি সিটে আমরা শুয়ে পড়েছি। ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। গল্প করছি শুয়ে শুয়ে। নজরুল চুপি চুপি বললে, একটা চাকরি বোধহয় পাওয়া যাবে।

কথাটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা কবলাম, কিসের চাকরি?

নজরুল বললে, পল্টনে যারা একটু নাম-টাম করেছে গভর্নমেণ্ট তাদের কিছু কাজকর্ম দেবে।

বললাম, তোমাকে কি কাজ দেবে? তুমি তো ম্যাট্রিকুলেশনও পাশ করলে না!

—নাই-বা করলাম! কত কাজ আছে।

—তুমি নেবে সেই কাজ?

—না নিলে খাব কি?

বলেছিলাম, ভিক্ষে করে খাবে।

নজরুল হো হো করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল ঠিক বলেছ। একটা হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় যদি গান গেয়ে বেড়াই তো মন্দ রোজগার হবে না।

—সঙ্গে যদি একটা সুন্দরী মেয়ে থাকে তো রোজগার আরও বেশি হবে।

—সেটা আর পাচ্ছি কোথায়?

—তোমার হাসির চোটে পাশের বাড়ির জানলাটানলাগুলো যেরকম খুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন জুটতে দেরি হবে না।

বয়সের ধর্মে কথার ধারাটা সেদিন অন্যদিকে গড়িয়ে গিয়েছিল।

তারপরের দিনই বোধহয় নজরুল আমাকে হঠাৎ বলে বসলো, তুমি মরতে এ-সব শিখতে এলে কেন? চাকরি করবে নাকি?

চিঠিতে তাকে কিছু কিছু জানিয়েছিলাম, তবু আবার জিজ্ঞাসা করলে কেন, বুঝতে পারলাম না। বললাম, জানো তো সবই।

নজরুল বললে, এই জন্যেই বড়লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

বললাম, এরা বড় মানুষ নয়, বড় অ-মানুষ।

নজরুল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, মদের মাতাল যেমন, তেমনি এরা টাকার মাতাল।

সেইদিনই একটা কাণ্ড ঘটলো। নীচে ছিল খাবার ঘর। আমরা নীচে না গিয়ে খাবারটা ওপরের ঘরে আনিয়ে নিতাম। খাওয়াদাওয়ার পর বসে বসে গল্প করছি, হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে কোরো না।

বললাম, বলুন।

তিনি বললেন, তোমার এই বন্ধুটি কতদিন থাকবেন এখানে?

— কেন বলুন তো?

কথাটা বলতে বোধকরি তিনি সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। বললেন, এখানেও তো তোমাকে গেস্ট, চার্জ দিতে হবে, তার চেয়ে ওঁকে যদি বাইরের কোনও হোটেলে খাইয়ে আনো তাহলে বোধহয় তোমার

খরচ কম পড়বে, ওঁর খাওয়াটাও ভাল হবে।

বলবার উদ্দেশ্য কিছুটা বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞাসা কবলাম, মুসলমান বলে কি কোনও কথা উঠেছে ?

তিনি বললেন, না তেমন কিছু নয় চাকরটা শুনেছে উনি মুসলমান। তাই ওঁর এঁটো বাসন ধুতে চাচ্ছে না।

আমি ধুয়ে দিচ্ছি। বলে চলে এলাম ওঁর ঘর থেকে।

আমাদের ঘরে এসে দেখলাম, আমাদের দু'জনের এঁটো বাসন তখনও তোলা হযনি। বিনোদ চলে গেছে ক্লাস করতে। নজরুল এক একটা সিটের ওপর ফিরে শুযে আছে। বোধকরি ঘুমিযে পড়েছে। কোনও শব্দ না করে চুপিচুপি জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললাম।

দুপুরে ঘণ্টা-দুই-এর জন্যে আমাদের একটা ক্লাস বসতো। জামাটা গায়ে দিযে খাতা-পেন্সিল নিযে নীচে নেমে যাবার আগে বললাম, ঘুমোলে নাকি ? আমি ক্লাসে যাচ্ছি।

চোখ বুজে তেমনি শুয়ে শুযেই নজরুল বললে, যাও।

ক্লাসে সেদিন কোনও কাজই করতে পারলাম না। ঠিক কবলাম নজরুলকে নিয়ে আমিও চলে যাব এখান থেকে। কুড়ি নম্বর বাদুড়বাগান রোডে (আজকাল ১, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট) রায়-সাহেব বাড়ি কিনেছেন একখানা। বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। নীচের একখানা ঘরে মাত্র একজন দারোয়ান থাকে। সেইখানেই গিযে উঠবো।

ক্লাসের ছুটির পর ওপবের ঘরে গিযে দেখি, নজরুল তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে বসে আছে।

যা ভয করেছিলাম তা হযেছে। নজরুল নিশ্চযই ঘুমোযনি, জেগে জেগে দেখেছে— আমি তার এঁটো থালা বাটি তুলে নিযে গেছি। ভালই হয়েছে। বললাম, দাঁড়াও, আমার বিছানাটা বেঁধে নিই। দু'জনে বাদুড়বাগানেব বাড়িতে গিয়ে উঠবো।

নজরুল বললে, না। দু'জনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি পরে একদিন যেযো। আমি আজ কলেজ স্ট্রীটে যাই।

৩২. কলেজ স্ট্রীটে মুজফ্ফর আহ্মদ-সাহেব মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন নজরুলকে। তিনি যেন তারই প্রতীক্ষায বসেছিলেন।

নজরুল : রবীন্দ্র বিচারে

প বি ত্র গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

নজরুলের আমি আযৌবন বন্ধু ও সাথী হিসেবে আমি মানুষটিকে তার কবিতার চেয়ে অনেক বেশী চিনেছি এবং ভালোবেসেছি। তা ছাড়া কাব্যের চুলচেরা সাহিত্যিক বিচাব করার মত বিশ্লেষণমূলক মানসিকতাও আমার নেই। আমি কবিতার বিচার করি কবিতা পাঠেব মানসিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে, আমার সেই মানসিক বিচারে নজরুল সার্থক কবি।

নজরুলের কবি-প্রতিভার মূল্যায়নে এ যুগ নীরব ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সে যুগ ছিল বিতণ্ডামূলক। অন্ততঃ রবীন্দ্র-অনুচরদের মধ্যে অস্বীকৃতির প্রয়াস যথেষ্ট ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কবিকে নস্যাৎ করতেন অনেকে। নজরুলের কাব্যপ্রয়াস ছিল 'তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁছা।

অথচত নজরুলের রচনায় অসির ঝনঝনাও সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে এমন স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছিলেন, ১৩২৯ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যেব উৎসর্গ পত্রে বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু'-কে।

নজরুলের কবি স্বীকৃতি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক উল্লেখেই সীমায়িত রাখেননি কবিগুরু। নজরুলকে কবি-স্বীকৃতি দিয়ে কবি যে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছিলেন, সেই ভীমরুলের হুল ফোটানোর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যে সব উক্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা আমার স্বকর্ণে শোনা।

নজরুল তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ। আমি প্রতি সপ্তাহেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার সঙ্গে নজরুলের নিয়মিত যোগাযোগের খবর নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেছিল, নইলে মধু রায়ের গলির মেসে স্নেহভাজন বুলা মহলানবীশকে পাঠিয়ে আমাকে জোড়াসাঁকোয ডাকিয়ে নিতেন না গুরুদেব। একবার সুবিধা মতো দেখা করবার কথা বললেন বুলাবাবু। কিন্তু ঠাকুর সন্দর্শনে কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করে সংগে সংগে বেরিয়ে পড়লাম এবং বুলাবাবুর সংগে গল্পে গল্পে কয়েক পা হেঁটেই জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে এসে হাজির হলাম। সেখানে অনুচর, তথা ভক্তজন, পরিবৃত হযে কবিগুরু আসীন। আমাকে দেখে প্রথমে কুশল প্রশ্ন করে নজরুলের খবর জানতে চাইলেন এবং আমি যে তাঁর সংগে নিয়মিত দেখা করি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেম আমাকে প্রশ্ন করে। বললেন জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না ভেবে দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সব চেয়ে ভালো, আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও।

কোনো বিষয়েই আপনার প্রতিনিধিত্ব করবার ধৃষ্টতা আমার নেই, আমি বললাম বরং আপনার অনুগ্রহ আদেশ পেলে বন্ধু নজরুলের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছ থেকে হাত পেতে আপনার

উৎসগীত গ্রন্থখানা গ্রহণ করার, সঙ্গে আপনার আশীর্বাদ আমি বয়ে নিয়ে যাব তাঁর কাছে। এ দুর্লভ সুযোগ কি করে আমি ছাড়ি বলুন, বন্ধুভাগ্যে যদি কিছু পাই তাই আমার পরম পাওয়া।

কথার মারপ্যাচ তো বেশ শিখেছ, পবিত্র।

শুনে অমল হোম মন্তব্য করলেন, বীরবলী কাব্যবিন্যাসের পরিবেশে বাস করেন তো উনি। আমি জবাব করি, বাস করি না, করতাম। তবে আপাতত যাঁর প্রতিভূ হয়ে এসেছি তিনি কিন্তু সরল সহজ ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন। কবির ইঙ্গিত পেয়ে তৎক্ষণে ফরাসের উপর বসে পড়েছি।

কবি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিদগ্ধ বাগ্‌বিন্যাসের যেমন মূল্য আছে, সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্যের মূল্যও কিছু কম নয়।

কিন্তু সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্য মাত্রই কবিতা বা সাহিত্য হয়ে ওঠে না, মন্তব্য করলেন অমল হোম।

কখনো নয়। তীব্রতাই যদি কাব্যগুণের আধার হত, তাহলে তোমার প্রতিটি কথাকেই তো কবিতা বলা যেত। তীব্রতা ও রসাত্মক হলেই কাব্য হয়ে ওঠে যেমন উঠেছে নজরুলের বেলায়। সবাই চুপচাপ। দু চারটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি কবির দিকে নিবদ্ধ। একটু থেমে আবার তিনি বললেন, নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তোমাদের মনে যেন কিছু সন্দেহ রয়েছে।

তখনো সবাই নীরব।

এবার কবি যেন বক্তব্য পেশ করতে চান। তবে তাতে কৈফিয়তের সুর নেই।

নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ পত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র।

মার মার কাট কাট ও অসির ঝনঝনার মধ্যে রূপ ও রসের প্রক্ষেপটুকু হারিয়ে গেছে, উপস্থিত একজন মন্তব্য করলেন।

কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, একতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈ কি। আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে কলমেও ওই সুর বাজত।

কিন্তু তার রূপ হত ভিন্ন, আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল।

দু-জনের প্রকাশ তো দু'রকম হবেই, কিন্তু তা বলে আমারটা নজরুলের চেয়ে ভাল হত, এমন কথাই বা জোর করে বলবে কি করে ;

যাই বলুন, এ অসির ঝনঝনা জাতির মনের আবেগে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলী কাব্যের জনপ্রিয়তাও মিলিয়ে যাবে, মন্তব্য এল ফরাস থেকে।

জনপ্রিয়তা কাব্য বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।

সবাই চুপচাপ। প্রসঙ্গান্তর তুলে কবি জানতে চাইলেন, আমি কবে যাব নজরুলের কাছে। আমি জানালাম বুধবারে ইন্টারভিউর দিন।

কে যেন দু কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানায় নিজের নাম দস্তখত করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তাকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিও তো চাই।

জেলের ইন্টারভিউ-নিয়মমাফিক গরাদের ব্যবধানে আমি প্যাকেট খুলে গুরুদেবের উৎসর্গ-পত্র দেখাতেই নজরুল লাফ দিয়ে পড়ল লোহার গরাদগুলির উপর। বন্দীর প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডার কারণ জানতে চাইল। আমি যখন বললাম, পোয়েট টেগোর ওকে একখানা বই ডেডিকেট করেছেন। সাহেব আমার ইংরেজির ভুল ধরে বলল, ইউ মীন প্রেজেন্টেড, আমি জোর দিয়ে বললাম, নো, ডেডিকেটেড।

সাহেবের মুখে বিস্ময়।

ইয়ো মীন দি কনভিক্ট ইজ সাচ অ্যান ইমপর্টান্ট পার্সন।

ইয়েস, আওয়ার গ্রেটেস্ট পোয়েট নেক্সট টু টেগোর।

এক সেকেণ্ড কি ভেবে সাহেব দরজাটা খুলে আমাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করল নজরুল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে ছিটকে পড়া বইখানা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বুকে চেপে ধরল।

দু'কপির অপর কপি চেয়ে নিল ওয়ার্ডার সাহেব। উত্তেজনা একটু প্রশমিত হতে নজরুল জিজ্ঞাসা করল, আর কি বলেছেন গুরুদেব ?

বলেছেন তুই যেন কবিতা লেখা বন্ধ করিস না। গুরুর আদেশ শিরোধার্য বলে সেদিন আমাকে বিদায় করেছিল নজরুল। নজরুলের কবিত্বে প্রত্যয় ছিল বলেই কবি তাকে ওই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। অসি ঘোরাতে বলেন নি, কবিতায় অসির ঝনঝনা প্রকাশের কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী চেতনা উদ্বোধনের গান গাইতে।

নজরুলের কথা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

নজরুলের কথা আজ এভাবে স্মরণ করতে হবে, সে কথা সুদূরতম কল্পনাতেও ভাবিনি। সাহিত্য-ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে, যখন পূর্ব যুগে সংঘটিত সাহিত্যিকদের প্রতি অবিচারের কাহিনী পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম, সেদিন ভাবিনি যে, আমাদের জীবদ্দশাতেই সাহিত্য-ইতিহাসের এক নিষ্ঠুরতম উদাসীনতার অসহায় সাক্ষীরূপে থাকতে হবে। মাইকেলের সমাধি স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম জীবনে কতদিন ভেবেছি, সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকতাম তাহ'লে সমগ্র বাংলাদেশের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতাম, সেই নির্মম উদাসীনতার দিকে; কিন্তু আজ, সেই উদাসীনতারই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে... সেই আমিও রয়েছি...কতটুকুই বা কি করতে পেরেছি বা পারি! নিজের অক্ষমতার দৈন্যে লজ্জিত হওয়া ছাড়া, বেশী কিছু আর কি করতে পারি?

(২)

কিন্তু ভাবি, কেন এই অসহায়তা? কোথায় যেন এর মধ্যে কি একটা মহৎ ত্রুটি সংগোপন অবস্থায় রয়েছে, যার জন্যে ব্যক্তিগত কোন চেষ্টাই ফলবতী হতে পারে না। অথবা ব্যক্তিগত দায়িত্বকে এড়াবার জন্যে এটা কোন আত্ম-প্রবঞ্চনারই রকমফের? নজরুলের সতীর্থ-বন্ধু সংখ্যা তো কম নয়। তাঁরা তো আজ সকলেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা ব্যক্তি।

কিন্তু বহু চেষ্টার ফলে, এই সমস্যার মুলের সন্ধান পেয়েছি। অতি সহজ সত্য এবং অতি সহজ বলেই তাকে খুঁজে বার করতে এত চেষ্টা করতে হয়। সত্যটা হলো এই, এ সমস্যা ব্যক্তিগত সমাধানের বিষয় নয়, এ সমস্যা নজরুলের আত্মীয় স্বজনের নয়, নজরুলের বন্ধু-বান্ধবের নয়, এ সমস্যা হলো সেই দেশের যে দেশের সন্তান সে, যে দেশকে সুন্দর করতে, স্বাধীন করতে সে রাত-প্রভাতের চরণের মত ঘুরে বেড়িয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে; এ সমস্যা হলো রাষ্ট্রের সমস্যা, যে রাষ্ট্র সভ্য মানুষের সমাজে মানবতাকে সম্মান করতে জন্মগ্রহণ করেছে, যে রাষ্ট্র পুরানো জগতের ভুলের সংশোধন করে নতুন মানুষের সামনে নতুন আদর্শকে তুলে ধরবে। এ হলো সাহিত্য ও রাষ্ট্রের সম্পর্কজনিত সমস্যা। যদি এ সমস্যার সমাধান না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে, আমাদের রাষ্ট্র এখনো সভ্যতার সে স্তরে এসে পৌঁছয়নি, যেখানে সাহিত্যকে সে তার যোগ্য মূল্য দিতে শিখেছে। সাহিত্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের সে আত্মিক সম্পর্ক বাংলা দেশে গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না; তাই আজ প্রত্যেক সাহিত্য-স্রষ্টার সমস্যা তার ব্যক্তিগত সমস্যা। রাজনীতি সাহিত্যকে এড়িয়ে আত্মসর্বস্বতার দম্ভে নিজেকে কতখানি রিক্ত করে তুলছে ভেতর থেকে, বাইরে তার স্ফীতোদর দেখে হয়ত বোঝা

যায় না, কিন্তু একদিন তার মূল্য অতি নির্মমভাবেই দিতে হবে; যখন সামান্য একটা পিনের ফোটায় ফুলে ওঠা বেলুনের পেট ফেটে পড়ে যাবে, তখন চুপসে রাস্তার ধারে নর্দমায় তাকে পড়ে থাকতে হবে। তখন আবার ডাক পড়বে সাহিত্যিকের...জাগাও, মাতাও, বাণী দাও, দাও বাণী...

৩

বসেছি লিখতে নজরুলের স্মৃতি— বন্ধুর স্মৃতি। বড় বিচিত্র এর পরিবেশ। সে রয়েছে দু'হাত দূরে, আমি বলছি তার স্মৃতিকথা, ভুল হলে সে তা সংশোধন করবে না, ঠিক হলে সে তাতে আনন্দিত হবে না। তার মর্মর মূর্তির মতনই, সে রয়েছে আমার সামনে...এক অংশ তার চলে গিয়েছে ইতিহাসে....আর এক অংশ এখনও রয়েছে আমাদের সঙ্গে...ভালবাসার বাউল, কবি...আমাদের ভালবাসা আজ তার একমাত্র উপজীব্য।

৪

বহুদূরে পেছনে চলে যায় দৃষ্টি। সব শেষ হয়েছে জগতের প্রথম মহাযুদ্ধ। একদল দুঃসাহসী বাঙালী ছেলে ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলেছিল ফ্রান্সের দিকে, মেসোপটেমিয়ার দিকে; রাজা ইংরেজকে সাহায্য করবার কথাটাই তাদের মনের মধ্যে বড় হয়ে ছিল না, তাদের অধিকাংশের মনের মধ্যে ছিল বাঙালী ভাল ছেলের ভালমানুষের বদনামটুকু ঘোচাতে... খাওয়া-বসা-শোয়া আর কেরাণীগিরি করার বাইরে একটা কিছু করা...

বর্দ্ধমান থেকে এই দলে একটি তরুণ যুবা যোগদান করে... তার যৌবন জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয়েছিল, যে পরিবেশের মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করেছে, সে যেন সে পরিবেশের নয়...তার নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বার করা যায়, তার কোন উপায়ই তার জানা ছিল না। ভেতরে জেগেছিল শুধু একটা অন্ধ আবেগ...জন্মান্তরের সঞ্চয় ফল... শুধু আছির শৃঙ্খল ভেঙ্গে একটা-কিছু হওয়ার আকুলতা। সেই আকুলতাই বর্দ্ধমানের পল্লীজীবন থেকে নজরুলকে টেনে নিয়ে গেল যুদ্ধ-যাত্রীর শিবিরে। সেখানে সে হলো হাবিলদার। হওয়াটাকেই সে আঁকড়ে ধরলো। বাইরের জগৎ কি ভাবছে বা ভাবতে পারে, সে সম্বন্ধে সে ছিল উদাসীন। নিজের নামের আগে তাই সেই শব্দটিকে সপ্রেমে আঁকড়ে ধরে এবং নিজের অঙ্গে সৈনিকের খাকি আর সৈনিকের বুটকে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত অঙ্গের সঙ্গে গেঁথে যুদ্ধ অন্তে শিবির থেকে ফিরে এলো শহরে...কলকাতায়। কলকাতার পথে সেই কাপড় আর চাদরের সঙ্গে সৈনিকের বুট যে কত বেমানান, সেদিকে তার লক্ষ্যই ছিল না... কবির পক্ষে হাবিলদার হওয়াটা যে নিতান্ত নিরর্থক, সেকথা তার মনেই হতো না। পল্লীজীবনের নিরর্থক অস্তিত্বকে ছেড়ে সে যে এগিয়ে এসেছে, হাবিলদার কথাটা হলো তার স্মৃতি, এবং সে যে এগিয়ে এসেছে এই সত্যটাই তার কাছে পরম সত্য। নিজের অন্তরের ভেতর ছিল যে দুর্বার শক্তি, বাইরের কোন সহায়-সুযোগ না পেয়ে নজরুল অন্ধের মতন পরম বিশ্বাসে তার কাছেই নিজেকে দিয়েছিল ছেড়ে, সে তাকে নিয়ে যা করবে, আনন্দে সে তাই হবে। সে-আনন্দ তার ঝরে পড়তো, তার এলোমেলো রঙীন পোষাকের স্বাতন্ত্র্যে, তার প্রাণখোলা পুরুষালী অট্টহাসিতে, তার সকাল-থেকে-সন্ধ্যা আবার সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত অনর্গল গান-গেয়ে-যাওয়াতে। একটা দুরন্ত ঝর্ণা পাষাণ-কারার বন্ধন ভেঙ্গে বেরিয়েছে....তাই তার প্রতি পদশব্দে উঠছে কোলাহল...আনন্দ কোলাহল...

৫

সেই মূর্তিতেই তাকে প্রথম দেখেছিলাম... সে যে প্রায় দু'যুগেরও বেশী হয়ে গিয়েছে...আরপুলি লেনে সদ্য পরলোকগত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ীতে। সে সময় কলকাতা শহরে তখনও দু'তিনটি

জমাট সাহিত্যের মজলিস ছিল, সে রকম প্রাণবন্ত মজলিস আজ বাংলা দেশ থেকে উবে গিয়েছে। বাগচী মশায়ের বৈঠকখানা তখন ছিল কলকাতা শহরের একটা মস্ত বড় সান্ধ্য মজলিস। তখনকার খ্যাতনামা প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিক সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত হতেন, কবি-গৃহস্বামী আদরে, আপ্যায়নে, স্নেহে, মজলিসের মধ্যে যেন হাজার বাতি জ্বেলে ধরতেন। প্রায়ই কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে, যেমন কেউ কোন নতুন কবিতা পড়ে শোনাবেন,...অথবা বাইরে থেকে কোন গায়ক এসেছেন, সমাদর করে সবাই মিলে তাঁর গান শোনা হবে, বিশেষ করে সাহিত্যিক সমাগম হতো। মৈত্রী-সিদ্ধ গৃহস্বামী এই সব উপলক্ষের সৃষ্টি করতেন। সন্ধানে থাকতেন, কোথাও সাহিত্য গগনে নতুন কোন জ্যোতিষ্কের উদয়-বিভা দেখা যাচ্ছে কি না, কোথাও কোন গায়কের কণ্ঠে নতুন কোন সুরের অবদান শোনা যাচ্ছে কি না...আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চলে যেতো নিমন্ত্রণ...দ্বার প্রান্তে নিশিগন্ধার ঝাড়... তারই গন্ধে আমোদিত সান্ধ্য-আসরে বন্ধু-সহবাসে চলতো তাঁকে নিয়ে অমৃত-রস-ভুঞ্জন...

সরু গলি থেকে তিন চারটে ধাপের ওপরেই বৈঠকখানা ঘর ...রাস্তা থেকে দেখা যায় এবং শোনাও যায়। সেই পথ দিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় যাতাযাত করি, দু'খানা বাড়ীর পরেই ছাত্র পড়াতে আসি। প্রতিদিন সেই পথ দিয়ে যাই আর সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে দেখি, কবির বৈঠকখানায় সেই সান্ধ্য-আসর, জমিদার-বাড়ীতে ভোজের [illegible] অবাঞ্ছিত ইতর জনের মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি। চেহারা দেখে মজলিসের কাউকে কাউকে চিনতে পারি- — তখনকার বাংলা সাহিত্যের খ্যাত নামা সব লেখক, মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি ...তারা কত দূরে ? ছাত্র পড়াতে বসি। মন থাকে সেই নিশিগন্ধার গাছের আশে-পাশে। হঠাৎ একজন ছাত্র বল্লো, জানেন মাষ্টার মশাই, বাগচী বাড়ীতে আজ কাজী নজরুল ইসলাম আসবেন... বিদ্রোহীর কবি।

বিদ্রোহীর কবি... সে কথাটা তখন প্রত্যেক তরুণ ছাত্রের মুখে। মুসলিম ভারতে প্রকাশিত নজরুলের সেই কবিতা আমিও পড়েছি...মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই কবিতা মনে জ্বালিয়ে দিয়েছে এক নিদারুণ অশান্তি... তখন ওয়ালট হুইটম্যান মাথার শিয়রে রেখে আমরা ঘুমাই। হুইটম্যানের সেই বন্ধনহারা মুক্ত ছন্দের ভৈরবী সুর অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে যে নামহীন নিরাবয়ব আকুতি, দেখি বাংলা ভাষায় বিদ্রোহী কবিতার লাইনের আড়ালে আড়ালে তার অনুরণন। নিদারুণ হিংসা হয়, ব্যর্থকামের অসহায় অর্ন্তদাহ। সেই সঙ্গে, কেন জানি না, মনে দুর্বার বাসনা জাগে, যে লোকটি লিখেছে, আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন, তাকে দেখতে কেমন ? নিশ্চয়ই হুইটম্যান সে গুলে খেয়েছে। কেউ যদি প্রমাণ করে দেয়, বিদ্রোহী কবিতা হুইটম্যানের প্রভাবে লেখা, মনে যেন একটা স্বস্তি পাই। এমন সময় শুনলাম, লোকটি দু'খানা বাড়ীর পরেই এসেছে কবির সান্ধ্য-আসরে। পড়ানো রেখে উঠে পড়লাম। বাগচী বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। বৈঠকখানার ভেতরে একঘর লোক। তার মাঝখানে একমাথা চুল এক তরুণ যুবা ঘরের সমস্ত আলো তার কালো দেহে সম্বরণ করে নিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে করে গান গাইছে। বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, গাইতে গাইতে তার গলার শিরা দড়ির মত ফুলে উঠছে। গানের সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঘন ঘন দুলছে... মাথার লম্বা লম্বা চুল উড়ে উড়ে এসে চোখে মুখে পড়ছে। তীব্র আওয়াজ... কোথায় যেন একটা কর্কশতা রয়েছে... অথচ কি বিচিত্র তার আবেদন। চড়ার দিকে আওয়াজটা যেন চিরে গেল কিন্তু ঝড়ের মতন সে-আওয়াজে আর সব শব্দ যেন ডুবে যায়...সেই একা সর্বময় অধীশ্বরের মত বিচার করবার আগেই জোর করে মন দখল করে নেয়। কখন ভিড় ঠেলে সিঁড়ির ধাপের উপর দিয়ে অনাহূত বৈঠকখানার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। গান শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গায়ক অকারণে অট্টহাস্য করে ওঠে ঘরের ভেতর থেকে কে একজন বলে ওঠেন, বাঃ, ভাই কাজী।

তা হলে, ইনিই বিদ্রোহীর কবি। ঘরের মধ্যে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মনে আছে, ডষ্টয়ভস্কীর নভেলের কথা উঠেছিল। তখন ডষ্টয়ভস্কীর নভেলের প্রত্যেক বিদঘুটে রাশিয়ান নামটি

পর্যন্ত মুখস্থ। নিজেকে জাহির করবার দুরন্ত লোভ। অনাহূত কথনে সাহিত্যিকদের আলোচনার সঙ্গে আমিও যোগদান করেছি... বাইরে থেকে একজন অপরিচিত এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছে, আলোচনার উত্তেজনায় কেউ তা লক্ষ্য করে নি। চা এলো। একটি কিশোরী নিজের হাতে সকলকে চা পরিবেশন করল। হঠাৎ আমার কাছে চায়ের কাপ আসতে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি, আমি তো নিমন্ত্রিত নই।

আমার কুণ্ঠা দেখে গায়ক বলে ওঠে, আরে লজ্জা কি ভাই। পাছে প্রত্যাখ্যান করলে নিজেকে আরও চিহ্নিত করে তোলা হয়, তাই তাড়াতাড়ি কাপটা নিই। এতক্ষণ পরে গৃহস্বামীর কৌতূহল দৃষ্টি আমার ওপর এসে পড়ে। সস্নেহ জিজ্ঞাসা, কৌতূহলী প্রশ্ন, কুণ্ঠিত উত্তর... ইত্যাদি... সভা সেদিনকার মত ভেঙ্গে যায়। গৃহস্বামী বলেন, তোমাকে আর আপনি বলবো না... যখন সময় পাবে, এসো ভাই।

কৃতার্থ হয়ে রাস্তায় নামি। হঠাৎ শুনলুম কে যেন আমাকে ডাকছে, শুনুন, শুনুন, মশাই।

দেখি, বিদ্রোহীর কবি আর তাঁর সঙ্গে ঈষৎ দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গ এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি আমার কাছে এগিয়ে এসে, নিজের পরিচয় নিজেই দেন; আমার নাম, আফজল... আফজল-উল-হক্... মোসলেম ভারত আমারই কাগজ... আর এঁকে তো চেনে? ইনিই বিদ্রোহীর কবি, হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম।

কলকাতা শহরের বিশেষ কাউকেই তখন চিনি না, জানি না। থাকি শহর থেকে দূরে, প্রায় পল্লী অঞ্চলে শহরের এক উপকণ্ঠে। মাত্র তখন সিটি কলেজের একজন ছাত্র।

ভদ্রলোকটী আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

বিদ্রোহীর কবি সেই সঙ্গে বলেন, হাঁটতে হাঁটতে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক্...

সাহিত্য জীবনের প্রথম মৈত্রীর সেই মধু রাত...হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে শহর ছাড়িয়ে চলে যাই...পৌঁছই আমার বাড়ীতে। আমি বলি, আপনারা পথ চিনে ফিরতে পারবেন না, চলুন এগিয়ে দিই। আবার তাঁরা দুজনে ফেরেন আমাকে এগিয়ে দিতে। রাত্রি হয়ে আসে গভীর। এতটুকু পথ যাওয়া-আসাতে যেন ভরে যায় জন্ম-জন্মান্তরের ফাঁক। মনে হয়, যে যোগসূত্র এদিন ছিল ছিন্ন আজ এই রাত্রিতে কে যেন অদৃশ্য হাতে তা আবার দিল জুড়ে। পুরুষে পুরুষে মৈত্রী... এর অনুরাগের তীব্রতার মধ্যে নেই ভেজাল নেই অন্য কোন জিনিসের সংগোপন আকর্ষণ।

এবার ফিরতে হবে...

বিদ্রোহীর কবি নিমন্ত্রণ করলো, কাল আমাদের পরব... আপনার নেমতন্ন রইলো... আমি নিজে রাঁধবো ... হাঁ ... আসবার সময় আপনার কবিতার খাতাটা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, আমি লিখি না। প্রথম সঙ্কোচ নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই—মেডিক্যাল্ কলেজের সামনে কলেজ ষ্ট্রীটের ওপর মেসবাড়ী। সেই বাড়ীতেই তখন ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরী, তারই একাধারে থাকতেন মুজফ্ফর আহ্মদ।

কবির ঘরে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে দুটো খাটে দুটি বিছানা। মেঝেতে একটা ষ্টোভে কবির নিজের হাতে রান্না প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। খেতে বসে দেখলাম, চাল আর ডাল, প্রায় আদিম অবস্থাতে পরস্পর পরস্পরকে চোখ রাঙিয়ে সরে আছে।

কিন্তু খাওয়াটা তখন জীবনে অত্যন্ত অবান্তর একটা ব্যাপার। তারই মধ্যে দেখি, দু'একজন ক'রে ছেলে আসে। বারান্দায় গোপনে কি কথা হয়, সব কথার শেষে সেই অট্টহাসি। হাসির কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি।

কি যেন একটা রহস্য চলেছে বুঝতে পারি না।

কথা... কথা... কথা... বিকেল হয়ে আসে... সন্ধ্যা হয়ে আসে... হঠাৎ কবি প্রস্তাব করে, আমরা একটা কাগজ বার করবো... তোমাকেও তাতে থাকতে হবে ... কাগজের নাম কি হবে, জান ? ধূমকেতু। আবার সেই অট্টহাসি।

কবি বলে, আমি বই পড়িনি বেশী ... পড়তেও চাই না ... সেদিকটা তুমি দেখবে ... দেশ বিদেশে যেখানে মানুষ স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছে বা দিচ্ছে, তার কথা আমাদের কাগজে থাকবে ... আর আমি, ভাষা দিয়ে চাবুক লাগাবো ... সন্ধ্যার ভাষা ... সেই হবে আমার ভাষা... মরা মানুষকে জাগিয়ে তুলবো ... এই ভয় জুজুর দেশে ভয়কে ভাঙ্গতে হবে ... তারি জন্যে আমরা...

রাত্রির অন্ধকারে শুনি, তরুণ বাংলার বিপ্লব সাধনায় আর এক অধ্যায়ের পরিকল্পনার কাহিনী...

যতদূর মনে আছে, ধূমকেতুর পুঁজি ছিল বোধ হয় গোটা ত্রিশ টাকা... মেটকাফ প্রেসে রমেশ ভায়া ছাপাতে রাজী হলো...

হঠাৎ শেষ মুহূর্তে মনে হলো, কবিগুরুর একটা আশীর্বাদ পাওয়া যায় না?

তৎক্ষণাৎ নজরুল একটা টেলিগ্রাম করলো। উত্তরে কবিগুরু কবিতায় আশীর্বাণী পাঠিয়ে দিলেন,—

'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু'
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা,
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যারা অর্ধ-চেতন।

সেই শিরোনামা নিয়ে ধূমকেতু বেরুলো।

বাংলাদেশে একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। একটা বেপরোয়া নতুন সুর রাতারাতি যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। লেখক, প্রুফ রীডার, দফতরী আমরা নিজেরাই। হকার এসে জুটলো, নজরুল-অগ্নিতে পতঙ্গের মতন তরুণ ছেলের দল।

কলেজ ষ্ট্রীটের মেস থেকে অফিস বদলে এলো প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে। ভাঙ্গা দোতলা বাড়ী। সম্পদের মধ্যে বাড়লো, আবদুল। রাঁধুনী, দরওয়ান, কেয়ার টেকার, সবই ষোল সতের বছরের ছোকরা। দেওঘরে গাড়ী চালাতো। দেওঘর থেকে নজরুলের সঙ্গে চলে আসে। একটি হ্যারিকেনের লণ্ঠন, একটি বদনা, খানকতক মাদুর, গোটাতিনেক চিনেমাটির প্লেট। সেই বদনা পায়খানায় যায়, রান্নাঘরে ঢোকে, চায়ের কাপের অভাব পূরণ করে। দুপুর বেলায় আবদুল এক হাঁড়ি ভাত, আর এক কড়া ঝোল এনে দেয়। দুপুর পর্যন্ত যারা থেকে যায়, তারা ভাগাভাগি করে খায়। কেন কোন দিন ভাগে একটি করে আলু পড়ে। আবার সেই ভিড়। আড্ডা। রমেশের তাগাদা কপির জন্যে। আফজল হন্যে হয়ে ছুটে আসে, কপি কই? সমানে চলে আড্ডা। তার মধ্যে এক কোণে দুই হাঁটু জড়ো করে নজরুল লিখতে বসে। চারদিকে চলে সমানে আড্ডা। সন্ধ্যার পর তৈরী হয়ে যায় কপি। রক্ত-অক্ষরে-লেখা ভৈরবিনী ছিন্নমস্তার আবাহন। রাত্রি হয়ে আসে। তেলের অভাবে আবদুল আর লণ্ঠন জ্বালে না।

জ্বালতে গেলেও নজরুল বারণ করে। উঠোনে নিমগাছটা অন্ধকারে দুলতে থাকে। সারা বাড়ীটা মনে হয় ভুতুড়ে বাড়ী। নজরুল একমনে বাঁশী বাজিয়ে চলে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ধূমকেতুর পুচ্ছ গিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নজরুল হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। ঢাকা, কুমিল্লা, মুর্শিদাবাদ... বিশেষ করে তখন আর একদিক থেকে কুমিল্লা তাকে টানছে। বাংলার আকাশে বাতাসে বিপ্লবের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ধূমকেতুর কবিতা জীর্ণ আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। তরুণেরা সে বহ্নুৎসবে উল্লসিত হয়ে ওঠে। একটা গতিশীল সজীবতা যৌবনকে উচ্চকিত করে তোলে। স্থানু প্রাচীনপন্থীর দল বিরক্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নায়কের পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রতিনিধিস্বরূপ ধূমকেতুর অবাচীন সম্পাদককে কলম উঁচিয়ে তাড়া করলেন, জঘন্য ভাষায় হীন গালাগাল সুরু করলেন। নায়কের বৃদ্ধ সম্পাদক ভেবেছিলেন, তাঁর ভাষার চাবকের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কোন তরুণ লেখক বাংলা ভাষায় এখনো জন্মায় নি।

কিন্তু পরের সংখ্যা ধূমকেতু খুলে দেখে তাঁর জ্ঞান হলো যে, তার অস্ত্রে তাঁকে ঘায়েল করবার মতন লোকের এখনও অভাব হয় নি। সুরু হলো এক জঘন্য লেখনী দ্বন্দ্ব। হয়ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রাম বহুল জীবনে সেই শেষ সংগ্রাম। এবং সে সংগ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইকে গোপনে তাঁর বন্ধু মহলে পরাজয়ই স্বীকার কবতে হয়েছিল।

ক্রমশঃ ধূমকেতুর বাণী স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। ভাষার শঙ্খে নজরুল আহ্বান ঘোষণা করলো, 'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ? স্বর্গ যে আজ জয করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।' বহুদিনেব বন্দী-জীবন যাপন করার পর ভূপতি মজুমদাব মহাশয তখন আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। নজরুলকে 'তনি তাঁর স্নেহচ্ছাযে গ্রহণ করলেন। বাংলার আকাশে আবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিযে উঠলো।

এমন সময একদিন টেগার্ট সাহেব সদলবলে প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে এসে উপস্থিত হলেন। নজরুল তখন কলকাতায নেই। একজন পুলিশ ইনস্পেক্টব আড়ালে আবদুলকে ডেকে পবম-বন্ধুর মত বল্লেন, এই. রিভলভার-টিভলভার যা লুকোনো আছে, এইখান দিয়ে নিযে পালিযে যা... আমি কিছু বলবো না... এই সুযোগ, বুঝলি ?

আবদুল বোকা সেজে বলে, আপনি যে কি বলছেন বাবু, তা আমি কিছুই বুঝি না।

কতকগুলি কাগজপত্র আর চিঠি নিয়ে টেগার্ট সাহেবের দল চলে গেলেন। খবর পেলুম, কুমিল্লার পথে নজরুল গ্রেফ্তার হযেছে।

কলকাতায ভূপতিদার কাছে খবর এলো, নজরুল নাকি পুলিশের কাছে "ষ্টেটমেন্ট" করেছে।

ভূপতিদা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, কখনই না... হতে পারে না... ভুল কথা।

আলীপুরের জেলে নজরুল আসতেই ভূপতিদার দূত গিয়ে দেখা করলো।

বিচারের দিন দেখা গেল, নজরুল এক জবানবন্দী পাঠ করলো, রাজবন্দীর জবানবন্দী...

সে-জবানবন্দী আজ সংগ্রহ করে পুনর্মুদ্রিত করা উচিত। বাংলার যৌবনেব মানসিক ইতিহাসে একটা পাতা তাতে আছে। বিচারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হলো।

কারাগারে বসে নজরুল তার এতদিনের কাব্য-সাধনার পুরস্কার পেলো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত গীতিনাট্য উপহার পাঠালেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে।

বন্ধুবর পবিত্র গাঙ্গুলী সে শুভসংবাদ নজরুলকে পৌঁছে দিল।

স্মৃতিপটে নজরুল

কাজী মোতাহার হোসেন

কবি নজরুল ইসলামেব সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ কবে হয়েছিল, ঠিক মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে কলকাতার তালতলা বাজারের কাছে কোন এক গলিতে বস্তি এলাকার একতলা কোন ক্ষুদ্র কোঠায় একবার তাঁব সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আর একবার মেডিক্যাল কলেজের সামনে কলেজ স্ট্রীটের* কোন মেস-এর দু'তলায়। তখন তাঁর ঝাঁকড়া চুল আর আয়ত দুটো চোখই আমার সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরপরে কারমাইকেল হোস্টেলের কোন এক নৈশ অনুষ্ঠানেই বোধ হয় সর্বপ্রথম তাঁর গান শুনি, এই সময় তাঁর হারমোনিয়াম বাজানোর কৃতিত্ব দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলাম। আরো পরে ইউরোপীয় এসাইলাম লেন, পানবাগান স্ট্রীট, বাগবাজার এলাকা, ইসমাইল স্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, এণ্টালী, জেলিয়াটোলা, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, মানিকতলা এবং চিৎপুর রোডেব উপবকার হিজমাস্টারস ভয়েস অফিস, ওয়েলসলি রোডের উপরকার সওগাত অফিস এবং জোড়া গীর্জা অঞ্চলের মঞ্জু সাহেব ওস্তাদের গানের মজলিশেও নজরুল ইসলামের সংগে আমাব দেখা হয়েছিল। পবে দু'একবার ওঁর সংগে চীৎপুর হিজমাস্টারস ভয়েস অফিসেও গিয়েছি। এই ঘটনাগুলো সবই কলকাতা অঞ্চলে আর ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে ঘটেছিল। কিন্তু এখানে সেগুলোকে কালক্রমিকভাবে সাজানো হয় নি। ১৯২৭ সালের আগে নজরুলের সংগে আমার যেসব দেখাশুনা হয়েছিল তা অনেকটা দূর থেকে কোন বিখ্যাত লোকের সংগে সাধারণ গুণগ্রাহী লোকের সাক্ষাতের মত। কিন্তু ১৯২৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী যখন নজরুল ইসলাম আমাদের নিমন্ত্রণে ঢাকায় এসে এখানকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন গীতি গাইলেন আর সে সুরের বিপুল উচ্ছ্বাসে উপস্থিত সুধীগণ এমনকি মোল্লা-মৌলভীগণ পর্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলেন তখন সেই যাদুকরী প্রভাবে সকলের সংগে আমিও মোহিত হয়ে গেলাম। এইবারই প্রথম তাঁর সংগে আমাব সত্যিকার পরিচয় এবং হৃদ্যতা জন্মে। এ হয়ত সংগীত শিল্পীর প্রতি সাধারণ সংগীত অনুরাগীর স্বাভাবিক আকর্ষণ। আমাদের মধ্যে বয়সেও মোটামুটি সাম্য ছিল। আমি ওঁব চেয়ে মাত্র দু'বছরেব বড। তাই অনায়াসে গোড়া থেকে 'আপনি আপনি' না হয়ে 'তোমা-তুমি'-র মত বয়স্য সুলভ সম্পর্কই গড়ে ওঠে।

সাহিত্য-সম্মেলনে আমিও "সংগীত-চর্চায় মুসলমান" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। আমার প্রবন্ধ শুনে মোল্লা সম্প্রদায়ের মুখ থেকে যে উক্তি বেরিয়েছিল সে হল— "ও বাব্বাহ্। দাড়ীর মধ্যেও এত কুফরী?" আর নজরুলের গান শুনে যে উক্তি বেরিয়েছিল তা হল, "বা! বা! কী সুন্দর ইসলামী গান— ঠিক যেন গজল" খুব সম্ভব:

দখিনের হালকা হাওয়ায আস্‌লে ভেসে সুদূর বরাতী।
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বল্‌ল দীপালী।
তালিবন ঝুমকি বাজায়, গায় "মোবারক-বা'দ" কোয়েলা।

---

* বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতিব অফিস ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট।

উলসি' উপচে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি।

এবং

এল কি অলখ্-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল-রাশীদ।
এল কি আল-বেরুণী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী॥
সানাইয়াঁ ভয়বোঁ বাজায়, নিঁদ-মহলায় জাগলো শাহজাদী॥
কারুণের রূপার পুরে নূপুর পায়ে আস্‌ল রূপওয়ালী॥
খুশীর এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফর্‌হাদ ও শিরী।
লাল ও লায়লি লোকে মজনু হর্দম চালায় পেয়ালী।

এরপর নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত মুসলিম সাহিত্যে সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনও ঢাকায় এসেছিলেন। আমি তখন বর্ধমান হাউসের হাউস টিউটর হিসেবে উক্ত ভবনের দোতলায় বাস করতাম। নজরুল ইসলাম সেবার মাসাধিক কাল আমার সঙ্গে ছিলেন। বাসগৃহের সংলগ্ন একটা ছোট কামরায় তিনি থাকতেন। আমার বড় মেয়ের বয়স তখন পাঁচ বছর। নজরুল তাকে গান শেখাতেন, 'এ আঁখি জল মোছ পিয়া ভোল ভোল আমারে', 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,' 'কি হবে জানিয়া বল কেন জল নয়নে'– ইত্যাদি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলাবার চেষ্টা করতাম বটে, কিন্তু ঠিক মত মীড-গমক আদায় করতে পারতাম না।

এবারে বনগাঁর অধিবাসিনী প্রতিভা সোম ওরফে রানু সোম্— (বর্তমানে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী) এবং রমনা হাউসের অধিবাসিনী উমা মৈত্র ওরফে নোটন- (ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্র মৈত্রের কন্যা) এই দুই জনের সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় হয়। রানু ও নোটন দুইজনেরই পিতামাতা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে আমার ও আমার পরিবারবর্গের সবিশেষ পরিচয় ছিল। রানুর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও সুরেলা ছিল। নজরুল একে গান শুনিয়ে আনন্দ পেতেন। তিনি "কল্যাণীয়া বীণাকণ্ঠী শ্রীমতি প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু" নামে তাঁর 'চোখের চাতক' উৎসর্গ করেছিলেন। রানুকে গান শেখাবার পেছনে কবির আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, দিলীপ রায়ের সংগে প্রতিযোগিতা। দিলীপ রায় ইতিপূর্বে রেণুকা সেনকে গান শিখিয়েছিলেন। তার কয়েকটা কীর্তন ইতিপূর্বে রেকর্ডে উঠেছিল।

এ-প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। সে হ'চ্ছে, আমাদের দেশের লোকের মনোবৃত্তি। দিলীপ রায়ের সঙ্গে রেনুকা'র সম্পর্কের বিকৃত অর্থ করে কলকাতার সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা দিলীপ রায়ের নাম দিয়েছিলেন 'কানুরে।', আর 'রানুর' সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কের বিকৃত অর্থ করে সজনীকান্তের শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছিল 'কে বিদেশী বন্‌গাঁবাসী বাঁশের বাঁশী (লাঠি?) বাজাও বনে।' আর নও জওয়ান হিন্দু ছোকরারা একজন মুসলমান (বা মুসলা) যুবক প্রতিভা সোমকে দিন নেই, রাত নেই, যখন তখন গান শেখাতে আসবে তা সহজ মনে গ্রহণ ক'রতে পারেনি— হয়ত তাদের কাছে এ-ব্যাপারে নিজেদের পৌরুষের উপর আঘাত বা চ্যালেঞ্জের মত মনে হয়েছিল। তাই একদিন রাত দশটা এগারোটার মত সময়ে রানুদের ঘর থেকে গান শিখিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় অন্ধকারে পাঁচ সাত জন যুবক নজরুলকে লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমণ করে। নজরুলও জওয়ান মর্দ মানুষ, বেতের মুঠোওয়ালা একটি লাঠি কেড়ে নিয়ে, তাদেরকেও দু-এক ঘা কষে লাগিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসেন বর্ধমান হাউসে। দেখলাম, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে। হাতে পিঠে রক্ত আর পিটুনির দাগ। অবশ্য, এ নিয়ে কোন দিক থেকে আর উচ্চবাচ্য হয়নি। নজরুল রানুকে যে সব গান শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে এইগুলো মনে পড়ছে: 'যাও যাও তুমি ফিরে (এই) মুছিনু আঁখি', 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়, তবু যেতে হবে হায়,' 'আঁধার রাতে কেগো একেলা, নয়ন সলিলে ভাসালে ভেলা,' 'আমি কি দুখে লো গৃহে রব, ' 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়,' 'নাইয়া কর পার। কূল নাহি নদী জল সাঁতার'— ইত্যাদি বহু ঠুংরী খেয়াল কীর্তন এবং বিভিন্ন জাতীয় গান।

প্রিন্সিপাল মৈত্রের মেয়ে নোটন ছিল অপরূপ সুন্দরী। দিলীপ রায় ঢাকায় এসে প্রধানত প্রফেসর সত্যেন বোসের বাড়ীতেই উঠতেন। ইনি সেখানে এবং প্রফেসর বোসের বন্ধুদের বাড়ীতেও গানের আসরে নিমন্ত্রিত হ'য়ে গান গেতেন। তাই তিনি আমাদের বাড়ীতেও দুই-একবার এসে গান শুনিয়েছেন ; তাছাড়া মৈত্র মশায়ের বাড়ীতে, রূপবাবুর বাড়ীতে, ধনকোড়া জমিদার বাড়ীতেও এবং অন্যত্রও—কার্জন হল, জগন্নাথ হল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও গান ক'রতেন। এর বাপ-মা জগন্নাথ হল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও গান ক'রতেন। এর বাপ-মা দু'জনেই কিছুটা বিলিতী ধরনের ব্রাহ্ম ছিলেন। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, চিত্র প্রভৃতির অনুরাগীরা এঁদের বন্ধু-শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাছাড়া টেনিস ও দাবা খেলাতেও নোটনের অনুরাগ ছিল। নজরুল এই পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নজরুল ইসলামের 'নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া- পরান পিয়া,' 'আজি এ কুসুম হার সহি কেমনে?' 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' প্রভৃতি বহু গানের সঙ্গে নোটন সেতারের সঙ্গত করেছেন। সে-সময় সস্ত্রীক মৈত্র মশায়, সত্যেন বাবু এবং আমিও বহুদিন এঁদের সঙ্গে সঙ্গীতালাপ উপভোগ ক'রেছি।.....নজরুলের 'চক্রবাক' গ্রন্থখানা নোটনের নামে নয়, নোটনের বাবা "বিগত-প্রাণ, কবি, দরদী-প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু"র নামে উৎসর্গ করা হ'য়েছিল। আমি জানি, নোটনের কাছ থেকে নজরুলের প্রতি কোন প্রকার বাহ্য পক্ষপাতিত্ব, সাড়া, অনুরাগ বা বিরাগ লক্ষ্য করা যায় নি। তাইতে মনে হয় 'চক্রবাকে'র অনেক কবিতায় যে হতাশার সুর, অভিমানী কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য ক'রেই হ'য়েছে ব'লে মনে হ'লেও খুবই সম্ভব তাতে কবি নজরুলের মনের নানা মিশ্র ঘটনার স্মৃতির একটা সমবেত (resultant) ছাপ পড়েছে। এ সম্পর্কে স্মরণীয় :

--ওগো ও কর্ণফুলী,
উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।
যে লোনা জলের সিন্ধু-সিকতে নিতি তব আনাগোনা,
আমার অশ্রু লাগিবে না সখি, তার চেয়ে বেশী লোনা।
তুমি শুধু জল টলমল ; নাই তব প্রয়োজন
আমার দু'ফোটা অশ্রুজলের এ গোপন আবেদন।

রাখাল গোপাল শ্রীকৃষ্ণের মত দুর্নিবার যে নজরুল, সে যে "কার আঁখি জলে বেঁচে যাবে বলে সকল তেয়াগী" ভিখারী সেজেছিলেন তা কে বল'বে ?

এ যাত্রারই কবির সঙ্গে মিস্ ফজিলাতুননেসারও পরিচয় হয়। নজরুল ইসলাম কিছু কিছু জ্যোতিষী জানেন এবং হস্তরেখা দেখে ভাগ্যগণনা ক'রতে পারেন, আমার কাছ থেকে এ-কথা শুনে ফজিলতের কাছে হাত দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে-ইচ্ছা সহজেই কাজে পরিণত হয়। এইভাবে ফজিলত ও তার ছোটবোন সফীকুননেসার সঙ্গে নজরুলের দেখাশোনার সূত্রপাত হয়। বর্ধমান হাউসে আমার ভাইবোনসহ অনেক লোক থাকায়, আমিও বাইরের ছোট ঘরটায় নজরুলের সঙ্গেই এক বিছানায় শুয়ে রাত কাটাতাম। একদিন রাতে উঠে দেখি নজরুল বিছানায় নেই। ব্যাপার কি ? পরে অনেক বেলাতে জানা গেল কখন যেন তিনি আলগোছে উঠে চ'লে গিয়েছিলেন দেওয়ান বাজার রাস্তার উপর অবস্থিত ফজিলতের গৃহে। সেখানে কখন গিয়েছিলেন, কতক্ষণ ছিলেন, কি ক'রেছিলেন,—সারারাত কি সেখানেই ছিলেন, না সেখান থেকে রমনা লেনের ধারে এসে দিনান্তের বিকাল বেলাকার অভ্যাসটা সম্প্রসারিত করে সেদিনের নিশান্তের শেষ যামটাও সেখানে বসেই লেকের পানি, গাছপালা ও ঘাসপাতা দেখে দেখেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন, এ-সব তথ্য আমি জিজ্ঞাসাও করিনি, জানতেও পারিনি। তবে পরদিন একটা ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম, ফজিলতের গলার লম্বা মটর মালার হারটা ছিন্ন। পরে সেটা সোনার দোকান থেকে জোড়া লাগিয়ে আনতে হয়েছিল। এরপরে নজরুল ঢাকা থেকে কলকাতা

চ'লে যান। যাবার সময় সেই নজরুল-মারা মুঠো-ওয়ালা বেতের লাঠিটা আমাকে দিয়ে যান। কলকাতা থেকে তিনি আমাকে কয়েকখানা চিঠি লিখেছিলেন, এবং আমার চিঠির সঙ্গে ফজিলতের কাছেও একখানা কাব্যিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই কাব্য-চিঠির নাম ছিল 'রহস্যময়ী'। পরে ঐ নাম বদলিয়ে 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' নাম দেওয়া হয়। আমার কাছ থেকে নজরুলের লেখা চিঠিগুলো নিয়ে অধ্যাপক আলী আশরাফ নজরুল চরিতের একটা দিক উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা ক'রেছেন। তাতে ঘটনার কিছু কিছু বিকৃতি থাকলেও বোধ হয় সাহিত্যিক বিচারে যতটা আন্দাজ করা সম্ভব, তা তিনি ক'রেছেন। নজরুলকে লেখা আমার চিঠিগুলোর নকল আমার কাছে নেই; আর সেই সব চিঠি কি নজরুলের কোন দেরাজে এখন পর্যন্ত রয়েছে। তারও সম্ভাবনা খুব কম। তবু আমার প্রতি তাঁর মনে যে একটা কোমল সখ্য ভাব ছিল, তার একটা পরিচয় এই যে, ১৯৪৩ সালের পরে ঢাকা থেকে কবির সুচিকিৎসার জন্য কিছু চাঁদা তোলা হ'লে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবদুল কাদির প্রমুখ কয়েকজন নজরুলের কাছে সেই টাকা দিতে যান; তখন নজরুল প্রায় সংজ্ঞাহীন। তাঁদের কাছে শুনেছি সে সময়ও কয়েকবার 'মোতাহার, মোতাহার' নাম উচ্চারণ ক'রেছিলেন। নজরুলের অবচেতন মনে প্রীতির এই স্মরণটুকু আমার কাছে এক মহামূল্যবান সম্পদ। যা হোক উপরে যা বলতে যাচ্ছিলাম: সে হ'লো শুধু চিঠিগুলো আর রহস্যময়ী কবিতার মধ্যে কবি-চিত্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়— যা, আলী আশরাফ আন্দাজ ক'রেছেন বা জাষ্টিস আবদুল মওদুদ সাহেব যুক্তিযুক্তভাবে প্রমাণ বা অনুমান করেছেন, তা হয়ত সত্যের কাছাকাছি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমিও 'রহস্যময়ী'র সব কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি; 'ছিন্ন হারে'রই বা তাৎপর্য কি, তা-ও আমার কাছে 'রহস্যময়'। তবে এ-সব কথার উপলক্ষ্য ফজিলত হ'লেও সবটা লক্ষ্য "কারো একার প্রাপ্য নয়" বলেই আমার বিশ্বাস।

একটি পাঠ্যবই-এর জন্মকথা

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন

তরুণ বাঙলার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নজরুলের ভক্তদলের মধ্যে [illegible] নিকটের লোক বলিয়া আমার গর্বের সীমা নাই। তাঁর নিকট হইতে আহ্বান আসায় তৎক্ষণাৎ গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

কবি হাসিয়া নিকটে বসাইলেন। বলিলেন, ওরে, আমি যে এক কুকর্ম করে ফেলেছি, এখন তুই না হলে যে আর চলে না। পাঠ্য বই নিয়ে খুব তো মাতামাতি করছিস্, দেখ তো এই ব্যাপারে কি করা যায়।

তাঁর কোন হিন্দু ব্যবসায়ী বন্ধু তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন, মক্তবের একখানা পাঠ্য বহি লিখিয়া যদি ডিরেক্টরের অনুমোদন লাভ করাইয়া বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘরে আসিবে।

দারিদ্রজর্জর কবি তাঁর ফাঁদে পা দিয়া মক্তব ও মাদ্রাসাসমূহের প্রথম শ্রেণীর একখানা বই লিখিয়াছেন। নাম দিয়াছেন, 'মক্তব সাহিত্য'। বহিখানার সামান্য কিছু কপি ছাপাও হইয়াছে। এখন উহা ডিরেক্টরের অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। ডিরেক্টর প্রত্যেক বহির জন্য তিনজন সদস্য নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাদের বইটি সম্বন্ধে অনুকূল মত দিলেই উহা অনুমোদন লাভ করিবে। সদস্যদের নাম এমন গোপন রাখা হইয়াছে যে কাহারও জানিবার উপায় নাই। তা সত্ত্বেও ধুরন্ধর প্রকাশকদের প্রচেষ্টায় এ নাম আর গোপন থাকে না। উহা এক সময় নানা কৌশলে তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। মক্তব সাহিত্যের প্রকাশকও নাম সংগ্রহ করিয়া আসিয়া কবিকে ধরিয়াছেন। বলিয়াছেন, আপনার প্রভাব খাটাইয়া ইঁহাদের অনুকূল মত সংগ্রহ করিতে হইবে।

কবি বাঁকিয়া বসিয়াছেন, কাহারও কাছে তিনি যাইবেন না। এখন আমাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে, আমি এ-ব্যাপারে কোনো সাহায্য করিতে পারি কি-না।

উপরের এত ঘটনার কোনো খবরই জানিতাম না। ইচ্ছা করিয়া আগে আমাকে জানানো হয় নাই। সাধারণত ইহা গোপনেই রাখা হয়। কারণ একখানা ভাল লোকের ভাল বহি পাস হইয়া গেলে অপরের বহি বাজারে দাঁড়াইতে পারে না। তাই ঐ বহিখানা বাদ দেওয়ার জন্য অনেক প্রতিযোগীই চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমি অবশ্য নজরুলের বহি যাহাতে বাদ পড়ে এরূপ চেষ্টা করিব না, আমার উপর কবির এ-বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি অকপটে আমাকে সব কিছু খুলিয়া বলিলেন আর আমার মত চাহিলেন।

টেক্সট বহির ভিতরে যে-সকল নোংরামি আছে তাহা আমি জানিতাম। আগে জানিতে পারিলে আমি হয়তো কবিকে এ-কাজে হাত দিতে দিতাম না। তাঁকে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিতাম। তাঁর মোহাচ্ছন্ন মন হয়তো আমার বারণ শুনিত না। তবু সতর্ক করিতে চেষ্টা করিতাম। বহি ছাপা হইয়া

কমিটিতে দাখিল হইয়াছে, এখন তাঁর বহি যাহাতে অনুমোদন লাভ করিতে পারে এজন্য চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা ছাড়া যে কিছু হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। আমি শুনিয়াছিলাম, ইহার আগে রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ সিরিজ' কমিটির অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই। অবশ্য উহা ডিরেক্টর- প্রবর্তিত সিলেবাসের নির্দেশ পালন করা হইয়াছে। অতএব একটু চেষ্টা করিলেই ইহা অনুমোদন লাভ করিতে পারে।

প্রকাশক-বন্ধুও ওখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, কবিকে আর এ-কাজে টানিবেন না। এজন্য যে হীনতা স্বীকার করিতে হয় কবির পক্ষ হইতে তাহা আমিই করিব।

খুশী হইয়া কবি আমার উপর সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলেন। প্রকাশক-বন্ধু যে ইহাতে খুশী হইতে পারিলেন না, তাহা বুঝিলাম। তবু আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া বাড়ী আসিলাম। চিন্তা করিতে লাগিলাম, কাকে দিয়া কাকে ধরা যাইবে এবং কি উপায়ে কবির বইখানার জন্য অনুকূল মত আদায় করা সম্ভব হইবে।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রকাশক-বন্ধু কবিকে সংগে করিয়া আমার বাসায় আসিয়া হাজির। একটি ট্যাক্সীতে করিয়া তাঁহারা আসিয়াছেন। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলাম। বুঝিতে পারিলাম, কবি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেও প্রকাশক-বন্ধু বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইহাকে স্বস্তি বোধ করিলাম এই ভাবিয়া যে একা এই কঠিন দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে রাখা আমার পক্ষে উচিত হয় নাই। খোদা যা করেন, যদি কোনক্রমে কবির বহি বাদ পড়িয়া যায় তা হইলে ভবিষ্যতে কবির সহিত আমার মধুর সম্পর্ক আর থাকিবে না।

উহাদের সঙ্গে হাওয়া বেলিলিয়াস রোডে এক সদস্যের বাসায় গেলাম। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কবির ভক্ত। তখন তিনি হাওড়ার কোন হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। আজ তাঁর নাম প্রকাশ করিতে কোন আপত্তি নাই। তিনি মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন।

মনসুরউদ্দীন আমাদের পাইয়া মহা খুশী। কবি তাঁহার বাসায় গিয়াছেন ইহাতে তিনি অবাক হইয়া গেলেন। কোথায় বসাইবেন, কি খাওয়াইবেন, সে এক মহা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। চা আসিল, মিষ্টি আসিল, পান জর্দা আসিল। মেস-জীবনে যতটুকু খাতির করা সম্ভব তাহার চরম করিয়া ছাড়িলেন।

প্রকাশক-বন্ধু তো অবাক। তিনি জানিতেন সদস্যরা বিশেষ পাত্তা দেন না। এ ক্ষেত্রে সদস্য খাতির করিয়া চা খাওয়ায়।

সমস্ত শুনিয়া মনসুরউদ্দীন বলিলেন, এজন্য কবির স্বয়ং কষ্ট করিয়া আসিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মঈনুদ্দীন একা আসিয়া শুধু আমাকে জানাইয়া গেলেই হইত।

যা-হোক যথা সময়ে কলিকাতা গেজেটের ২৪.৯.১৯৩৬ তারিখের সংখ্যায় অনুমোদিত বহিগুলির তালিকা প্রকাশিত হইল। দেখা গেল, উহাতে কাজী নজরুল ইসলামের বহি 'মক্তব সাহিত্য' প্রকাশ পাইয়াছে।

বহি পাস তো হইল। পুরা বহি ছাপাইয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়া হইল। কিন্তু আশানুরূপ বিক্রি হইল না। কারণ বিক্রীর জন্য যে-সকল কায়দা-কানুন প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা প্রকাশক-বন্ধুর জানা ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল বহি বোধ হয় বাজারে বাহির করিলেই চলে। কারণ তিনি করিতেন অন্য ব্যবসা। বহি চালাইবার জন্য যে সকল কারিকুরি করিতে হয় এবং সারা দেশের স্কুলসমূহে সে সকল জাল বিস্তার করিতে হয় তাহা করার মত সাধ্য নূতন প্রকাশকের ছিল না। বিরক্ত হইয়া তিনি উহা অন্যের নিকট বিক্রী করিয়া দিলেন। তারপর আরও অনেক হাত বদল হইল। কিন্তু ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইল না। প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, কবিও কোনো অর্থের মুখ দেখিলেন না।

প্রথম শ্রেণীর জন্য লেখা আটচল্লিশ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র বহিতে তিনি মোট একুশটি বিষয় সন্নিবেশিত

বিড়াল সম্বন্ধে শিক্ষণীয় বিষয়সহ অনেক কিছুই দিয়াছেন।

কবি এক সময় ব্যবসাযী মৌলবী সাহেবানদিগের চরিত্রের মন্দ দিক দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন :

মৌ-লোভী যত মৌলভী আর মোল্-লারা ক'ন হাত নেড়ে,
'দেব দেবী নাম মুখে আনে সবে দাও পাজীটার জাত মেরে।
ফতোযা দিলাম— কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও,
'আমপারা' পড়া হাম্ বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে।'

তিনিই আবাব 'মক্তব সাহিত্যে' তাঁদের চরিত্রের উজ্জ্বল দিকটা তুলিযা ধরিযাছেন। বলিযাছেন :

দুনিযাবাদীদেব কাজ নিযে দুনিযার লোক থাকে মাতি,
মৌলভী সাহেব দুনিযা ভুলে জ্বালিযা বাখেন দীনেব বাতি।
উনিই জ্বালান জ্ঞানের আলো আমাদের এই আঁধার মনে,
ওঁবই গুণে মানুষ বলে পরিচিত হই ভুবনে।
শিক্ষা দিযে দীক্ষা দিযে ঢাকেন মোদের সকল আযেব।
পার কদমে সালাম জানাই নবীর নাযেব মৌলভী সাহেব।

মুসলিম মনোভাবের (sentiment) দিকে লক্ষ্য রাখিযা 'মক্তব সাহিত্য' বইটি প্রথমে একটি কবিতা দিযা শুরু করিযাছেন। উহা পাক কোরান শরীফের প্রথম সুরা ফাতেহার অনুবাদ। অনুবাদটি এই :

মোনাজাত
(সুরা ফাতেহা)

শুরু করিলাম লযে নাম আল্লার
করুণা ও দযা যাব অশেষ অপার।

*

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা
করুণা কৃপার যাঁব নাই নাই সীমা।
বিচার দিনের খোদা। কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সহজ সরল পথে মোদের চালাও
যাদের বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
যারা অভিশপ্ত পথভ্রষ্ট এ জগতে
চালায়ো না খোদা যেন তাহাদের পথে।

ইহার পরে একটি নিবন্ধ। নাম "হজরত মোহাম্মদের উম্মত পরীক্ষা"। একব্যক্তি উম্মত হইবার জন্য হজরতের নিকট প্রার্থনা জানালে হজরত হাতে একটি ছুরি ও মুরগী দিযা বলিলেন, "কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে মুরগীটা জবেহ্ করিয়া আন।"

লোকটি কিছুক্ষণ পরে ছুরি ও মুরগী ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "হুজুর! আমি কোনও নির্জন স্থান পাইলাম না। অতি নির্জন জায়গায় গিযাও আমার মনে হইল : এখানেও তো আল্লাহ্ রহিয়াছেন। তিনি সব দেখিতেছেন।"

হজরত সানন্দে বলিলেন, "তুমিই আমার উম্মত হইবার উপযুক্ত পাত্র।" আল্লার প্রতি এরূপ গভীর বিশ্বাসই হজরতের উম্মতের জন্য প্রয়োজন।

কবি বালকদের মনে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই গল্পটি সংকলন করিয়া শিশুদের ভাষায় লিখিয়া দিয়াছেন।

ইহার পরের কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের "আলস্যের ফল"। লাঙ্গল ফলাকে বলিল :

যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেই দিন হতে মোর এত ঘোরাঘুরি।

ফলা বলিল, 'ভাল, আমি তাহা হইলে খসিয়া যাই। তুমি আরামে ঘরে বসিয়া থাক।' ফলা খসিয়া যাওয়ায় লাঙ্গলের কাজ ফুরাইল। চাষা বলিল, 'এ আপদ আর বিনা কাজে রাখিয়া লাভ কি?' সে লাঙলের কাষ্ঠখণ্ড দিয়া আখা (চুলা) ধরাইবার আয়োজন করিল। হল তখন ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

হল তবে বলে,— 'ভাই ফলা আয় ধেয়ে,
খাটুনি যে ভাল ছিল জ্বলুনীর চেয়ে।'

"পানি" নিবন্ধে পানির অপ্রয়োজনীয়তা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, দূষিত পানি কেমন করিয়া শোধন করিতে হয় তাহার প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

ইহার পর গ্রাম্য কুটিরের বর্ণনাত্মক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি কবিতা সংকলন করিয়া দিয়াছেন।

ঈদের দিনের বর্ণনা দিতে গিয়া তার সুন্দর মধুর রূপটি কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন পরবর্তী অধ্যায়ে। এই প্রসংগে শিশুদের প্রতি হজরত মোহাম্মদের স্নেহকোমল মনের একটি প্রাণস্পর্শী পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পরের কবিতাটিই 'মৌলভী সাহেব'। এর পরিচয় আগে দেওয়া হইয়াছে। 'চাষী' কবিতাটি কবির নূতন রচনা :

চাষীকে কেউ চাষা বলে করিওনা ঘৃণা,
বাঁচতাম না আমরা কেহ ঐ যে কৃষক বিনা।
রৌদ্রে পুড়ে বৃষ্টিতে সে ভিজে দিবা রাতি
মোদের ক্ষুধার অন্ন জোগায় চায়না সে যশ খ্যাতি।

ইহার পরের নিবন্ধ 'কাব্য শরীফ'। কাব্য গৃহের উৎপত্তি, ইহার পবিত্রতা এবং তীর্থস্থান রূপে ইহার মর্যাদা দিয়া কবি বলেন :

যে সব মোমিন হজ করিতে যান তাঁহার কাব্য শরীফ তওয়াফ করিয়া পবিত্র আবে জমজম পানি পান করিয়া পবিত্র হন।

দশম নিবন্ধ 'কোরান শরীফ'। তারপর কথোপকথনের সাহায্যে উদ্ভিদের পরিচয়। ইহার পরের নিবন্ধ 'আল্লাহ্ তায়ালা।' কবি লিখিয়াছেন :

আল্লাহ্ এক। তিনি লা-শরীক। অর্থাৎ তাহার কোন শরীক নাই। তাহাকে কেহ পয়দা অর্থাৎ সৃষ্টি করে নাই। এই বিশ্বের যাহা কিছু আকাশ, বাতাস, গ্রহ, তারা, রবি, শশী, জীবজন্তু, তরুলতা, ফুলফল সমস্তই তিনি সৃজন করিয়াছেন।

আজিকার তুলনায় সে সময় প্রথম শ্রেণীর মান (standard) কিছু উঁচু ছিল। এজন্য কিছু কিছু শব্দ প্রথম শ্রেণীর জন্য কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও বর্ণনার সহজ সরল ভংগী শিশুচিত্ত আকর্ষণের উপযোগী সন্দেহ নাই।

পরবর্তী বিষয়টি হইল, 'আমাদের খাদ্য'। নজরুল এক সময় সৈনিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সিপাহীরা ডাল রুটির জোরেই লড়াই করিতে মজবুত। তাঁর অবচেতন মনের কথাটি সুযোগ পাইয়া কবি শিশুদিগকে শুনাইয়া দিয়াছেন।

ইহার পরের কবিতা 'হজরতের মহানুভবতা'। হজরত তাঁর প্রিয় দুলাল হাসান হোসেনের মুখের গ্রাস একজন দুইদিনের উপবাসীর মুখে কেমন করিয়া তুলিয়া দিয়াছিলেন তাহারই মহৎ বর্ণনা।

সিলেবাসের নির্দেশ অনুযায়ী গৃহপালিত জন্তু 'গরু'র কথা বলিতে যাইয়া, গরুর অবয়ব এবং উপকারিতার বর্ণনা দিয়াছেন।

'আদর্শ ছেলে' শীর্ষক একটি কবিতা সংকলন করিয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহার পর 'পরিচ্ছদ' সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র রচনা।

পরবর্তী লেখা, একটি আরব যুবকের 'সত্য রক্ষা'। ইতিহাসের পাতা হইতে পুনর্লিখিত হইয়া ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

ইহার পব 'বিড়াল' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ আর 'ঈদের চাঁদ' নামে তাঁর নূতন লেখা একটি মৌলিক কবিতা।

রোমজানেরই বোজার শেযে উঠেছে আজ ঈদেব চাঁদ
চারদিকে আজ খুশীর তুফান নাই ভাবনা নাই বিষাদ

* * *

যে হযরতের উম্মত্ যাঁর দোওয়ায আসে ঈদ এমন
তাঁহার নামে পড়ব দরদ, চাইব সদা তাঁর স্মরণ।

'স্মরণ' শব্দটির প্রয়োগ এখানে ছাপাখানার ভুল বলিয়াই আমাদের মনে হয়। শব্দটি আসলে হইবে 'শরণ'।

রবীন্দ্রনাথের ছোটদের উপযোগী 'হারজিত' কবিতাটি দিয়া বইখানার সমাপ্তি রেখা টানা হইয়াছে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন, ভাষার সহজ সাবলীল ভংগী, তাহার উপর তিন-রঙা সুন্দর আঁকা প্রচ্ছদপট যেমন রুচিশীলতার পরিচয় বহন করে, তেমনি শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করে। বইখানা আর কাহারও কাছে আছে কিনা জানিনা। যক্ষের ধনের মত একখানা বহি আমি আগলাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার অজান্তে এ-বহিখানাও উঁই পোকার শিকারে পরিণত হইয়াছে এবং বহুস্থানেই পাঠোদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কে নজরুল

আ ক ব র উ দ্দী ন

১৯২৬ সালের গোড়ায় নজরুল হুগলী থেকে কৃষ্ণনগর বাস করতে এসেছিলেন, ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় চলে যান। দিন তারিখ মাসগুলো স্মৃতির কোঠা থেকে হারিয়ে গিয়েছে। ১৯২৬ সালে অবিশ্যি তিনি চাঁদসড়কের ঐ বাড়িতে বাস করতে এসেছিলেন। তবে ১৯২৬ সালের গোড়ায় তৎকালীন অন্যতম কংগ্রেসী নেতা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রধান সহকারীদের মধ্যে অন্যতম হেমন্তকুমার সরকার নজরুলকে কৃষ্ণনগর নিয়ে আসেন। প্রথমে তিনি এসে ওঠেন হেমন্তকুমারের বড় ভাই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র সরকারের গোয়াড়ির একটা বাড়ীতে। বাড়ীটা ছিল অত্যন্ত ঘিঞ্জি জায়গায়। আশেপাশে সবাই অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু-- যদিও তাঁরা ও তাঁদেব ঘরের মেয়েরা নজরুলের গান শোনার জন্য এই বাড়ীতে ভিড় জমাতেন। শেষে চাঁদসডকের এই মুক্ত বাড়ীতে এসে নজরুল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

পাঁচ বিঘে জমির উপর বাড়ী— দুটো বেশ বড় শোবার ঘর, সামনে চওড়া বারান্দা, ভিতর দিকেও তেমনি বারান্দা, একটা ছোট ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। বাইরে এক পাশে একটা বড় ইঁদারা। বোম্বাই আমের গাছ্ এবং তারপরে গুটিকয়েক দেশী আমের গাছ্। দক্ষিণ দিকে বাড়ী থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে রেল স্টেশনে যাওয়ার বড রাস্তা; পশ্চিমদিকে চাঁদসড়ক পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা— সেটাও বাড়ীটা থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে; এই রাস্তার পশ্চিমে একটা ছোট আমবাগান আগে ছিল মোড়লদের, তাই নাম মোড়লবাগান। এই পথ দিয়ে বাগান পেরিয়ে বাঁ ধারে একটি ছোট খড়ের ঘর ছিল— নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা'র মেজবৌদের, তারপরই ছিল আমাদের বাড়ী। পূর্বদিকটা ছিল একেবারে ফাঁকা অনেকদূর পর্যন্ত, উত্তরদিকের সীমানায় একটা ছোট আমবাগান— তারপরই 'অমন কাথ্লি' পাড়া। পশ্চিমদিকে অনেক দূর পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের বৃহত্তম মুসলমান পাড়া, এরও পশ্চিমে গোয়ালাপাড়া।

নজরুল যে বাড়ীটায় থাকতেন তার ও চাঁদসড়ক পাড়ার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম দুটো কারণে। প্রথমত, 'মৃত্যুক্ষুধা' যারা পড়েছেন বা পড়বেন তাঁরা বইয়ের বিষয়বস্তু ও পরিবেশ একটু ভাল করে বুঝতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, বাড়ীটা ছিল শহরের মধ্যে, অথচ দূরে- শহুরে কোলাহলের চিহ্ন এখানে ছিল না, লোকের ভিড় নাই, দলে দলে যুবকেরা এসে ঝামেলা করত না— এ যেন কবির উপযুক্ত স্থান। বাড়ীর উত্তর দিকের ইঁদারা থেকে ৮/১০ গজ দূরে যে বোম্বাই আমগাছটি ছিল সেটার তলায় বসে নজরুল বহু কবিতা, গান ও গজল লিখেছিলেন। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটিও এই গাছতলাতেই বসে লেখা। গানটি রচনার কয়েক মিনিট পরেই আমি প্রায় নিত্যকার মতো সেখানে গিয়েছিলাম। পড়ে শোনালেন, তারপর বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে হার্মোনিয়াম এনে সুর দিলেন, গেয়ে শোনালেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে এটা ছিল উদ্বোধনী সঙ্গীত।

দিলীপ রায় এসে গানের খুব সামান্য একটু পরিবর্তন করেছিলেন। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ছিল হার্মোনিয়াম, ক্লারিওনেট ও একটা বিরাট ঢাক। দিলীপ রায় গানে 'লীড' দিয়েছিলেন। গান শুনে উচ্ছ্বসিত হয়নি, হাজার হাজার শ্রোতার মধ্যে এমন কেউ ছিল না। তবু সেই অধিবেশনেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট নাকচ হয়ে গিয়েছিল।

নজরুল ছিলেন আমার অতি নিকট প্রতিবেশী— মাঝে শুধু একটা ছোট আমবাগান। শুধু প্রতিবেশী বললে সবটা বলা হয় না। নজরুল আমার কাজী-দা ছিলেন না, আমি তাঁর ভক্তের দলভুক্ত ছিলাম না। অথচ, আমাদের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নজরুল আমার থেকে বছর চারেকের ছোট। লোকে বলে, নজরুল নাকি বড় ছোট মানতেন না। আমি এটা সমর্থন করি না। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার ও আচরণ বরাবর একই রকমের ছিল। আমাদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না মোটেই। আমার ঘরের কথা তিনি জানতেন, আমি জানতাম তাঁর ঘরের কথা। এমন কি অনেক অন্তরের কথাও।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। সৈযদ আলী আশরাফ তাঁর 'নজরুল জীবনে প্রেমের একটা অধ্যায়' বইতে লিখেছেন, ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে নজরুলের প্রেমের কথা একমাত্র কাজী মোতাহার হোসেন ছাড়া আর কেউ জানতেন না। আমি কিন্তু জানতাম। শুধু জানতাম নয়, নজরুলের নিজের মুখে শুনেছিলাম। অনেক দিন এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। অনেকগুলো চিঠি তিনি আমাকে নিজে পড়ে শুনিয়েছেন। এই বিষযটি সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করব। ফজিলাতুন্নেসা ছাড়া আরো অন্ততঃ দু'জন মহিলার কথা নজরুল আমাকে বলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের সম্ভবত বছর দশ আগে মৃত্যু হয়েছে, অন্যজন আজও জীবিত আছেন।

নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আরো একটা কারণ ছিল। আমার প্রথম পত্নীর মৃত্যুর মাস তিনেক পরে আমার আব্বা আমাকে আবার বিয়ে দেযার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কারণও ছিল। আমার মা ১৯৯৪ সালে জান্নাতবাসিনী হয়েছিলেন। ঘর ছিল শূন্য। সুতরাং আমার বিয়ে না দিলে চলে না। যে সম্বন্ধ আসে সেটাতেই আমি অমত করায় শেষ পর্যন্ত আব্বা গিয়ে নজরুলকে ধরেন। একদিন সকালে নজরুল আমাকে বললেন, "চাচাজান এসেছিলেন। আপনি নাকি বিয়ে করতে চান না?"

বলেছিলাম, "চাই না কথাটা ঠিক নয়। তবে যে সব মেয়ের কথা বলেছেন, সেগুলো আমার পছন্দ নয়।

এমনি সময় মাসীমা (নজরুলের শ্বাশুড়ী) চা নিয়ে এলেন। তিনি শুনে নজরুলকে বললেন, "আখতারের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব কর না কেন?"

দোলেনা (নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা দেবী) সাধারণতঃ আমার সামনে আসতেন না। তিনি দরজার ওপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, "ভাই সাহেব, আপনি আখতারকে বিয়ে করলে আমার বড় ভাল হয়। আমি একজন সঙ্গী পাই।"

মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এই বিয়ে করতে বলছেন সব ভেবে?"

বললেন, 'আমি বলছি, তুমি এই বিয়েতে সুখী হবে।"

নজরুল বললেন, "কি বলেন?"

আমি বললাম, "মাসীমা বলছেন ভাল; বেশ তাই হোক।"

মাসীমা নজরুলকে বললেন, "তুমি আজই চিঠি লিখে দাও।"

দোলেনা সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম হাজির করলেন। চিঠি লেখা হয়ে গেল। নজরুল হলেন এ বিয়ের ঘটক। এরই মধ্যে মাসীমার কাছে শুনলাম, তাঁরা হুগলীতে যে বাড়ীতে থাকতেন ঠিক তারই উল্টোদিকের বাড়ীটা ছিল আমার হব শ্বশুর বাড়ী। ঘটনাক্রমে বিয়ে হয়ে গেল। নজরুল ও দোলেনা

উভয়েই বিয়েতে গিয়েছিলেন। নজরুল বিয়ের আসরে গান গেয়েছিলেন। আর তার চাইতেও শুনে বিস্মিত হবেন যে নজরুল নেচেছিলেন। নজরুল নাচতে জানেন, একথা হয়ত কেউ বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু তিনি জানতেন এবং অতি সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। নজরুল আমার শ্বশুরকে 'আব্বা' বলতেন। আমার শ্বশুরের আরবী,ফারসী, উর্দু, বাংলা, ও ইংরেজীতে অসাধারণ দখল ছিল। অনেক সময় নজরুল তাঁর সঙ্গে আরবী, ফারসী কাহিনী ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন। আমার বিয়ের পর দোলেনা প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতেন। আর ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে যে আড়াই মাস নজরুল ঢাকায় ছিলেন তখন দোলেনা অনেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতেই কাটাতেন।

আগেই বলেছি, নজরুল চাঁদসড়কে যে বাড়ীতে থাকতেন, সেটা শহরের মধ্যেও বটে, আবার বাইরেও বটে। কৃষ্ণনগর আসবার আগে তাঁকে ঘিরে যত কোলাহল হত, ভক্ত, বন্ধু ও বান্ধবীরা যত ভিড় জমাতো, এখানে তা ছিল না। কৃষ্ণনগর জায়গাটা একটু অদ্ভুত বললেও চলে। ওখানকার লোকে দাবী করতো তারা প্রগতিবাদী মডার্ণ, কিন্তু আসলে ছিল রক্ষণশীল। নজরুলের চাঁদসড়কের বাড়ীতে কখনো মহিলাদের ভিড় দূরে থাক, দু'চার জনকেও জমায়েত হতে দেখিনি। এমনকি পুরুষদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যক লোক আসতেন। হেমন্ত সরকার, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (পরে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক) তাঁর ভাই মিহিরলাল প্রমুখ জনকতক আসতেন। জমজমাট গানের আসর কখনো হয়নি বললেও অত্যুক্তি হয় না। হৈ হুল্লোড়, মাতামাতি ও হাসি ঠাট্টা করে দরাজ হাসি হেসে যাঁর দিন কাটতো, চাঁদ সড়কের শান্ত নীরব জীবন তাঁর কেমন লাগতো বলা কঠিন— অন্তত কথায় তেমন কিছু প্রকাশ করতেন না। তবু বেশ বুঝতে পারতাম কখনো কখনো বাঁধনহারা' এই বন্ধন ছিন্ন করে বেরোবার জন্য ব্যাকুল হতেন। আমি তখন কৃষ্ণনগর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। সুতরাং বিনাভাড়ায় ভাড়াটে গাড়ী পাওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। বিকেলের দিক কোন দিন হয়ত শান্তিপুরের রাস্তায়, কোনদিন নবদ্বীপের রাস্তায়, কোনদিন বাদকুল্লার রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা দু'জন বেরোতাম। শহরের বাইরে দু তিন মাইল দূরে গিয়ে মাঠে বসতাম। সন্ধ্যের পর ফিরে আসতাম।

এমনি এক দিনের কথা বলি। সেদিন ছুটির দিন। সকালে চা খাওয়ার পর নজরুলের বাসায় গিয়েছিলাম। নজরুল চুপচাপ আমগাছতলায় বসেছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, "চলুন আজ কোথাও বেরিয়ে পড়া যাক।"

"কোথায় যেতে চান?"

বললেন, "যেদিকে হোক, তবে বেশ কিছুটা দূরে। ফিরবো সন্ধ্যেবেলা।"

মাসীমা তখন ঘরের ভেতর বেশ জোরে কি যেন বলেছিলেন। হঠাৎ নজরুল নিমেষের জন্য গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "বেশ ব্যবস্থা করছি।"

কৃষ্ণনগর শহর থেকে সাত আট মাইল দূরে একটা ছোট বিল আছে। প্রত্যেক বছর আমরা সেখানে পাখী শিকারে যেতাম। নজরুল অবশ্য কখনো যাননি। এদিন সেখানে যাওয়াই সাব্যস্ত করে শিকারী দুই বন্ধু— মোহাম্মদ ইব্রাহীম ও জয়নাল আবেদীনকে খবর পাঠালাম। তাঁরা এলেন। আমরা— নজরুল, আমি, ইব্রাহীম ও আবেদীন রওয়ানা হলাম। নজরুল হার্মোনিয়ামটাও তুলে নিলেন। আমরা যাত্রা করলাম।

হঠাৎ নজরুল বললেন, — গাড়ীর ভেতর এ রকম বাঁধা থাকা যায় না। তিনি গাড়ীর ছাদে বসবেনই। অগত্যা আমাকে যেতে হ'ল। নজরুলকে কিছু লোক চিনতো। তারা ভীড় করে আশেপাশে দাঁড়ালো। গাড়ীর ছাদে উঠে হার্মোনিয়াম টেনে নিয়ে নজরুল গান ধরলেন। এর পরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নজরুল ইসলাম ও কৃষ্ণনগর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গাড়ীর ছাদে, সে এক অবাক কাণ্ড। তার

চালাতে বললাম। গাড়ী চললো নজরুলের গানও চলতে লাগলো। আরও কয়েক জায়গায় বাধ্য হয়ে গাড়ী থামাতে হয়েছিল। নজরুল তখন যেন মুক্ত মানুষ— সব বাধাবন্ধের উর্ধ্বে।

বিলে পৌঁছে বোধ হয় দুটো নৌকা অথবা একটা নৌকা ও দুটো ডোঙা নেওয়া গেল। নৌকায় আমি ও নজরুল। ভাল পাখী পাওয়া গেল না -। শেষ পর্যন্ত একটা বালি হাঁস, গোটা দুই তিন বক, গোটা দুই ঘুঘু পাওয়া গেল। ইব্রাহীম খাওয়ার জোগানে নেমে পড়লেন। নিকটবর্তী গাঁয়ের লোক আমাদের চিনতো। ইব্রাহীম খাওয়ার তৈরি করলেন। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর পেরিয়ে গিয়েছে। খাওয়া দাওয়া সারতে বেলা পড়ে গেলো। নজরুল বললেন, "চলুন, আর একটু নৌকা ভ্রমণ করা যাক।"

ইব্রাহীম ও আবেদীন পড়ে রইলেন পাখীর তল্লাসে। নজরুল ও আমি নৌকায় বিলের মাঝের দিকে চললাম। একটু পরেই সূর্য দিগন্তে ঢলে পড়েছে— পশ্চিমে আকাশের কোল লাল হয়ে উঠেছে — বিলের পানিতে সেই লালিমা প্রতিফলিত হয়েছে, ওদিকের পানিটাও যেন লাল আবিরমাখা। নজরুল কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর সব চঞ্চলতা যেন কোথায় উবে গেলো— তখন ধীর স্থির, ধ্যানগম্ভীর। তাঁর দৃষ্টি দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। তাঁর এই মেজাজের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

তাঁর বাড়ার বারান্দায় অথবা ইঁদারার ধারের আমগাছ তলায় বসে হয়ত দু'জন বাজে আলাপ করছি, চা খাচ্ছি, হঠাৎ দেখা গেল, কয়েক মিনিট তিনি নীরব, দৃষ্টি শূন্য, কাছে যে একটা মানুষ বসে আছে তাও যেন তিনি জানেন না। কিছুক্ষণ পরে উঠে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা দেখা নেই। বুঝতে পারতাম নতুন কিছু রচনা করছেন। ফিরে যখন এলেন, তখন হাতে একটা কলম ও কাগজ। কবিতা হলে পড়ে শোনাতেন, সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করতেন। গান হলে গুন্ গুন্ করে সুর দিতেন— খানিক পরে হার্মোনিযাম এনে হয়ত গাইতেন।

চাঁদ সড়কের এই বাড়ীতে আসার কিছুদিন পর থেকে সম্ভবত নজরুলের মনের একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণনগরে আসবার পর চাঁদ সডকের বাড়ীতে নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি— সম্ভবত— নিজের সত্তা খুঁজছিলেন। এখানে আসবার পর কলকাতায় এমনকি হুগলীতেও যা সম্ভব হয়নি তাই হয়েছিল। নিশীথ রাতের তারার মালা দেখবার পরিপূর্ণ সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তাই ত' তিনি ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠিতে লিখতে পেরেছিলেন :

আমায় সব চাইতে অবাক করে নিশীথ রাতের তারা, ছেলেবেলা থেকে তার শব্দহীন উদয়াস্ত....

এরই মধ্যে যতদূর মনে পড়ে ১৯২৭ সালের এক গোধূলি বেলায় এক ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনা (অথবা দুর্ঘটনা) নজরুলের অন্তরের নিভৃততম কন্দরের একটা বেদনার্ত দিককে আমার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিল। ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালের একটা দিন গোধূলি বেলাশেষে নজরুল ও আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

নজরুলের কথামতো আমরা ষ্টেশনের রাস্তায় চললাম। চাঁদ সড়কের অপর প্রান্তে বৌ বাজার। এককালে এখানে একটা বড় বাজার ছিল— প্রত্যেক দিন বাজার বসতো। তখনো গোয়াড়ী জমজমাট হয়নি। পরে অবিশ্যি এখানে 'না ছিল বৌ, না ছিল বাজার'— কথাটা নজরুলের। তবে, তখনো পাঁচ ছ'টা দোকান ছিল। এই দোকানগুলোর কাছে ছিল এক বহুকালের বিরাট অশ্বত্থগাছ। শান্তিপুরের রাস্তার মোড় পর্যন্ত যেতে সন্ধ্যে হয়ে এলো। তখনো একেবারে অন্ধকার হয়নি। ফিরে আসবার সময় বৌ বাজারের ঐ অশ্বত্থতলার কাছে এসে নজরুল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বাভাবিক উচ্চহাসি হেসে বললেন, "আরে! এখানে উট এলো কোত্থেকে!" বলে আবার জোরে হেসে উঠলেন। তাকিয়ে দেখলাম, উট নয়, একটা লোক দুই হাত, দুই পায়ে ভর দিয়ে ধনুকাকৃতির হয়ে যাচ্ছে। লোকটা বৌ বাজার পাড়ার। জন্মাবধি এ রকম ছিল না। হঠাৎ একবার কি কারণে জানি না রোগে এই রকম হয়ে গিয়েছিল। সোজা হয়ে চলতে পারত না— এইভাবে চলতো। দিনের বেলায় সে

বেরুতো না— কদাচিৎ নেহাৎ কোন দরকার পড়লেই বেরুতো। নজরুলের হাসির আওয়াজ শুনে লোকটা এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো। আমরা তখন প্রায় তার কাছে এসে পৌঁছেছি। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হাসছ তোমারও তো একদিন এরকম হতে পারে।" লোকটার এই কথাটার মধ্যে কি একটা রুদ্ধ ব্যথা পুঞ্জীভূত অভিযোগ আর্তনাদ করে উঠেছিল। নজরুল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন— তাঁর সেই হাসি কোথায় উবে গিয়েছে। আমিও বিমূঢ় হযে গিয়েছিলাম। কথা ক'টা ক'টা বলে লোকটা অতি ধীরে ও কষ্টে তেমনি এগিয়ে যেতে লাগল। নজরুল যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে এগিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। হাত জোড করে বললেন, "আমি অপরাধী, আমাকে মাপ কর।" নজরুলের এই ক'টা কথাও যেন আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল। লোকটা থেমে ঘাড ফিরিয়ে বললো, 'ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন।"

আর কোন কথা বললো না, ধীরে ধীরে চলতে লাগল। নজরুল আর কোন দিকে না তাকিয়ে হন্ হন্ করে বাড়ীতে গিয়ে আমতলায বেতের চেয়ারটায বসে পডলেন। একটু পরে আমিও এসে আর একটা চেয়ারে বসলাম। দেখলাম, নজরুল নীরব, নিস্তব্ধ-- অসাড়ের মতো বসে আছেন; দৃষ্টি দূরে প্রসারিত। আলো আঁধারিতে ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবু মনে হচ্ছিল, তাঁর মুখে যেন সারা বিশ্বের ব্যথা— বেদনা জমাট হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ আমরা দু'জনেই নীরবে বসে রইলাম। শেষে আমি বললাম, 'আপনি বড্ড উদ্বিগ্ন হয়েছেন মনে হচ্ছে।"

একটু চুপ করে থেকে তিনি অত্যন্ত ধীরে ধীবে বললেন, "আমার হাতের বেখা কি বলে জানেন? জ্যোতিষীর কথাই ঠিক, আমার সামনে রয়েছে নিবিড় দুঃখ—"

বাধা দিয়ে বললাম, "জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করেন?"

বললেন, 'করি না বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে, এতদিন যেটুকু সন্দেহ ছিল, আজ তা কেটে গেল।"

আমি বললাম, "আজকের এই সামান্য ঘটনাকে এত বড় করে দেখছেন কেন।"

বললেন, "বড ছোট করে দেখার কথা হচ্ছে না। জানেন, আমি ত' কোনদিন মানুষকে অপমান করতে চাইনি। এতকাল পরে আজ কেন এমন হল?

বলতে বলতে তিনি যেন ভেঙে পড়লেন।

এই ঘটনার মাসখানেক আগের কথা। তখনো আমার প্রথমা স্ত্রী জীবিত ছিলেন। একদিন সকালে গিয়ে দেখি নজরুল আমতলায় বসে আছেন। তাঁর সামনে বেতের টেবিলে এক পেয়ালা চা, কলম, কাগজ। কিন্তু লিখছেন না কিছুই। নিজের ডান হাতটা ঘুরিযে ফিরিয়ে দেখছেন। আমাকে দেখে মাসীমা আর এক পেযালা চা দিয়ে গেলেন।

নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হযেছে হাতে?"

বললেন, "দেখি আপনার হাতটা?"

জানতাম, নজরুলের হাত দেখা বাতিক আছে। একদিন বলেছিলেন, হাতের রেখা দেখার অনেক বই তিনি পড়াশুনা করেন, কলকাতায় ও আরো কোথাও কোথাও জ্যোতিষীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেন। তবে, এ বিষয়ে তাঁর বিদ্যা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস ছিল না বললেও অত্যুক্তি হবে না। অজানা ভবিষ্যতকে জানবার একটা আকুল আগ্রহ সব মানুষের আছে। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অন্যান্য কয়েকটা কথার পর বললেন, "আপনার আড়াইটে বিয়ে।" জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে আবার কি রকম?"

একটা 'ফুল' বিয়ে হয়েছে। আর একটা হবে।"

হেসে বলেছিলাম, "দুটো একসঙ্গে মন্দ কি ?"

গম্ভীর ভাবে, "বললেন, "এক সঙ্গে নয়-- একটার পর আর একটা, তবে দ্বিতীয়টাও বিদায় নেবেন।" সেদিন কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। হাতের রেখা বিচার সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, আজ দেখছি নজরুলের সেদিনের কথাগুলো সত্যি হয়েছে।

১৯২৮ সালের ৮ই মার্চ তারিখে কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা একটা চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেন, "আজ একটি মহিলা বলছিলেন, এবার আপনাকে বড্ড নতুন নতুন দেখাচ্ছে। যেন পাথর হয়ে গেছেন। বেশ ভাবুক ভাবুক দেখাচ্ছে কিন্তু।"

নজরুল নিজে হয়ত বুঝাতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর ভিতরে একটা পরিবর্তন বেশ কিছুদিন আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল। ১৯২৭ সালের শেষ দিকে নৃপেন (প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) কৃষ্ণনগরে এসে নজরুলের ওখানে দু'দিন ছিল। নৃপেনেব সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। দ্বিতীয় দিনে সকালে নৃপেন আমার বাড়ীতে গিয়ে চা পান কবতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাজীর কি হয়েছে বলতে পার, ব্রাদার ?"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন ? কি হয়েছে ?

নৃপেন বললো, 'সে কাজীত' আর নেই। অনেকটা বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে।"

নৃপেনের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। ওর ধারণা হয়েছিল, কৃষ্ণনগরে নিঃসঙ্গ থেকে নজরুলের মন মরে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বলল "নাঃ ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে।"

তখনই নৃপেনকে বলেছিলাম, কলকাতায় কাজীকে হয়ত নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সেটা কাজীর জীবনে হবে মারাত্মক ভুল। তার চাইতে ডি.এম.লাইব্রেরী ও অন্য পাবলিশাররা যাতে ওর প্রাপ্য টাকা নিয়মিত দেয়, সেই ব্যবস্থা কবতে পারলে কাজীর সত্যিকারের উপকার করা হবে।

অনেক আলোচনা করেও নৃপেনকে বুঝতে পারি নি নজরুলের মানসিক পরিবর্তনের গতি। এর আগেই মাসীমার ইচ্ছা আমি জানতাম। সংসার চালাতেন তিনি। দোলেনার সঙ্গে সংসাব যাত্রার কোনই সম্পর্ক ছিল না। সত্যি কথা বলতে গেলে, অন্যরা যাই বলুন, একটা কথা অত্যন্ত সত্য যে, গিরিবালা দেবী না থাকলে নজরুল দোলেনার সংসার কবে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো। অথবা কি অঘটনা ঘটতো কে জানে। সংসারের তাড়নায় মাসীমা মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে বাস করার কথা বলতেন।

সেদিন নৃপেনের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত নজরুলকে ওরা কলকাতায় নিয়ে যাবেই। প্রধান কারণ, মাসীমা ওদের পক্ষে। এর পরে মিস ফজিলাতুন্নেসার ব্যাপারটা ইন্ধন যুগিয়েছিল মাত্র।

১৯১৫ সালে 'আল-এসলাম' পত্রিকায় আমার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পর বছর তিনেক লিখেছিলাম। পরে লেখা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৭ সালে কৃষ্ণনগর পৌরসভায় ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আমার প্রথম মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাইরের কাজ বিশেষ ছিল না, এই সময় নজরুল একদিন আমাকে বললেন, "আপনি ত আগে লিখতেন, আবার লিখতে আরম্ভ করুন না কেন ?" কিন্তু প্রায় একযুগ কাল এ অভ্যাস ও চর্চা না থাকায় আমি সাহস করছিলাম না। এমনি করে দু'তিন দিন তাগিদ দেওয়ার পর 'ইরানী' নামে একটা গল্প লিখে নজরুলকে দেখতে দিয়েছিলাম। তিনি দু'একটা জায়গা বদলে দিতে বলছিলেন। তাঁর কথামত পরিবর্তন করে সেটা তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি একটা চিঠি দিয়ে কোন একটি পত্রিকায় (সম্ভবত সাপ্তাহিক বা মাসিক 'সওগাতে') পাঠিয়েছিলেন।

১৯৩২ সাল থেকে আবার পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলাম একটানা আট বছর। এ সময় আমার লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৪ সালে আরম্ভ হয় আমার সাংবাদিক জীবন। এর পর থেকে

পারার যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম, ১৯২৭ সালে নজরুল আমাকে সাহায্য করেছিলেন সেই বিশ্বাস ফিরে পেতে।

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর গড়ের উত্তর পূর্ব দিকে কয়েক ঘর গরীব মুসলমানের একটা পাড়া ছিল। সেখানে লতিফ মওলবী নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। লতিফ মিয়া অবিশ্যি সত্যিকার মওলবী ছিলেন না। অবস্থার তাড়নায় একটা পুরানো শেরোয়ানী চড়িয়ে রুমি টুপি মাথায় দিয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে এখানে ওখানে মিলাদ পড়ে, কিছুটা ওয়াজ নসিহত করে যা পেতেন তাতেই সংসার চালাতে হোত। ভদ্রলোক কিন্তু নজরুলের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং মাঝে মাঝে এসে হাসি মশকরায় যোগ দিতেন।

একদিন বিকেলে নজরুল ও আমি আমতলায় বসে গল্প করছি। এমন সময় লতিফ মিয়া হাজির হয়ে একটা লম্বা সালাম দিয়ে জোড়হাত করে দাঁড়ালেন। নজরুল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কোথায় কি পাপ করে এলেন ?' লতিফ মিয়া একবার আমার দিকে ও একবার নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার একটা আরজ আছে।" নজরুল বললেন, "কি ব্যাপাব ?" লতিফ মিয়া অতি বিনয়ে বললেন, "আগামী কাল দুপুরে মেহেরবানী করে আপনাদের দু'জনকে আমার কুঁড়ে ঘরে দাওয়াতে কবুল করতে হবে।" আমরা লতিফ মিয়ার অবস্থা জানতাম। প্রথমটা একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এটা কি লতিফ মিয়ার আর একটি মশকরা। কিন্তু তিনি আবাব সবিনয়ে অনুরোধ করবেন। নজরুল আমার দিকে তাকালেন। আমি একটু ইশারা কলাম। উঠে গিয়ে লতিফ মিয়ার হাত ধরে বললেন, "আমাদের জন্য এত কষ্টের দরকার কি ?" লতিফ মিয়া বললেন, "অনেক দিন থেকে ইচ্ছা আপনাদের দু'জনকে আমার কুঁড়ে ঘরে নিয়ে যাব। কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিলাম না, তবে এই দু'দিন জাঙ্গের পুরে (জাহাঙ্গীর পুর গ্রাম কোম্পানীর বাগানের নিকটবর্তী) দু'টো মিলাদ পড়িয়েছিলাম। গাঁয়ের লোক সকলে মিলে দশটা টাকা আর দুটো বড় বড় মোরগ দিয়েছে। তাই সাহস করছি। নজরুল বললেন, "আপনার ছেলেমেযেরা খেলেই আমাদের খাওয়া হবে।" লতিফ মিয়া বললেন, "আল্লামিয়া সেদিক দিয়ে আমাকে রেহাই দিয়েছেন।" আমি নজরুলকে বললাম, "লতিফ মিয়ার কেবল মিয়া বিবি সম্বল।" শুনেই নজরুল বললেন, "আপনার দাওয়াত আনন্দের সঙ্গে কবুল করলাম। কাল দুপুরে যাব।" আমি বললাম, "মওলবী সাব্‌', একটা কথা... পোলাও খাব না, সাদা ভাত আর মুরগীর তরকারি– এতে যদি রাজী থাকেন ত' যাব"। এটা বললাম কারণ জানতাম, বেচারী পোলাও কোরমা করলে যে দশটা টাকা পেয়েছে, তার সবটাই খরচ হয়ে যাবে। লতিফ মিয়া আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে একটু হেসে তাতেই রাজী হলেন। তারপর নজরুল তাকে দুটো গান শোনালেন, ভদ্রলোক অত্যন্ত খুশী হয়ে চলে গেলেন।

পরদিন দুপুর বেলা নজরুল ও আমি পদব্রজে লতিফ মিয়াব বাড়ী যাচ্ছি। নেদেপাড়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। এই পাড়াটি কুলিন-ব্রাহ্মণের রাজ্য ; শূদ্র অবিশ্যি কযেক ঘর আছে। চাঁদসড়কের মুসলমান পাড়ার পাশেই যেমন 'ওমান কাথলী' (রোমান ক্যাথলিক পাড়া) তেমনি নেদেরপাড়ার গা ঘেঁষে ছিল পৌরসভার মেথর পাড়া।

এ পাড়ার সকলেই আমাকে চিনত। পাড়ার মাঝামাঝি পৌঁছেছি। একবয়স্কা মহিলা (তিনি আমার এক বন্ধুর মা) বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন আমাকে দেখে বললেন, 'কি বাবা, বিল্ব মঙ্গল, এ ভরদুপুরে কোথায় চলেছ? জওয়াব দেবার আগেই পাশের বাড়ীর দরজায় দাঁড়ানো এক যুবতী বলে উঠলেন, সঙ্গে ত কেষ্টঠাকুরও যাচ্ছেন দেখছি। "নজরুল তুরুপ জওয়াব দিলেন, কেষ্ট যাচ্ছেন গোপিনীর সন্ধানে।" মেয়েটি মুচকি হাসলো। আমি দেখলাম বেগতিক। ঘোর নিভাজ কুলীন ব্রাহ্মণ পাড়ায় আবার ওদিকে অদূরে আমাদের শিশির-দা আসছেন দেখা গেল। তাড়াতাড়ি নজরুলের হাত ধরে কোন কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। শুধু বললাম, "দেরী হয়ে যাচ্ছে", এগিয়ে গিয়ে নজরুলকে বললাম, "বিপদে ফেলেছিলেন আর কি— এটা যে ঘোর কুলীন পাড়া।"

একদিন একটা ছোট ঘটনাব কথা বলি। কলকাতা থেকে দু'জন যুবতী মহিলা কৃষ্ণনগবে এসেছিলেন তাঁদেব এক আত্মীযেব বিবাহ উপলক্ষে। একদিন বিকেলে নজরুল ও আমি আমতলায বসে গল্প কবছিলাম। এমন সময সেই মহিলাদ্বয ও তাঁদেব নব বিবাহিত আত্মীযটি নজরুলেব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছিলেন। যুবতীদ্বযেব মধ্যে একজন নজরুলেব পূর্ব পবিচিত মহিলা। এসেই নজরুলকে বললেন, "কাজীদা, অনেক দিন দেখা হয নি; তাই ভাবলাম কৃষ্ণনগবে যখন এসেছি তখন একবাব দেখা কবে যাই।" নজরুল তাঁব স্বাভাবিক উচ্চকলকণ্ঠে তাঁদেব অভ্যর্থনা কবলেন। মহিলা দু'জন বাড়িব মধ্যে গিযে মাসীমা ও দোলেনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবলেন। আমাদেব আসন আমতলা থেকে বাড়িব মধ্যে বাবান্দায স্থানান্তবিত হল। কিছুক্ষণ হাসি গল্পেব পব একজন গান শোনাবাব বাযনা ধবলেন। নজরুল তখন দু'টো গান শোনালেন। এব পব তাবা চলে গেলেন। নজরুল তখন দু'টো গান শোনালেন। এব পব তাঁবা চলে গেলেন। নজরুল অবশ্য আমাব সঙ্গেও তাদেব পবিচয কবিযে দিযেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদেব সঙ্গে একটি কথাও বলতে পাবি নি, অথবা তাদেব মুখেব দিকেই চোখ তুলে তাকাতে পাবি নি। ওবা চলে গেলে নজরুল আমাকে বললেন, "মেযেদেব দেখলে আপনি অমন গোমড়া মুখ কবে বসে থাকেন কেন ?" কথায কথায আবো বললেন, "ফুল দেখতে কি আপনাব ভাল লাগে না" — ইত্যাদি।

সাধাবণভাবে এই ছিল তাব দৃষ্টিভঙ্গী। সুন্দব ফুল দেখে কখনো তা তুলবাব, ঘ্রাণ নেযাব সাধ তাব [illegible] না, এমন কথাই বা হলফ কবে বলি কি কবে। একটা কথা অবিশ্যি জোব কবে বলতে পাবি, চাদসড়কে থাকাকালে তাকে কখনো 'ফুল তুলতে' দেখি নি, কিম্বা সে বকম অভিযোগও কেউ কবে নি।

১৯২৮ সালেব জুলাই অথবা আগস্ট মাসেব কথা ঠিক মনে কবতে পাবছি না। এই মাত্র মনে আছে, এবই মাসখানেক আগে আমাব বিযে (দ্বিতীয বাব) হযেছিল। সেদিন সন্ধ্যাব পব বাড়ি ফিবে দেখি আমাব স্ত্রী সৈযদা আখতাকুন্নেসা বেগম এক মহিলাব সঙ্গে আলাপ কবছেন। আমাকে দেখেই মহিলা দাঁড়ালেন। আমাব স্ত্রী তাঁব সঙ্গে পবিচয কবিযে দিলেন। মহিলাব বযস ২৫/২৬ এব বেশি হবে না। তিনি সেই দিনই বিকেল পাচটাব ট্রেনে কৃষ্ণনগব পৌঁছে সোজা আমাদেব বাড়ি এসেছেন। স্ত্রীব নিকট আবাব নাম শুনেই তাব পবিচয পেলাম। এব কথা নজরুলেব কাছে কযেকবাব শুনেছি। দু'চাবটি অন্যান্য কথাব পব তিনি আমাকে বললেন, "বিশেষ একটা কাবণে এসেছি"--- সেতাবকে (আমাব স্ত্রীব ডাকনাম) বলেছি। আমাব স্ত্রী আমাকে পাশেব ঘবে ডেকে নিযে বললেন- "এসেছেন দাদা ভাইযেব (নজরুলকে আমাব স্ত্রী দাদা ভাই ডাকতেন) সঙ্গে একবাব দেখা কবতে। কোন বকমে দেখা কবিযে দিতে পাব ?"

পবিস্থিতি জটিল। নজরুলেব বাড়ি গিযে সোজাসুজি দেখা কবা সম্ভব নয। এমনকি, নজরুল নিজেই দেখা কববেন কি না সন্দেহ আছে।

আমাব স্ত্রীকে বললাম, "ব্যাপাব ত' জান। ওব নাম কবে নজরুলকে ডাকলে তিনি আসবেন কিনা সন্দেহ। এমনি ডাকলে আসবেন নিশ্চযই। কিন্তু এসে এবে দেখে আমাদেব উপব যদি চটে যান।"

এঘবে এসে মহিলাকে সোজাসুজি বললাম, "দেখুন আপনাব কথা আমি নজরুলেব কাছেই শুনেছি। ডেকে আমি আনতে পাবি। কিন্তু তাতে লাভ কি ?"

আসল কথা হচ্ছে মহিলা বিবাহিতা। অথচ নজরুলেব প্রতি তাঁব দুর্দমনীয আকর্ষণ সম্ভবত প্রেম। সেজন্য তিনি স্বামীব ঘবে যান না। অথচ নজরুলও তাকে আগেই প্রত্যাখ্যান কবেছেন।

আমি তাঁকে নিবস্ত কবাব চেষ্টা কবছিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন,— "কোন বকমে একবাব দেখা কবিযে দিন। কসম কবে বলছি, আব কখনো তাঁব সঙ্গে দেখা কবতে চাইব না। তাঁকে একথা বলতে পারেন।"

তাঁর জেদাজেদিতে অবশেষে আমাকে যেতেই হল। নজরুলকে আমতলায় থেকে খোলাখুলি সব কথা বললাম। আরো বললাম, "আপনার ইচ্ছা হলে দেখা করতে পারেন।— আমি কোন রকম অনুরোধ উপরোধ করছি না। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে আমি মহিলাকে যে-কথা বলছিলাম, নজরুলও তাই বললেন, "দেখা করে লাভ কি!"

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

আর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বেশ চলুন, এসেছে যখন দেখা দিয়েই আসি।"

ঘরে ঢুকেই হেসে আমার স্ত্রীকে বললেন, "কি রে আখতার? একটু চা খাওয়া দেখি— "স্ত্রী চায়ের কথা বলতে চলে গেলেন। আমিও আজীকে চায়ের সঙ্গে একটু মিষ্টিও দিও বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ঘর থেকে বেরোবার সময় এক নজর পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মহিলাটি নজরুলের পায়ের ধূলো নিলেন। কি কথা হ'ল শুনতে পাই নি। মিনিট দশেক পরে নজরুল হাঁক দিলেন "কৈরে? এক পেয়ালা চা করতে এত দেরী— সংসার করবি কি করে?"

চা অবিশ্যি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা ইচ্ছা করেই দেরী করছিলাম। হাঁক শুনে বুঝলাম ওদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছে। চা-মিষ্টি নিয়ে আমার স্ত্রী আগে ঘরে ঢুকলেন--- পরে আমি।

লক্ষ্য করলাম, মহিলাটি এক পাশে চুপ করে বসে আছেন--- চোখে সারা আকাশের মেঘ-পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। নজরুলের মুখের হাসির পিছনে বেদনার ছায়া।

কিছুক্ষণ পর নজরুল চলে গেলেন। মহিলাটি তখন প্রথমে একটু ক্ষীণ হাসি হাসলেন; তারপর হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লেন, অঝোর-নিঃশব্দ কান্না।

শেষ রাতে তিনটের ট্রেনে তাঁকে আমি তুলে দিয়ে এলাম।

ষ্টেশনে ট্রেনে উঠবার আগে তিনি আমাকে বললেন, "ভাই সাহেব, আজ আমার যে-উপকার করলেন, যতদিন বাঁচি ভুলতে পারব না।"

আর কিছু না বলে সালাম করে তিনি ট্রেনে উঠলেন।

ট্রেন ছাড়লো। কি জানি কেন আমার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

পরে শুনেছিলাম যে-মিনিট দশেক ওরা সামনা-সামনি বসেছিলেন এর মধ্যে কেউ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। শেষে মহিলাটি আর একবার নজরুলের পায়ের ধূলো নেয়ার পর চায়ের হাঁক পড়েছিল।

পূর্বে যে-দুই মহিলার উল্লেখ করেছি, ইনি তাঁদের একজন।

ফজিলতুন্নেসা সম্পর্কিত ঘটনাটি নজরুলের মুখে যা শুনেছি, তাতে আমরা কেউই বিষয়টি সঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। ১৯২৮ সালের প্রথম দিকের ঘটনার প্রায় আড়াই মাস কাল যাবৎ কোন সংবাদ না পেয়ে মাসীমা সত্যিই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। দোলেনা প্রায়ই আমাদের বাড়ি এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলতেন। মাসীমা ও দোলেনা অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন। আমিও কয়েকটা চিঠি লিখেছিলাম ও টেলিগ্রাম করেছিলাম। নজরুল এসবের কোন উত্তর দেন নি। মাসীমার মেজাজ ক্রমে সপ্তমের উর্ধ্বে উঠেছিল। বিশেষত নজরুলের দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে সংসারে নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছিল। প্রায় আড়াই মাস পরে নজরুল ফিরে গিয়েছিলেন।

নজরুল ফিরলেন ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে একটা পরিবর্তন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। আগের মতো দিল খোলা হাসি ঠাট্টা করতেন না। প্রথম দিকে মনে করেছিলাম, হয়ত নিজেকে অপরাধী মনে করে গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দিন পনের পরেও যখন এ-ভাব বদলালো না তখন একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, "শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।"

বলেছিলাম, "আগেও ত' আপনাকে অসুস্থ দেখেছি, সেবার কদিন ত' শয্যাশায়ী হয়েছিলেন।

কিন্তু এমন ত' দেখি নি।

আমাব কথায বাধা দিযে বললেন, "বসুন, চা খান।"

মাসীমা এমনি সময চা দিযে গেলেন।

এবও কযেক দিন পবে বিকালে আমতলায গিযে দেখলাম, তিনি একটা চিঠি লিখেছেন, কিম্বা তখনই লেখা শেষ কবেছেন, পত্রটি কাজী মোতাহাব হোসেনের নিকট লেখা।

হঠাৎ কি মনে কবে চিঠিটা আমাকে দেখতে দিলেন। আলী আশবাফ সাহেবেব 'নজরুল জীবনে প্রেমেব এক অধ্যায' বইতে সে চিঠিটা নেই বলে মনে হয।

চিঠিটা পডবাব পব একটু অবাক হযে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাব দিকে তাকালাম।

তখন সন্ধ্যা হযে আসছে।

নজরুল বললেন, "এবাব বুঝেছেন ত' ?"

এ নিযে কোন আলোচনা বা কথাবার্তা সেদিন হয নি। চিঠিটা পডবাব পব যেমন অবাক হযেছিলাম, সে ভাবটা কিন্তু কাটিযে উঠতে পাবি নি। দোলনাকে জানতাম। অমন শান্ত, স্থিব, একনিষ্ঠ স্ত্রী থাকতে আব একজনেব জন্যে মোহান্ধ হওযাব কাবণ আমাব মতো একজন অতি সাধাবণ মানুষেব পক্ষে দুর্বোধ্য। পূর্বে দু'জন মহিলাব প্রত্যাখ্যান কবাব পব এ মোহ হওযাব কাবণ জানবাব একটা আগ্রহ আমাব হযেছিল। কিন্তু আমাব দিক থেকে প্রসঙ্গটি উত্থাপন যুক্তিযুক্ত হবে না মনে কবেছিলাম।

দিন কযেক পব বিকাল বেলা আমবা দু'জনে সেই আমতলায বসে আছি। নজরুল বললেন, মাসিমা কলকাতায গিযে বাস কবাব ব্যবস্থাব জন্য উঠে পডে লেগেছেন।

কাবণ জিজ্ঞাসা কবলাম। বললেন, "মাসিমা বলছেন এখানে থাকলে সংসাব অচল হযে যাবে। আমিও সেটা বুঝছি; তবে এইটাই একমাত্র কাবণ নয।"

এব-পব যা বললেন তাব সাবমর্ম হচ্ছে এই যে, ঢাকা থেকে কেউ মাসিমাকে চিঠি লিখেছে; ওবা ব্যাপাবটা জেনেছেন, এব মনে কবছেন, চিবকালেব বাউণ্ডুলে আমি, যে কোন দিন পালিযে যেতে পাবি।

জিজ্ঞাসা কবলাম, "যেতে পাববেন ?"

একটু হেসে বলেছিলেন, "না। এখানে ত' আমাব নোঙব বাধা। আব সে (ফজিলতুন্নেসা) যা চায আমি তা দিতে পাবি না, আমি যা চাই সে তা দিতে পাবে না।"

এব পব আবো কথা হযেছিল। শেষে বলেছিলেন, "মাসিমা যদি একান্তই কলকাতা যাওযাব জন্য সংকল্প কবে থাকেন, আমাকে যেতেই হবে। তাছাডা বোধ হয, আমাব যাওযাই ভাল।"

আমি কিন্তু নজরুলেব কলকাতা যাওযাটা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পাবি নি, আমাব মনে হযেছিল কলকাতা গেলে আবাব ওখানকাব হৈ চৈযেব মধ্যে তাব প্রতিভা যে নতুন পথে অগ্রসব হচ্ছিলো সেটা হযতো বন্ধ হযে যাবে। আমাব আশংকাব কথা তাকে বলেছিলাম। কিন্তু আমাব, এমন কি তাঁবও, বাধা দেযাব ক্ষমতা ছিল না। এব দিন কযেক পব নৃপেন ও যতদূব মনে পডে নলিনীকান্ত সবকাব কৃষ্ণনগব এসেছিলেন। তখনই বুঝেছিলাম, এবাব নজরুল চাঁদসডক ত্যাগ কববেন।

ফজিলাতুন্নেসাব ঘটনাটি আলী আশবাফ সাহেব যে ভাবে নিযেছেন, আমি কিন্তু ঠিক সে ভাবে নিতে পাবি নি।

নজরুলেব কথাবার্তায আমাব মনে হযেছিল ফজিলতুন্নেসাব সঙ্গে পবিচয হওযাব পব বাঁধন হাবাব মনেব একটা রুদ্ধদ্বার খুলে গিযেছিল। পূর্বাপব তিনি খুঁজছিলেন তাঁব মানসী প্রিযাকে; অথচ সেটা যে কি, তাব রূপ কি, এসব বিষযে তাঁব নির্দিষ্ট ধাবণা ছিল না, থাকা সম্ভবও নয। কৃষ্ণনগবে কযেক বছব থাকাব ফলে বন্ধু-সঙ্গ-বঞ্চিত মন ফজিলতুন্নেসাকে হঠাৎ দেখে, তাব সঙ্গে কথাবার্তা বলে যেন সেই মানসী প্রিয়ার দেখা পেয়েছে মনে করেছিল। তাঁব এ-আকর্ষণ (অথবা প্রেম) ছিল প্রধানতঃ

স্বপ্নিক, লালসাগত নয়। অন্য দিকে, নজরুলের প্রতি ফজিলতুন্নেসার আকর্ষণও কম ছিল না। নজরুলের নিজের মুখে শোনা একটা রাত্রির ঘটনা থেকে বুঝেছিলাম ফজিলতুন্নেসার আকর্ষণ কম ছিল না। ফজিলতুন্নেসার আকর্ষণ ছিল জৈবিক এবং তার এই দাবি পূরণ করার শক্তি স্বাপ্নিক নজরুলের ছিল না। এই দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের মিলন সম্ভব নয়। সুতরাং, কে কাকে প্রত্যাহার করলো, বিচার করা কঠিন ও অসমীচীন।

কৃষ্ণনগরে চার বৎসরকালেরও বেশী থাকার সময় নজরুল গোড়ার দিকে একবার মাত্র আমার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তে চাঁদ সড়ক মসজিদে গিয়েছিলেন। আরবী জোব্বা-জোব্বা-ওয়ালা পোষাক ও আরবী ধরনের পাগড়ি মাথায় বেঁধে তিনি নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন। আর কখনো তাঁকে নামাজ পড়তে দেখিনি। এমন কি পরবর্তী সময়ের ঈদের জমায়েতেও শামিল হন নি। অথচ, তিনি কখনো আল্লাহ্ নাই একথা যেমন বলেন নি, তেমনি কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতেও তাঁকে শুনি নি। তবে, সকল ধর্মাবলম্বীদের কুপ্রথা, কুসংস্কার ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আপোষহীন মনোভাব।

এই প্রসঙ্গে একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়লো। এ বোধ হয ১৯২৮ সালে গোড়ার দিকের ঘটনা। একদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় গিয়ে দেখি নজরুল একটা চিঠি হাতে করে আমতলায় বেতের চেয়ারটায় বিষন্নভাবে বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি চিঠিটা আমাকে দিলেন। কোন এক অখ্যাত মওলবী এই চিঠিতে নজরুলকে কাফের বলেছেন ও অনেক কটুকথা লিখেছেন— এর মধ্যে কিছুটা পারিবারিক ব্যাপারও ছিল।

নজরুল বললেন, "আমাকে হাজার বার কাফের বলুক ক্ষতি নাই; কিন্তু আমার স্ত্রীকে এর মধ্যে জড়ানো কেন?"

বললাম, "আপনার বাড়ীর ঐ কোণের কলতলার ঝগড়া ত' রোজই শোনেন। লক্ষ্য করেননি কি যে, গালাগাল দিতে আসল কথার সঙ্গে অনেক সত্যি-মিথ্যে অপ্রাসঙ্গিক অনেক কিছু আসে; আর তা না হলে গালাগাল জমে না।"

হেসে বললেন, "যাক, মনটা হাল্কা হ'ল।"

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চা পান করতে করতে বললেন, "মন্দ বলেননি। চাঁদ-সড়ক, 'ওমান কাথলি' পাড়া আর এই কলতলা একটা অদ্ভুত দুনিয়া। এই নিয়েই ত অনেক কিছু লেখা যায়।"

বললাম, "লিখুন না কেন?"

বলা বাহুল্য এরই ফলশ্রুতি 'মৃত্যু-ক্ষুধা'।

একদিনের কথা। ১৯২৮ সালের শেষ— তবে আমার যতদূর মনে হয় ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে— সন্ধ্যের পর নজরুল আমার বাড়ীতে এসে কতকটা অবসন্নভাবে একটা চেয়ারে বসলেন, আমার স্ত্রীকে বললেন, "একেবারে তিন পেয়ালা চা দে'রে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "একেবারে তিন পেয়ালা! ব্যাপার কি? ঝগড়া করেছেন নাকি?"

আমার স্ত্রী তখনো দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে বললেন, "যানা রে, চা দিবি না?"

তিনি তখন চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন।

নজরুলের মুখের ভাব যেন একটু অন্য রকমের মনে হল। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকালাম।

ম্লান হাসি হেসে বললেন, "মাসীমা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। কাল কলকাতা থেকে দলবল আসছে আমাদের নিয়ে যেতে। কৃষ্ণনগরের পালা শেষ হয়ে গেল।

এরকম পরিস্থিতি দাঁড়াবে তিনিও জানতেন, আমিও জানতাম। প্রায় বছর খানেক আগেই বুঝেছিলাম, এ-পথিকের পথের শেষ নাই। যে-পাখী জীবনের প্রভাতে একদিন নীড় হারিয়েছে, সে কি আবার সেই আশ্রয় খুঁজে পাবে!

দু'জনেই চুপ করে বসেছিলাম। আমার স্ত্রী চা নিয়ে এলেন। চুপ করে বসে আছি দেখে বললেন, "একি ? তোমরা চুপ করে বসে কেন ?"

আমি বললাম, "তোমার দাদা ভাইরা আগামী কাল কলকাতা চলে যাচ্ছেন।"

নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যি নাকি ?"

নজরুল ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "সত্যি।"

আমি বললাম, "এখানে আসবার পর এই ক'বছরে আপনার ভেতর যে একটা পরিবর্তন আসছিল, সেটা কি আপনি অস্বীকার করেন ?"

বললেন, "হয়ত' তাই। তবু, ও আমার নিয়তি। আপনাকে আগেই বলেছিলাম হাত দেখে। সবাই বলছেন, আমিও জানি, আমার জীবনে অনেক ট্র্যাজেডি আছে, অনেক কিছু হারাতে হবে। এর শেষ কোথায় জানি না।"

আমিও ভাবছিলাম, এর শেষ কোথায়! ফজিলতুন্নেসার ঘটনাকে তিনি এক সময় একটা ট্র্যাজেডি মনে করেছিলেন। তিনি জানতেন, আমিও তাঁর কথায় বুঝেছিলাম, ওটা সত্যিকার ট্র্যাজেডি নয়। তাতে হঠাৎ তার অন্তরের একটা অস্পষ্ট দিগন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল মাত্র। নিয়তি তাঁকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে, কে জানে।

ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমার স্ত্রীকে বললেন, "সেতারা, কলকাতায় যদি যাস, তোর দাদা ভাইয়ের খোঁজ নিস্।"

উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি যাবার জন্য চলতে শুরু করলেন। দরজা পর্যন্ত সঙ্গে এসে আমি বললাম, "একটা কথা বলবো ?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বললাম, "আপনি কবি— এটা যেন ভুলে যাবেন না।" আমার হাতে একটু মৃদু চাপ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

পরদিন সত্যিই সকাল বেলা কলকাতা থেকে নলিনী সরকার, নৃপেন ও আরো কয়েকজন এসে হাজির হ'ল। সেই দিনই বিকেলে— অথবা তার পর দিন দুপুরের ট্রেনে – ঠিক মনে নেই চাঁদসড়কের পাট তুলে নজরুল চলে গেলেন।

যাওয়ার আগে মাসীমা ও দোলেনা দেখা করতে এসেছিলেন।

মাসীমা বলেছিলেন, "ভালই ছিলাম বাবা ; তবে এখানে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে।"

উত্তর দিতে পারিনি। কথাটা সত্যি।

নজরুলের কবিতা

জী ব না ন ন্দ দা শ

নজরুল ইসলাম অনেক দিন থেকে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। এব দৈহিক ওজন আমাদেব জানা আছে, আত্মিক, ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে।

জনগণ, ভদ্র সাধারণ এখনও মরে বেঁচে আছে, আসছে সার্বিক নিপাট মৃত্যু এদের জন্যে -- এবং তার ভিতর থেকেই আরো এবার বেঁচে ওঠবার অধ্যায়--- জীবনকে নতুন ক'রে প্রতিপালন করবার প্রয়োজনে।

কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে এই মৃত্যু ও জীবন যে যার কাছে দুরতিক্রম্য নয়। যতদূর ধারণা করতে পারি, এই মানুষের পৃথিবীতে অনেকদিন থেকে এইরকমই চলেছে, একটা সময় — বৈশিষ্ট্য ক্ষয়িত হযে নতুন সাময়িকতাকে নিযে আসে। এতে সমাজ কাজে উন্নত না হোক (বা হোক), মূল্যচেতনায স্থিরতর হবার অবকাশ পায় ব'লেই তো মনে হয। প্রবীণ বিরস মনীষীরা যাই ভাবুন না কেন, সাধারণেব মানব-মন মনে করে যে ভোর আসছে। একেই কখনো বুদ্ধের, ধর্মাশোকের বা ফরাসী বিপ্লবোত্তর মানবীয় প্রাতঃকাল ব'লে মনে হযেছে। সে সব প্রাতঃকাল উন্মেষেই মিলিয়ে গিয়েছে বার বার। ইতিহাসে দীর্ঘ সুদিন কোথায় পেলাম আমরা -- এবং সুদীর্ঘ সুরাত্রি? কিন্তু তবুও আবারও ভোর আসছে।

এর থেকে নিরাশার মতামতে উপস্থিত হওয়া যায়, কিংবা জীববিজ্ঞানীর কাছ থেকে জেনে নিযে এই মর্মে উপস্থিত হওয়া যায় যে মানুষ এখনও শিশু — তার সভ্যতার অস্তিমক্ষণ এত দূরে যে আমাদের পক্ষে তা নেই, আমরা এসেছি কেবলমাত্র ভূমিকার ভাঙা গড়ার ভিতর।

আমরাও তাই ভাবি। একটা যুগ ভেঙে যাচ্ছে দেখে আমাদের কারো কারো সাহিত্য স্বভাব ভাঙনের লিপিরচনায় উদ্বেলিত হয়েও যা আজও পাওয়া যায়নি, এমন কোনো নতুন সময়ে আভাসে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে চায়, কিন্তু স্থিরতা পায কি, অর্থসফলতা লাভ করে? ফলে আমাদের আগামী যুগের কবিতা হয় অত্যন্ত স্থূল হয়ে দাঁড়ায়, যে সব নিয়মের প্রভাবে আগামীকাল ক্রমে ক্রমে এসে পড়ছে তাদের ভিতর থেকে কয়েকটি প্রতীক বা প্রবর্তয়িতার মত চালিয়ে দিয়ে আমাদের কবিতা কি নবীন হয়ে ওঠে কিংবা কবিতা হয? আর তা নয় তো, বস্তুশক্তির দুরন্ত ক্রিয়াকৌশলের পরিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখেও একান্তভাবে ভাবনানিষ্ঠ হতে গিয়ে আধুনিক ও আগামীকালের কবিতা কারো কারো হাতে এত বেশী তনু সূক্ষ্ম হয়ে দাঁড়ায় যে আজ'কের কর্তব্যাসক্ত মানসের বিচারে সে কবিতার শব্দ, ভাষা, ইঙ্গিত সমস্তই অসঙ্গত, আচ্ছন্ন বলে মনে হয়। এখনকার বাংলা কবিতায় এই দুটি স্বভাবই লক্ষিত হয়--- প্রথমটি নিশান হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে— নিজের বা অপরের মুখে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত

দিব্য দিনের কিছু না কিছু স্বাদ পেয়েছে ব'লে। কিন্তু এই দুই প্রকৃতির মিশ্রণে ভালো কবিতা পেয়েছি --- নিতান্ত কম নয়।

এ কালের বাংলা কবিতার এই সব অভিব্যক্তির আগে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। (তখন তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হ'ত)। আমাদের দেশে যে বিশেষ সময়রূপ অনেক দিন থেকে কাজ করে যাচ্ছিল, তেরোশো পঁচিশ আটাশ তিরিশে এক দিক থেকে যেমন তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল অন্যদিকে কয়েকটি ইতিহাসোত্থিত কারণে এবং অঙ্গাঙ্গী নতুন সময় পর্ব তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল বলে তা একটা আশ্চর্য রক্তচ্ছটায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। যাকে মৃত্যুর বা অরুণের জীবনেরও বলে মনে করতে পারা যেত। নজরুলের অনেক কবিতাই সেই সময় লেখা হয়। মনের উৎসাহে লিখতে তিনি প্রলুব্ধও হয়েছিলেন, নিভে যাবার আগে বাংলার সমপর্যায় তখন বিশেষভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল ব'লে। এ রকম পরিবেশে হয়তো শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মায় না, কিংবা এতেই জন্মায়, কিন্তু মনন প্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতার প্রয়োজন। নজরুলের তা ছিল না। তাই তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মনোত্তীর্ণ নয়। জনগণ তখন আজকের মত ঈষৎ উন্নীত - কিংবা রূপান্তরিত? - ছিল না, চমৎকার কবিতা চাচ্ছিল, (আজো জনমানস রকম ফেরে, তাই ই চায় যদিও), নজরুল সেই মন স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এমনভাবে যে আজকের কারো কোনো জনসাধারণের জন্য তৈরি কবিতা বা গদ্য কবিতা ফলত পদ্যের স্তরে নেমেও তা পেয়েছে কিনা বলা কঠিন। তখনকার দিনে বাংলায় লোকোত্তর পুরুষ কম ছিলেন না— শ্মশানের পথে সন্তানোৎসব জমেছিল বেশ খানিকটা উদ্যোক্তা। নজরুল ইসলামের আগ্রহ পুষ্ট হয়েছিল, তিনি অনেক সফল কবিতা উৎসারিত করতে পেরেছিলেন। কোনো কোনো কবিতায় এত বেশি সফলতা যে কঠিন সমালোচকও বলতে পারেন যে নজরুলী সাধনা এইখানে —- এইখানে সার্থক হয়েছে - কিন্তু তবুও মহৎ মান এড়িয়ে গিয়েছে। কোনো এক যুগে মহৎ কবিতা বেশি লেখা হয় না। কিন্তু যে বিশেষ সময় ধর্ম, ব্যক্তিক আগ্রহ ও একান্ততার জন্যে নজরুলের অনেক কবিতা সফল ও কোনো কোনো কবিতা সার্থক হয়েছিল — জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতার মূল্য ও মাত্রা চেতনায় খানিকটা সুস্থির হয়েও আজকের দিনের অনেক কবিতাই যে সে তুলনায় ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে তা শুধু আধুনিক বিমুখ সময়রূপের জন্যেই নয় — আমাদের হৃদয়ও আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করে, অনেক সময়ই আমাদের মনও আমাদের নিজেদের নয়, এই সাময়িকতার নিয়মই হয়তো তাই।

কিন্তু নজরুলের ব্যক্তিকতা ও সময় এই বুদ্ধি সর্বস্বতার হাত থেকে তাঁকে নিস্তার দিয়েছিল। আধুনিক অনেক কবিতা থেকে তাঁর কোনো কোনো কবিতার অঙ্গীকার তাই বেশী, ধ্বনিময়তাও উৎকর্ণ না করে এমন নয়। কিন্তু নিজেকে বিশোধিত করে নেবার প্রতিভা এই এ সব কবিতায় বিধানে, শেষ রক্ষার কোনো সন্ধান নেই।

পরার্থপরতার চেয়ে স্বার্থসন্ধান ঢের হেয় জিনিষ, স্বার্থসাধন কিছুই নয়, কিন্তু কবি মানসের আত্মোপকার প্রতিভাই তাকে নির্মাতার ওপরের ভূমিকায় ওঠাতে সাহায্য করে, কবিতাকে তার অন্তিম সঙ্গতির পথে নিয়ে যায়। এরই স্বভাবে সৃষ্ট কবিতা যতদূর ব্যাপ্ত ও গভীর হয়ে উঠতে পারে নজরুল ইসলামের প্রথম ও শেষ কবিতা এরই অভাবে একই সূচনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ততদূর স্থান হারিয়ে ফেলছে।

আমার গীতিকার নজরুল

মন্মথ রায়

দুনিযায খুব কমই দেখা যায, যে একজন আর একজনকে টেনে তুলছে ওপরে। এবং সে টেনে তোলা আরও মহত্ত্বর হয়, যখন যিনি টেনে তুলছেন, তিনি খ্যাতির শীর্ষদেশে সমাসীন- যাকে টেনে তুলছেন, সে রযেছে অখ্যাত, অবহেলিত। এমনি একটি কাহিনী দিযেই আজ আমি নজরুল ইসলামের স্মৃতি-চারণ করছি।

১৯২১ সাল। দেশে তখন প্রবল অসহযোগ আন্দোলন। সে আন্দোলনে ভাসিযে দিলাম আমার আসন্ন বি. এ. পরীক্ষা। স্কটিশ হস্টেল ছেড়ে দিয়ে বাসা বাঁধলাম নন্দকুমার চৌধুরী লেনের একটি মেসে।

'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখন জনপ্রিযতাব শীর্ষে। একদিন তাব কথা উঠতে পবিত্র বললেন, 'ও কাজীটাব কথা বলছিস ? তা ওটাকে আনবো একদিন।'

আমি তো হাঁ! বড় বেশী কথা বলতেন পবিত্র। কিন্তু সত্যি সত্যিই তিনি অবাক করে দিলেন কবি কাজী নজরুলকে একদিন আমাদেব মেসে এনে। একটা শিহবণ খেলে গেলো আমার মনে। এই সেই কাজী নজরুল ? আর পবিত্র তাঁর এতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পূজারীর মনোভাব নিযে সেদিন তাঁদের সামনে অর্ঘ্য রেখেছিলাম চায়ের বাটি, জলখাবারের থালা।

আমি তখন 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একটি রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক লিখে নিজেই রোমাঞ্চিত। খুব ভয়ে ভযে কথাটা পেড়ে পাণ্ডুলিপি থেকে কবিকে তার দু'এক পাতা পডে শোনাবার একটা দুর্দম আকাঙ্খায় ভুগছি। শুরুও করেছিলাম, কিন্তু তেমন একটা সাড়া পেলাম না। আর একদল অনুরাগী এসে কবিকে বগলদাবা করে তুলে নিয়ে গেলেন আমাদের আসর থেকে।

১৯২৩ সাল। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. আর ল' পড়ি। তখনই লিখি আমার প্রথম একাঙ্ক নাটক— 'মুক্তির ডাক'। একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এলো। কলকাতার স্টার থিয়েটার ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই নাটকটি এখনকার নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক একাঙ্ক নাটকরূপে নাটকটি ঐতিহাসিক মর্যাদা পেলো বটে, কিন্তু তদানীন্তন চার-পাঁচ ঘণ্টার নাটকের যুগে এই স্বল্প-দৈর্ঘ্য দেড় ঘণ্টার একাঙ্ক নাটকটি মোটেই জনপ্রিয় হলো না।

কিন্তু তখনও আমি অখ্যাতই বলতে হবে। কারণ ষ্টার থিয়েটার তাঁদের প্রচার পত্রে নাট্যকাররূপে আমার নাম ঘোষণা করেন নি, 'মুক্তির ডাক' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো, তখনই আমার নামটা প্রকাশ পেলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় জগন্নাথ হলের সাহিত্য মুখপত্র 'বাসন্তিকা'য় আমি 'সেমিরেমিস'

নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক লিখি। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ, সবুজপত্র, কল্লোল, বিচিত্রা প্রভৃতি সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় আমার কিছু একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হলো বটে কিন্তু তখনও খ্যাতিমান হইনি আমি।

এম.এ. এবং ল' পাশ করে আমি চলে এলাম আমার তদানীন্তন বাসভূমি বালুরঘাট মহকুমা শহরে। শুরু করলাম ওকালতি। সাহিত্যের হাটে হারিয়েই গেলাম বলা চলে। হঠাৎ সেখানে পেলাম অযাচিত একখানি চিঠি। বিস্ময়ে হলাম অভিভূত। বহু কষ্টে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠিটি লিখেছেন কবি নজরুল ইসলাম। আমার সঙ্গে পরিচয় করতে উৎসুক তিনি, কলকাতায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেন না ভুলি... সঙ্গে সঙ্গে দিলাম উত্তর। লিখলাম, 'ঐ লগ্নটির অপেক্ষায় আমিও রইলাম।' সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাঁর আর একখানি চিঠি। লিখলেন তিনি—

কার্যালয়

নওরোজ
সচিত্র মাসিক পত্র

৪৫বি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৪-৭-২৭

জয়যুক্তেষু

আপনার স্নিগ্ধ চিঠি না-চাওয়ার পথ দিয়ে এসে আমায় যতো না বিস্মিত করেছে তার চেয়ে আনন্দ দিয়েছে ঢের বেশী।

আমি এতটা আশা করতে পারিনি যে, আমার প্রশংসা আপনার ললাটের প্রদীপ্ত প্রতিভা-শিখাকে উজ্জ্বলতর করবে— বা সোজা কথায় আমার প্রশংসায় আপনার মতো অসীম শক্তিশালী দুরন্ত সাহসী লেখকের কিছু -- 'এসে যায়'।

আমার মনের চেয়ে চোখের স্মরণশক্তি একটু বেশী। দেখলে তাকে হয়তো গ্রহান্তরেও চিনতে পারি-- শুনলে তাকে পথান্তরে চিনতেও বেগ পেতে হয়। তাজেই নন্দকুমার চৌধুরী লেনের দেখা আপনাকে কাব্যের নন্দন-কাননের রাজপথে দেখেও চিনতে আমার এতটুকু দেরী হয়নি। নন্দকুমার চৌধুরী লেনের সেই সুশ্রী ছিপ্‌ছিপে তরুণের চোখে অপ্রকাশ প্রতিভার যে আয়োজন দেখেছিলাম— তার পরিপূর্ণ বিকাশের সমারোহ আজ আমাকে শুধু বিস্মিত করেনি— পূজারী করে তুলেছে। এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু'চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়— এ বল্‌লে আপনি কী মনে করবেন জানিনা তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালো করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।

নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে আপনার 'লোমহর্ষণ' নাটকটা শুনছিলাম কিনা মনে নেই, যখন মনে নেই— তখন ওটাতে হয়ত 'লোমহর্ষণই' হয়েছিল 'প্রাণ হর্ষণ' হয়নি; হলে নিশ্চয় মনে থাক্‌তো। তার জন্য দুঃখ করিনে, কারণ আপনাকে মনে আছে। শুধু সুশ্রী আপনাকে দেখেছিলাম সেদিন, আজ সুন্দর তোমায় দেখ্‌ছি।

পবিত্রের মারফৎ আপনার প্রথম লেখা পড়ি— মুক্তির ডাক। পড়ে আমার কেমন লাগে, পবিত্র লিখ্‌তে বলেছিলেন। ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মতো আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি মাত্র, তাকে প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই।

আপনার 'মুক্তির ডাক'-এর পর আমি 'অজগর মণি' ও 'কাজল লেখা' পড়ি। পড়ে মুগ্ধ হই,

কিন্তু মুগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত থাকিনি, যাকে পেয়েছি তাকেই পড়িয়েছি। কিছুদিন আগে নোয়াখালি যাই, সেখান থেকে লক্ষ্মীপুরে গিয়ে সুধাংশু বলে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। বোধহয় আপনিও চেনেন তাকে। তাকে ধন্যবাদ, সেই আমার তিনখানা 'বাসন্তিকা' দেখায়। তাতেই আপনার অমর সৃষ্টি 'সেমিরেমিস', 'ইলা' ও 'স্মৃতির ছায়া' কি 'ছাপ' পড়ি। 'সেমিরেমিস' পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি— তা বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি, ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হ'য়ে উঠতো। এ ঈর্ষা এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও— দুঃখিত যতই হই।

ইলাও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি— কিন্তু সেমিরেমিসে আমি যেন তলিয়ে গেছি। এত বড় সৃষ্টি!— দুঃসাহসের দিক থেকে বল্‌ছিনে— এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়েই বল্‌ছি— আমায় আর কারুর কোনো লেখা এতো বিচলিত করেনি। ...আপনার লেখার একটা ফিরিস্তি দেখেছি বাসন্তিকায় আপনার শেষ চিঠিতে কিন্তু তার সবগুলি পড়ে উঠবার সুযোগ সুবিধে পাইনি বলে নিজেকে দুর্ভাগ্য মনে করছি।

আমার ভয় হয়, উকিল মন্মথ সেমিরেমিসের মন্মথকে ভস্ম না করে ফেলে। ল' আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলেবেলা থেকে।...

আমি ইঙ্গিত দিতে কী পারবো আপনার মতো শিল্পীকে আপনার সৃষ্টি বিষয়ে? আমার মনে হয় 'তাজমহল' সৃষ্টির কল্পনাকে কেন্দ্র করে লেখা আপনার হাত দিয়ে যা বেরুবে, তা সত্যিকার - তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেমিরেমিসের স্রষ্টাকে এ লিখ্‌তে এতটুকু কুণ্ঠা আমার নেই। আপনার মতো জান্‌লে খুশি হব।

'নওরোজ' বেরিয়েছে— ওতে আমার এক মিতে লেখককে দেখবেন—. তবে তিনি 'নাজিরুল', নজরুল নন,— আকার ইকারের দন্ড ধারণ করে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। তাঁর ভালো লেখা পড়ে তাঁর প্রাপ্য নজরুলকে দেবেন 'না' যেন। সত্যিই অনেক বক্‌লাম-- আপনার অনুরোধই রক্ষা করা গেলো। তবে বকাটা বড্ড তাড়াতাড়ি হলো-- তাই এ বকাটা বোকার মতই মনে হবে।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি—

'নবনাটিকা' দর্শনাকাঙ্ক্ষী
নজরুল ইসলাম

P. S. আপনার নৃপেনদার সহযোগে আমিও অনুরোধ জানাচ্ছি নওরোজের হাটে সওদা করতে আসার জন্য। দেরী করলে চলবে না। কখন লেখা পাঠাচ্ছেন জানাবেন।

এই যে সাহিত্যিক উদারতা— একজন অজ্ঞাত অখ্যাত লেখকের রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সাহিত্য সমাজে এমন করে বরণ করে নেওয়া, নিজের প্রাণামৃতে এমন করে অভিষিক্ত করা— সাহিত্যের শিখরদেশ থেকে চলমান পৃথিবীর এক অখ্যাত অজ্ঞাত শিল্পীকে বুকে টেনে তোলা— এই ঔদার্য, — এই মহিমা, বিশেষ করে সাহিত্য-সমাজে এতই বিরল যে আমি চিরদিন অবাক হয়েছি, আজও অবাক হই।

শুধু তাই নয়, এরপর ওই ১৯২৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর যখন মনোমোহন থিয়েটারে আমার পঞ্চাঙ্ক নাটক 'চাঁদ সদাগর' মঞ্চস্থ হয়, তখন তা দেখে সঙ্গীত রচনায় অক্ষম এই নাট্যকারের হাত দু'খানি ধরে তদানীন্তন জনপ্রিয়তম ঐ কবি নজরুল একদিন আমায় বললেন, 'আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়ে গান না লিখিয়ে নিলে আমার অভিমান হবে'।

এই আন্তরিক স্নেহেই তিনি আমার 'মহুয়া'র কণ্ঠে গান দিয়েছিলেন। আমার 'কারাগার'এর জন্য শুধু গান রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরমোল্লাসে তাতে স্বয়ং

সুর যোজনাও করেছেন। আবার 'সতী' ও 'সাবিত্রী' নাটকেব গীত-সম্ভারও তাঁরই মহাদান।

অক্ষম আমি। তবু ঋণ শোধের একটি ক্ষীণ চেষ্টা আমি না করে পারলাম না। বাংলার এই কবি দুলালের মহিমময় পুণ্য জীবনী জনসাধাবণের মধ্যে প্রচাবই হলো আমার জীবনেব মহাব্রত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রযোজকরূপে আমার বচিত ও পবিচালিত তথ্যচিত্র 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম' কবিব উদ্দেশ্যে আমাব সকৃতজ্ঞ অন্তরেব সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য।

হুগলীতে নজরুলের কারাজীবন

প্রা ণ তো ষ   চ ট্টো পা ধ্যা য়

১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এক বৎসর সশ্রম কাবাদণ্ড হয়। ঐ সময়ে রাজনৈতিক কয়েদীদের কোন শ্রেণী বিভাগের নিয়ম ছিল না। যাকে পারত তাকেই ধরে নিয়ে এসে বন্দী করত। পরে বিচার প্রহসনের দ্বারা দণ্ড দিয়ে কয়েদীর ছাপ দিয়ে দিত। বিচারক সুইন হো নিজে কবি হয়েও বিদ্রোহী কবির বেলাতে কোন শ্রেণী বিভাগ না করেই তাকে সাধারণ কয়েদীরূপে গণ্য করেছিলেন। ডোরাকাটা হাফ্ পাঞ্জাবী, উক্ত কাপড়ের ইজের, আর ঐ কাপড়েরই গামছার মত গা'মোছা চাদর, বিষম কুটকুটে খোঁচা খোঁচা লোমের কাঁটা কম্বলসহ এই অপরূপ পোষাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাঙলার জাতীয় জাগরণের কবিকে সাজিয়ে কয়েদীর গাদিতে ছেড়ে দিলে। কারাদণ্ডের পর তাঁকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি ১৬ই জানুয়ারি থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত থাকেন। সময় প্রায় চার মাস। এই চার মাসের মধ্যে নজরুল জীবনের পরম আনন্দলাভের একটি মধুর ঘটনা ঘটে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনার দূতরূপে সেণ্ট্রাল জেলে নজরুলের কাছে উপস্থিত হন। যতদূর জানা যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে তাঁর লিখিত 'বসন্ত' নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে সেণ্ট্রাল জেলে তাঁকে দেবার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন।

কবি ১৯২৩ সালের ১৪ই এপ্রিল সেণ্ট্রাল জেল থেকে হুগলী জেলে এলেন। কবিকে আনা হয়েছিল কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই তিনি উদাত্ত স্বরে "দে গরুর গা ধুইয়ে" বলে হাঁক ছাড়লেন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনল বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলী জেলে পদার্পণ করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

বিভিন্ন জেলার অহিংস ও বিপ্লবী যুব ও ছাত্রসমাজ, বিশেষ করে হুগলীর যুব ও ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশ তখন আন্দোলনের সৈনিকরূপে "হুগলী বিদ্যামন্দিরে" স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবেত হয়েছিলেন। হুগলী জেল তখন বিভিন্ন জায়গার রাজনৈতিক বন্দীর সমাগমে গমগম করছিল। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে, হাসির হুল্লোড়ে খুব হৈ চৈ করে কাটাত। বাইরে থেকে ছাত্রের দল হুগলীঘাট স্টেশনের উপর থেকে জেলের কয়েদীদের দেখত এবং নানারকমে উৎসাহিত করত। বিপ্লবী তরুণ নেতা সিরাজুল হক তাঁর দল নিয়ে হুগলীঘাট স্টেশনের উপর থেকে তাক বুঝে, কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সাবান, বিড়ি, সিগারেট, খবরের কাগজ প্রভৃতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। কবি সুবোধ রায়, সিরাজুল হক, হামিদুল হক, বিজয় মোদক, হৃদয় মোদক, জনার্দন চক্রবর্তী, প্রাণতোষ, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন ঘোষ প্রভৃতি এইসব কাজের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করতেন। কারণ এ ব্যাপারটা যাতে জেল কর্তৃপক্ষ ধরতে না পারে। জেল কর্তৃপক্ষও নানারূপ বাধার সৃষ্টি করত। বন্দীরাও

তাঁদের খবরাখবর পাঠাবার জন্য চিঠি প্রভৃতি ঢিলের সঙ্গে ছুঁড়ে এদিকে পাচার করতেন। তাই জেল কর্তৃপক্ষ যখন প্রায় হার মানল তখন সাদা পোষাকের পুলিসের আড়কাঠি টিকটিকি নিযুক্ত করতে বাধ্য হল হুগলীঘাট স্টেশনে, কারণ জেলের অনেক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে বাইরের লোকের সঙ্গে বন্দীদের যোগাযোগ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, শত চেষ্টাতেও কাজটি সমানেই চলেছে এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের কানে ভালভাবে যেতেই স্টেশনের উপরে বন্দুকধারী পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হল। কিন্তু দুঃসাহসী ছেলেদের এতেও ঠেকানো গেল না। পরে সেজন্য স্টেশনের দক্ষিণ দিকের অনেকটা জায়গা করোগেটিড টিন দিয়ে খুব উঁচু করে বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেয়। তবুও দুর্দান্ত কয়েকটি ছেলে জীবন বিপন্ন করে চেষ্টা করায় শেষ পর্যন্ত বিদ্যামন্দিরের নেতাদের নিষেধে ছেলেরা হাত গুটিয়ে নিল।

যতগুলো জেল আছে তার মধ্যে হুগলী জেলটা সবচেয়ে ওঁচা জেল। এর "জেলর" যেমনি অভদ্র তেমনি অশিক্ষিত। চোর,ডাকাত, পকেটমারদের সঙ্গে যে ব্যবহার করত, বিশিষ্ট ও সম্মানিত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গেও জেলর ও জেলসুপার সেই ব্যবহার করত। চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ তো দিতই না। কলম পেন্সিলও অফিসে জমা নিয়ে নিত জোর করে। কবি নজরুলের এইসব ব্যাপারে মনটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সময় হুগলী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ছিল এক ইংরেজ। লিকলিকে চেহারা, রসকষ শূন্য শরীর, রংটা ছিল একেবারে বিশ্রী রকমের সাদা, লোকটার নাম ছিল 'থাসচিন'। রাজনৈতিক বন্দী দেখলেই কারণে অকারণে তেলে বেগুনে সে জ্বলে উঠত। বন্দীরাও মজা দেখবার জন্য তাকে চটাবার আয়োজন করে রাখত। কবি নজরুল এই ইংরেজ জেল সুপারটির নাম রেখেছিলেন হার্সটোন ; কারণ গলার আওয়াজটা ছিল ভারী কর্কশ। কবি একে চটাবার জন্য 'সুইপার বন্দনা' নামে একটি গান লেখেন। গানটি এই—

সুইপার বন্দনা (সুপার)

"তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারই গান তোমারই ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জানাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয় ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে
আঁকাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছো আমার রসনালোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লপসী' শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।
ধর ধর খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সগুষ্টি
ওল ছোলা দেহধবল কুষ্ঠ
তুমি ধন্য ধন্য হে।" (ভাঙার গান পৃঃ ৮)

কবি রবীন্দ্রনাথের "তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' গানটির এটি লালিকা অর্থাৎ প্যারডি। "বুড়ো

ডাঁটা ঘাঁটা' কথাটির একটা ব্যাপার আছে। তা এই যে, হুগলী জেলে কি সাধারণ কয়েদী কি রাজনৈতিক কয়েদীদের দিয়ে খুব বড় করে একটা তরকারি ও ফুলের বাগান করা হয়েছিল। কয়েদীদের রসনাতৃপ্তির ব্যবস্থা হত সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংসের বরাদ্দের মধ্যে কাঁটা ও হাড় দেখা যেত, বাকি বস্তুর গতি যে কি হত তা কয়েদীরা সবাই বুঝতো। আর থাকত তরকারির খোসা। কিন্তু তখনকার দিনে ভাল ভাল তরকারি, ভাল ভাল ফুলের থোকাগুলি জেল কর্তৃপক্ষের ঘরে চলে যেত। আর বুড়ো ডাঁটা, কপির শুকনো পাতা, ফুটে যাওয়া ফুলকপি, দরকচা ধরা বেগুন, ঝিঙে, আধপচা লাউ কুমড়ো আর তরকারির খোসা প্রভৃতিতে ক্ষুদ ও ধানের 'কুন' মিশিযে মিশিয়ে সেদ্ধ করে ভোরের দিকে সানকি থেকে সানকিতে ঢেলে দিয়ে যেত 'ফালতুরা'। তার রং ছিল কালো, আস্বাদের মতো কোন বালাই ছিল না। জেল জীবনে হুগলীর কয়েদীদের ঐটাই ছিল পরম পদার্থ 'লপ্সী' ব্রেকফাষ্ট। কবি নজরুল ঐ অপদার্থকেই "বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লপ্সী শোভন" বলেছেন। বলতেই হবে, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের 'লপ্সী' ছিল খুব লোভনীয়। কারণ ডালের আর চালের ক্ষুদের সঙ্গে পেঁযাজের কুঁচো লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করা হত। সুপার 'হার্সটনের' গাযের রঙটা ছিল বিশ্রী রকমের সাদা। কবি একটি লাইনের ভিতর তাঁর অনবদ্য ভাষায় লিখেছিলেন "ওল ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠি'। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তারা এর রসটা বেশ ভালভাবেই নিতে পারবেন। এই গানটি শুনলেই সাহেব পুঙ্গব ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কি করবে ঠিক করতে পারত না। সাধারণ কয়েদীরা তো স্বদেশী কয়েদীবাবুদের বেশ ভক্ত হযে উঠেছিল। বিশেষ করে নজরুলের। তৎকালীন জেলর সাধাবণ কযেদীদের মন ভাঙার একটা চক্রান্ত করল। ঘটনাটা যেমন হাস্যকর তেমনি মজারও।

ব্যাপারটা হল এই যে, স্বদেশী কয়েদীরা যখন উদাত্ত কণ্ঠে "কারার ঐ লৌহ কবাট" গানটা গাইতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কয়েদীরাও গানে যোগ দিত। ক্রমশঃ এই গানের-মাধ্যমে সাধারণ ও স্বদেশী কয়েদীদের মধ্যে একটা বেশ একতার সৃষ্টি হয়েছিল। যারা বাগান করছে, ঘানি ঘরে, তাঁত ঘরে যে যেখানেই থাকুক না কেন, যে কাজই করুক না কেন, সারা জেলে সবাই একসঙ্গে গান গেযে উঠত। এই একতাকে ভাঙবার জন্য সাধারণ কয়েদীদের বোঝান হয় যে 'বাবু কয়েদীরা তোদের শালা' বলে গাল দিচ্ছে আর তাই তোরা মেনে নিবি ?

ব্যাপারটা হচ্ছে 'ভাঙার গানে' একটি লাইন আছে 'যত সব বন্দীশালা' তার মানে জেলর ওদের বোঝাল যতসব বন্দীরা সবাই হল 'শালা', এই নিয়ে অশিক্ষিত বন্দীরা বাবুকয়েদীদের উপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে হাঙ্গামা বাধাবার উপক্রম করলে। তখন সতীন সেন, ধরানাথ ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় নেতারা তাদের বোঝালেন, 'শালা' শব্দের মানেটা গালাগালের নয়। এই 'শালা' শব্দের মানে হল 'বাড়ি' বা 'ঘর'। তখন সাধারণ কয়েদীরা খুবই খুশি হয়। তারপর সরকারের বদ মতলব বুঝে, আরো চটে যায় জেলর ও সুপারের উপর। তারা প্রাণপণ করে স্বদেশী কয়েদীদের কাজের সঙ্গে যোগ দিয়ে জেল আর জেলের শাসকদের অসুবিধা আর বেকায়দায় ফেলে। কবির 'ভাঙার গান' নামক গ্রন্থে এই গানটিও আছে। তার ফুটনোটে কবি এই কথা কটি লিখেছিলেন—

"হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল। সেইসময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড় কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।"

কয়েদীরা খবরের কাগজ পড়ে তবু মনকে সান্ত্বনা দিত। কারণ বন্দীদের কাছে দৈনিক আনন্দবাজারের কী যে কদর ছিল এখনকার লোকদের তা বুঝানো অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় স্তম্ভ ছিল আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্টার্টার স্বরূপ। সহস্র বিপদ মাথায় করেও বিদ্যামন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকরা জেলের মধ্যে উক্ত পত্রিকাকে সরবরাহ করত। সরবরাহ করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল ভোগও করেছে দু'একজন, শুধু তাই নয়, অনেক ওয়ার্ডারদেরও শাস্তি পেতে হয়েছে।

পুলিস পাহারার চাপে শেষে কাগজ তো বন্ধ হলই, নিত্যব্যবহার্য সাবান সোডা ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে গেল।

দেশভক্ত বন্দীদের প্রাণ হাঁফিয়ে উঠল। সরকার মনোনীত পত্রিকাগুলোও 'হার্সটন' বন্ধ করে দিল। আগেই জেলের খাবারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেছি। এবার বিহারের কথা বলব। পূর্বে নূতন নূতন বন্দী এলে সকালে বিকালের নির্দিষ্ট সময়ে বন্দীদেব জেলের উঠোনে, মাঠে বেড়াতে দিত। কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দিল। বন্দীদের মধ্যে প্রাণবন্ত যারা ছিল তাদের এক একটা ঘরে কোথাও দুজনকে, কোথাও একজনকে আটকে রেখে সমস্ত রকম অধিকার হরণ করে নিল। নির্দিষ্ট সময়ে যেটুকু বাইরের হাওয়া উপভোগ করত তাও বন্ধ হয়ে গেল, বন্দীর সঙ্গে বন্দীরা কথাও বলতে পারতো না। কবি নজরুলকে জেলের পশ্চিম অংশে পূর্বমুখী সারবন্দী সেলগুলির ভিতর ৫নং সেলে বন্দী করা হল। এই সেলের পরিসর লম্বায় ছয় ফুট এবং চওড়ায় চার ফুট। চারদিকে দেওয়াল। সারবন্দী ছটা সেল। ছোট্ট ঘরের দরজাটি ছিল মোটা মোটা লোহার গরাদেব। তা বন্ধ করে দিলে সামনে একটু বারান্দা। তারপরই এক ফালি পাকা উঠোন। তারপর লোহার পাত দিয়ে মোড়া বড় দরজা। সেই দরজা বন্ধ করে দিলে নজর একেবারে ছয় ফুট চাব ফুট ঘরের মধ্যে আটকে পড়ে। এইরকম একটা বিশ্রী ঘরে কবিকে বাস করতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। বাংলাব কোন কবি সাহিত্যিক এমন একটি ঘরে জাতির মুক্তির জন্য বাস করেছেন কিনা শুনিনি। এমন অবস্থাতেও কবি নজরুল গান না গেয়ে থাকতে পারতেন না, তিনি গান ধরতেন।

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কর্‌রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষান বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষান
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদী।" ইত্যাদি

গানগুলি শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠত। তারা জেল কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হত। কবি, সতীন সেন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দীকে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ী দিয়ে "সেলে" বন্দী করে অন্যান্য কয়েদী থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিল। কবি তখন 'শিকলপরার গান" খানি হাতকড়া বাঁধা হাত দুটি সেলের লোহার গরাদের সঙ্গে ঘা দিয়ে দিয়ে বাজিয়ে গাইতেন :

"(এই) শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল
(এই) শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল!
(তোমার) বন্দীকারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
(ওরে) ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
(এই) বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়।
(এই) শিকল বাঁধা 'পা' নয় এ শিকল ভাঙ্গা কল।"

বন্দীজীবনে ভয়শূন্য হবার জন্য কবি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কাগজ নেই, কলম পেন্সিল, তাও নেই, কবি শূন্য হাতে শুধু স্মৃতিশক্তির জোরে এই সব গান শত

বাধা সত্ত্বেও সুর ও দরদ দিয়ে ভাবাবেগের সঙ্গে গেয়ে বন্দীদের প্রাণে প্রাণে প্রতিকারের জন্য, প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত প্রতিবাদের জন্য আগুনকে বন্দীদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর বিখ্যাত 'সেবক' কবিতা উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে বন্দীদের সংগ্রাম শক্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কবির সান্নিধ্যে এসে সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত দেশকে ভক্তি করতে শিখেছিল আবৃত্তির মাধ্যমে—

"সত্যকে হায় হত্যা ক'রে অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নাই কিরে কেউ সত্য সেবক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়
বজ্রহাতে জিন্দানের (জেলখানার) এই ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?"

এই প্রশ্ন বারে বারে বন্দীদের কাছে তুলে ধরলেন।

জেলের অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠলো। জেলে যতরকম শাস্তি দেওয়ার ফন্দী ছিল, জেলার আর সুপার সকলের উপর তাই প্রয়োগ করতে লাগলো। অনমনীয় বন্দীরা, অনমনীয় বিদ্রোহী কবি, অনমনীয় সাধারণ কয়েদীরাও এরই প্রতিবাদের জন্য মিলিত ভাবে সবাই অনশন ধর্মঘটের প্রস্তাব দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে সকলে প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে চলে। এই সময় কবি নজরুল 'মরণবরণ' গানখানিও গেয়ে দেশভক্ত বিপ্লবী ও সাধারণ কয়েদীদের প্রাণবন্যা বইয়ে দিতেন—

"এস এস এস ওগো মরণ
এই মরণভীতু মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ।
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের পরে
ভীমরুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙ্গন ভরা চরণ।"

এই সঙ্গে 'বন্দী বন্দনা' নামে আর একটি গানও গাইতেন। ভোরবেলায় রাজনৈতিক বন্দীদের "ফাইলে" দাঁড়াতে হত। স্কুলে ড্রিলের সময় যেমন দাঁড়াতে হয় সেইরকম দাঁড়ানোকে "ফাইল' বলে। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, বন্দীদের রাম দুই করে হেড জমাদার গুনতো। গোনা হয়ে গেলে জেলার তার বিকট ভুঁড়ি দুলিয়ে মূর্তিমান দম্ভের মতো ঢুকতো বোকা বোকা মুখের ভাব নিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে জমাদার বীভৎস চীৎকার করে বলে উঠত "সরকার সেলাম"। এই সরকার সেলাম কবি, কবির বন্ধু, মঈনউদ্দীন, সতীন সেন, হুগলীর দুর্গাদাস ও অন্যান্য বন্ধুরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একটি করে ঠ্যাং সামনের দিকে তুলে দিতেন। পরে এই নিয়ে অনেক মারপিট হয়েছিল। মনে পড়ে, এই পদ্ধতিটা হুগলী বিদ্যামন্দিরের প্রাণস্বরূপ শিক্ষক দধিচী ৺দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় সবাইকে শিখিয়ে ছিলেন। ভোরবেলায় এই ব্যাপারটার সঙ্গে উপরিউক্ত "বন্দীবন্দনা" গানটির যোগাযোগ ছিল। ভোরের সুরমণ্ডিত এই প্রভাতী গান গেয়ে কবি নজরুল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। গানটি এই—

"আজি রক্ত নিশিভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দীশৃঙ্খলে
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়াতলে।

ওরা দুপায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে
বাজিল নভতলে
স্বাধীন ডঙ্কারে
বিজয় সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে
উতল কলরোলে !!
আজি কারার সারাদেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হাহাস্বরে ছিঁড়িছে বন্ধন
নিখিল গেহ যেথা বন্দীকারা, সেথা
কেনরে কারা ত্রাসে মরিবে বীর দলে ?
"জয় হে বন্ধন" গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভতলে।।" ইত্যাদি (বিষেব বাঁশী)"

এরপর শুরু হল অনশন ধর্মঘট। এবং বন্দীরা জোরগলায় জানিয়ে দিল "সম্মানজনক অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলা থামবে না।" প্রথম প্রথম এই ধর্মঘটের কথা বাইরে প্রকাশ হয়নি। তারপর জেল ... হুগলির শাসক ঘটনাকে আঁচল চাপা দিয়ে এই আগুন আর চেপে রাখতে পারল না। "সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।" এই অনশনে ধর্মঘট নিয়ে সারা বাংলা দেশ ও নিখিল ভারতের নরম ও চরমপন্থী নেতারা, ছাত্র ও যুবকরা এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও খুব বিচলিত হয়েছিলেন। কবি নজরুল নিজে সৈনিক পুরুষ, একরোখা লোক, যা করবেন তা করবেনই, কিছুতেই তাঁকে রাখা যেত না। এই অনশনের সময় সমস্ত বন্দীরই অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হাত-পা-মাথা চেপে ধরে জেলওয়ার্ডার চামুণ্ডার দল জোর করে নলের মাধ্যমে নাকের মধ্য দিয়ে খাওয়ানোর জন্যই বেশিরভাগ বন্দীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন শুধু তাই নয় কারুর কারুর জীবনও সংশয় হয়েছিল। সকল বন্দীর জন্য, বিশেষ করে বিদ্রোহী কবির জন্য দেশবাসী উদ্বেগে অধীর হয়ে উঠে। সভাসমিতি, প্রস্তাব পাশ, নানারকম চেষ্টা চলতে থাকে। কবিকে দেশের বড় বড় নেতারা অনশন ত্যাগের অনুরোধ করে চিঠিও পাঠান। কবি "মরণবরণ" গান গেয়ে সকলকে মৃত্যুভয় শূণ্য হয়ে অনশনের পথে ডেকেছেন, তিনি হয় সকলকে নিয়ে মরবেন, নয় সকলকে নিয়েই সাফল্যের মধ্য দিয়ে অনশন ত্যাগ করবেন এই তাঁর জিদ্। পরে স্বয়ং বিশ্বকবি যখন তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানালেন :—Give up hunger Strike, our literature claims you - Rabindranath. কবি নজরুল হুগলী জেলে আসেন ১৪.৪.২৩ তারিখে, হুগলী জেল থেকে বহরমপুর জেলে যান ১৮.৬.২৩ তারিখে। সর্বসাকুল্যে নজরুল হুগলী জেলে ছিলেন দুই মাস চার দিন। তাহলেও নজরুলকে পেয়ে তখনকার দিনে হুগলী ও নানা জেলার যে-সব রাজনৈতিক কয়েদী ছিলেন এবং সাধারণ কয়েদীরাও আইনতঃ যা কয়েদীদের পাওয়া উচিত তাই দাবি করে অনশন শুরু করলেন। অনশন অন্তে নজরুলকে ১৮.৬.২৩ তারিখে বহরমপুর জেলে পাঠান হয়, সর্বপ্রকার দাবি পূরণ করে।

অনশন যখন তুঙ্গে ওঠে তখন রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করেন আলিপুর জেলে। কিন্তু সেই টেলিগ্রাম নজরুলকে হুগলী জেলে পাঠিয়ে ফেরত পাঠান হয়েছিল। "বসন্ত" নাটক পেয়ে নজরুল আলিপুর সেনট্রাল জেলে যে আনন্দলাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন, এই অনশনের সময় রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম হস্তগত হলে তিনি আরও প্রেরণা লাভ করতেন ও দেখতেন যে রবীন্দ্র-পরিষদের শত বিরূপতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাকে কত ভালবাসেন। তাঁর মঙ্গল চিন্তা শতসহস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও করে থাকেন। কিন্তু নজরুল রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রামের কোন কথাই জানতে পারলেন না। পরে অবশ্য

এইজন্য নজরুলের রবীন্দ্রনাথের উপর অভিমানও হয়েছিল। যাইহোক নজরুলের অনশনের সংবাদে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন যে রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে নজরুলের শুভসংবাদ সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। তিনি লেখেন—

কল্যাণীয়েষু,

রথী, নজরুল ইসলামকে Presidency Jail ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম ; লিখেছিলুম 'Give up hunger strike, our literature claims you'। জেল থেকে Memo এসেছে—"The addressee not found" অর্থাৎ ওরা আমার Message ওকে দিতে চায় না ; কেননা, নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয়ই জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু নজরুলকে গভীর স্নেহ করতেন এবং তাঁর কবিত্বের দ্বারা যে দেশ সমৃদ্ধ হবে এ বিশ্বাসও গুরুদেবের ছিল। তাই নজরুলের আমরণ অনশনের সংবাদ পেয়েও তৎকালীন সরকারের অমানুষিক দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তায় আকুল হয়ে শেষ পর্যন্ত রথীন্দ্রনাথকে খবর জানাবার জন্য চিঠিও দিয়েছিলেন।

(দৈনিক বসুমতী- -১৩৫৮, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার)

কবি নজরুলের বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকা দরকার একথা বিশ্বকবি স্বীকার করলেও তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকেরা স্বীকার না করে দেশবাসীদের কাছে হেয় হয়ে আছেন। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকখানি নজরুলকে উৎসর্গ করেন, আলিপুর জেলে। পবিত্রবাবুর হাত থেকে 'বসন্ত' নাটকখানি হাতে নিয়ে নজরুল দেখলেন কবিগুরু 'বসন্ত' নাটকের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছাপা অক্ষরে "শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েসু" লিখে নিচে তাঁর নাম কালি দিয়ে সই করেছেন।

অনশনের সময়ে বাইরের আন্দোলনের চাপে ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে বন্দীদের দাবি মেনে নেবে বলে সরকার স্বীকার করল। তখনও চির অবিশ্বাসী ব্রিটিশ সরকারকে বন্দীরা বিশ্বাস করতে পারলেন না। অনশন ধর্মঘট চলছে, এমন সময় একদিন কলকাতা থেকে পবিত্রবাবুর সংগে বিরজাসুন্দরী দেবী, হুগলী বালির ৺চারুশীলা মিত্র প্রভৃতি হুগলী জেল গেটে এসে উপস্থিত হলেন। এদের সঙ্গে হুগলীর বিপ্লবী নেতা সিরাজুল হক্, হামিদুল হক্, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায ; বিজয় মোদক আরও দু'একজন ছিলেন। বিরজাসুন্দরী দেবীকে কবি নজরুল 'মা' বলে ডাকতেন। এঁকে "সর্বহারা' নামক শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন। তাতে লিখেছিলেন—

"সর্ব্বংসহা সর্ব্বহারা জননী আমার।
তুমি কোনদিন কারো করনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা বারিধির
কূলে বসে কাঁদ মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী। যেন কোন্ পথ ভুলে আসা
ভিন গাঁর ভীরু মেয়ে! কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছ আপনারে, এ আমি কোথায় ?-—"

বিশ্বকবির হস্তক্ষেপে ও বিরজাসুন্দরীর বহু সাধ্যসাধনায় ও সরকার পক্ষের দাবি মিটিয়ে দেবার স্বীকৃতিতে মায়ের হাতের লেবুর রস পান করে কবি নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন। অনশন যখন চলছে, তখন নজরুলের মা তাঁর গ্রামের একটি ছেলেকে ও বড় ছেলে সাহেবজানকে নিয়ে হুগলীতে আসেন।

কিন্তু একেবারে নূতন জায়গা। কোথায় যাবেন? তখন ছেলে স্বদেশী করে জেলে গেছে ভেবে বুদ্ধি করে তাঁরা ১৯২৩ এর মে মাসের প্রথম দিকে হবে, হুগলী কংগ্রেসের বিদ্যামন্দিরে এসে আমাদের কাছে পরিচয় দিয়ে রাত্রিবাস করে নজরুলের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই হিসাবে নজরুলের মাকে আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করে দি। অতঃপর কয়েকদিনের চেষ্টায় নজরুলের মা তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন। সঙ্গের যুবকটিকে হুগলী জেলার গোয়েন্দা বিভাগে দেখা করবার অনুমতি দেয়নি। নজরুলের মা ঐ একদিনই দেখা করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু নজরুল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি মার সঙ্গে দেখা করবেন না। হুগলী জেলের প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীভূজঙ্গ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তি ঘোষ হুগলী জেলখানার কাছেই থাকতেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। কবি যখন জেলে থাকতেন তখন এই মহিলাটি চিঠি ও নানারূপে খবরাখবর সরবরাহ করে কবিকে সাহায্য করেছেন। অনশনভঙ্গ হবার পর কর্তৃপক্ষ বন্দীদের সমস্ত দাবিই মিটিয়ে দিল, কিন্তু সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা কেটে তারপর পড়তে দিত।

কবি নজরুল ইতিমধ্যে কবিখ্যাতির চরমে উঠেছেন। এতে করে তৎকালীন বাঙলাদেশের ছিদ্রান্বেষী সাহিত্য ব্যবসায়ী সাহিত্যিকদের বুকে হিংসার বিষ উথলে [illegible]ঠল। এরা শুধু হিংসা করেই ক্ষান্ত হননি। প্রতিহিংসা নেবার জনেও কলমকে [illegible] শূল করে তুললেন। সুবিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতাকে ব্যঙ্গ কর[illegible] [illegible]লাল মজুমদার "কবি বিদ্রোহী" লিখলেন। সজনীরা "শনিবারের চিঠিতে" লিখলেন "ব্যাঙ' নাম দিয়ে কবিতা। এঁরা মনে করেছিলেন এইভাবে কবি নজরুলকে বাংলা কাব্য জগত থেকে সরিয়ে দেবেন! কিন্তু এঁদের নাম এরই মধ্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, কিন্তু নজরুল জনগণের মনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এর কারণ কবি হয়ে তিনি জাতির স্বাধীনতা অভিযানের সঙ্গে পা মিলিয়ে, জানকবুল করে, মৃত্যুকে ভয় না করে চলেছিলেন। পলাযনী বৃত্তি তাঁর ছিল না— তাই কবি নজরুল শত বাধা বিরোধিতাকে ঠেলে উন্নত শিরে ছাতি চিতিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

নজরুলের সঙ্গে আলাপ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নৃপেন তখন সিটি কলেজে আই-এ পড়ে ও আরপুলি লেনের এক বাড়িতে ছাত্র পড়ায়। দু'তিনখানা বাড়ির পরেই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির বাড়ি। সে সব দিনে-- তখন সেটা ১৩১৮ সাল--- বাগচি কবির বৈঠকখানায় কলকাতার একটা সেরা সান্ধ্য মজলিস বসত। বহু গুণী গায়ক ও সাহিত্যিক সে মজলিসে জমায়েত হতেন। বাংলাদেশের সব জ্যোতির্ময় নক্ষত্র--- গ্রহপতি স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন। যতীন্দ্রমোহনের অতিথিবাৎসল্য নগরবিশ্রুত। কোথায় কোন ভাঙা দেয়ালের আড়ালে নূতনের কেতন উড়ছে', কোথায় কার মাঝে মৃদুতম সম্ভাবনা, ক্ষীণতম প্রতিশ্রুতি-- সব সময়ে তাঁর চোখ কান খোলা ছিল। আভাস একবার পেলেই উদ্বেল হৃদয়ে আহ্বান করে আনতেন। তাঁর বাড়ির দরজা যে হাসনাহেনার গুচ্ছ ছিল তার গন্ধ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের গন্ধ। নৃপেন দু-দুবার সে বাড়ির সুমুখ দিয়ে হেঁটে যায়, আর ভাবে ঐ স্বর্গরাজ্যে তার কি কোনোদিন প্রবেশের অধিকার হবে? আদর্শ তাড়িত যুবক,সাংসারিক দারিদ্র্যের চাপে সামান্য টিউশনি করতে হচ্ছে, বাগচি কবি কি করে জানবেন তার অন্তরের সীমাতিক্রান্ত অনুরাগ, তার নির্জনলালিত বিদ্রোহের ব্যাকুলতা? নৃপেন যায় আর আসে, আর ভাবে, ঐ স্বর্গরাজ্যে কে তাকে ডাক দেবে, কবে, কার কণ্ঠস্বরে?

একদিন তার ছাত্র নৃপেনকে বললে, 'জানেন মাস্টার মশাই, আজ বাগচি বাড়িতে 'বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আসছেন।' 'বিদ্রোহী'র কবি! "আমি ইন্দ্রাণী-সুত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য, মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।" "আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন; আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।" সেই 'বিদ্রোহী'র কবি? কেমন না জানি দেখতে! রাস্তার উপরে উৎসুক জনতা ভিড় করে আছে আর ঘরের মধ্যে কে একজন তরুণ গান গাইছে তার স্বরে। সন্দেহ কি, শুধু বিদ্রোহী'র কবি নয়, কবি বিদ্রোহী। তার কণ্ঠস্বরে প্রাণবন্ত প্রবল পৌরুষ, হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা। গ্রীষ্মের রুক্ষ আকাশে যেন মনোহর ঝড় হঠাৎ ছুটি পেয়েছে। কর্কশের মাঝে মধুরের অবতারণা। নিজেরা অলক্ষ্যে কখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নৃপেন। সমস্ত কুণ্ঠার কালিমা নজরুলের গানে মুছে গেছে। শুধু কি তাই? গানের শেষে অতর্কিতে সাহিত্যালোচনায় যোগ দিয়ে বসেছে নৃপেন। কথা হচ্ছিল রুশ সাহিত্য নিয়ে, সব সুমহান পূর্বসূরিদের সাহিত্য--- পুশকিন, টলস্টয়, গোগল, ডস্টয়ভস্কি। নৃপেন রুশ সাহিত্যে মশগুল, প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নখমুকুরে। তাছাড়া সেই তরুণ বয়সে সব সময় নিজেকে জাহির করার উত্তেজনা তো আছেই। কে যেন ডস্টয়ভস্কির কোন উপন্যাসের চরিত্রের নামে ভুল করেছে, নৃপেন তা সবিনয়ে সংশোধন করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিস্তৃতি। সকলের বিস্মিত চোখ পড়ল নৃপেনের উপর। নজরুলের চোখ পড়ল নবীন বন্ধুতার।

ঘর থেকে নেমে এসেছে পথে, পিছন থেকে কে ডাকল নৃপেনকে। কি আশ্চর্য! বিদ্রোহী কবি স্বয়ং, আর তার সঙ্গে তার বন্ধু আফজল উল হক "মোসলেম ভারতে"র কর্ণধার। মানে, যে কাগজে 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছে সেই কাগজের। সুতরাং নৃপেনের চোখে আফজলও প্রকাণ্ড কীর্তিমান। আর, "প্রবাসী"র যেমন রবীন্দ্রনাথ, "মোসলেম ভারতে"র তেমনি নজরুল।

নজরুল বললে, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'তা হলে আসুন, হাঁটি!'

নৃপেন তখন থেকে চিংড়িঘাটায়, কলকাতার পুব উপান্তে। নজরুল আর আফজল চলে এল নৃপেনের বাড়ি পর্যন্ত। নৃপেন বললে, আপনারা পথ চিনে ফিরতে পারবেন না, চলুন এগিয়ে দিই। এগিয়ে দিতে দিতে চলে এল কলেজ স্ট্রিট, নজরুলের আস্তানা। এবার ফিরি, বললে নৃপেন। নজরুল বললে, চলুন ফের এগিয়ে দিই আপনাকে। সে কি কথা? নজরুল বললে, পথ তো চিনে ফেলেছি ইতিমধ্যে।

রাত গভীর হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে গভীর হয়ে এল হৃদয়ের কুটুম্বিতা। দৃঢ় করে বাঁধা হয়ে গেল গ্রন্থি।

নজরুল বললে, "ধূমকেতু" নামে এক সাপ্তাহিক বের করছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি মহাকালের তৃতীয় নয়ন, আপনি ত্রিশূল। আসুন, দেশের ঘুম ভাঙাই, ভয় ভাঙাই—

নৃপেন উৎসাহে ফুটতে লাগল। বললে, এমন শুভকাজে দেবতার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করবেন না? তিনি কি চাইবেন মুখ তুলে? তবু নজরুল শেষ মুহূর্তে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন? তাছাড়া, এ নজরুল, যার কবিতায় পেয়েছেন তিনি তপ্ত প্রাণের নতুন সজীবতা। শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন "ধূমকেতু"র মর্মকথা কি। যৌবনকে "চিরজীবী" আখ্যা দিয়ে "বলাকা'য় তিনি আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে বলেছিলেন, 'সেটাতে রাজনীতি ছিল না, কিন্তু, এবার "ধূমকেতু"কে তিনি যা লিখে পাঠালেন তা স্পষ্ট রাজনীতি, প্রত্যক্ষ গণজাগরণের সংকেত।

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন,
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্জের গলি থেকে বেরুল 'ধূমকেতু"। ফুলস্কাপ সাইজ, চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম বোধহয় দু পয়সা। প্রথম পৃষ্ঠায়ই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, আর তার ঠিক উপরে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ব্লক করে কবিতাটি ছাপানো।

নৃপেনের মত আমিও ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। সপ্তাহান্তে বিকেলবেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে "ধূমকেতু"র বান্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সঙ্গে "ত্রিশূলের" আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী যুগের "সন্ধ্যা"তে ব্রহ্মবান্ধব এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করবার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙার গান, প্রলয় বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।

কাবার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট, শিকলপূজার পাষাণবেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি!
গাজনের বাজনা বাজা! কে মালিক কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হাহাহা পায় যে হাসি ভগবান পরবে ফাঁসি
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?
ওরে ও পাগলা ভোলা, দে রে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলো জোরসে ধ'রে হেঁচকা টানে!
মার হাঁক হায়দরী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবনপানে।
নাচে ঐ কালবোশেখী, কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি!
লাথি মার ভাঙরে তালা যত সব বন্দিশালা।
আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি॥

'ধূমকেতু'র সেসব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলা সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত। অন্তত সাক্ষ্য থাকত বাঙলা গদ্য কতটা কাব্যগুণান্বিত হতে পারে, "প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী" কি করে "বিনিষ্ক্রান্তাসিধারিণী" সংহার কর্ত্রী মহাকালী হতে পারে। প্রসাদরম্য ললিত ভাষায় কি করে উৎসারিত হতে পারে অগ্নিগর্ভ অঙ্গীকার। একটা প্রবন্ধের কথা এখনো মনে আছে— নাম, "ম্যায় ভুখা হু"। মহাকালী ক্ষুধার্ত হয়ে নরমুণ্ডের লোভে শ্মশানে বেরিয়েছেন তারই একটা ঘোরদর্শন বর্ণনা। বোধহয় সে সংখ্যাটা কালীপূজার সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল। কালীপূজার দিন সাধারণ দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজে যে মামুলি প্রবন্ধ বেরোয়— মুখস্ত করা কতকগুলো সমাসবদ্ধ কথা— এ সে জাতের লেখা নয়। দীপান্বিতার রাত্রির পরেই এ দীপ নিবে যায় না। বাঙলাদেশের চিরাকালীন যৌবনের রক্তে এর দ্যুতি জ্বলতে থাকে।

'ধূমকেতু'তে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলাম। অর্থাৎ, একটা সাঁকো ফেললাম নজরুলকে গিয়ে ধরবার জন্যে। সেই কবিতাটি ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় বেরুল না। অন্যুৎসারিত হবার কথা, কিন্তু আমার স্পর্ধা হলো নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে মুখোমুখি জবাবদিহি নিতে হবে। গেলাম তাই একদিন দুপুরবেলা। রঙিন লুঙ্গি পরনে, গায়ে আঁট গেঞ্জি— অসম্পাদকীয় বেশে নজরুল বসে আছে তক্তপোশে— চারদিকে একটা অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া ছড়িয়ে। 'অগ্নিবীণা'র প্রথম সংস্করণে নজরুলের একটা ফোটো ছাপা হয়েছিল, সেটায় বড় বেশি কবি কবি ভাব এখন চোখের সামনে একটা মানুষ দেখলাম, স্পষ্ট, সতেজ প্রাণপূর্ণ পুরুষ। বললাম— আমার কবিতার কি হল? নজরুল চোখ তুলে চাইল: কোন্ কবিতা? বললাম— আপনার কবিতা যখন 'বিদ্রোহী', আমার কবিতা উচ্ছৃঙ্খল। হা হা হা করে নজরুল হেসে উঠল। বললে— আপনি মনোনীত হয়েছেন।

কবিতাটা ছাপা হয়েছিল কিনা জানি না। হয়তো হয়েছিল, কিংবা হয়তো তার পরেই নজরুলকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে। কিন্তু তার সেই কথাটা মনের মধ্যে ছাপা হয়ে রইল। আপনি মনোনীত হয়েছেন।

নজরুলকে কিসের জন্যে ধরলে জানো? জিগগেস করলে নৃপেন।

'কিসের জন্যে ?'

আগে লিখেছিল— "রক্তাম্বর পর্ মা এবার জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেতবসন। দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন বাজে তরবারি ঝনন ঝন।" এবারে লিখলে "আর কতকাল রইবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ? স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল!" এই লেখার জন্যে নজরুলের একবছর জেল হয়ে গেল। সে যা জবানবন্দি দিলে তা শুধু সত্য নয়, সাহিত্য।'

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বসে ছিল একপাশে। বললে, 'তার জেলের কাহিনীটা আমার কাছ থেকে শোনো।'

'তোমার সঙ্গে নজরুলের আলাপ হল কবে ?'

'নজরুল যখন করাচিতে, যখন ও শুধু কবি নয়, হাবিলদার কবি। পল্টনে লেফট রাইট করাতে হত তাকে। পল্টনও এমন পল্টন, লেফট রাইট বোঝে না। তখন এক পায়ে ঘাস ও অন্য পায়ে বিচালি বেঁধে দিয়ে বলতে হত, ঘাস বিচালি ঘাস। সেই সময়কার থেকে চেনা। আছি তখন 'সবুজপত্রে'— হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক চিঠি আসে করাচি থেকে, সঙ্গে ছোট একটি কবিতা। লেখক উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি পল্টনের একজন হাবিলদার, নাম কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতাটি বড্ড রবীন্দ্রনাথ ঘেঁষা। স্বকীয়তা খুঁজে পেলেন না বলে চৌধুরী মশায়ের পছন্দ হল না। আমার কিন্তু ভাল লেগেছিল। কবিতাটি নিয়ে গেলাম "প্রবাসী'র চারুবাবুর কাছে। চারুবাবু খুশি হয়ে ছাপলেন সে কবিতা। বললেন, আরো চাই। এক জায়গায় পাঠানো কবিতা অন্য জায়গায় চালিয়ে দিয়েছি লেখকের সম্মতি না নিয়ে, কুণ্ঠিত হয়ে চিঠি লিখলাম নজরুলকে। "দে গরুর গা ধুইয়ে"-- নজরুল তা থোড়াই কেয়ার করে। প্রশস্ত সাধুবাদ দিয়ে চিঠি লিখলে আমাকে, এতটুকু ভুল বুঝলে না। নবীন আগন্তুককে প্রবেশ পথে যে সামান্য সাহায্য করেছি এতেই তার বন্ধুতা যেন সে কায়েম করলে। তারপর পল্টন ভেঙে দেবার পর যখন সে কলকাতায় ফিরল, ফিরেই ছুটল 'সবুজপত্রে" আমাকে খোঁজ করতে—

একদিন জোড়াসাঁকো থেকে খবর এল— রবীন্দ্রনাথ পবিত্রকে ডেকেছেন। কি ব্যাপার ? ব্যাপার রোমাঞ্চকর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বসন্ত" নাটকটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছেন। এখন একখানা বই ওকে জেলখানায় পৌঁছে দেওয়া দরকার। পারবে নাকি পবিত্র ?

নিশ্চয়ই পারবে। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম লিখে দিলেন। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছাপা ছিল : 'শ্রীমান কবি কাজি নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু।' তার নিচে তাঁর কাচা কালির স্বাক্ষর বসল। শুনেছি তাঁর আশে পাশে যে সব উন্নাসিক ভক্তের দল বিরাজ করত তারা কবির এই বদান্যতায় সেদিন বিশেষ খুশি হতে পারেনি। কিন্তু তিনি নিজে তো জানতেন কাজী নজরুল তাঁরই পরেকার যুগে প্রথম স্বতন্ত্র কবি, স্বীকার করতে হবে তার এই শক্তিদীপ্ত বিশিষ্টতাকে। তাই তিনি তাঁর অন্তরের স্নেহ ও স্বীকৃতি জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। "শ্রীমান" ও "কবি" এই কথা দুটির মধ্যে তাঁর সেই গভীর স্নেহ ও আন্তরিকতা অক্ষয় করে রাখলেন।

নজরুল মিঠে পান ও জর্দা ভালোবাসে, আর ভালোবাসে হেজলিন স্নো। এই সব ও আরো কটা কি বরাতী জিনিস নিয়ে পবিত্র একদিন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের দুয়ারে হাজির, নজরুলের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে। লোহার বেড়ার ওপার থেকে নজরুল চেঁচিয়ে জিগগেস করলে— সব এনেছিস তো ? পবিত্র হাসল। কী জানে নজরুল, কী জিনিস পবিত্র আজ নিয়ে আসছে তার জন্যে। কী দেবতা দুর্লভ উপহার! কী এনেছিস ? চেঁচিয়ে উঠল নজরুল। পবিত্র বললে, তোর জন্যে কবিকণ্ঠের মালা এনেছি। বলে "বসন্ত" বইখানা তাকে দেখাল। নজরুল ভাবলে, রবীন্দ্রনাথের "বসন্ত" কাব্যনাট্যখানা নিয়েই পবিত্র বুঝি একটু কবিয়ানা করছে। এই দ্যাখ। উৎসর্গ পৃষ্ঠাটা পবিত্র খুলে ধরল তার চোখের সামনে। আর কী চাস! সব চেয়ে বড় স্তুতি আজ তুই পেয়ে গেলি। তার চেয়েও হয়তো বড় জিনিস রবীন্দ্রনাথের স্নেহ!

রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলকে দেশের ও সাহিত্যের একটা দামী সম্পদ বলে মনে করতেন তার আর একটা প্রমাণ আছে। নজরুল যখন হুগলি জেলে অনশন করছে তখন রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে তাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন— Give up hunger strike, our literature claims you. টেলিগ্রাম করেছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সেই টেলিগ্রাম ফিরে এল রবীন্দ্রনাথের কাছে। কর্তৃপক্ষ লিখে পাঠাল : Addressee not found.

এই সময়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। পবিত্র তা চেপে যাচ্ছে। বললেন নলিনীকান্ত সরকার, আমাদের নলিনীদা। কৃষ্ণের যেমন বলরাম, নজরুলের তেমনি নলিনীদা। হাসির গানের তানসেন। নজরুল গায় আর হাসে, নলিনীদা গান আর হাসান। নজরুলের পার্শ্বাস্থি বলা যেতে পারে। নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নলিনীদার কাছে সন্ধান নাও। নজরুলকে সভায় নিয়ে যেতে হবে, নলিনীদাকে সঙ্গে চাই। নজরুলকে দিয়ে কিছু করাতে হবে, ধরো নলিনীদাকে। নজরুল সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল।

শোনো সে মজার কথা। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে নজরুল তখন বদলি হয়েছে হুগলি জেলে। হুগলি জেলে এসে নজরুল জেলের শৃঙ্খলা ভাঙতে শুরু করল, জেলও চাইল তার পায়ে ভালো করে শৃঙ্খল পরাতে। লেগে গেল সংঘাত। শেষকালে নজরুল হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে। আটাশ দিনের দিন সবাই আমাকে ধরলে জেলে গিয়ে নজরুলকে যেন খাইয়ে আসি। জানতাম নজরুল মচকাবার ছেলে নয়, তবু ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। গেলাম হুগলি জেলের ফটকে। আমি আর সঙ্গে, সকল অগতির গতি, এই পবিত্র। জেলে ঢুকতে পারলাম না, অনুমতি দিলে না কর্তারা। হতাশ মনে ফিরে এলাম হুগলি স্টেশনে। মনে হল জেলের পাঁচিলটা একবার কোনোরকমে ডিঙোতে পারলেই নজরুলের সামনে সটান চলে যেতে পারব। আর এভাবে জেলের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে সহজে যে বেরুনো চলবে না তা এই দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। তবু বিষয়টা চেষ্টা করে দেখার মত। পবিত্রকে বললাম, তুমি আগে উবু হয়ে বোসো, আমি তোমার দু' কাঁধের উপর দু' পা রেখে দাঁড়াই দেয়াল ধরে। তারপর তুমি আস্তে আস্তে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। তোমার কাঁধের থেকে যদি একবার লাফ দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠতে পারি, তবে তুমি আর এখানে থেকো না। স্রেফ হাওয়া হয়ে যেয়ো। বাড়তি আরেক জনের জেলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

বেলা তখন প্রায় দুটো, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর আনাগোনা কম। 'য়্যাকর্ডিং টু প্ল্যান' কাজ হল। পবিত্রর কাঁধের থেকে পাঁচিলের মাথায় কায়ক্লেশে প্রমোশন পেলাম। প্রমোশন পেয়েই চক্ষু চড়কগাছ! ভিতরের দিকে প্রকাণ্ড খাদ— খাই প্রায় অন্তত চল্লিশ হাত। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি পবিত্রর নামগন্ধ নেই। যা হবার তা হবে, দু'দিকে দু' ঠ্যাং ঝুলিয়ে জাঁকিয়ে বসলাম পাঁচিলের উপর ঘোড় সওয়ারের মতো। যে দিকে নামাও সেই দিকেই রাজি আছি— এখন নামতে পারাটাই কাম্যকর্ম। কিন্তু কই জেলখানার ভিতরের মাঠে লোক কই? খানিকপর সামধ্যায়ী মশাইকে দেখলাম— মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী। বেড়াতে বেড়াতে একটু কাছে আসতেই চিৎকার করে বললাম, নজরুলকে ডেকে দিন। নজরুলকে।

সার্কাসের ক্লাউন হয়ে বসে আছি পাঁচিলের উপর। জেলখানার কয়েদীরা দলে দলে এসে মাঠে জুটতে লাগল বিনা টিকিটে সে সার্কাস দেখবার জন্যে। দু'টি বন্দী যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বল পায়ে টলতে টলতে নজরুলও এগিয়ে আসতে লাগল। বেশি দূর এগুতে পারল না, বসে পড়ল। গলার স্বর অতদূরে পৌঁছুবে না। তাই জোড় হাত করে ইঙ্গিতে অনুরোধ করলাম যেন সে খায়। প্রত্যুত্তরে নজরুলও জোড়হাত করে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল এ অনুরোধ অপাল্য।

এ তো জানা কথা। এখন নামি কি করে? পবিত্র যে ঠিক "ধরো লক্ষ্মণের" মতই অবিকল ব্যবহার করবে এ যেন আশা করেও আশা করিনি। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার চেয়ে পাঁচিলে তুলে কাঁধ সরিয়ে নেওয়া ঢের বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু ভয় নেই। স্টেশনের বাবুরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমার চোদ্দপুরুষের— আদ্য কি করে বলি— শেষ শ্রাদ্ধ করছেন। ধরণী, সিধা হও, বলে পাঁচিল থেকে

পড়লাম লাফ দিয়ে। স্টেশনের মধ্যে আমাকে ধরে নিয়ে গেল, পুলিশের হাতে দেয় আর কি। অনেক কষ্টে বোঝানো হল যে আমি সন্ত্রাসবাদীদের কেউ নই। ছাড়া পেয়ে গেলাম। অবিশ্যি তার পরে পবিত্র আর কাছছাড়া হল না—

'তারপরে নজরুল অনশন ভাঙল তো?'

ভাঙল চল্লিশ দিনের দিন। আর তা শুধু তার মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবীর স্নেহানুরোধে।

নজরুলের বিদ্রোহ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও আত্মভোলা বন্ধুত্বের পরিচয় পেলাম। তারপরে স্বাদ পাব তার দারিদ্র্যজয়ী মুক্ত প্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বহীন বোহিমিয়ানিজম! সবই সেই কল্লোলযুগের লক্ষণ।

কিন্তু তোমরা কে কি করে এলে কল্লোলে'?

নৃপেন হঠাৎ একদিন একটা দীর্ঘ প্রেমপত্র পায়—তুমি এসো, আমার হাতের সঙ্গে হাত মেলাও। এ প্রেমপত্র তাকে কোনো তরুণী লেখেনি, লিখেছে 'কল্লোলের" পরিকল্পক স্বয়ং দীনেশরঞ্জন। "ধূমকেতু"তে ত্রিশূলের লেখায় আকৃষ্ট হয়েই দীনেশরঞ্জন নৃপেনকে সম্ভাষণ করেন— আর, শুধু একটা লেখার জন্যে অনুরোধ নয়,গোটা লোকটাকেই নিমন্ত্রণ করে বসলেন। ভোজ্য সাজাতে, পরিবেশন করতে। নৃপেন চলে এল সেই ডাকে। মুখে সেই মধুর মন্দাক্রান্তা ছন্দ—

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফল দ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ
ত্বয্যারূঢে—শিখরমচলঃ—স্নিগ্ধবেণীস্ববর্ণে।
নূনং যাস্য —ত্যমবমিথুন —-প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ— স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

আর পবিত্র একদিন ফোর আর্টস বা চতুষ্কলা ক্লাবে এসে পড়েছিল ওমরখৈয়ামের কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। পুরানো ঘর ভেঙে যখন ফের নতুন ঘর বাঁধা হল, ছোট করে, বন্ধুতায় ঘন ও দৃঢ় করে, তখনও পবিত্রর ডাক পড়ল। ঘর ছোট কিন্তু চুট খুব উঁচু। সে চূড়া উঁচু আদর্শবাদের।

কান্তিচন্দ্র ঘোষকে দূর থেকে মনে হত সুকৃত্রিম আভিজাত্যের প্রতীক। এক কথায় স্নব। তিনিও নিজেকে dilettante বলতেন। "বিচিত্রা"য় থাকা কালে তার সংস্পর্শে আসি। তখন বুঝতে পারি কত বড় রসিক কত বড বিদগ্ধ মন তাঁর। তিনি "সবুজপত্রের" লোক। তাই সাহিত্যে সব সময নব্যপন্থী, অচলায়তনী নন। রসবোধের গভীরতা থেকে মনে যে স্নিগ্ধ প্রশান্তি আসে তা তাঁর ছিল— সে শান্তির স্বাদ পেয়েছে তাঁর নিকটবর্তীরা।

কিন্তু নজরুল এল কি করে?

পবিত্র যখন জেলে নজরুলকে "বসন্ত" দিতে যায় তখনই নজরুল কথা দেয় নতুন কবিতা লিখবে পবিত্রর ফরমায়েসে। "কল্লোলের" জন্যে কবিতা। লাল কালিতে লেখা কবিতা। জেল থেকে এল একদিন সেই কবিতা— সত্যিসত্যিই লাল কালিতে লেখা — "সৃষ্টি সুখের উল্লাসে"।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি আসল কাঁদন, আসল মুক্তি আসল বাঁধন;
মুখ ফুটে আজ, বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে,
রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে॥

এই কবিতা ছাপা হল "কল্লোলের" প্রথম কি দ্বিতীয় সংখ্যায়। কবিতাটির জন্য পাঁচ টাকা দেওয়া হয়েছিল। জেলে সেই টাকা পবিত্র পৌঁছে দিয়েছিল নজরুলকে।

এমন সময় কল্লোল অফিসে কে আরেকটি যুবক এসে ঢুকল। ছিপছিপে ফর্সা চেহারা, খাড়া নাক, বড় বড় চোখ, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বয়সেই কপালের উপর দু চারটি রেখা বেশ গভীরভাবে ফুটে উঠেছে-। কে এ? এ সুকুমার ভাদুড়ি। একদিন এক গ্রীষ্মের দুপুরে হঠাৎ অনাহূত ভাবে কল্লোল আপিসে চলে আসে। একটা গল্প হয়তো বেরিয়েছিল "কল্লোল" — সেই অধিকারে। এসে নিঃসংকোচে দীনেশ ও গোকুলকে বললে, 'আমি আপনাদের দেখতে এসেছি।' আর ঘরের এক কোণে নিজের জায়গাটি পাকা করে রেখে যাবার সময় বললে, 'আমি কল্লোলের জন্যে কাজ করতে চাই।'

আনন্দের খনি এই সুকুমার ভাদুড়ি। কিন্তু কপালে ঐ দুশ্চিন্তার রেখা কেন? এমন সুন্দর সুকান্ত চেহারা, এমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চক্ষু, কিন্তু বিষাদের প্রলেপ কেন?

নৃপেন বললে, 'এখন এসব থাক। এখন হুগলি চলো।'

বলে, এখন, এতক্ষণে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করলে:

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা
তোমার রীতি সরল অতি নাহি জানো ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা, নাইকো তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ ফাঁসি বলো নাকো মিষ্টভাষ,
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস।

প্রসঙ্গ : নজরুলের সঙ্গীত শিক্ষণের পদ্ধতি

জগৎ ঘটক

কাজি নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর মামলায বাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ থাকার পব বহরমপুর জেল থেকে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরের প্রায শেষের দিকে মুক্ত হন। যেদিন মুক্ত হন সেই দিনই তাঁকে সাংসাবিক কারণে কলকাতা চলে আসতে হয। এর কিছুকাল পরে কবি মার্চ এপ্রিল নাগাদ পুনরায বহরমপু‍র আসেন এবং এই সময়েই বহবমপুববাসী সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয ও নানা স্থলে সম্বর্ধনা সভায যোগদান করেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালযের বি-এ ও বি-এস্-সি পবীক্ষা সবে শেষ হওযায় এই সময়ে পবীক্ষার্থী ছাত্রবর্গেব মাথা থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তারা নানা উৎসবে মেতে উঠলো। কবি নজরুলের সম্বর্ধনার সকল আযোজনও তাবা এইসময়েই কবে।

আমিও ঐসব পরীক্ষার্থীদের অন্যতম। দেশ গোবরডাঙা থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর বহরমপুর কলেজ থেকে আই এ ও বি-এ সাঙ্গ কবি। পরীক্ষার পর অন্যান্য সকলেব সঙ্গে এক সম্বর্ধনা সভায আমিও যোগদান করি। একদিন কলেজেব ১ নং সায়েন্স হোস্টেলের ছাত্ররা সবাই মিলে কবির সম্বর্ধনা সভাব আযোজন কবে। আমি যদিও হস্টেলের মেম্বাব ছিলাম না। (আমাদের বহরমপুরেই বাস ছিল) তবুও সেই সভায যোগদান করতে আমন্ত্রিত হই। সেই অনুষ্ঠানসভায আমি কবিকে প্রথম দেখলাম। অনুষ্ঠান শেষে কবি উপস্থিত অনেকের সাথে আলাপ করলেন। আমাব সঙ্গেও। জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের বাসা কোথায়। বললাম। বাসায় আমরা থাকতাম— মা (সুনীতি দেবী), বাবা (চন্দ্রভূষণ) ও ভাইবোন নিতাই, গৌরী, কেষ্ট এবং শচী— (এর মধ্যে গৌরী ও কেষ্ট এই দুই ভাই বোন কযেক বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছে)। যে সময়ের কথা বলছি সেই সময আমার বাবা কার্যোপলক্ষে বাইরে ছিলেন। কবি বললেন— চল মাকে প্রণাম করে আসি। কবির প্রস্তাবে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল মনের মধ্যে। কবিকে বাসায নিয়ে এলাম। সংগে এলেন আর একজন স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক পবিত্র গাঙ্গুলী। আমাদের বাসায় এসে কবি আমার মাকে (সুনীতি দেবী) মা বলে সম্বোধন করলেন, প্রণাম করলেন। কযেক মিনিটের মধ্যেই জাঁকিয়ে বসে প্রাণ মাতানো গান ধরলেন। এর পর যে কটি দিন বহরমপুরে রইলেন, প্রায় প্রত্যেকদিনই আমাদের বাসায় এলেন; সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তুললেন আর গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে গেলেন।ঐ সময় স্বনামখ্যাত নলিনাক্ষ সান্যালও সঙ্গে এলেন। তাঁর বাড়ি আমাদের বাসার ঠিক সামনেই ছিল। অবশ্য তিনি সদা সর্বদাই আমাদের বাসায় আসতেন।

কবি কোলকাতায় বসবাস শুরু করার অল্প কিছুকাল পরে আমার চাকরির সূত্রে আমরাও কোলকাতায় চলে আসি। ইতিমধ্যে আমরা বহরমপুরের বাসা ছেড়ে দেশের বাড়িতে চলে আসি। কবির পরিবারবর্গের সাথে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ আত্মীযতার পর্যায়ে ঘনীভূত হয়। কবি আমার অগ্রজের

মত, কবিপত্নী আমাদের 'দুলিবৌদি' (কবি পত্নীর ডাকনাম ছিল 'দুলি', আসলে প্রমীলা, কবির দেওয়া) কবির শাশুড়ি গিরিবালা দেবীকে কবির মত আমরাও মাসিমা বলতাম। মাসিমা এবং আমার মা কবিকে নুরু বলতেন। সেইসূত্রে আমরা কবিকে নুরুদা বলতাম। আমার একমাত্র বোন গৌরীকে (অকালে বিধবা ও বর্তমানে স্বর্গতা) মাসিমা আপন সন্তানের মত ভালবাসতেন, অনেক সময়েই কাছে রাখতেন। প্রথমদিকে কবিরা এণ্টালীতে থাকতেন। পরে বেশ কয়েকবার বাসা বদল করেছেন। শিমলার কাঁসারিপাড়ায় নলিনদার বাসার পাশেই সীতানাথ রোডের বাসায়, হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে, শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে ইত্যাদি। আমাদের আসা যাওয়া সবসময়েই ছিল, মাঝে মাঝে একত্রে থাকার স্মৃতিও মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কোলকাতায় কবির গানের বন্ধু অনেক ছিলেন। অন্যতম ছিলেন ৺উমাপদ ভট্টাচার্য। উমাপদবাবু বহরমপুর নিবাসী ছিলেন, পরে কোলকাতায় বাগবাজারে বাসা করেছিলেন। তিনি শুধু সুকণ্ঠ গায়কই ছিলেন না, বহুরকমের সংগীতে অভিজ্ঞ ছিলেন, গানে সুর লাগাতেন বড় চমৎকার মেজাজে। শুনেছি তিনি মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ কাদের বক্স এবং মঞ্জুসাহেবের কাছে তালিম পেয়েছিলেন। কোলকাতায় আসার আগে থেকেই তাঁর কবির সাথে আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়েছিল, কোলকাতায় বাসা নেবার পর তাঁর বাগবাজারের বাসা কবির এক মস্ত গানের আড্ডা হয়ে উঠেছিল। কবি উমাপদবাবুকে অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। ওই গানের আড্ডায় আমিও থাকতাম। উমাপদবাবু কবির গানের এক উৎসাহী সমঝদার ছিলেন, কবির গান তিনি গায়কীর যাদুতে জীবন্ত করে তুলতেন। উমাপদবাবুর গায়কী কবির সদ্য রচিত গানগুলির জৌলুষ বাড়িয়ে দিত, কবি খুব তারিফ করতেন। উমাপদবাবুর গায়ন কৌশল এবং পরামর্শ মত সুরগুলির একটু আধটু সংস্কার করেও নিতেন। এই আড্ডাতেই একদিন কথা উঠল, গানগুলির সুর স্বরলিপিতে বেঁধে ফেলতে হবে। আমি গানগুলি ওঁদের মুখ থেকে শুনে শুনেই শিখে নিতাম। গানের কথাগুলির ওপর সুরের পর্দাগুলি নোট করতাম। তারপর ছক কেটে মাত্রা বিভাগ করে কথা লিখতাম, শেষে স্বরগুলি কথার ওপর বসিয়ে গানের স্বরলিপিটি দাঁড় করাতাম। ঠিক হল কিনা ওঁদের দেখিয়ে নিতাম। উমাপদবাবুর ডাকনাম ছিল ফেণু— আমরা তাঁকে ফেণুদা বলতাম, কবির ইচ্ছা হল, এবার স্বরলিপির বই বের করতে হবে। ১৩৩৮ সনে কালিকা প্রেস থেকে কবির নামেই প্রকাশিত হল 'নজরুল স্বরলিপি'। বইটি কবি উৎসর্গ করলেন উমাপদবাবুকে, একটি সুন্দর কবিতায় উৎসর্গ পত্রটি লিখলেন— তাতে এই লাইনগুলি ছিল :—

কেহত জানেনা, মম গান মম বানী
বন্ধু, তোমার কাছে ঋণী কতখানি!
কত সে হীরক রতন মানিক দানে
সাজায়েছ নিরাভরণা আমার গানে।

কথাগুলি একটুও অতিরঞ্জিত নয়, আমি সামনে বসে দেখেছি, কবির গান ফেণুদার স্পর্শে কত পরিপূর্ণতা লাভ করতো। প্রথম যুগে কবির গান ফেনুদাই সর্বত্র গেয়ে জনপ্রিয় করেছিলেন, তখন একটিও গান রেকর্ড হয় নি। 'নজরুল স্বরলিপি' পুস্তকের 'কৈফিয়ৎ'-এ আমার নাম ছাড়াও কবি উল্লেখ করেছিলেন গোপালচন্দ্র সেন এবং অনিল বাগচীর নাম। কারণ ওঁরাও ফেণুদার বাড়িতে ওই গানের আড্ডায় আসতেন, গান গাইতেন, গল্পগুজব করতেন। স্বরলিপি করার কাজটা অবশ্য আমারই ছিল। পরবর্তীকালে ওইজন্য কবি আমার প্রয়োজন অনুভব করতেন।

'নজরুল স্বরলিপি' প্রকাশের পর নলিনীদা (প্রয়াত নলিনীকান্ত সরকার) কবির ত্রিশটি গানের স্বরলিপি করে 'সুরমুকুর' নামে একটি বই প্রকাশ করেন ১৩৪১ সনের আশ্বিন মাসে। ঠিক তার আগের মাসে আমার করা কবির গানের স্বরলিপি পুস্তক 'সুরলিপি' প্রকাশিত হয় গুরুদাস লাইব্রেরী

থেকে। ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে 'সুরলিপির' প্রথম সংস্করণ আছে। পরে ডি, এম. লাইব্রেরী স্বরলিপি পুস্তকগুলির স্বত্ব কিনে নিয়ে পরবর্তী সংস্কারগুলি বের করেন। 'নজরুল স্বরলিপি'তে কিছু ছাপার ভুল এবং ত্রুটি ছিল। একদিন গোপালদাকে (ডি.এম.এর স্বত্বাধিকারী ৺গোপালদাস মজুমদার) কথাটা বলি। তখন বোধ হয় পঞ্চম সংস্করণ চলছে। দুফর্মা ছাপা তখন হয়ে গেছে। পরের ফর্মাগুলি তখন তিনি সংশোধন করে দিতে আমায় অনুরোধ করেন, আমিও ঠিক করে দিয়েছি। 'সুরলিপি' ছাপায় মোটামুটি ঠিকই আছে। কবি 'সুরলিপি' উৎসর্গ করেছিলেন গোপালচন্দ্র সেনকে। তাঁর প্রতি কবির একটু বিশেষ রকম স্নেহ ছিল, কারণ তিনি অন্ধগায়ক ছিলেন এবং সুকণ্ঠ ছিলেন। নজরুল গীতি তিনি ভাল গাইতেন। 'সুরলিপিতে' কবি আমার স্বরলিপি করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আরেকটি কথা লিখেছিলেন যেটা আজকের দিনে খুবই প্রাসংগিক— "সুরলিপি অন্ততঃ তাঁদের আনন্দ দান করবে যাঁরা স্বরলিপি দেখে গানের নির্ভুল সুর শিখতে চান"। আজ অধিকাংশ গায়ক গায়িকা নির্ভুল সুরের তোয়াক্কা করছেন না বলেই কবি কি লিখে গেছেন সেটির উল্লেখ করলাম।

সুরলিপির পর অনেকদিন আমার আর কোনো স্বরলিপিই বই বের করা হয়ে ওঠেনি। তার মানে এই নয় যে কবির গান লেখা বন্ধ হয়েছিল বা আমার সাথে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল। কবির সংগীতসৃষ্টির পরিধি ক্রমশঃ বাড়ছিল গ্রামোফোন রেকর্ড, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির মধ্যে কবি জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমার ভাই নিতাইকেও কবি সহকারী হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। স্বরলিপি করার জন্য আমাকে নিয়েও বসতেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গীত বিভাগের ভার আমার ওপর প্রায় দশ বারো বছর ছিল। বহু স্বরলিপি আসতো প্রকাশ করার জন্য। সেগুলি আমি বাছাই করে ছাপতে দিতাম। এই সময়ে কবির গানও স্বরলিপি সমেত ভারতবর্ষে অনেকগুলি ছাপিয়েছি। ভারতবর্ষ ছাড়াও কবির গানের স্বরলিপি আমি 'সংগীত বিজ্ঞান', 'নবারুণ', 'পাঠশালা', 'চিত্রালী' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশ করেছি। ৺রামেন্দু দত্ত আমাকে তাঁর গানের স্বরলিপি করার জন্য ধরলেন। তাঁর গানের স্বরলিপিও করেছিলাম — 'নবমঞ্জরী' নাম দিয়ে সে বই বেরিয়ে ছিল। রামেন্দুবাবু ছাড়াও ৺হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের কিছু গানের স্বরলিপি তাঁর বইয়ের জন্য আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলাম। ৺অজয় ভট্টাচার্য্য তাঁর গানের কতকগুলি 'ভারতবর্ষ' স্বরলিপির সঙ্গে ছাপাবার জন্য অনুরোধ করেন। অজয় ভট্টাচার্য একবার আমাকে শচীন দেব বর্মনের অনুরোধে তাঁর কাছে নিয়ে যান ও সদ্য লেখা একটা গানের — "ফুলের বনে থাক ভ্রমর ফুলের মধু খাও"— স্বরলিপি করিয়ে নিয়ে পরের মাসে ভারতবর্ষে ছাপিয়ে নেন। ভারতবর্ষে কবির একটি গজল ছাপাবার সময় ফুটনোটে লিখেছিলাম "শেয়র অংশে সুর একটু টানিয়া টানিয়া গাহিতে হইবে। ছাপার ভুলে সুর 'নূর' ছাপা হয়ে গিয়েছিল। দেখে কবির কি হাসি। সকলকে ডেকে ডেকে বললেন— "দ্যাখো, দ্যাখো, জগৎ আমার দাড়িতে নূর বসিয়ে কেমন টানছে সবাই দ্যাখো।' সকলে হেসে উঠলো কবির রসিকতায়।

কবির রসিকতা সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। সীতানাথ রোডের বাসায় একদিন রাত দশটা নাগাদ সবাই কাজকর্ম সেরে বাড়ির ছোট্ট বারান্দায় এসে মজলিস সুরু করেছি। সবে একটু কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছে এমন সময় রাস্তার ওদিককার বস্তিতে 'ছ্যাঁচাবেড়ার ঘরে কে একজন উৎকট হেঁড়ে গলায় এক বেসুরো হারমোনিয়ম বাজিয়ে তারস্বরে সংগীত চর্চা সুরু করল— সা রে গা মা। যেমনি বেসুরো গলা, তেমনি কর্কশ আওয়াজ। এই কালোয়াতের সংগীতচর্চা সেই রাতেই প্রথম নয়, প্রায় রাতেই শোনা যাচ্ছিল। কবি বারান্দায় বসে ঐ উৎকট সংগীতচর্চা কয়েক মিনিট সহ্য করলেন। তারপর— কুশা (চাকর) কুশা, বলে হাঁক দিলেন। কুশা আসতেই বল্লেন, হারমোনিয়ামটা এখানে নিয়ে আয় তো। হারমোনিয়ম এল। কবি গুণ গুণ করে হারমোনিয়ম বাজিয়ে একটা গান লিখে ফেল্লেন। তারপর জোর গলায় গানটা ধরলেন—

রামছাগী গায় চতুরঙ্গ বেড়ার ধারে,
গাইয়ে ষাঁড় সাথে বাছুর হাম্বা রবে—
ভীষণ নাদ ছাড়ে
ফেটে বুঝি গেল কান, প্রাণে মারে।

বেড়ার ধারে সেই ঘর থেকে স্বরসাধনা থেমে গেল। শুধু সেই রাতের জন্যই নয়, বরাবরের মত।

কবির রচনা কি শুধু নিভৃতে বসে হ'তো? না, তা নয়। তিনি যখন তখন লিখে যেতে পারতেন, তা সকলের উপস্থিতিতেই হোক বা নির্জনই হোক। লিখতে শুরু করলে তাঁর ভাবের অভাব হ'ত না। সৃষ্টি প্রতিভায় তিনি এতই উজ্জ্বল ছিলেন যে গান বাঁধবার জন্য তাঁর কোনো নির্দিষ্ট অভ্যাস বা পরিবেশ প্রয়োজনীয় ছিল না। দেখেছি, গ্রামোফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে অনেকের উপস্থিতির মধ্যে অনায়াসেই নানা রকমের গান বাঁধছেন আবার রাতে নিজের বাসায় নির্জনতা বেছে নিয়ে আপনমনে সংগীত রচনা করছেন। কবির সম্পর্কে অনেকেই একটা ভুল ধারণা পোষণ করেছেন। কবি যেন আড্ডা আর মজলিশের মধ্যেই গানের জন্ম দিয়ে ক্ষান্ত হতেন, সংগীত সম্পর্কে তাঁর কোনো নিভৃত চিন্তা বা নেপথ্য প্রস্তুতি যেন কিছুই ছিল না। কবিকে আমি তন্ময় হয়ে সংগীতগ্রন্থ পাঠ করতে দেখেছি, দেখেছি নির্জন পরিবেশে মনের মত সুর উদ্ভাবনের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, দেখেছি আহার নিদ্রা বিশ্রাম ভুলে সংগীতের ধ্যানে মগ্ন অবস্থা। একদিন শুধু নয়, দিনের পর দিন। এও দেখেছি, ভীড়ের মধ্যে বসে সেসব গান অনেক গভীরভাব স্বাদ বহন করত এবং কবির নিজের কাছে বেশ তৃপ্তিকর হ'তো। তাই পরবর্তীকালে যেসব গান তিনি মনের মত করে লিখতে চেয়েছিলেন, সেগুলি হয় গভীর রাতে অথবা সকলের নির্জন পরিবেশে লিখতে চাইতেন। এবং সেইজন্য তিনি আমার বাসায় স্থান বেছে নিয়েছিলেন। আমার বাসায় আরও একটা সুবিধা বুঝেছিলেন যে ভাল সুর রচনা করার সংগে সংগে স্বরলিপিতে বেঁধে ফেললে সুরের এদিক ওদিক হবার আশংকা থাকবে না। তাই আমাকে নিয়ে তিনি বসতেন, কথার ওপর স্বরগুলি নোট করিয়ে নিতেন, গানগুলি গেয়ে গেয়ে সুরের ভাজটি ঠিক করে নিতেন। গানের কথাগুলি মাত্রার ছকে সাজিয়ে আমি দেখে নিতাম তালের সীমা। মাত্রা কম হলে বা বেশী হলে আমি বলতাম কবি সুর ছোট বড় করে ঠিক করে নিতেন। লয়জ্ঞান কবির অদ্ভুত রকম পাকা ছিল। ছন্দের তো কথাই নেই। তাই তালে ভেড়াতে কবির একটু অসুবিধা হ'ত না। কবির গান শুনে শুনে আমি কবির সুর সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা করতে পারতাম, কম্পন, স্পর্শকার, মীড় প্রভৃতি কারুকার্য্যের ইংগিতগুলি সহজেই ধরতে পারতাম। স্বরলিপির ভাষা খুব জটিল হলেও চলে না। আবার সূক্ষ্ম ইংগিতগুলি বাদ দেওয়াও চলে না— এইরকম ছিল কবির মত। আমার করা স্বরলিপি দেখে কবি সন্তুষ্টই হতেন। শুধু তাই নয়, ওই স্বরলিপি দেখে 'হারামণি', এবং 'নবরাগ' পর্যায়ের গানগুলি রেডিওতে গাইতেন, যাতে সুর একটুও এদিক ওদিক না হয়।

অপ্রচলিত এবং নতুন রাগের গান বাঁধবার ইচ্ছা কবির মনে বাসা বাঁধে ত্রিশের দশকের শেষ দিকে। গ্রামোফোনের জন্য ব্যবসাদারী গান লিখে তিনি আর তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। ঠিক করলেন, যে সব রাগ রাগিনী ওস্তাদরা হাতছাড়া করেন না, কোন জায়গায় কেউ গেয়েও শোনান না, সেইরকম রাগগুলি অবলম্বনে বাংলা গান রচনা করে ওইসব সুর সহজলভ্য করতে হবে। উচ্চাংগ সঙ্গীতের একটি বই করতে হবে, তাতে স্বল্প প্রচলিত রাগ রাগিনী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় এবং স্বরলিপি সহ বাংলা গান থাকবে। রাগ রাগিনীর একটা লিষ্ট তৈরী হয়েছিল। নানা সংগীতগ্রন্থ থেকে নোট লেখা হয়েছিল, নানারকম মতামত বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য নির্দেশ খুঁজে বার করা হয়েছিল। কবি সমসাময়িক নানা ওস্তাদের সঙ্গলাভ করেও অনেক চিজ্ সংগ্রহ করতেন, প্রখর স্মৃতিশক্তিতে রাগের চলন মনে মনে ধরে রাখতেন। বেশ কিছু অপ্রচলিত রাগের বাংলা গান কবি তৈরী করে ফেললেন। আবার

নতুন রাগের লিষ্ট হল। এই সময় কবি প্রত্যহ আমাদের বাসায় এসে সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত অপরিসীম নিষ্ঠায় সংগীত গবেষণায় নিযুক্ত থাকতেন। আমাকেও সংগে নিয়ে বসতেন। মাঝে মাঝে সুরেশদা আসতেন (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী), কবির সাথে তাত্ত্বিক আলোচনা করতেন, নতুন রাগ সৃষ্টি এবং রাগ মিশ্রণ সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি করতেন। এই সময় কবি নবাব আলি চৌধুরীর একটি উর্দু বই 'মআরিফুন্নাঘমাউ' খুব ব্যবহার করতেন। বইটি শতচ্ছিন্ন ছিল, কোথা থেকে জোগাড় করেছিলেন জানি না, আঠা দিয়ে যত্ন করে জুড়ে ব্যবহার করেছিলেন। কবি ফার্সী সংগীতগ্রন্থও সংগ্রহ করেছিলেন— আমির খসরুর লেখা প্রাচীন বই। ভাতখণ্ডের বই তো ছিলই, আরো অনেক বই ছিল। প্রত্যেকটি বই তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন, দাগ দিতেন, পাশে নোট লিখতেন। অনেকেই জানেন না, সংগীতশাস্ত্র ঘেঁটে ঘেঁটে কবি কি বিপুল সংগীত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সুরেশদা কবিকে ভৈরব রাগের প্রচলিত রূপ এড়িয়ে নতুন সুরের রূপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন। কবি সেই নিয়ে মেতে উঠলেন, এমনকি ঘুমের মধ্যেও রাগ রাগিনীর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, নতুন ভৈরব রাগের উদ্ভাবন— অরুণ ভৈরব, উদাসী ভৈরব, রুদ্র ভৈরব ইত্যাদি। 'উদাসী ভৈরব' নামে একটি নাটিকা আমাকে দিয়ে লেখালেন। তাতে তাঁর ছয়টি নতুন ভৈরব ও ভৈরবী অঙ্গের উদ্ভাবিত রাগের গান যোগ করে একটি চমৎকার গীতিনাট্য হল। সঙ্গে সঙ্গে গানগুলির স্বরলিপিও করে ফেললাম, 'উদাসী ভৈরব' বেতারে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। শিব ও সতীর ভূমিকায় কণ্ঠ দিয়েছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ও ইলা ঘোষ। গানগুলি কে কে গেয়েছিলেন ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তবে সেই দিনটির কথা এখনও ভুলিনি। দিনটি হল ১৯৪০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি। কবি আমার সেই বাঁধানো বড় খাতাটি নিয়ে রেডিওতে গান গাইলেন স্বরলিপি সামনে খুলে। তারপরে সে খাতা যে কোথায় অদৃশ্য হল আজও জানা যায় নি। কবি সেদিন রেডিও অফিসে কোথায় কোথায় বসেছিলেন, কে কে ছিলেন, কার কার বাড়ি গেলেন ও খোঁজ করলেন সবই বল্লেন। কিন্তু খাতাটি যে কেমন করে বা ঠিক কখন তাঁর কাছছাড়া হল সেটা বলতে পারলেন না। দুঃখে কবি কয়েকদিন শয্যা নিয়েছিলেন। আমার অবস্থাও তদ্রূপ। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ হল, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল — সব বৃথা। সেই থেকে অপ্রচলিত রাগের গান বাঁধার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। স্বরলিপি করারও কোনো তাগিদ রইল না। দুলিবৌদির অসুখ তখন খুবই বেড়ে গেছে, নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে। নিরাময়ের সব চেষ্টা বিফল হচ্ছে, কবির আর্থিক অবস্থাও বিপর্যস্ত। সব মিলিয়ে কবি যেন কেমন হয়ে যেতে লাগলেন।

'নবরাগ' ও 'বেণুকা' নামে দুটি স্বরলিপি গ্রন্থ আমি ১৩৭৫ ও ১৩৭৭ সালে প্রকাশ করেছি। স্বরলিপিগুলি কবির সামনে বসে করা ছিল, কিছু ছিল আমার কাগজপত্রে, কিছু ছিল পত্রপত্রিকায় ছড়ানো। বইদুটি প্রকাশক (হরফ) আর নাকি ছাপাচ্ছেন না, একশো গানের স্বরলিপির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কবির ঈপ্সিত উচ্চাংগ সংগীতের পৃথক বই আর তোলো না।

এখন আমার গলা দিয়ে দু চারটে কথাই বেরোয, গান আর বেরোয না। আগে গাইতে পারতাম। ফেণুদা আমাকে 'বাসন্তী বিদ্যাবীথিতে' নজরুল গীতির শিক্ষক হিসাবে যুক্ত করেছিলেন। তখন 'নজরুল গীতি'কথাটি চালু হয়নি। ফেণুদা ৮৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি'র ভাড়া নেওয়া বাড়িতে সপরিবারে উঠে এসেছিলেন। আমরাও এসেছিলাম। কবি এখানে প্রায় রোজই আসতেন। আমার কাছে গান বাঁধতে ও স্বরলিপি করিয়ে নিতে। এই বিদ্যালয়ে কবির গান আমি অনেককে শিখিয়েছি। এই মুহূর্তে একজনের নাম মনে পড়েছে— সুপ্রীতি ঘোষ। কবির গান রেকর্ড করেছিল। কবির নিজের কণ্ঠেও বেশী রেকর্ড হয়নি। ফেণুদার অনেক রেকর্ড ছিল— সেনোলা কোম্পানীর ফেণুদা অসুস্থ হয়ে অকালে চোখ বুজলেন, যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৭ সালে। ফেণুদার স্ত্রী প্রবন্ধ, কণ্ঠ গায়ত্রী বৌদি, বহরমপুরে শ্বশুরালয়ে ফিরে গিয়ে সেখানে বাস করছেন।

আমি প্রায় আঠারো বছর ধরে নজরুল গীতি শুনেছি স্বয়ং নজরুলেরই কণ্ঠে। কবির সমসাময়িক

কালের প্রায় সব যশস্বী শিল্পীদের গানও শুনেছি। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখেছি নজরুলগীতির কেমন সব বিধিবহির্ভূত গায়নপদ্ধতি গজিয়ে উঠেছে। সে ঢং নেই, প্রাণের স্পর্শ নেই, যার যেরকম খুশি সে সেইরকম নজরুলগীতি বানিযে নিচ্ছে। যেসব গানের সুর হাতের কাছে পাচ্ছে না তাতে নিজের সুর লাগিয়ে কেউ কেউ গাইছেন, শেখাচ্ছেন, সেই সবই টেপ হচ্ছে, রেকর্ড হচ্ছে, প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। আজকালকার গান গাইবার ষ্টাইল নাকি আলাদা-— কবির ষ্টাইল, কবির দেওয়া সুর, কবির শেখানো গায়নভঙ্গি আজকে নাকি অচল! এই অবস্থায় কাকে কি বলব? নজরুল গীতির স্বকীয়তা— বাংলা গানের একটা বিরাট ঐতিহ্য— বাঙালী গায়করা ধ্বংস করতে লেগেছে। তার ফল বাঙ্গালীরাই একদিন ভোগ করবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বেচ্ছাচারিতা একটা বোর্ডের মাধ্যমে অনেকটা তবু রোধ করা হয়েছে। নজরুলগীতির সেরকম কিছু আজও হয়নি। আজকের সংগীতশিল্পীদের এই কথাটি জানাবার অধিকার আমার আছে— কবি তাঁর গানের সুর এদিক ওদিক করা একটুও পছন্দ করতেন না। কবি একথাও বলেছেন যে, আমাব সুব যদি পছন্দ না হয তবে তোমরা আমার গান গেয়োনা। কবি লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর গান নিযে কেউ কেউ কেরামতি করছেন, তাঁদের দু-একজনকে সাবধান করেও দিয়েছিলেন। সৌজন্যবশতঃ তাঁদের নাম উল্লেখ করছি না। গানটি কোন্ চালের— সেটা বুঝে সেইমত গায়কী লাগানো কবি পছন্দ করতেন কিন্তু গায়কীর আতিশয্যে মুল সুর ও গানের ভাব ক্ষুন্ন করা তিনি কখনই চাইতেন না। সুরের বিকৃতি তো নয়ই। রেকর্ড করানোর জন্য তাঁর কিছু কিছু গানে ধীরেন দাস, কমল দাশগুপ্ত প্রমুখ সুরকারগণ সুর দিয়েছেন। তাঁরা কবির সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের স্বাধীন ভাবে সুরারোপ করতে কবি গান লিখে দিয়েছিলেন। তাঁদেরও কবি প্রদত্ত সুর বদল করার অধিকার ছিল না।

আজকাল বাজারে অনেক স্বরলিপির বই বেরিযেছে। তার মধ্যে অনেক ভুল আমার নজরে পড়েছে। ভুল শুধু ছাপার নয— সুরের ভুল। আমার করা স্বরলিপি সবই কবির সামনে বসে করা এবং কবিব দেখে যাওয়া। কবির অবর্তমানে যেসব স্বরলিপি হয়েছে সেগুলি বাছ বিচার দরকার। শিক্ষার্থীরা রেকর্ডের মাধ্যমে তা অনেক ভুল শিখছে, স্বরলিপির মাধ্যমেও যদি ভুল শেখে তবে নজরুলগীতির ভবিষ্যৎ বলতে আর কিছুই থাকবে না। এখনও কয়েকজন আছেন যাঁরা নজরুল গীতির অবিকৃত রূপটি জানেন। আবার এও দেখেছি— নিজেদের স্বেচ্ছাচার কাজীদা শিখিয়েছিলেন বলে চালানোর চেষ্টা হয়। আসলে কবির সব গান কেউই শেখেননি কবির কাছে। কিছু কিছু শিখেছিলেন রেকর্ড করার জন্য। বাকি সবই অন্যের কণ্ঠে শোনা। তাও অনেক বছর আগে। এখন ঝুলি থেকে বের করলে কিছু বিস্মৃতির ধুলো তো তাতে লেগে থাকবেই।

অনেকের মত আমিও ইতিপূর্বে প্রস্তাব করেছি নজরুলগীতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য একটি পরিষদ বা বোর্ড হোক। তাতে বিকৃতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ থাকবে, কবির গানগুলি এতটা বিশৃংখলার দিকে যেতে পারবে না। বোর্ড মানে কযেকজন মাতব্বর নয। বোর্ড মাধ্যমে অবিকৃত নজরুলগীতির এক প্রামাণিক সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে হবে, সেখানে অবিকৃত নজরুলগীতির স্বরলিপি থাকবে, বাজারে চলতি ভুল স্বরলিপির সংশোধন থাকবে আর থাকবে সঠিক সুর ও ঢঙে গাওয়া গানগুলির নমুনা— ডিস্কেই হোক বা টেপেই হোক। এই কাজ হলে রেকর্ড কোম্পানী, শিক্ষায়তন, বেতার কেন্দ্র, দূরদর্শন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধি ও সহায়তায় নজরুলগীতি গাইবার একটি আচরণবিধি চালু করতে হবে। কাজটা এখন খুবই কঠিন তবে একেবারে অসম্ভব বলে মনে হয় না।

.গান খাব

ল, নানার

চট্টগ্রামে নজরুল

শামসুন নাহার মাহমুদ

প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মাঝখানে একটা যুগ; বেশিদিন নয়, বছর কুড়ি-পঁচিশ। বাংলার মুসলমানের জাতীয় জীবনে এটা একটা বিশেষ স্মরণীয় যুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে জাতির জীবনে যে ক্ষীণ চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, এ যুগে তা যেন হঠাৎ জোয়ারের মত ভেঙে পড়ল। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে আশ্রয় করেই মূর্ত্ত এসেছিল এই জোয়ার। নজরুলের আবির্ভাব অস্বাভাবিক না হলেও অত্যন্ত আকস্মিক তাঁর আগুন ঝরা লেখা হঠাৎ চমক লাগালো বাঙালি পাঠক সমাজের মনে।

যুদ্ধ-ফেরতা নজরুলের যখন প্রথম আবির্ভাব হল কলকাতায়, আমার স্বামী ঐ সময় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তখনকার কথা পরে তাঁর মুখে যেমন গল্প শুনেছি, ঠিক তেমনি বলছি। তিনি বলেছেন— 'মেডিক্যাল কলেজের সামনে ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার আপিসে একটি রিডিং রুম ছিল। আমি সেখানে গিয়ে প্রায়ই পড়াশোনা করতাম। একদিন অভ্যাসমত রিডিং রুমে বসে পড়ছি। লোকজন বেশী নেই, শুধু ভেতরের ঘরে বসে আছেন সাহিত্য সমিতির সেক্রেটারী, আরও জন দুই লোক। এমন সময় সৈনিক কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম ঝড়ের মত এসে ঢুকলেন সেখানে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব অনুভূত হচ্ছে তার আগে থেকেই, ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই হাসি ও গল্পের তোড়ে ছোট্ট আপিসখানা কাঁপিয়ে তুললেন তিনি।

আমার আর পড়াশোনা হল না সেদিন। চুপচাপ একপাশে বসে দেখছি। তারপর তিনি আরম্ভ করলেন কবিতা আবৃত্তি। বোঝা গেল, তিনি নতুন কবিতা লিখেছেন, আর তাই সাহিত্যিক বন্ধুদের শোনাবার জন্যে ছুটে এসেছেন। তিনি আবৃত্তি ক'রে চললেন:

'বল বীর
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।'

নতুন লেখা 'বিদ্রোহী' কবিতাখানি একটানা সম্পূর্ণ আবৃত্তি ক'রে তিনি থামলেন। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবছি, কি অদ্ভুত লোক, কি অভিনব কবিতা, আর কি চমৎকার আবৃত্তির ভঙ্গী। কিছুদিন পরে দেখলাম, যে কবিতাটি আমি বঙ্গীয় মুসলমান পত্রিকার আপিসে বসে অবাক হয়ে শুনেছিলাম— সেই 'বিদ্রোহী' কবিতা সারা বাংলাদেশে এক মহা তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।'....

এল অসহযোগ আন্দোলন। আজাদীর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিদ্রোহী নজরুল। প্রবন্ধ, কবিতা, গান ও বক্তৃতার ভেতর দিয়ে তিনি পরাধীনতার মর্মজ্বালা ছড়ালেন দেশময়। শুধু তাই নয়। তিনি এগিয়ে এলেন পুরোভাগে, পরলেন শৃঙ্খল। বিদেশী শাসনের আইন অমান্য করে কয়েকবার তিনি

কারাবরণ করলেন। সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে বললেন:

'তোদের চক্ষু যতই রক্ত হবে,
মোদের চক্ষু ততই ফুটবে।...'

এইভাবে কয়েদখানার আবহাওয়াকে কি করে তাঁরা উতরোল করে তুলতেন, অতিষ্ঠ করে তুলতেন জেল কর্তৃপক্ষকে— এসব গল্প আমরা নজরুলের নিজের মুখে শুনেছি। তাঁর চট্টগ্রাম সফরের কথা বলছি। দাদা চট্টগ্রামের ছাত্রদলকে, তরুণ সমাজকে মাতিয়ে তুললেন, 'নজরুলকে চট্টগ্রামে আনা চাই।' ফলে ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ এই বছর তিনেকের মধ্যে নজরুলকে দু'বার আমরা চট্টগ্রামে পেয়েছিলাম আমাদের বাড়িতে।

আমাদের দাওয়াত তিনি কবুল করেছিলেন খুশি হয়ে। যে ডাক প্রাণের ডাক, সে ডাকে তাঁর স্নেহ-কাঙাল মন সাড়া দিয়েছে চিরকালই। তাছাড়া অলক্ষ্যে চট্টগ্রামের নদীগিরিবন যে দাওয়াত পাঠিয়েছিল তাও বড় কম লোভনীয় ছিল না তাঁর কবি-চিত্তের কাছে। কবির থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। এ ব্যাপারে আমার আম্মা ও নানীআম্মার আগ্রহও বড় কম ছিল না।

যে ক'দিন তিনি ছিলেন, শুধু চট্টগ্রাম শহরটাই যে সভা-সমিতিতে বক্তৃতায়, গানে, আবৃত্তিতে গুলজার হয়ে থাকত তা' নয়, চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রকৃতি, চট্টগ্রামের নদীগিরিবন সমুদ্র পর্যন্ত যেন উতরোল হয়ে উঠত; এমনি ছিল নজরুলের প্রাণের প্রাচুর্য।

বাইরে যেমন সভা-সমিতিতে, বক্তৃতায়, গানে মেতে থাকতেন – অথবা পাহাড়ে, ঝর্ণায়, নদীতে, সমুদ্রে আনন্দ লুটে বেড়াতেন— তেমনি বাড়িতেও চলত অবিরাম হাসি, গল্প, গান ও পানের মজলিস। সকাল থেকে শুরু করে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ফাঁক পড়েনি কখনো এক মুহূর্ত। তিনি বলতেন, 'থাকি আমি পানবাগানে, পান বা গান দু'য়ের এক আমার চাই-ই।' কলকাতার পানবাগান লেনে তাঁর বাস ছিল তখন, তারই উল্লেখ করে এই রহস্য।

নজরুল নদী-ভ্রমণে ও সমুদ্র-বিহারে ফরমাশ করে মাঝিদের কণ্ঠে সাম্পানের গান শুনে যেতেন অজস্র। আবার অন্যদিকে বাড়ি ফিরে রচনা করে চলতেন নিজেও। নিজেই সুর দিয়ে তিনি গাইতেন স্বরচিত সাম্পানের গান, তখন গানের আসরে শ্রোতাদের উৎসাহের সীমা থাকত না।

কবির অনুরোধে কখনো কখনো আমার দাদুর ঝুলি ঝেড়ে কিছু কিছু প্রচলিত গান উদ্ধার করে কবির দরবারে পৌঁছে দিতাম। কাজ-কারবার উপলক্ষে চট্টগ্রামের বহুলোক হরদম আকিয়াবে-রেঙ্গুনে গিয়ে বসবাস করেছে বরাবর। দাদুর কাছ থেকে পাওয়া এই গানগুলোর মধ্যে বর্মী মেয়েদের সঙ্গে তাদের প্রেমলীলার রসাল বর্ণনা কবি খুব উপভোগ করতেন। যেমন —

'রেঙ্গুনের বর্মা মাইয়া বড় যাদু জানে
খোঁপার উপর পানের খিলি ইশারাতে আনে।'

'রেঙ্গুনের বর্মা মাইয়া বড় যাদুগীর
টাকা পইসা খাইয়া মোরে বানাইল ফকির।'

নজরুলকে সাধারণত নিজের রচিত গান ছাড়া অন্য গান গাইতে শুনিনি। গান গাইতে গিয়ে তিনি বলতেন, 'ফরমাশ কর কি গান গাইব। শ্রোতাদের তরফ থেকে যদি ফরমাশ না আসে তবে জমে না গানের মজলিস।' একই বৈঠকে তিনি অবিরাম গানের পর গান গেয়ে যেতেন। প্রথমবার বেশির ভাগই তাঁর উদ্দীপনামূলক ও বিপ্লবাত্মক গান এবং সাম্যের গান গাইতে শুনেছি তাঁকে।

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল্
নিম্নে উতলা ধরণীতল্
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।

চাষী গান—

ওঠরে চাষী জগৎবাসী ধর কষে লাঙ্গল
আমরা মরতে আছি, ভাল করেই মরব এবার চল।

ধীবরের গান—

আমরা দাঁড়েব ঘায়ে পায়ের তলে
জলতরঙ্গ বাজাই জলে রে।

ছাত্রদলের গান —

আমরা ছাত্রদল
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।

কারার ঐ লৌহ কবাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।

আরও তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গান—

দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।
যাত্রীরা তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।

এ গান পরে নানান জায়গায় নানান গায়কের কণ্ঠেও বারে বারে শুনেছি, আজও শুনি। কিন্তু গানের চরণে চরণে ফূর্তি আনন্দের প্রতীক নজরুলের কণ্ঠে যে বুক-ফাটা কান্না ঝরে ঝরে পড়ত, তাঁর চোখে-মুখে উঠত যে তীব্র বেদনার ছাপ, তা' আর কোথাও শুনেছি বা দেখেছি বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি, নিজের লেখা নাটকের ভূমিকায় দেখেছি তাঁকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির রঙ্গমঞ্চে, সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশাল জনসমাবেশে এবং কলিকাতা টাউন হলে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা করেছেন দেখেছি। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় পরিবার-পরিজনবর্গের মাঝখানে 'উত্তরায়ণে'র কক্ষেও তাঁকে দেখবার সুযোগ হয়েছে। তিনি কবি— তাঁর চলা, তাঁর বলা সব কিছুতেই ঝংকৃত হয়েছে যেন সুর ও ছন্দ। কিন্তু নজরুলের মধ্যে দেখেছি যে তেজ, তাঁর গান, আবৃত্তি, বক্তৃতায় ঝরেছে যে আগুন— তা' আর কোথাও দেখিনি। একটি মৃতপ্রায় জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য এই জিনিসটারই বুঝি দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি।

"অগ্নিবীণা", "বিষের বাঁশী" প্রভৃতি কাব্যের গান ও কবিতা সেকালে দেখতে দেখতে দেশময়

ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের মুক্তি-আন্দোলন একটা প্রেরণার উৎস সৃষ্টি করেছিল নজরুলের সাহিত্য ও জীবন।

নজরুলের অল্প কয়েক বছরের কবিজীবন। শেষের দিকে সেই আবেগ ও উন্মাদনা অনেকটা স্থিতিলাভ করল। এই সময় গান ছাড়া তিনি আর উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করেননি। গান তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য। তার মধ্যে বহু গান সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবার দাবি রাখে। তাঁর প্রথমবার চট্টগ্রাম অবস্থানকালে যেমন তিনি আসর জমাতেন স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমমূলক গান দিয়ে, তেমনি দ্বিতীয়বার শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করতেন গজলের সুরে সুরে। ঘন্টার পর ঘন্টা স্বরচিত গজল গানের আনন্দ ও বেদনা ঝরে পড়ত কবির কণ্ঠে।

'কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে'
'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল'
'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী'
'করুণ কেন অরুণ আঁখি লাওগো সাকী, লাও শরাব'

এসব গজলের সুরের মূর্ছনায় ভরপুর হয়ে তাকত আমাদের বৈঠকখানার মজলিস।

তাঁর গজলগান সেকালে জনসাধারণের মধ্যেও অসম্ভব সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর গজলের সুর সেকালে বাংলাদেশের যেখানে-সেখানে চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁয় শোনা যেত,— পথেপ্রান্তরে ধ্বনিত হত রাখাল বালকের, কুলি-মজুর, গাড়োয়ানের কণ্ঠে কণ্ঠে।...

নজরুলকাব্যের একটা শ্রেষ্ঠ অংশ রচিত হয় চট্টগ্রামে। প্রথমবার চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরে আসবার পর তিনি আমায় লিখেছিলেন— 'কারুর বলা যদি আনন্দ দেয়, তবে সেই আনন্দের বেগে সৃষ্টি হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে। তোমরা আমায় বলেছ লিখতে-সে বলা আমায় আনন্দ দিয়েছে, তাই সৃষ্টির বেদনাও জেগেছে, অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে, শিশিরের ছোঁয়ায় আমার মনের কুঁড়ি বিকচ হয়ে উঠেছে।'

আমরা পরম উৎসাহে মোটা বাঁধানো খাতা, কালি, কলম, পেন্সিল কবির ঘরে সাজিয়ে রেখে দিতাম। সারাদিন অবিশ্রাম কোলাহলের পর তখনো পর্যন্ত আসল জিনিসটাই বাকি। মধ্যরাত্রে যখন সমস্ত কলরব থেমে যেত, প্রকৃতি হয়ে যেত নিস্তব্ধ, তখন কবি মনের গহনে ডুবে যেতেন- — শতধারে উৎসারিত হত তাঁর কবিত্বের উৎস। তাঁর এই সময়ে লেখা 'স্তব্ধ রাতে' কবিতায় তিনি নিজেই বলেছেন :

'থেমে গেছে রজনীর গীত কোলাহল,
ওরে মোর সাথী আঁখিজল
এইবার তুই নেমে আয়
অতন্দ্র এ নয়নপাতায়।'

এবার সারা রাত ধরে চলত অঝোরে কবিতা রচনা। আমাদের কৌতূহল উপচে পড়ত ; সকালে উঠেই প্রথম কাজ হত, আজ কি কবিতা লেখা হল, কতখানি লেখা হল দেখা। অধীর আগ্রহে পড়ে যেতাম—

'হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী
হে অতৃপ্ত, রহি রহি কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায় ?
কি কথা শুনিতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে নীলা, নিম্নে বেলাভূমি।'

রাজনৈতিক আন্দোলনের হট্টগোলের মাঝখানে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রচারের উত্তেজনার ভেতরে একই সময় পাশাপাশি বিশ্বপ্রকৃতি কি করে তাঁকে হাতছানি দিত, তা আমরা চোখে দেখেছি। সারাদিন

সভা-সমিতি, বক্তৃতা, মজলিস নিয়ে ব্যস্ত থাকবার পর রাত্রির অন্ধকারে প্রকৃতি তার রূপের ঐশ্বর্য মেলে ধরত তাঁর কাছে, চট্টগ্রামের গিরিনদীবন তাঁর মনকে উতলা করে তুলতো। রাত্রির পর রাত্রি খাতার পাতায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগল 'সিন্ধু' প্রথম তরঙ্গ, 'সিন্ধু' দ্বিতীয় তরঙ্গ, 'সিন্ধু' তৃতীয় তরঙ্গ, 'কর্ণফুলী', 'সাম্পানের গান', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি।' এই সময়েই 'অনামিকা', 'গোপন প্রিয়া' প্রভৃতি "সিন্ধু-হিন্দোল" কাব্যের বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সঙ্ঘ। নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলতে, দু'ধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দু'ধারের গ্রামবাসীদের জন্যে, তা তার এক আনা। বাকি পনের আনা চলেছে আর চলেছে সৃষ্টি-দিন হতে, আমার সুন্দরের উদ্দেশ্যে। আমার যত বলা, সেই বিপুলতরকে নিয়ে, আমার সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে নিয়ে।

রাজনৈতিক কোলাহলের হট্টগোলের মাঝেও তিনি সেই সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতেন।

চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যই শুধু কবির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেনি, চট্টগ্রামের কীর্তিমান্ মানুষের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েও মুখর হয়েছে তাঁর বাণী। চট্টগ্রামের কবি নবীনচন্দ্রকে স্মরণ করে তিনি করলেন কবিতা রচনা ; বললেন— 'অজয়ের কবি আজ কর্ণফুলীর কবিকে অর্পণ করতে এসেছে শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

চট্টলে শিক্ষাগুরু আবদুল আজীজের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে তিনি গাইলেন— 'বাংলার আজীজ'।

পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন।
মুসলমানের রাত্রি তখন আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় তখন বঙ্গ মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান।'

একদিন ভাই বললেন— 'কবিদা, এবার ছোটদের জন্যে কিছু লেখো।' কবির কলমে এবার ঝরল 'সাত ভাই চম্পা।'

'আমি হব সকাল বেলার পাখী—
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি।
...
'আমি সাগর পাড়ি দেব, আমি সওদাগর,
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর'।

মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল নজরুলের অসাধারণ। আমার আম্মাকে ও নানীআম্মাকে তিনি স্নেহ-মমতায় বেঁধে দিয়েছিলেন। একদিন সকালবেলা আম্মা তাঁর তিন মাসের দৌহিত্রটিকে কবির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ফাঁক পেলেই আমার ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে মশগুল হয়ে যেতেন কবি। কিন্তু আম্মা আজ তুললেন অন্য কথা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— 'জানালার ধারের ঐ সুপারি গাছগুলো দেখতে সুন্দর না এই শিশুটি ?' এর আগের রাত্রিতে কবি লিখেছিলেন 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। আমাদের জানালার পাশে পুকুরের ধারে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছিল ন'টা সুপারি গাছ। আসন্ন বিদায়ের কথা স্মরণ করে কবি লিখলেন—

'বিদায় হে মোর বাতায়ন পাশে নিশীথ জাগার সাথী,
ওগো বন্ধুরা পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি।
আজ হতে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি।
আজ হতে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।'

'সুপারি গাছগুলো সুন্দর, না এই শিশুটি'— আম্মার একথা শুনে কি বুঝে জানিনা কবি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, বললেন— 'আম্মার মনের কথা বুঝতে আর আমার বাকি নাই।' পরদিন সকালে

কবিতার খাতা খুলতেই চোখে পড়ল নতুন কবিতা 'শিশু যাদুকর।'

'পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর।
এই পারে এলি তুই, শিশু যাদুকর।'

যার ঘরে শিশু নতুন অতিথি হয়ে এসেছে, তারই মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে এই কবির মধ্যে। কবিতাখানির এক জায়গায় আছে—

'লায়লার পারে দুর নাহারের কোল
আলো করি এলি কে রে পুষ্প বিভোল,
পেলি হেথা ঠোঁট ভরা-মধু চুম্বন
আমি দিনু হাতে তোর নামের কাঁকন।
যাদু মোর কি দিবে এ ভিখারী আশিস,
সুন্দর হয়ে যেন ধবায় বাঁচিস।'

এ কবিতার সঙ্গে আমার ছেলের নামকরণের ইতিহাস একটুখানি জড়িত আছে, তা বোঝাই যাচ্ছে। কবি ওর জন্য ডাকনাম পছন্দ করেছিলেন, 'শেলী'। আর একটা নাম দিয়েছিলেন 'সোহরাব'। রুস্তম-সোহরাব কাহিনীর সোহরাব চরিত্র তাঁকে ভারি মুগ্ধ করত, তিনি বলেছিলেন। কিন্তু কাহিনীটা বিয়োগান্ত বলে কবির দেওয়া ঐ নামটা আমাদের বাড়িতে ক্রমে চাপা পড়ে যায়।

এভাবে নজরুলের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ যখন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তখনো কিন্তু বাড়ির পুরোপুরি সাহিত্যিক আবহাওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা বাইরের জগতের সঙ্গে মুখোমুখী আলাপ করবার অধিকার পান নি। ফাঁকে ফাঁকে আড়াল-আবডাল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে বাহির-বিশ্বের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় করবার চেষ্টা চলত আমাদের বাড়ির মেয়েদের। আর আমি? আমি তখন সবে নতুন বন্দিনী। উচ্চশিক্ষার জন্য আমার চলছে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে নজরুলের প্রভাব কতখানি কার্যকরী হয়েছিল, তা ভেবে আজ মন কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

আমি চট্টগ্রাম থাকতে কবি-পত্নীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার পত্রালাপ চলত। আজকাল দেখতে পাই তিনি নাম স্বাক্ষর করেন 'প্রমীলা নজরুল', তখন কিন্তু আমাকে চিঠিতে লিখতেন 'তোমার বৌদি আশা'। একবার কবি বৌদির কথা চিঠিতে রগড় করে লিখেছিলেন, 'দেখতো ভাই, চিঠি লিখতে লিখতে এই দোয়াত কালি ঢেলে ফেললাম একটা বইয়ের ওপর। তার জন্য তোমার বৌদির কি বকুনি, আর কি তম্বিহ্।'

নিজের সম্বন্ধে কবি ছিলেন চিরদিনই উদাসীন। কবির মাতৃস্থানীয় মিসেস এম রহমান একবার আমাকে চিঠি লিখে চট্টগ্রাম থেকে কবির জন্য 'বিনি সুতোর' একখানা দেশী চাদরের ফরমাশ দিয়েছিলেন। আমি চিঠিতে সে কথা কবির কাছে উল্লেখ করায় তিনি জবাবে লিখেছিলেন— 'কথা আমার বিনি গোচর। সে মা-ই জানেন, আর তোমরাই জান।'

কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম চট্টগ্রাম। আমাদের সেই পুরানো বাড়িতে আজ ভিন্ন লোকের বসবাস, অন্য লোকজনের আনাগোনা; তবুও যখনই সেখানে পা দিই, শৈশবের শত স্মৃতির সঙ্গে মনে পড়ে যায় বছর ত্রিশ বত্রিশ আগেকার কথা। দক্ষিণে পুকুরপাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেই তখনকার কালের সুপারি নারিকেলের গাছগুলো যেন বাতাসে হা হা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন জীবনে বেঁচে ওঠে ঘাটের ধারে গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়ানো ন'টা সুপারি গাছ, বাংলা সাহিত্যে অমর সেই 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। অন্দর মহলে শান্ত উদার হাসিতে জেগে ওঠেন জান্নাতবাসিনী আম্মা ও দাদু (মাতামহী)। পেছনের দিকে বছরের পর বছর পেরিয়ে শৈশব ফিরে পায়, আনন্দে কলহাস্য করে ওঠে আমার 'বাচ্চা-ই সাক্কাও', আমার 'শিশু যাদুকর।'

আর এসে দাঁড়ান আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাহার— নব নব পথ রচনার নেশায় মাতাল। তাঁর আশেপাশে

আঙিনায় ভিড় করে আসেন কানাই, সুধীন্দ্র, মনিরুজ্জামান, ইস্কান্দর, রবিউল হোসেন, দিদারুল আলম— তাঁর বন্ধুরা দলে দলে। সবার ওপরে সগৌরবে মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসেন দলের মধ্যমণি আমাদের কবিদা'— দেশ ও জাতির সম্পদ কাজী নজরুল ইসলাম। হাসি, গান ও উল্লাসে যেন আজও মুখর হয়ে ওঠে চারিদিক।

সেই থেকে বাস্তবে কত কি নিদারুণ ঘটে গেল। কিন্তু তবু মনে হয়, সে তো সত্য নয়; সেদিন যা ঘটেছিল, শুধু তাই সত্য, অবিস্মরণীয়, অবিনশ্বর।

---

* ছোট শিশুকে বাড়িতে সবাই বলত 'বাচ্চা', তাই শুনে কবি ওকে আদর করে 'বাচ্চা ই সাকাও' বলে ডাকতেন। কবির 'শিশু যাদুকর' কবিতা ওরই জন্য লেখা। বলা দরকার, আফগানিস্তানে 'বাচ্চা-ই সাকাও' এর আবির্ভাবে সে যুগে এদেশেও কম হৈচৈ হয়নি।

নজরুলের কবিভাষা : পুরাণ ও প্রকৃতি

আহমদ শরীফ

আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল এবং নতুনতব ধারায় জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে ও সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিব চক্রবর্তী প্রমুখেব কবি-ভাযা স্বল্পশক্তির কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত কবেছে। আবার এসব প্রধানবাও দেশী-বিদেশী শক্তিমান ও জনপ্রিয প্রখ্যাত কবিদের অনুকবণ-অনুসরণ করেছেন। যেহেতু এমনি প্রভাব ও অনুকবণ স্বাভাবিক ও আত্মা-নির্মাণে আবশ্যিক এবং চিরকাল ঐতিহ্য নামে এ প্রভাব স্বীকার আবর্তিত হযেই আসছে সব সাহিত্যে, সেহেতু অবিকল নকল নিন্দনীয ও অপরাধ হলেও আত্মীকরণে সাফল্য ব্যক্তিক কৃতিত্ব রূপেই গ্রাহ্য, কেননা একটা ভাব-চিন্তা কচিৎ কখনো মৌলিক রূপে প্রতীযমান হলেও আসলে সাধারণভাবে সবটাই 'অতি পুরাতন কথা নব আবিষ্কাব' মাত্র।

নজরুলের কবি-ভাষার যে পরিমাণ গুণ, শক্তি ও সৌন্দর্য রযেছে তিনি সেই পরিমাণে পরিমাপেই বড়ো এবং সেই কবি ভাষার যে পরিমাণ দুর্বলতা ও ত্রুটি বযেছে, সে পরিমাণেই তাঁর কবিতা নিন্দনীয। অতএব, কাব্যবিচার পরিণামে কবি-ভাষারই মূল্যায়ন। আব কবি-ভাষা মানেই আলঙ্কারিক ভাষা-বাকপ্রতিমা। বিশেষ কবির বিশেষ বাক্-ভঙ্গি, স্বতন্ত্র কণ্ঠে-অনন্য উচ্চারণ। কবির বিশেষ ও স্বতন্ত্র চারিত্র্য লক্ষণ। এ-কালে ইংরেজী সাহিত্যে টি,এস, এলিঅটে, বাঙলায মধুসূদনে, নজরুল, বিষ্ণু দে, সমর সেনে পুরাণপ্রীতি বেশি। এঁদের মধ্যে নজরুলে পুরাণ প্রযোগ সব চেয়ে অধিক।

নজরুল ইসলাম দেদার আরবী-ফারসী-হিন্দি শব্দ আর বাক্ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন তাঁর বিদ্রোহ-বিপ্লবাত্মক উদ্দীপনা-উত্তেজনা প্রেরণা-প্রবর্তনা সঞ্চারক কবিতায ও গানে। নজরুল ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত শত মাইল দূরে করাচিস্থ নিরাপদ সামরিক জীবনে ফারসী ভাষা-সাহিত্যের বিশেষ করে হাফিজ-উমরের কাব্যানুশীল করেছিলেন, আর মুসলিম হিসেবে ঘরোযা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে নিত্য ব্যবহৃত আরবী-ফারসী বহু বহু শব্দ তো জানাই ছিল তাঁর। ফলে আয়ত্ত ও ঐতিহ্যসূত্রে অজস্র আরবী-ফারসী শব্দের সঞ্চয় ছিল তাঁর। আর শক্তিমান স্বভাবকবি হিসেবে সুপ্রয়োগে ছিল তাঁর সহজাত নৈপুণ্য।

আবার এ-ও লক্ষণীয় যে নজরুল যত্রতত্র আরবী-ফারসী-হিন্দি শব্দ প্রয়োগ করেন নি। ইসলাম

ও মুসলিম বিষয়ক কবিতায় ও গানেই কেবল সচেতনভাবে মুসলিম শাস্ত্র-সংস্কৃতির আচার-আচরণের পরিবেশ সৃষ্টি লক্ষ্যেই ওই সব শব্দ ব্যবহৃত। কিংবা 'বিদ্রোহী'র মতো কিছু উদ্দীপনাজনক কবিতায় হিন্দু-মুসলিম-পুরাণ-ঐতিহ্য সাধ্যমত সমভাবে প্রয়োগের প্রয়াস রয়েছে। অন্যান্য কবিতায় বাঙলা কবিতার ভাষায় দৈশিক, চালু-রীতি অবলম্বন করেছেন কবি। নজরুল এমনি ভাষারীতির বা বিদেশী শব্দ প্রয়োগরীতির প্রবর্তকও নন। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম বিষয়ক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার দেদার ফারসী (ও তৎভুক্ত আরবী শব্দ) শব্দ ব্যবহার করেছেন-মুসলিম জীবন ও সমাজ প্রতিবেশ সৃষ্টির কাব্যিক প্রয়োজনে। (দিলদার, নাদির শাহ, নূরজাহান, আরঙ্গজেব, রুবাই, বেদুঈন, ইরানী, গজল প্রভৃতি কবিতায়)।

অতএব, নজরুল এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এঁদেরই অনুসরণ করেছিলেন। আশৈশব মুসলিম মোল্লা ঘরে ও সমাজে লালিত বলেই ওই দুই হিন্দু কবির কৃত্রিম অনুশীলনে ও প্রয়োগে যে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা ছিল, তা নজরুলের সুনিপুণ সহজ প্রয়োগে দেখা যায় নি। 'দাঁড়ি মুখে সারী গান লাশরিক আল্লা'- — এমনি চরণই তো মুগ্ধ ও গুণগ্রাহী মোহিতলালকে নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পরে জীবনানন্দ দাশও তাঁর প্রথম দিককার কবিতায় মোহিত নজরুলের অনুকরণে, অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন। এ-ও লক্ষণীয় যে নজরুলে নতুন আরবী-ফারসী-হিন্দি শব্দের প্রয়োগ বেশি নেই, পুরোনো প্রচলিত শব্দই বেশি, তবু তাঁর প্রয়োগে এগুলোর জৌলুস এও চমক বেড়েছে, আমাদের সাহিত্য পাঠক বাঙালীর অনভ্যস্ত চোখে-মনে আকস্মিক ঝিলিক দেয় বলে।

অবশ্য নজরুলেও যে আরবী-ফারসী-হিন্দির সর্বত্র সুপ্রয়োগ রয়েছে, তা নয়, মাঝে মধ্যে অসঙ্গতি ও অর্থান্তর ঘটেছে প্রয়োগে।

শোর, সালাম, কামাল, সাব্বাস, শমসের, দুষমন, একদম, বুজদিল, বিলকুল, সাফ, পাঁও, তক্, খুন, হর্দম, যিগর, আসমান, আজাদ, বদ্‌নসিব, বরাত, খাবার, কল্লা, মুর্গী, তাজী, মর্দ, গাজী, মোল্লা, কুলমুলুক, নেস্তনাবুদ, জের, গোশ্বা, পিরহান, জোর, শহীদ, দোস্ত, কলল্‌জে, কসাই, জান, খুবসুরৎ, ময়দান, জালিম, মুর্দা, কিল্লা, ফলে, পরওয়া, বেহেস্ত, রৌশন, জামাল, জোশ, শোহ্‌রত, নওরাতি, আব, জমজম, জানোয়ার, সালাম, জখমী, সিপাহ্‌সালার, কালাম, দিলওয়ার, তলওয়ার, আফসোস, বখ্‌ত, সুমসাম, দুনিয়া, দিল, জিঞ্জির, খিঞ্জীর, গেদ্‌ধড, গর্দান, জোরওয়ার, জেরবার, মুশকিল, কঞ্জুস, হুঁস, বেইমান, বিয়াবান, পস্তান, দরিয়া, দিক্‌দার, লোহু, সম্‌ঝায়, পঞ্জা, কবজা, খুন, দিলীর, গোর্দা, শেরশব্বর, কোরবান, দ্বীন, খোশরোজ, রোজ, আমামা, গোস্তাখীর, জুল্ফিকার, হায়দারী হাঁক, গুল, কিয়ামত, জান্নাত, শাফাযত, জোরবার, আরশ, লাল, পয়মাল, বরবাদ, কাৎরা, আফতাব, মশিয়া, জহুর, কম্‌বখ্‌ত, দাদ্‌, নকীব, তসলিম, আওয়াজ, মুঝদা, আঞ্জাম, তাঞ্জাম, ফিরদৌস, হাম্মাম, বাগেবাগ, কওস্‌র, তামাম, সামান, মশগুল, গুলজার, গুলসান, গুলফাম, তেগ, খুশী, হুরী, নূর, কুরসী, সবজা, জীন, ওক্ত, সাবেঈন, তাবেঈন, জওহর, খারেজিন, গওহর, মারহাবা, বান্দা, বোরহান, রুহ, দরদ, নার্গিস, নালা, দরাজ, দস্ত, মাহবুব, কবুতর, হাসব, জুলুম, সওদাগর, ফজুল, নজ্জুম, সিজদা, রহম, দুম্বা প্রভৃতি বিভাষার শব্দের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়-প্রতিবেশে সুষম ও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ ব্যবহার রয়েছে নজরুলের কাব্যেও গানে।

নজরুলের কবি ভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুচিত শব্দের সুবিন্যাস প্রবণতা। অনুপ্রাসে নজরুলের আসক্তি ছিল প্রবল। কবিতায় অর্থ-গৌরবের চেয়ে, ধ্বনি মাধুর্য তাঁর অধিক কাম্য ছিল। তবু শক্তিমান কবি বলেই তাঁর তৈরী দ্বি-শাব্দিক (দ্বৈশাব্দিক), ত্রিশাব্দিক, (ত্রৈশাব্দিক) কিংবা বহু-শাব্দিক বাক্‌খণ্ডগুলো হীরের টুকরোর মতোই এক একটি চিত্রকল্প, বাকপ্রতিমা, কিংবা চরিত্রলক্ষণ হয়েই কবিতার চরণে চরণে ব্যঞ্জনার দ্যুতিতে তাৎপর্যের দীপ্তিতে ঝিলিক ও চমক সৃষ্টি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছে। যেমন, শাস্ত্র,-শকুন, মন-মৌমাছি, বোল্‌তো-ব্যাকুল, শরম-শাড়ি, মন-মৃগ, মানুষ, মেষ,

কশাই-কঠিন, তুফান-তাজী, কান্না-কাতর, তেজ-তপন, শোক-সাহারা, শাওন-সাঁজ কিংবা পরশ-সুধা, মুক্তি-তোরণ, খোদা-খোদ-দেমাকী, আঁখি-পাখী, খুন-রঙিন, বসন-শাসন অথবা পুরুষ-পরশ-সুধা, কুকুর-কুরু-নেতা, মরণ-হরণ-শরণ, চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন, থিরবিজুরী-উজল, সুচিত সুষম সুন্দর সুপ্রযুক্ত বাক্-খণ্ড। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে জিঞ্জীর কাব্যান্তর্গত 'সুবহ্ উম্মেদ' (পূর্বাশা) নামে গোটা কবিতাটি সযত্নে অনুপ্রাস-সজ্জিত; নজরুল কাব্যের ও গানের সর্বত্র বিভিন্ন ধরণের মধ্য মিল ও অনুপ্রাস সুলভ।

কবির এ দ্বিশাব্দিক, ত্রিশাব্দিক ও বহুশাব্দিক বাক্-খণ্ড তৈরীর বন্ধন সূত্র হয়েছে 'হাইফেন'। নজরুলের এ 'হাইফেন' প্রীতি মজ্জাগত। এ আবেগপ্রবণ কবি কিছুতেই এক শব্দে তাঁর অনুভবের আবেগ ও স্বরূপ পূর্ণভাবে যেন অভিব্যক্ত করতে পারছেন না। প্রকাশের আকুলতা থেকেই যেন এক একটি বাক্খণ্ডের জন্ম। ব্যাকুল বিচলিত কবি 'আপনি না বুঝে, বুঝাতে পারে না' গোছের উদ্বেলিত অবস্থায় এসব বাক্খণ্ড তৈরী করেছেন। তাই এ কবিভাষা তাঁব কবি স্বভাব থেকেই উৎসারিত। এ-ও বাঙলা সাহিত্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক। কেননা, এটি কবির বিশেষ মানস-লক্ষণের পরিচায়ক। গোড়া থেকেই 'হাইফেন'-কবলে পড়েছিলেন, তাই কেবল কবিতা নির্মাণে নয়, কাব্য নাম চয়নেও 'হাইফেন'-কে করেছেন অবলম্বন: অগ্নি-বীণা, দোলন-চাঁপা, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, প্রলয় শিখা, মরু ভাস্কর। গদ্য গ্রন্থের নামও 'হাইফেন' বদ্ধ: বাঁধন-হারা, মৃত্যু-ক্ষুধা। গান ও সংকলন গ্রন্থগুলোও: নজরুল-গীতিকা, সুর-সাকী, বন-গীতি, গুল-বাগিচা প্রভৃতি। অবশ্য সীমিত সংখ্যায় মোহিতলালে এবং গোড়ার দিকে অনুকারক জীবনানন্দ দাশেও 'হাইফেন' প্রয়োগে বাক্খণ্ড নির্মাণ ও প্রবণতা দেখা যায। অবশ্য প্রয়োজনে দু'দশটা এমনি হাইফেন বদ্ধ শব্দাবলী সবার রচনায মেলে। সংগ্রামপ্রসূন রণ-রক্ত-অগ্নিপ্রতীক বাক্খণ্ড বা বাক্প্রতিমা নির্মাণেও, রয়েছে তাঁর নিপুণতা। তাঁর মনোনীত ছন্দের বন্ধনে তাঁর নির্মিত বাক্খণ্ড উত্তেজিত মানুষের আবেগ চালিত অনর্গল বক্তৃতার মতো করে তুলছে তাঁর কবিতাগুলোকে। আবেগের উত্তাপে মুখে যেন তাঁর খই ফুটছে, পটকার মতো গর্জে উঠছে যেন এক একটি কথা। যেমন অগ্নিঋষি, বহ্নি-বাগ, অগ্নি-মরু, অগ্নি-সুর, রক্ত-শিখা, প্রলয-নেশা, বজ্র-শিখা, রক্ত-তড়িৎ, বজ্র-গান, রৌদ্র-রুদ্র, অগ্নি-পাথার, রোষ-হুতাশন, রক্ত-অশ্ব, অগ্নি-ফণী, রক্ত-পাথার, বহ্নি-বীর্য প্রভৃতি যেমন তাঁর চিত্রকল্প নির্মাণ দক্ষতার পরিচায়ক, তেমনি অসম্বৃত আবেগেরও প্রমাণক। নজরুলের দ্রোহ-বিপ্লব-সংগ্রাম-ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জন, শোষণমুক্তি, দুঃশাসনের অবসান, কুসংস্কার বর্জন, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িকতার বিলুপ্তি প্রভৃতি লক্ষ্যে। এসূত্রে মনে রাখা দরকার যে এ হচ্ছে কবির মসী-যুদ্ধ। মসী-অসির মতো তাৎক্ষণিক ফলপ্রসূ। যেহেতু নজরুল ইসলামেব প্রত্যয়ে ও আস্থার দৃঢ়তা কিংবা একনিষ্ঠতা ছিল না, সেহেতু বিশৃঙ্খলা-বিত্তীপ বিশ্বাস ও সংকল্প, আদর্শ ও লক্ষ্য অবিরলভাবে তাঁর রচনায় হর-হামেশা অভিব্যক্তি পেয়েছে। এতে অমনোযোগী ও নিষ্ঠ পাঠক বিভ্রান্ত হয়।

কবি ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নজরুল প্রাচীন প্রচলিত ধারার সঙ্গে তাঁর সমকালীন প্রতিষ্ঠিত কবিদের প্রভাব ও রীতি যেমন তাঁর স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁর সমবয়সী সহযাত্রীদের নতুনতর মত-পথেরও ভাষা-ভঙ্গির তাঁর উপর প্রত্যাশিত প্রভাব পড়েনি। পড়লে নজরুল চেতনা আরো কিছুটা প্রসারিত, সূক্ষ্মায়িত ও পরিমার্জিত হত, এবং কাব্যের আঙ্গিকে ও শব্দ বিন্যাসে যুদ্ধোত্তর নতুন কালের নতুন আবরণ ও আভরন শোভা পেত। ব্যতিক্রমও অবশ্যই আছে যেমন— বৌদ্র দ্বন্দ্বের গান, তেমন একটি প্রতীক রূপক রচনা যা আধুনিক ও নিখুঁত।

আলোর লাগি জাগে ফুল
নদী ধায় সাগর যেমন
চকোর চায় চাঁদ, চাতক মেঘ

যারে চায় তারেই চায় এ মন।

চাঁদ-চকোর, চাতক-জলদ, চখা-চখীর বিরহ, চাঁদের কলঙ্ক প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে হিন্দু-পুরাণ ও মুসলিম ঐতিহ্য মিশ্রিত হয়ে তাঁর কাব্য নতুন লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে বটে, তবে সবটাই অতীতাশ্রয়ী হওয়ায়, উপমাদি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কবির পশ্চাত-চেতনা যত প্রকট, সম্মুখ দৃষ্টি তত স্পষ্ট নয়। যদিও তাঁর এ অতীতাবলম্বন কেবল বর্তমানকে নির্মাণ ও ব্যাখ্যা করার জন্যেই।

ঐতিহ্যের বা পুরাণের প্রয়োগ কাব্যে দু'ভাবে হতে পারে, এক তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ শাস্ত্র-সংস্কৃতিপ্রতীক শব্দ প্রযোগে আর কবিতার বিষয়ে ও ভাবে ঐতিহ্যের কিংবা পুরাণের সামষ্টিক বা সামগ্রিক আবহ সৃষ্টিতে। সামগ্রিকতার নমুনা এরূপ ;

হারুত-মারুত ফেরেশতাদের গৌরব রবি-শশী
ধরার ধূলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি।
(পাপ। সাম্যবাদী)

বা উর্‌দ্‌ য়্যামেন নজদ হেজাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহরান স্মরি কাহার বিরাট নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুরপরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর
হাতে আব জমজম জাম।
(ফাতেহা-ই-দোয়াজ,-দহম)

এবং এলকি আল্‌-বিরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী
খুশীর এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরী
লাল এ লায়লি লোকে মজনু হর্দম চালায় পেয়ালী
(খোশ আমদেদ। জিঞ্জীর)

আবার বিদ্রোহী, কোরবানী, ঝড় প্রভৃতি কবিতায়ও সাম্যবাদী কাব্যে ঘটেছে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য-পুরাণের মিশ্রণ :

১. এই রণভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহাগীতা
এই মাঠে হল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।

২. আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর বিশ্বের সম্পদ। (সাম্যবাদী)

৩. ভুলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি
বিশ্ববিধাত্রীর
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

বাক্যে তো বটেই, বিশেষ্যে বা নামপদেও চিত্রকল্পের ও ঐতিহ্যের বিশেষ্য বা দূর-বিথারী ব্যঞ্জনা

থাকে। যেমন— ওঙ্কার, দুর্বাসা, কৃষ্ণ, সীতা, ঊষা, চণ্ডী, কালী, দশমহাবিদ্যা, পলাশী, পানিপথ, পরশুরামের কুঠার, হিমাদ্রি, আরশ, কুরশী, শাত-ইল-আরব, কোরবানী, টর্পেডো, মাইন, চেঙ্গিস, যমুনা, পিনাক-পাণি, ত্রিপুরারি, গৈরিকবস্ত্র, লাল-ঘোড়া, ত্রিনয়ন, প্রণবনাদ, শয়তান, হায়দরী হাঁক, মদন, শহীদ, জুলফিকার, শিব, হর, রুদ্র, দুলদুল, আমামা, মর্সিয়া, বৃন্দাবন, পদ্ম, রক্তজবা, গোলাপ, মন্দির-মসজিদ-গির্জা-মঠ-বিহার-সিনাগগ, ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, নল-দময়ন্তী, সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতি তার প্রমাণ।

বাক্যে : দাও দুশমন দুর্গ-বিদারী দু'ধারী জুলফিকার।
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার।
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী।
ছিল একদিন,-আমার সোহাগে গলিয়া যমুনা হতে
নিবেদিত নীল পদ্মের মত ভাসিতে প্রেমের স্রোতে।
নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রুজলে।
ছুটিয়া চলিছে মরু-বকৌলি নীল দরিয়ার পানি।
মরু-সাইমুম-তাঞ্জামে চড়ি কোন পরীবানু আসে :

কবিতায় ছন্দস্রষ্টা সূচিত শব্দের সুষম ধ্বনির অর্থাৎ অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের পরেই তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ শব্দের ভূমিকা নির্ধারিত। এ ভূমিকা মুখ্যত উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা। অলঙ্কার ও চিত্রকল্প, রূপক-সাংকেতিক আবহ এবং প্রতীকি বাকপ্রতিমা নির্ভর। প্রতীচী প্রভাবিত আধুনিক গীতি কবিতায় উপমাদি অলঙ্কার, চিত্রকল্প ও বাকপ্রতিমা প্রভৃতির প্রধান অবলম্বন প্রকৃতি! রবীন্দ্রনাথে আমরা তা-ই দেখতে পাই। প্রকৃতির অবয়বের অন্তরে নিহিত ও অবলিপ্ত বিমূর্ত রূপকেই রবীন্দ্রনাথ মানস-গোচর করে তুলেছেন। আর সত্যেন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন বস্তুর রূপের জৌলুস্। মোহিতলাল প্রিয়া ও পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধকে জীবন ও যৌবন সম্পদ রূপে বরণ করে বর্হিরূপের ও বর্হিজগতের মূল্য-মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর নজরুলে সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল আর রবীন্দ্রনাথ কবির সাধ্যানুসারে অনুসৃত হয়েছেন। তবে যেহেতু স্থিতি ও স্থিরতা, ধীরতা ও নীরবতা এবং প্রশান্তি ও প্রসন্নতা ছিল নজরুলের স্বভাব বিরুদ্ধ, সেহেতু আবেগতাড়িত নজরুলে পূর্বসুরীর প্রকৃতি, বস্তু ও ঐতিহ্য-চেতনা কবিতার অঙ্গে ও অন্তরে রণ-রক্ত-বন্যা-খরা-অগ্নি-মহামারী-ঝড়-ধূমকেতু প্রভৃতির গতি-প্রকৃতি, রীতি-নিয়ম, রোষ-ক্ষোভ, দ্রোহ-বেদনা, রূপ-স্বরূপ নিয়ে বিচিত্রভাবে তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে অবলীলায় ও অনায়াসে। তাই কবি স্বয়ং বলেন—

'কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা' এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলতে চেয়েছি। আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি, ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। আমি যা ভাল বুঝি, যা সত্য বুঝি-শুধু সেইটুকুই প্রকাশ করব।' (ধূমকেতুর পথ)

'আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে-যা মিথ্যা কলুষিত পুরাতন, পচা-সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।' 'আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কন্যা' (শিখা গোষ্ঠীর আবুল হোসেনকে লিখিত পত্র)।

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর
বিপ্লব দেবতা ঐ শিয়রে তোমার
পথে পথে খুঁড়িয়াছে মিথ্যার পরিখা
চোখে মুখে লিখিয়াছে ভণ্ডামীর নীতি-বাণী-লিখা
কোনদিক দেখি নাই চলিয়াছি আগে

লঙ্ঘি বাধা লঙ্ঘিযা নিষেধ
মানিনিকো কোরান পুরাণ-শাস্ত্র মানিনিকো বেদ।

এতো দায়িত্ব এতো ব্রত ও এতো চিত্তবিক্ষোভ নিয়ে কবিতা রচনা করতে হয়েছে বলেই কবি সংযত আবেগে চাপা উচ্ছ্বাসে মনীষা প্রয়োগে মননের ও মনস্বিতার সংমিশ্রণে নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত ও কল্পনা-মনন-মনীষা বিজড়িত কবিতা রচনা করার মতো ধৈর্য ও অবসব আয়ত্তে রাখতে পারেন নি। স্বভাবকবি বলেই 'প্রকৃতি' কবির সংবেদনশীল হৃদয-মন হরণ কবেছিল, ভযে ভুলেছিল। বিশেষত প্রেমের শান্ত-সুন্দর পেলব প্রকৃতি সংমর্মিতায ও সহানুভূতিতে কবির নিত্যসাথী।

নজরুলের রোম্যান্টিক অনুভবে-চেতনায় ও কল্পনায চেতন-প্রকৃতির রূপ-স্বরূপ:

১. আকাশ-গাঙে জাগবে জোযার। রঙের রাঙা বান।
২. দুধ-হাসি হাসে হে হেথা সদা কচি ঘাস
   উপরে মারে মত চাহিয়া আকাশ।
৩. উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায যখন সাঁঝেব মাযা।
৪. তরুণ নযনসম আকাশ অনীল।
৫. পাখী উড়ে, আঁকা যেন আকাশ-পটে।
৬. শ্রাবণ মেঘেব আড়াল টানিযা গগনে কাঁদিছে ববি।
৭. বাজ পড়া তালতরুসম এক বৃন্দহীন। দাঁড়াযে বৃদ্ধ মত্তালিব।
৮. পড়ে গো উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদেব রূপ অমিয
   সে বেড়ায হীবক নড়ে। আলো তাব ঠিক্বে পড়ে।
৯. খুঁজে ফিবি কোথা হতে এই ব্যথা ভাবাতুব মদ গন্ধ আসে
   আকাশ বাতাস ধবা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোব তপ্তঘন দীর্ঘশ্বাসে।
   কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায জাগা অতৃপ্ত বিধাতা।
১০ কালো মেঘেব কাজল চোখের পাগল চাওযার ইঙ্গিতে।
১১. পান করে যে প্রাণ-পেযালায যুগের আলোর রৌদ্র শারাব।
১২. এবার আমার জ্যোর্তিগেহে তিমির প্রদীপ জ্বালো
   আনো অগ্নি-বিহীন-দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো।
১৩. নযন আমার তামস তন্দ্রালসে। ঢুলে পড়ুক সবুজ রসে।
১৪. নিখিল-গহন-তিমির-তমাল গাছে:
   কালো কালার উজল নয়ন নাচে,
   আলো-রাধা যে কালোতে নিত্য যাচে
   ওগো আনো আমার সেই যমুনার জলবিজুলির আলো।
১৫. বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভযঙ্কর।
১৬. সেথা যেতে নারে বুঢ্ঢা পীর। শাস্ত্র শকুন জ্ঞান-মজুর।
১৭. তবুও বিদায-পথে কাননে কাননে কদম কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে।
১৮. দিবা চলে যায় বলাকা পাখায়। (বুলবুল)
১৯. হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত।
২০. সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়—
   হেমন্তের ঐ শিশির নাওয়া হিমেল হাওয়া
   সেই নাচনে উঠল মেতে।

২১ কুমারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রুসম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।
২২. (মেঘ রূপী সিন্ধু) হেসে ওঠে তৃণে শস্যে-দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে হিম-কণা আনন্দাশ্রু ভার।
২৩. সাঝের আকাশ মায়ের মতন ডাকবে নত চোখে।
২৪. ঘর দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস মাঠে।
২৫. বেদনা-হলুদবৃন্ত কামনা আমার
শেফালীর মত শুভ্র সুরভি বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে। তুমি হে নির্মম।
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম।
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছল ছল
করে ওঠে সারা হিয়া শিশির সজল
টলটল ধরণীর মত করুণায়।
ম্লান মুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সব।

নজরুলের গানে, গদ্যে এবং কবিতায় এমনি অসংখ্য মুক্তোর মতো, হীরক খণ্ডের মতো, চুমকীর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অলঙ্কার। নজরুলের রচনায় সামগ্রিক ও সামষ্টিক সৌন্দর্য সামঞ্জস্য কম বটে, কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্য অঢেল অজস্র।

আগেই বলেছি, কাব্যদেহের ভিত্তি বা কাঠামো হচ্ছে ছন্দ। কাজেই ছন্দই হচ্ছে কাব্য-শরীর আর সে-শরীরের স্বাস্থ্য হচ্ছে অলঙ্কারের লাবণ্য এবং কাব্যের প্রাণ হচ্ছে অনুভব-কল্পনা-মনীষার সম্মিলিত ও সমন্বিত দীপ্তি। এরূপে ভাব-ভাষা ছন্দ-অলঙ্কার যোগে কবিতা হয়ে ওঠে এক নিখুঁত নিটোল রূপের ও রসের প্রতিমা। গাঢ় অনুভবের আবেশে এবং কল্পনার ঔজ্জ্বল্যে আর মনীষার দীপ্তিতে এক একটি কবিতা সেই চিরপুরাতন ফুল পাখী প্রেম প্রকৃতি, মিলন-বিরহ সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও এক একটি অনন্য অপরূপও নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। অতএব ছন্দও কবিভাষার অংশ। এ জন্যে আমরা এখানে নজরুলের সৃষ্ট ছন্দের কিছু কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করব মাত্র। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব না।

কবিতার ছন্দের ও সঙ্গীতের সুরের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম কঠিনকেই বরণ করেছিলেন, সহজের প্রতি আসক্তি হয়নি। মাত্রাবৃত্ত ছন্দই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। স্বরবৃত্তেও ছিল তাঁর অনুরাগ, অক্ষরবৃত্ত তিনি বলতে গেলে কচ্চিৎই প্রয়োগ করেছেন। গানের জগতেও তিনি ছিলেন রাগ রাগিণীর ভক্ত। তাঁর গান যেমন রাগ প্রধান, তাঁর শব্দ চয়নও কখনো গানেও তরল ছিল না। উল্লেখ্য যে রবীন্দ্র সঙ্গীত মুখ্যত বাণীপ্রধান, আর নজরুল সঙ্গীত স্বচ্ছপত, রাগপ্রধান। গানের বাণীতে রবীন্দ্রনাথ আকাশচারী, আর নজরুল মর্ত্যবিহারী।

নজরুল ইসলাম যে অসম্বৃত প্রবল আবেগতাড়িত অসংযত বাঁধন ছেঁড়া বিদ্রোহী, বিপ্লবী ছিলেন, নতুনের কাঙ্ক্ষী ছিলেন, পুরোনো নিয়ম-শৃঙ্খল ভাঙায় আগ্রহী ছিলেন, তার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর কবিতায় ছন্দ প্রয়োগে এবং সঙ্গীতে সুর যোজনায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো তাঁর উৎসাহ ছিল দেশী-বিদেশী কাব্যে, ছন্দে ও সুরে যে-সব বৈচিত্র্য রয়েছে, সে-গুলো বাঙলায় প্রয়োগ করার। নজরুল ইসলামের আকর্ষণ ছিল মাত্রাবৃত্ত আবেগচালিত। তাই অসম চরণে, অসম পর্বে অসম স্তবকে অভিব্যক্তি পেয়েছে কবির আবেগ, উচ্ছ্বাস ও আস্ফালন-ক্ষোভ-রোষ-দ্রোহ কিংবা প্রেম-রণ-রক্ত তৃষ্ণা। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'মুক্তকছন্দ'ই ছিল তাঁর প্রিয়। তাই তিনি অক্ষরবৃত্তে, মাত্রাবৃত্তে ও স্বরবৃত্তে তাঁর উদ্বেলিত হৃদয়ের আর্তি-আকৃতি অকুণ্ঠ ভাষায় ও চরণ-শৃঙ্খল-মুক্ত ছন্দে অভিব্যক্ত করেছেন।

আশ্চর্য সাহসের ও সাফল্যের সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত এ তরুণ-অসম চরণের ও অসম স্তবকের প্রবহমান মাত্রা-বৃত্তের প্রয়োগে কলম ধরেন। পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয় ও দক্ষতা না থাকলেও এ অসম্ভব হত। তার প্রমাণ তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী কবিরা। বলতে গেলে এ শক্তি অনন্য নয় শুধু, অসামান্যও বটে। তাঁর পছন্দের ছন্দ না হলেও প্রবহমান সমিল কিন্তু অসমচরণের ও অসমপর্বের অক্ষরবৃত্তের 'মুক্তকছন্দ' ব্যবহারেও ছিল এ আবেগচালিত কবির আনন্দ ও নৈপুণ্য।

স্বরবৃত্তের সুনিপুণ প্রয়োগেও তাঁর কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। মাত্রাহ্রস্ব-দীর্ঘ করে উচ্চারণে সযত্ন সচেতনতা তেমন প্রযোজন হয় না। এও কবির দক্ষতার পরিমাপক ও পরিচায়ক। নজরুলের ধ্বনিচেতনা ছিল প্রবল ও তীক্ষ্ণ। তাই সুষমধ্বনির সৌন্দর্য সৃষ্টির ও বৃদ্ধির জন্যে তিনি সর্বত্র অনুপ্রাসের এবং সাধ্যমত মধ্যমিলের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সযত্ন সচেতন প্রয়াসে তাঁর সৃষ্ট ছন্দে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট। নজরুল কাব্যে ছন্দোগত ত্রুটি বেশি নেই। তবে গোঁজামিল আছে এখানে সেখানে। অসম মাত্রার চরণও কম নয়। এবার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা তুলে ধরছি:

কোথাকাব আঁখি হতে সরিল পাষাণ যবনিকা
তারি আখি দীপ্ত-শিখা রক্ত-রবি রূপে হেবি ভরিল উদয়-ললাটিকা
পড়িল গগনঢাকে কাঠি,
জ্যোতির্লোক হতে ঝরা করুণা-ধারায ডুবে গেল ধরা-মা'র স্নেহ শুষ্কমাটি,
পাষাণ পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল-- -
বার্হিরিল কোন্ বার্তা নিযা পুনঃ মুক্তপক্ষ আগ্নি-জিব্রাইল।
দৈত্যাগার দ্বাবে দ্বাবে ব্যর্থ রোষে হাঁকিল প্রহরী।
কাঁদিল পাষাণে পড়ি
সদ্য ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল।
মুক্তি মাব খেয়ে কাঁদে পাষাণ-প্রাসাদ-দ্বারে আহত অর্গল
শুনিলাম, মম পিছে পিছে যেন তরঙ্গিছে নিখিল বন্দীর ব্যথাশ্বাস---
মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।

(মুক্ত পিঞ্জর। বিষের বাঁশী)

এতে গর্জন নেই বটে, তবে গুরু-গম্ভীর মেঘমন্দ্র আছে, গতি ধীর, কণ্ঠ দৃঢ, উচ্চারণ স্পষ্ট এবং চিত্র নিখুঁত, নিটোল ও পূর্ণ, বক্তব্য সালঙ্কার ও প্রমূর্ত, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। আর একটি দৃষ্টান্তঃ

এত দিনে অ-বেলায়
প্রিযতম!
ধূলি অন্ধ ঘূর্ণিসম
দিবাযামী
যবে আমি
নেচে ফিরি 'রুধিরাক্ত মরণ খেলায়-
এতদিনে অ-বেলায়
জানিলাম, আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি।
পূজারিণী!
ঐ কণ্ঠ, ও-কপোদ-কাঁদানো রাগিণী,
ঐ আঁখি, ঐ মুখ,
ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,
ঐ তব অপরূপ রূপ,

ঐ তব দোলো-দোলো গতি-নৃত্য দুষ্ট দুল রাজহংসীজিনি—
চিনি সব চিনি। (পূজারিণী)

ঐ সুদীর্ঘ কবিতাটির সাজানোটা মোটেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ-কাঠামোর মতো নয়। নাটকের সংলাপের মতো এ কবিতায় কোথাও এমন চরণ ও স্তবক রয়েছে, যা আপাতদৃষ্টে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে ভ্রম জন্মে :

খুঁজি ফিরি, কোথা হতে এই ব্যথা-ভাবাতুর মদ-গন্ধ আসে
আকাশ-বাতাস ধবা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর ঘন দীর্ঘ শ্বাসে।
কেঁদে ওঠে লতাপাতা,
ফুল পাখী নদী-জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা। (পূজারিণী)

অক্ষরবৃত্তের আর দুটো উদাহরণ :

বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এতবেগ, এত জ্বালা ?
কে দিল না প্রতিদান ? কে ছিঁড়িল মালা ?
কে সে গরবিনী বালা ? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান। (সিন্ধু। ২য় তরঙ্গ)
বেদনা-হলুদ বৃন্ত কামনা আমার
শেফালীর মত শুভ্র সুরভি বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
দলবৃন্ত ভাঙশাখা কাঠুরিয়া সম।
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছল ছল
করে ওঠে সারা হিয়া শিশির সজল
টলটল ধরণীর মত করুণায় !
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা নীহার বিন্দু। ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে। স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের কল্যাণের। তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল অমৃতে কি ফল ?

এ সমিল নির্বিঘ্ন গতি প্রবহমান পয়ার স্বল্পশক্তির কবির পক্ষে সহজে সম্ভব হয় না। শব্দে-ধ্বনিতে চিত্রকল্পে ও বাক্‌প্রতিমায় এ অংশ চমৎকার।

এবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন দিচ্ছি :

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস হা-হুতাশ
আমি হুতাশীর !
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চিরগৃহহারা যত পথিকের
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ-জ্বালা প্রিয় লাঞ্ছিত
বুকেগতি ফের
আমি অভিমানী, চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়

চিত চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ
কুমারীর।
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন্‌কন্‌।

(বিদ্রোহী)

মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অসম চরণে ও অসম পর্বে মুক্তাক্ষর সমন্বিত কঠিন ও গম্ভীর ধ্বনি সমাবেশে এমনি গর্জন-তর্জন-আস্ফালন ও করুণ-কোমল দরদী উচ্চারণ বাঙলা সাহিত্যে নজরুলের বিশেষ ও অনন্য অবদান। কাব্যক্ষেত্রে নবাগত তারুণ্যে-এ সাহস ও সাফল্য, এ আত্মবিশ্বাস ও নৈপুণ্য বিস্ময়কর। চরণগুলোর প্রায় সর্বত্র দৃশ্য ও অদৃশ্য অনুপ্রাসধ্বনি গৌরবেও এ কবিতাকে করেছে অসামান্য।
নিয়মিত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত কবিতা ;

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে--
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন। (খেয়াপারের তরণী)

অথবা,

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিযাছে অভিমান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

(কাণ্ডারী হুঁশিযার)

পাঁচ মাত্রার নিখুঁত চাল :

মৃণাল-হাত। নয়ন-পাত
গালের টোল। চিবুক দোল
সকল কাজ। করায় ভুল
প্রিযার মোর। কোথায় তুল ?
কোথায় তুল। কোথায় তুল ?
স্বরূপ তার। অতুল তুল
রাহুর তুল। কোথায় তুল'
দোদুল দুল্‌। দোদুল দুল্‌।

(দোদুল দুল্‌। দোলনচাঁপা)

সাত মাত্রার চাল :

আদর-গরগর
বাদর-দরদর
এ-তনু ডর ডর
কাঁপিছে থর থর
নয়ন ঢল-ঢল
সজল ছল-ছল
কাজল কালো জল
ঝরলো ঝর ঝর।

(বাদল দিনে। ছায়ানট)

অথবা

নাসায় তিল ফুল
হাসায় বিলকুল
নয়ান ছলছল উদাস
দৃষ্টিচোর চোর
মিষ্টি ঘোর-ঘোর
বয়ান ঢল্‌ঢল্‌ হুতাশ। (প্রিয়ার রূপ। ছায়ানট)

পাঁচ মাত্রার— কিংবা :

রেশ্‌মি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরম-কথা
পথের মাঝে চম্‌কে কে গো থম্‌কে যায় ঐ শরম-লতা।
[ছায়ানট]

বা চার মাত্রার :

বনে বনে দূরে দূরে
ছল করে সুরে সুরে
এত করে ঝুরে ঝুরে
কে আমায় যাচিল ? (কার বাঁশী বাজিল। ছায়ানট)

স্বরবৃত্ত ছন্দের চটুল চাল :

খেলেগো ফুল্লশিশু, ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়,
পড়েগো উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়।
সে বেড়ায় হীরক নড়ে,
আলো তার ঠিকরে পড়ে।

অথবা, বয়ে যায় গন্ধ শিলায় ঝর্ণা নহর লহরী লীলায়,
যেতে সে খোশবু পানি ছিটায় কুলের মহলায়।
পাখী সব শিস্‌ দিয়ে যায় কিস্‌মিসেরই বল্লরীতে,
আকাশ আর বনদেবীতে মন বিনিময় নীল হরিতে।
(শৈশবলীলা। মরুভাস্কর)

কিংবা, বাদলা কালো সিন্ধু আমার কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজলো নুপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুটলো উষার মুখটি অরুণ ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়,
জমলো আসর বর্ষাবাসর, লাও সাকী লাও ভর-পিয়ালায়

বা দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক
ঘুষ দিলে ঐ চ্যাপ্টা নাকেই বাজতো সাতটা শাঁখ,
দিদিমা তাই থাবড়া মেরে ধাব্‌ড়া করেছেন
অ-মা ! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাংড্যাং।
(খাঁদুদাদু।ঝিঙেফুল)

দেখা যাচ্ছে প্রণয় কথা স্বরবৃত্তেও ফোটে চমৎকারভাবে।

বাক্যে অনুপ্রাস :

১. মবা মবক্কো মবিযা হইযা মাতিযাছে কবি মবণ পণ।
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিযা।
(সুবহ্ উম্মেদ। জিঞ্জীব)

২. আমি পাতালে মাতাল অগ্নি পাথাব কলবোল কল কোলাহল
আমি অজয অমব অক্ষয আমি অব্যয।
(বিদ্রোহী)

৩. কদম্ব তমাল তাল পিযাল তলায
দাদুবীব আদুবী বাজবী।
(ঝড়)

৪. গহন বাধাব আধাব বাধা কাবায।
(পথহাবা। দোলনচাঁপা)

৫. নীল নলিনীব নীলিম অণু।
(নীলপবী। ছাযানট)

মধ্যমিল দহনা বনেব গহন চাবী।
(উৎসর্গ। অগ্নিবীণা)

দিলওযাব তুমি জোব তলওযাব হানো।
(আনোযাব। অগ্নিবীণা)

মোবা আসবুকে ধীব হাসবুকে মব।
(বণভেবী)

তবে বাজছ দামামা, বাঁধছ আমামা, হাতিযাব শাণায
(বণভেবী)

আজ জল্লাদ নয, প্রহ্লাদ সম মোল্লা খুনবদন।
(কোববাণী)

সে কি দমাক দমাক ধমকি ধমকি
বণ ঝনঝন ঝন বণ বণ
হাকে লাখে লাখে। ঝাঁক ঝাকে ঝাঁকে।
লাল গৈবিক গায সৈনিক ধায তালে তালে
তাতা থৈ থৈ থৈ থৈ খল খল খল
নাচে বণ বঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে
ধ্বংসে মাতিযা, তাথিযা তাথিযা
নাচিযা বঙ্গে। চবণ ভঙ্গে।
(আগমনী)

প্রায সর্বত্র অনুপ্রাসেবও মধ্যমিলেব কাবণ হচ্ছে 'সুবহ্ উম্মেদ' : (জিঞ্জীব)

এল কি আবব আহবে আবাব মূর্ত মর্ত্য মোর্তজা ?
হিজবত কবে হজবত ফিবে এল এ মেদিনী মদিনা ফেব ?
সিজ্দা কবিল নিজ্দ হেজাজ আবাব কাবাব মসজিদে
মাজাব ফাড়িয়া উঠিল হাজাব জিন্দান ভাঙা জিন্দা বীব।
গাবত হইল কবদ হোসেন—
ঘোষিত ওহদ, 'আল্লা আহদ'—

মনে হল এল ভক্ত বেলাল—
বিরান মুলুক ইরাণও সহসা। ইত্যাদি।

কবি নজরুল ইসলামের কাব্যের দোষ-গুণ সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি, তা একালের রস-রুচি-চেতনা থেকেই উৎসারিত। আমাদের একালও অবশ্য অবসিত প্রায়, কেননা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে নতুন কালও শুরু হয়ে গেছে।

পঞ্চাশ বছর আগে নজরুল ও নজরুল কাব্যের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পরিমাপক ছিল ভিন্নরূপ। কালের ধারায় প্রজন্মে প্রজন্মে তাঁর এবং তাঁর কাব্যের ও সঙ্গীতের মূল্যায়নের পদ্ধতি, মান, মাত্রা ও মাপক বদলে গেছে। নজরুল জনপ্রিয় হয়েছেন, তাঁকে হিংসা-ঈর্ষা-ঘৃণা-অবজ্ঞা করার লোক নেই কেউ কোথাও। এখন পাঠক তাঁর অনু-অনুরাগী, তাঁর ভক্ত, এমনকি উদাসীন ব্যক্তিও তাঁর খ্যাতি-প্রভাবিত। এখন নজরুল মুসলিমদের গৌরব গর্বের কবি, ভারতের জাতীয় কবি, গণ-মানবের কবি, গণ-সংগ্রামের কবি, বিদ্রোহের কবি, বিপ্লবের কবি, প্রাচ্যের জাগরণের চারণ কবি, গানের কবি, সুরের কবি, জুলুমমুক্ত মানবতার কবি।

নিরক্ষর-আকীর্ণ দেশে এখনো পুরোনো রস-রুচির মানুষই অধিক। এখনো গণ মানব শোষণ-শাসন-পীড়ন মুক্তি প্রতীক্ষু। কাজেই নজরুল সাহিত্যের উপযোগ ও ভূমিকা এখনো আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। নজরুলের সঙ্গীত সুরের সমঝদারও অসংখ্য। অতএব আরো অনাগত অনেকদিন ধরে নজরুল এমনি নিত্য স্মরণীয় ও বরেণ্য হয়ে থাকবেন বাঙালাভাষী সমাজে।

কাজী নজরুল ইসলাম

হী রে ন্দ্র না থ মু খো পা ধ্যা য়

বছব বিশ পঁচিশ আগে 'সীমান্ত গান্ধী' বলে খ্যাত আবদুল গফ্ফর খান-এর 'দেশ' থেকে কয়েকজন আমার কাছে যখন আসেন, তখন স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনত... মূল্য হিসাবে দেশবিভাগের প্রসঙ্গ ওঠে (সীমান্ত গান্ধী ১৯৪৭ সালে ক্ষুব্ধ হযে গান্ধীজীর কাছে অনুযোগ করেছিলেন যে পাঠানদের তিনি ঠেলে দি...ছেন 'নেক্ড়ে বাঘের মুখে'), আব কথায কথায আমার মনে আসে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশযের ছড়া, "ভুল হয়ে গেছে বিলকুল / আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে / ভাগ হর্যনিকো নজরুল!" ছড়া শুনে সীমান্তপ্রদেশের পাঠান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে বিমল আনন্দ পেযেছিলেন তা মনে পড়ছে। অন্নদাবাবুর ছড়ার উদ্ধৃতিতে যদি ভুল করে ফেলে থাকি, তো তার দায় আমার স্মৃতিভ্রংশের।

এরই সঙ্গে মনে আসছে যা আমরা সবাই জানি, তবু বারবার তা স্মরণ করার দাম আছে। এই সেদিন নোবেলজয়ী অর্মত্য সেন-এর মুখে তা শোনা গিয়েছে, আর মনে পড়িয়ে দিয়েচে যে এখনও নানাভাবে আমাদের প্রায 'সর্ব কর্ম চিন্তা আর আনন্দের নেতা' হলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি একই সঙ্গে দুই স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা। দেশ ভাগ হযে গিয়েছে, কিন্তু নজরুল 'ভাগ' হন্‌নি, একই সঙ্গে বাংলাদেশের আর পশ্চিমবাংলার হৃদয়ের সম্পদ হযে রয়েছেন। আর এটাই সঙ্গত— রবীন্দ্রনাথ যে 'মহাভারতবর্ষ'-এর কথা বলেছিলেন, যা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয়েছিল আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশে পশ্চিম এশিয়া থেকে আসা ইসলামি তরঙ্গের অভিঘাতে। সেই মহাভারতবর্ষের দীপ্তি বিলীন হলে আমাদের ইতিহাসসঞ্জাত সত্তা বিকৃত হবে, ভবিষ্যত কলুষিত হবে।

সম্প্রতি 'কবিতা উৎসব' ইত্যাদি নিয়ে যে আলোড়ন দেখা গেল আর অনুরূপ কযেকটি উপলক্ষ নিয়ে কাব্যামোদী মহলে প্রায় মাদকতার প্রকাশ (কিছু পরিমাণে সুসঙ্গত হলেও) ঘটিয়েছে, সেই 'মচ্ছব' এর চাপে আমরা যে একই সময়ে নজরুল জন্মের শতাব্দীপূর্তি পালন করছি, তা শুধু বিস্মৃত নয়, প্রায় যেন সজ্ঞানে অনাদৃত ও অবহেলিত হয়েছে। স্পষ্টোক্তি অবশ্যই কাম্য, আর শুধু নজরুল কেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অতিভক্তির প্রাবল্যে ভেসে গিয়ে কঠোর সমালোচনা থেকে বিরত হবার লেশমাত্র বাধ্যবাধকতা নেই, তবে প্রয়োজনে একটু গভীর স্তরে, যথাযথ মর্যাদা দিয়ে আর স্থানকালপাত্র বিবেচনা করে সে কাজে নামা, আমার আশঙ্কা অমূলক হতে পারে, কিন্তু একটু যেন অস্বস্তি বোধ করেছি আর ভবিষ্যৎ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছি দেখে যে, নজরুল বিষয়ে একদা প্রচলিত 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি কামানোর' শ্লেষেরই এক অত্যাধুনিক অনতিসূক্ষ্ম পুনরুক্তি আজকের এই বিদগ্ধ অনীহা সৃষ্টি করেছে। 'কারার এই লৌহকপাট' (যা আজও মানবজীবনের অভিশাপ) ভাঙবার জন্য যদি 'হৈদরী হাঁক' দিতে হয় তো কবিতা কি বাতিল হওয়া অনিবার্য? কবি কি কখনও কম্বুকণ্ঠ হতে পারেন না,

'নিবিষ্ট' অনুভূতি প্রকাশ কি প্রায় স্বগতোক্তির ছাড়া সম্ভব নয়? 'মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক / শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে / কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী / নারী ঘাতী শিশুঘাতী কুৎসিত বীভৎসা প'রে / ধিক্কার হানিতে পারি যেন' — রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ কি ব্যর্থ, বর্জনীয়? বাইবেল্-এর কাহিনীতে Jericho নগরের প্রাকার অতিক্রমের জন্য কি প্রয়োজন হয়নি যথোপযুক্ত তূর্য নিনাদ? অকালে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার অভিশাপ বহন করলেন যে বহু বিচিত্র প্রতিভাধর মানুষটি তার সমগ্র বিক্ষিপ্ত জীবন ও বিপুল কীর্তির কথা স্মরণ করেও এই একান্ত মরমী অর্থাৎ দুঃসাহসিক ও নিয়ত সংগ্রামী বিপ্লবপ্রয়াসী ব্যক্তিত্বের গুণগানে যদি আজ কুণ্ঠা আসে তো প্রত্যবায় ঘটবে, বাঙালির সীমিত আকাশে এক দ্যুতিময় জ্যোতিষ্কেরই (ধূমকেতু নয়) অসম্মান করা হবে।

নজরুল কিছু পরিমাণে এই অসম্মান অনুমান করেই লিখে গেছেন, 'পরোয়া করি না বাঁচি কি না বাঁচি / যুগের হুজুগ কেটে গেল / মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি / রয়েছে সোনার শত ছেলে / বড়ো কথা বড়ো ভাব আসে নাকো / মাথায় বন্ধু বড়ো দুখে / দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি / তাই যাহা আসে কই মুখে / অমর কাব্য তোমার লিখিও যাহারা বন্ধু আছো সুখে।" এরপর যখন শুনি: 'প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় / তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস / যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।" তখন বুঝি যে বাঙালির মরমে স্থান পেলেও বিশুদ্ধ কবিকুল থেকে নির্বাসনদণ্ড পেলেন। কিন্তু এটাই কি দরদী বলেই যারা শ্রদ্ধার্ঘ্য তাদের বিচার।

নজরুলের কথা উঠলেই মনে পড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বহু বিশ্রুত Physics Theatre-এ অনুষ্ঠিত এক সভা (১৯২৩ সালে সম্ভবত) যেখানে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবাই তাঁকে দেখেছিলাম, শুনেছিলাম, গানের সঙ্গে তাল রাখার চেষ্টা করেছিলাম, গোটা 'হল' গম্ গম্ করে উঠেছিল অপরূপ এক 'মাতোয়ারা' প্রভাবে। 'বিদ্রোহী' নজরুল তখন 'যোদ্ধ-কবি' ইত্যাদি নামে খ্যাত, দীপ্তিময় তার উপস্থিতি, কেশে বেশে চলনে বলনে কেমন যেন চমক (আমাদের সেদিনের চোখে)। স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় গলা ছেড়ে অঙ্গভঙ্গী করে গাইলেন সরকারী কলেজের ছাদ যেন ভেদ করে: 'এই শিকল পরা ছল / তোদের এই শিকল পরা ছল / এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল"! হাতের কাছে নজরুলের কোনও লেখা নেই। 'সঞ্চিতা' বোধহয় হারিয়ে গেছে। তবু সেই পঁচাত্তর ছিয়াত্তর বছর আগে শোনা গান এখনও কণ্ঠস্থ রয়েছে: 'ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা / সে যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা / এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা / মোদের অস্থি দিয়ে জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।'

খাপছাড়া হয়ে পড়েছে লেখাটা। কিন্তু এরই সঙ্গে মনে পড়ছে বোধহয় ১৯৩৬ কি ১৯৩৭ সালে ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে গিয়েছি শিলচরে, যেখানে যমজ দুই ভাই একসঙ্গে গাইল উদ্বোধনী গান: 'বলো ভাই মাভৈ মাভৈ / নবযুগ ঐ এলো ঐ / এল ঐ রক্ত যুগান্তর!" সারা জমায়েত সোৎসাহে সাড়া দিল যখন তারা গেয়ে উঠল, "মোরা ভাই বাউল চারণ / মানিনে শাসন বারণ / জীবন মরণ পায়ের অনুচর রে" আর সেজন্যই 'খুঁড়বো কবর তুড়ব শ্মশান, মরার হাড়ে জাগাব প্রাণ" — থাক্ উদ্ধৃতি এমন সহজ সরল উদ্দীপক গান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও হাত থেকে অদ্যাবধি তো বেরোল না। আর অন্তত নজরুল সম্বন্ধে বিদগ্ধ কটাক্ষ তৎক্ষণাৎ নস্যাৎ হবে যদি কেউ উচ্চনাসা ভঙ্গিতে ফরমায়েসি রচনার মধ্যে 'আরোপিত মতাদর্শ' বা 'পঠিত বিশ্বাস'-এর অশুভ লক্ষণ নিয়ে বিদ্রূপ ও শ্লেষের পথে যায় প্রেম, প্রকৃতি, ধর্ম, দেশাভিমান, সর্ববিষয়ে নজরুল প্রতিভার অপ্রতিরোধ্য, অশান্ত, অবিকল, কিছুটা জেনেশুনেই বিশৃংখল (অর্থাৎ মাঝে মাঝে 'frothy' হলেও কখনও মূলতগতভাবে যা superficial নয়, ঝুটা তো নয়ই) প্রকাশ নিয়ে সুস্থ সুষ্ঠু চিন্তা চাই, যা এই শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে হয়তো কিছু পরিমাণে মিলবে।

বীরভূমে গ্রাম্য জীবন, 'লেটো'র দলে মিলে গান গেয়ে বেড়ানো, ধর্মস্থানে ঘুরে বেড়ানো, ছটফটে

কৈশোর কাটিয়ে অল্পবয়সী নজরুল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) কালে বাঙালি পল্টনে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিল এটা তার নিজেকে গড়ে তোলার ইতিবৃত্তে একটা বড়ো ঘটনা। লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা মিলেছিল তখনকার কালে যাকে বলা হত 'মেসোপটেমিয়া', সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের আরব সভ্যতার কেন্দ্রস্থল নানা বৈষয়িক কারণে তখন (এবং এখনও বহুলপরিমাণে) পশ্চিমী সাম্রাজ্যতন্ত্রের ক্ষুধার খোরাক (আজও সেই ঐতিহ্যের পরম্পরা বিদ্যমান)। তুর্কীর খলিফা গোটা মুসলিম দুনিয়ার অধিপতি আর ধর্মস্থানগুলির অভিভাবক বলে স্বীকৃত (কতকটা মুঘল যুগে 'দিল্লীশ্বর' আর জগদীশ্বর' কে যেমন এক ভাবা হত) আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী ইংরেজের শত্রুপক্ষে থাকায় পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান শক্তিপুঞ্জ যেন মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধের (crusades') চরমতম বিজয়ের উল্লাসে নেচে উঠেছিল। এরই ছায়া পড়ে ভারতবর্ষে, ১৯২০ ২২ সালে মহাত্মা গান্ধী দেশ জুড়ে তুমুল আন্দোলনের ঢেউ তুলতে পেরেছিলেন কারণ ইংরেজের হাতে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের দুর্গতি সারা দুনিয়ার মুসলমান মনকে প্রচণ্ড আঘাত করে আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবিরোধী অনুভূতির সঞ্চার করে। মওলানা আবুল কালাম আজাদের গুরু স্থানীয় 'হিন্দুস্তানের ইমাম' মহমুদ হাসান এই বিষয়ে ১৯১৭ ১৮ সালে ইংরেজ বিরোধিতার ডাক দেন, একদা বিখ্যাত Silk Letter Conspiracy' তার সাক্ষ্য বহন করে। গান্ধীজীর কথা ছিল যে আমাদের মুসলিম ভাইদের মন যখন ভারাক্রান্ত, তখন হিন্দুরাও কি সেই দুঃখের ভাগিদার হবে না, দুঃখ মোচনের চেষ্টায় নামবে না? যাক্ সে কথা। নজরুল এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন। শুধু যে মধ্যপ্রাচ্যের বিবিধ রত্ন সম্ভার বাংলা ভাষায় চিন্তায় গানে আর সর্ব উপায়ে মেলাবার চেষ্টা করলেন দেশে ফিরে নয়, তা ঐ আপাতস্বেচ্ছাচালিত 'বিদ্রোহী'র অপরিকল্পিত সাহিত্য জীবন তার সাধনায় ফুটে উঠেছিল।

সৌভাগ্যের কথা যে দেশে ফিরে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি আর 'সওগাত'-এর মতো পত্রিকা আর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর মতো সমর্পিতপ্রাণ সাম্যবাদীর সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তিরূপে কাজ করল, নজরুলের বাঁধন হারা উদ্দামতাকে কতকটা সংযত ও নির্দিষ্ট হতে সহায় হল। মুজফ্‌ফর হলেন এদেশে কম্যুনিজম-এর প্রায় যেন আদি সাধক, সেদিনের অন্ধকারে যেন কোন্ অদৃশ্য সূত্রে আলোর সন্ধান পেলেন (সোভিয়েত বিপ্লবের বৈরিতা তখন জগৎ জুড়ে জাঁকিয়ে রয়েছে) আর অকুতোভয়ে দু'একজন সাথী নিয়ে সলতে জ্বালিয়ে রাখলেন প্রায় নিভৃত প্রদীপে। একেবারে গোড়া থেকে মুজফ্‌ফর গান্ধী প্রমুখের নেতৃত্বে বীতশ্রদ্ধ শুধু নয়, বিরক্ত বিরূপ বিরুদ্ধবাদী। নজরুলের সঙ্গে তবুও তার অন্তরঙ্গতা ঘটল যা সর্বজনবিদিত, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যেন 'মিল নাই মিল নাই, তাই বাঁধিলাম রাখী'! তাই দেখি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন লিখলেন, "নগরের পথে রোল ওঠে আজ: গান্ধীজী! গান্ধীজী!" তেমনই নজরুল গেয়ে উঠলেন, 'কোন্ পাগল পথিক ছুটে এল। বন্দিনী মা'র আঙিনায় / ত্রিশ কোটি লোক সকল ভুলে গান গেয়ে আর সঙ্গে যায়!" কেউ যেন কখনও না ভুলি যে নজরুল ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে, বহুদিন ধরে তার মূল্যও দিয়েছিলেন, আর প্রাণান্ত করেছিলেন হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর প্রয়াসে— কে ভুলতে পারে নজরুলের উদ্দীপক 'স্বদেশী' গান আর "দুর্গম গিরি কান্তার মরু / দুস্তর পারাবার হে" র মতো মনমাতানো আহ্বান?

এই গান লেখা আর গাওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে (সিরাজগঞ্জ ১৯-২৩)। যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 'চুক্তি' সম্পাদন করে তার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক কলহের বিষ সমাজ দেহ থেকে উৎপাটনের লড়াইয়ে নেমেছিলেন। কিন্তু যদিও বা বাংলার জনমত তিনি সামলাতে পেরেছিলেন, তবু প্রচণ্ড প্রতিকূলতার চাপে এই 'চুক্তি' সর্বভারতীয় স্তরে গৃহীত হল না, বাংলাতেও এই উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না, আর সঙ্গে সঙ্গে (এটা অবধারিত সত্য) বপন করা হল সাম্প্রদায়িক হলাহলের বীজ, যার ফসল হল দেশবিভাগ। ভাবতেই লজ্জা হয় যে এমন ঘটনা ঘটতে পারল — আমাদের 'জাতীয়' সংগ্রামে 'গোড়ায় গলদ' যে কত বিকট, তার পরিচয় তো এতকাল পরে আজও আমরা পেয়ে চলেছি। আশ্চর্য কি, নজরুলের মতো মানুষ 'দেখিয়ে

শুনিয়া ক্ষেপিয়া' যে শুধু গেলেন তা নয়— একেবারে ভেঙে পড়লেন, যে বিদ্রোহীসুত' একদা ভৃগুর মতো ভগবানের বুকে পদচিহ্ন রেখে দেবার তেজস্বিতা দেখিয়েছিলেন, "ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবন ধনদীন"দেশে প্রাণসঞ্চারের বজ্রবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ('বিশুদ্ধ কবিতা' বলে তা স্বীকৃত না হোক্) সেই নজরুল সর্ব অর্থে জীবন্মৃত হয়ে রইতে বাধ্য হলেন জীবনেরই চাপে। তবু আশা করব পরিশুদ্ধ কাব্য বিচারে 'পাশ' করুন বা না করুন, যেখানেই বাংলা ভাষায় মানুষ কথা কয়, সেখানেই নজরুল বেঁচে থাকবেন যতদূর ভবিষ্যৎ তা হোক্ না কেন।

হয়তো অনেকের হাসির খোরাক হতে পারি কিন্তু নজরুলের কথা ভাবতে গিয়ে ভোলা যায় না সেসব দিনের কথা, যখন বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেখেছি সর্বত্র তার গানের আদর। পান বিড়ির দোকান থেকে আরম্ভ করে যত্রতত্র অতি সাধারণ মানুষের গলায় ঘুরছে নজরুলের গান। "কে বিদেশী, মন উদাসী / বাঁশের বাঁশি বাজায়ে বনে" / কিংবা "ঝিমিয়ে আসে ভোমরা পাখা / যূথীর চোখে আবেশ মাখা/ কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা/ ভোর গগনের দরদলানো" — এমন কত লাইন আমাদের মনে আজও ঘুরছে, যদিও জানি এর শিল্পমূল হয়ত প্রায় শূন্য— ঠিক জানি না, তবে হয়তো এটা বলছি 'জাতে ওঠা'র জন্য! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে স্বাধীন ভারতেই বিনা বিচারে, কারাবাসকালে মুজফ্‌ফর আহমদ, আবদুর রজ্জাক খান, আবদুল মোমিন প্রমুখ ডাকসাইটে কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছি— হয়তো মুজফ্‌ফর তুললেন নজরুলের কথা 'International' তরজমার কাহিনী, নজরুলকে নিয়ে 'লাঙল' এর (১৯২৫) কথা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ আর আলাপের ঘটনা। আর সঙ্গে সঙ্গে আবদুল মোমিন একেবারে অনভ্যস্ত গলায় গাইতে চেষ্টা করলেন: 'ভুলি কেমনে / আজও যেমনে / বেদনাসনে রয়েছে গাঁথা"। আর যেটা শুধু জেলখানায় সম্ভব (অনেকটা শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের বার্মাগামী জাহাজে 'কাবুলিওয়ালারাও গান গায়' আবিষ্কারের মতো!)। তা দেখা গেল, অর্থাৎ আমরা, তখনই যথেষ্ট পরিণত বয়স্ক গুরুগম্ভীর 'কম্যুনিস্ট' বলে পরিচিতরাই অক্ষম কণ্ঠে নজরুলের স্বদেশী গান (আর অন্য ধরনেরও) তুলে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম!

আগেই বলেছি নিজেকে হাসির খোরাক করে ফেলছি। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? নিজেদেরই নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে পারা একটা গুণ তো বটে— অন্তত যারা গোমড়া মুখে রাজনীতি বা সাহিত্য বা অন্য কিছু করে তাদের পক্ষে তো বটেই।

বড্ড উচ্চকণ্ঠ ছিলেন নজরুল -- যা আমার কাছে অরুচিকর নয়। গলা তো তুলতেই হয় যদি দরকার পড়ে "Scatter, as form an unextinguished hearth/ashes and sparks, my words before mankind"! নিজেরাই অন্তস্থলে জমে থাকা প্রতিভার জ্বালায় নজরুল যেন জানাতে চেয়েছিলেন নিজের দেশের কত কাল ধরে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে — জীবনের জয়গান যার প্রতি মুহূর্তের আবেশ, সে কি মরণের মতো 'অতি চুপি চুপি কথা' কইতে পারে? আর নজরুল তো রেখে গেছে অসংখ্য গান আর কবিতা নয়, তার গদ্যরচনা (স্বল্প হলেও) অকিঞ্চিৎকর নয়। আর এখানে আমার সময় ও সামর্থ্যের অভাব তার কবিকৃতির আলোচনা না করতে পারলেও বলব যে একটু ধৈর্য সহকারে নজরুল রচনার পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে সংস্কৃত কবিকুলের কাম্য 'উপমা' অর্থগৌরব' শব্দলালিত্যে' — এই ত্রিবিধ গুণের অসদ্ভাব তো নেই তাঁর কাব্যে। থাক সে আলোচনা — এ লেখাটা সাহিত্য বিচার নয়। শুধু আমার মতো দীর্ঘায়ু এক বাঙালির কিছু স্মৃতি নিয়ে কথার ছড়া। আবার বলি কী, বরাৎ আমাদের যে অন্তত এখানে 'আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে / ভাগ হয়নিকো নজরুল!'

প্রতিভার অভিশাপ : নজরুল প্রসঙ্গে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রতিভাবানরা সকলেই জগজ্জয়ী শক্তির অধিকারী হবেন এমন কোন নিয়ম নেই। প্রতিভার ছোঁয়াচটা লেগেছে, মানুষটা জ্বলেও উঠেছিল কিন্তু অল্পকাল জ্বলেই হঠাৎ নিবে গিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। আরম্ভটা যেমন চমকলাগানো, শেষটা আবার তেমনি মিয়োনো। যে কারণেই হোক শেষরক্ষা হয়নি। তাহলেও মানুষটা যে অসাধারণ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবেই। প্রতিভা জিনিসটাই বেহিসেবী ; ওকে সামলে রাখতে না পারলে হিসাবে গরমিল হয়ে যায়, আকাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় না। সামান্যটুকু করতে গিয়ে অনেকটুকু নিয়ে টান ধরে ; লাভ হয় যতখানি, ক্ষয় হয় তার চাইতে বেশি। ফলে সমস্ত শক্তিই অকালে নিঃশেষিত হয়। এই যে বেহিসেবী উড়নচণ্ডী প্রতিভা— এর দৃষ্টান্ত সকল কালে, সকল দেশেই দেখা গিয়েছে। দূরে যেতে হবে না, আমাদের হাতের কাছের দৃষ্টান্ত— কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। সে প্রতিভার ছাপ তাঁর সৃষ্টিকর্মে ততখানি নয়, যতখানি তাঁর ব্যক্তিত্বে। কবি ছিলেন কিন্তু খুব উঁচুদরের কবি তাঁকে বলব না। তাহলেও স্বভাব-কবির অনায়াস-লব্ধ উচ্ছলতা তাঁর কাব্যেব একটি উজ্জ্বলতা দিয়েছিল। মানুষটি যেমন প্রাণবন্ত ছিলেন, তাঁর কাব্যেও তেমনি একটা প্রাণবন্ত ভাব ছিল, সেটাই পাঠকের মনকে টানত। গান লিখেছেন অজস্র, সুরের বৈচিত্র্যে লোকের মন মাতিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় একাধারে গীতিকার এবং সুরকার কিন্তু নজরুল গীতিকে কখনই রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়নি। গান করতেন, খুব যে সুকণ্ঠ ছিলেন এমন নয়, তাহলেও এমন দরদ দিয়ে গাইতেন যে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতো। গুণগুলির কোনটাকেই অসাধারণ বলব না, কিন্তু সব মিলিয়ে গোটা মানুষটা অসাধারণ। একটা জ্বলজ্বলে ঝলমলে মানুষ। সেজন্যই একে ব্যক্তিত্বের প্রতিভা বলেছি। প্রতিভা-দীপ্ত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। নজরুলের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই এর সাক্ষ্য দেবেন।

প্রতিভাবানরা এমন কিছু কীর্তি রেখে যান যা শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকে। কিন্তু প্রতিভাবান হয়েও নজরুল এমন কিছু রেখে যান নি যা খুব দীর্ঘজীবী হবে। কারণ তাঁর প্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভের সুযোগই পায় নি। নজরুলের সাহিত্যিক জীবন বলতে গেলে মাত্র কুড়িটি বছরের। কুড়ি বাইশ বছরে শুরু, চল্লিশ বেয়াল্লিশে শেষ। একটি উল্কার মত অকস্মাৎ বাঙলার আকাশে দেখা দিলেন। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ গতিতে দীপ্ত শিখায় সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে অচিরে উল্কাটি ভূমিস্যাৎ হল। গতি স্তব্ধ হওয়া মাত্র তার আলোও নেই, তাপও নেই। একটি শীতল প্রস্তরখণ্ড মাত্র। আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্গীরণ করে ঝিমিয়ে পড়ে, কিন্তু পরে কোন সময়ে আবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করে অগ্নি বর্ষণ করতে থাকে। নজরুলের এক জ্বালাময়ী কবিতা এক সময়ে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের ন্যায় ঝলকে ঝলকে প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু একদিন যে সেই স্রোত স্তব্ধ হল, আর তাতে এতটুকু স্পন্দন ফিরে এল

না। নিজের আগুনেই নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে চিরতরে নির্বাপিত হল। প্রতিভা কারো হাতে আসে দেবতার বর হিসাবে, কারো কাছে অভিশাপ হয়ে। দৃষ্টান্ত আগেই দিয়েছি। একটা বিস্ফোরক পদার্থকে বহন করে চলা সব সময়েই বিপজ্জনক। যাঁরা স্থিতধী তাঁরা নীলকণ্ঠ। অর্থাৎ বিপদ তাঁরাও এড়াতে পারেন না, অনেক ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখ আঘাত সইতে হয়। তবে সে সমস্তই তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাই ঘটেছে। সকল ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে প্রতিভা তার মূল্য আদায় করে নেয়।

নজরুল মানুষটা এমন, প্রথম দর্শনেই চমক লাগিয়ে দিতেন। নিজেব কথা মনে পড়ছে, তখন আমি কলেজে ইনটারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র, বয়স সতেরো আঠারোর বেশি নয়। সে বয়সে অবশ্য সহজেই চমক লেগে যায়। তবে নজরুলেরই বা বয়স তখন কত ? তেইশ চব্বিশের বেশি নয়। কিন্তু এরই মধ্যে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে সারা দেশে সোরগোল বাঁধিয়ে দিয়েছেন। আমাদের হস্টেলে 'বিদ্রোহী' কবিকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। সুদর্শন মূর্তি, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, চোখে মুখে তারুণ্যের আভা। কথাবার্তায়, ভাবে ভঙ্গিতে, উচ্ছ্বসিত হাসিতে কোন একটি মানুষের মধ্যে এতখানি প্রাণের প্রাচুর্য এর আগে আমি দেখি নি। 'বিদ্রোহী' এবং 'কামাল পাশা' কবিতা আবৃত্তি করলেন, গান করলেন। অনুরোধ উপরোধের প্রয়োজন ছিল না, আপনা থেকেই একের পর এক গান গেয়ে গেলেন। হাসি গান কথা আপনা থেকেই যেন উপচে পড়েছিল। এই যে উপচে-পড়া ভাব এটাই তাঁর প্রতিভা। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের মধ্যে যেটুকু প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যেটুকু তার উদ্বৃত্ত সেটুকুর মধ্যেই তার শক্তির পরিচয়। নিজেকে তিনি নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি। অন্তর্নিহিত কোন শক্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। বালক বয়সে পাঠ্যাবস্থা থেকেই ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবন, প্রথম যৌবনে গিয়েছেন ইংরেজের হয়ে লড়াই করতে, ফিরে এসে সাহিত্য চর্চা, সেই সঙ্গে রাজনীতি, পরে সাংবাদিকতা। যে ইংরেজের হয়ে একদিন লড়েছিলেন সে ইংবেজের বিরুদ্ধেই রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ, পরে গীতিকার এবং সুরকার, শেষ পর্যন্ত যোগ সাধনা। কি যে চেয়েছেন, কিসের পেছনে ছুটেছেন কে জানে, মনে হয় তাঁর অস্থির অশান্ত চিত্ত শান্তি পায় না।

আমরা বাস্তুছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল।
আমরা করেছি টলমল
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল।

মনে হবে এ যেন নজরুলেরই বর্ণনা। অথচ নজরুলের বয়স তখন তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়। কবি তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন। বসন্ত অজস্রতার ঋতু— ফুলে ফলে রঙে গন্ধে আপনাকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে রিক্ত বসন্ত একদিন বৈরাগী হয়ে চলে যায়— সে উদাসীন, কারো দিকে সে ফিরেও তাকায় না। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গেও নজরুল জীবনের একটু যেন মিল আছে।

বলেছিলাম শান্তি পান না। নিজে শান্তি না পেলে কি হবে, অপরকে আনন্দ দিয়েছেন প্রচুর। প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি ছিল, এক সময়ে বহু লোক তাঁকে ঘিরে থেকেছে। যখন যার সঙ্গে মিশেছেন তারই মন জয় করে নিয়েছেন। নিজেকে দিতেও পারতেন নিঃশেষে। সমস্তই আত্যন্তিক, বিপদটা ওখানেই— সর্বমত্যন্তম্ গর্হিতম। বেহিসেবী উড়নচণ্ডী মানুষ, সব কিছুতেই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন— নিজের ইচ্ছায় নয়, সবই হয়েছে কোন প্রবল শক্তির তাড়নায় যার উপরে তাঁর কিছুমাত্র কর্তৃত্ব ছিল না। এমন নির্ভেজাল ভালো মানুষ যে, কোন কিছুকে বাধা দেবার বা ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অজাতশত্রু মানুষ। এখানে স্বভাবতই কল্লোল গোষ্ঠীর কথা মনে হবে। আমরা তখন ভাবতাম কল্লোলের আঙিনায় চমৎকার একটি সাহিত্যিক ব্রাদারহুড-এর সৃষ্টি হয়েছে। পরে দেখা গেল, তাঁদের

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনটা বড় ঢিলে। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কন নি, একে অন্যের সম্পর্কে অশোভন উক্তিও করেছেন। এক নজরুল সম্বন্ধেই কারো মুখে কোন নিন্দা শোনা যায় নি, তিনি কারো সম্বন্ধে কোন নিন্দার কথা কোন দিন উচ্চারণ করেন নি।

দোষে গুণে মিলিয়ে নজরুল এমন মানুষ ছিলেন যে, তাঁকে ভালবাসা খুব সহজ ছিল। দোষ-গুণগুলি সবই ছিল তাঁর আপন স্বভাবজাত। প্রতিভা যেমন স্বভাবজাত, প্রতিভাবানের দোষগুণও তেমনি। আগেই বলেছি, প্রতিভা জিনিসটা বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের ন্যায় অর্জিত ক্ষমতা নয়, শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়ের দ্বারাও লভ্য নয়। এ জিনিস প্রকৃতি-দত্ত, আপন স্বভাবের মধ্যে নিহিত। সাধ্য সাধনা করে একে পাওয়া যায় না। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'তোরা পারবিনে ফুল ফোটাতে'— প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়টি ঐ। প্রতিভাবানের পক্ষে যা সহজসাধ্য, বিদ্বান বা পণ্ডিতের পক্ষে তা শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। কারণ, প্রতিভা তার কল্পনার ডানা মেলে দিয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছোতে পারে, পাণ্ডিত্য বেচারী পায়ে হেঁটে (তাও আবার পুঁথির ঝাঁকা মাথায় করে) কখনো সেখানে গিয়ে পৌঁছোতে পারে না। ব্যাপারটা বারো আনাই স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু বাকি চার আনার জন্যে একটু-আধটু সাধ্যসাধনার প্রয়োজন আছে বইকি, নইলে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। নজরুলের প্রতিভা পরিণতি লাভ করেনি। কবি জীবনের প্রারম্ভে যে প্রতিশ্রুতি দেখা দিয়েছিল ক্রমবিকাশের পথে তা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। অর্ধপথেই গতি স্তব্ধ হয়েছে। যৌবনের দৌড় বড় বেশী দূর নয়। প্রতিভাবানদের বিষয়ে বলতে গিয়ে পশ্চিমী লেখক বলেছেন, Youth gives brilliance— যৌবনের দান চমক, ঝলক। Age gives fulness to that brilliance —প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ পরিণত বয়সের দান। বলেছেন, greatness comes with age - প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য চাই বয়সের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান-গাম্ভীর্য। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। পৃথিবীর সাহিত্যে একমাত্র কীট্সকে বলা চলে এর ব্যতিক্রম। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে তিনি যে পরিণত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই এমনটি আর ঘটেনি। শক্তির পরিণতিতে বয়স বা সময়ের একটা মস্ত বড় ভূমিকা আছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। নজরুলের বেলায় অঘটন ঘটল, মাঝপথে সময় স্তব্ধ হয়ে রইল। বয়স বাড়ল কিন্তু তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেলেন। পরিণতি লাভ তো দূরের কথা, একেবারে যে ভরাডুবি হল সেও তাঁর বেপরোয়া স্বভাবের দরুণই বলতে হবে। জীবনযাত্রায়, সংসারযাত্রায় কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলাটা নিরাপদ। নজরুল নিরাপদ পথে চলতে জানতেন না, কোন ব্যাপারেই মাত্রাজ্ঞান ছিল না—সংসারী মানুষ ছিলেন কিন্তু ঘর সংসারের কথা ভাবেন নি; গান করতে বসেছেন তো আহার নিদ্রা ভুলেছেন; সাহিত্যচর্চা করেছেন তো অর্থোপার্জনের কথা ভাবেন নি, রাজনীতি করেছেন তো রাজশক্তির পরোয়া করেন নি, রাজদ্রোহের দায়ে পড়েছেন।

অনেক ব্যাপারেই তাঁকে সামলে রাখা কঠিন ছিল। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি আশ্চর্য সংযম এবং অবিচল দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতাকে তিনি কোনকালে প্রশ্রয় দেননি। ধর্মবিরোধ তাঁর কবিধর্মে এতটুকু আঁচড় বসাতে পারেনি। সর্বান্তঃকরণে কবি ছিলেন বলেই বিভেদমূলক কোন চিন্তা কোন কালে তাঁর মনে স্থান পায়নি। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। কোন কবিকে জাতীয় কবির আখ্যা পেতে হলে সমগ্র দেশের এবং জাতির জাতির ট্রাডিশনকে যথাসাধ্য আত্মসাৎ করতে হয়। এ দেশের হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রীস্টান ট্র্যাডিশনকে সমগ্র ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেজন্যে খুব ন্যায্যভাবেই তিনি ভারতের জাতীয় কবি হিসাবে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিল একমাত্র নজরুলই ভারতীয় ঐতিহ্যের যে সামগ্রিক রূপ তার প্রতি যথাযোগ্য আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এক সময়ে তিনি যে কবি হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁর মূলে ঐ ট্র্যাডিশন—নিষ্ঠা। জীবনে এবং সাহিত্যে নজরুল বাঙালী এবং ভারতীয়— এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন পরিচয় ছিল না। জীবনের যে দেশজ রূপ তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা কবি মানুষদের স্বভাবগত। আচারে

ব্যবহারে উৎকট রকমে সাহেব এবং ধর্মবিশ্বাসে খ্রীষ্টান হয়েও মাইকেল তাঁর কাব্যের প্রকরণ ভারতীয় মিথলজি থেকেই সংগ্রহ করেছেন। শেক্সপীয়ারের নাটকে স্থান কাল পাত্রের যে সমাবেশ তার বৃহত্তর অংশের সঙ্গে ইংলণ্ড বা ইংরেজ জাতির কোন সম্পর্ক নেই। তথাপি তিনি যে জীবনের কবি এঁকেছেন তা একান্তভাবেই ইংরেজ জীবন। সকল দেশেরই মহাকবির কাব্যে জাতীয় জীবনের নিখুঁত চিত্র প্রতিফলিত। অবশ্য তাই বলে নজরুলকে আমি মহাকবি বলছি না, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল তাতে তিনি মহাকবি না হলেও মহৎ কবি হতে পারতেন। দুর্দৈববশত সে দাবিও তিনি পুরোপুরি পালন করে যেতে পারেন নি।

প্রতিভা কোন মানুষকে অতি মাত্রায় আত্ম-সচেতন করে তোলে, আবার কোন মানুষকে নিতান্তই আত্মভোলা করে দেয়। নজরুল ঐ আত্মভোলার দলে, আপন শক্তি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অবশ্য এই ঔদাসীন্যেরও একটা সৌন্দর্য আছে। রূপ, গুণ, মান মর্যাদা, ধন ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যে মানুষ উদাসীন তিনি সাধারণের বহু উর্ধ্বে এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু এর অপর দিকটাও আছে— শক্তি সামর্থ্য যাঁর আছে তিনি বিষয়ে উদাসীন থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি যে শক্তিকে যথোচিত মর্যাদাই দিচ্ছেন না। অবমানিত শক্তি তখন তার প্রতিশোধ নেয়। প্রতিভাকে কেবলমাত্র দেবতার বর হিসাবে দেখলে হয় না, একে এক বিরাট দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ কবতে হয়, নতুবা বিপত্তি ঘটে। আমরা কথায় বলি, শাপে বর হল কিন্তু দেবতার বরও যে অভিশাপ হযে দেখা দিতে পারে প্রতিভাবানদের বেলায বারম্বার তা দেখা দিয়েছে। যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে না পারলে প্রতিভা ব্যুমেরাং-এর ন্যায় ঘুরে এসে অধিকারীকেই আক্রমণ করে। প্রতিভাবান তখন হয় প্রতিভার ভিকটিম্। প্রতিভার আপাত-মোহিনী মূর্তি দেখে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু সে যে অকস্মাৎ ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করতে পারে সে কথা আমাদের মনে থাকে না। দেবতার বরই বলি, আর প্রকৃতির দানই বলি, একে গ্রহণ করতে হয় অতি সাবধানে। কারণ যেমন তার তাপ, তেমন তার ধার, তেমনি তার ভার। সকলে তা সহ্য করতে পারে না। সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের সেই কবি যিনি প্রতিভার অগ্নিপরীক্ষায জয়ী হয়েও বলেছেন—

এ তো মালা নয় গো, এ যেন তোমার তরবারি!
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্র-হেন ভারী,
এ যে তোমার তরবারি।

ঢাকায় শেষ দিনগুলি

কল্পতরু সেনগুপ্ত

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময়ে নজরুল ইসলাম বাক্‌শক্তিহীন ছিলেন। তার স্বাভাবিক চেতনা ছিল না, তথাপি পূর্ব পাকিস্তানের আমলে থেকে কবিকে ঢাকায় বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা বেসরকারী ভাবে কেউ কেউ বলতেন। তখনো সরকারীভাবে ঘোষিত না হলেও তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদার কথা চিন্তা করা হতো। এর বিপরীত আরেকটি দিক ছিল — জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েও তার গান ও কবিতার অঙ্গচ্ছেদ করার চেষ্টা হতো হিন্দুয়ানীর অভিযোগে। এভাবে যথেচ্ছ শব্দ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত কম ছিল না। পাকিস্তান আমলে 'নওবাহার' পত্রিকায় নজরুলের সমালোচনায় কবি গোলাম মোস্তফা লিখেছেন : "নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নজরুলের সবচেয়ে বড় অপবাদ যদি কিছু থাকে, তবে এই।... পাকিস্তানের কবি হওয়া দূরের কথা, নজরুল ছিলেন ঘোর পাকিস্তান বিরোধী।

তিনি গাহিয়াছিলেন 'অখণ্ড ভারতের গান', তিনি দেখিয়াছিলেন হিন্দু মুসলিম কৃষ্টির 'হরগৌরী রূপ।' মুসলিম জাতির জন্য তিনি নতুন করিয়া কিছু ভাবেন নাই।... তিনি ছিলেন আগে ভারতবাসী, পরে মুসলমান। মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি যত কবিতা ও যত গান লিখিয়াছেন, সমস্তই ভারতীয় মার্কা।... আপন আপন জাতীয় ঐতিহ্য ও রূপায়ণই তো কবি সাহিত্যিকের ধর্ম। কবি নজরুল ইসলাম এখানে চরম পরাজয় মানিয়াছেন।.... ইসলামের আলোকে দেখিলে দেখা যায়, ইসলামের সনাতন আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা তার কাব্যে আছে।"

নজরুল ইসলাম দ্বি জাতিতত্ত্ব সমর্থন করতেন না। 'নবযুগ' (১৯৪১)-এ তাঁর বিখ্যাত সম্পাদকীয় "পাকিস্তান না ফাঁকিস্থান" রচনায় তার চিন্তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে জাতিতত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক মনে করতেন। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় আমৃত্যু তিনি ভারতীয় থাকতেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস তাঁর জীবনাবসান হয়েছে ঢাকায় বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে। অবশ্য তাঁর অজ্ঞান অবস্থায় নাগরিকত্বের ছাপটা দেওয়া হয়েছিল। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে দেশ ভাগ হলেও রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলকে ভাগ করা যায়নি। তাঁরা দুই রাষ্ট্রেরই জনমনে জাতীয় কবির মর্যাদার আসনে ছিলেন, এখনো আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় অকল্পনীয় রক্তপাতের ভিতর দিয়ে। সেদিন রণসঙ্গীত ছিল নজরুলের গান, প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রের স্বদেশী গানে। পাকিস্তানের প্রভুত্বের শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সম্মানজনক স্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গে। বাংলাদেশ

সবকাবেব পক্ষে তাব অনুবোধে ভাবত সবকাব কাজী নজরুলকে বাংলাদেশে পাঠাতে বাজী হয়। উদ্দেশ্য ছিল দুই বাংলাব মধ্যে মৈত্রীব সম্পর্ক বক্ষা কবা। সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৯৭২ সালেব জন্মোৎসব পালিত হবে বাংলাদেশেব ঢাকায়। কবি তাব পবিজন সহ একবছব বাংলাদেশে থাকবেন। ১৯৭৩ সালেব জন্মদিনে কবি উপস্থিত থাকবেন ভাবতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা যায়, দেশ ভাগেব পবে ১৯৫৭ সালে কবিকে ঢাকায় নিয়ে যাবাব জন্য প্রস্তাব এসেছিল। বুলবুল একাডেমী নজরুল সঙ্গীত সম্মেলন কবাব আযোজন কবেছিল। প্রস্তাব এসেছিল কবি ও তাঁব পবিবাবেব লোক এবং কলকাতাব বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দসহ মোট ২৫ জন ঢাকায় ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভাবত সবকাব কবি ও প্রমীলাদেবী ছাড়া মোট ২৩ জনেব পাশপোর্ট মঞ্জুব কবে। সুতবাং বুলবুল একাডেমীব নজরুল সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। সে সময়ে ভাবতেব প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জহবলাল নেহেরু। পাকিস্তানে ভাবতেব ডেপুটি হাইকমিশনাব ছিলেন এস. সি. দেশাই। সম্ভবত তাবই বিপোর্টে কাজী নজরুল ও প্রমীলাদেবীব পূর্ব পাকিস্তান যাওয়া ভাবত সবকাবেব অভিপ্রেত ছিল না। শ্রীদেশাই অনুমান কবেছিলেন কবিকে একবাব ঢাকায় নিয়ে গেলে নানা টালবাহানায় সেখানে বেখে দেওয়া হতে পাবে। তাঁব অনুমান যে অনর্থক নয় পববর্তী সময়ে তা প্রমাণ হয়েছে। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় নিয়ে যেতে ভাবত সবকাব সর্বতোভাবে সহযোগিতা কবে। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিবা গান্ধী।

১৯৭২ সালেব ২৪শে মে কবিকে নিয়ে বাংলাদেশেব একটি বিমান বেলা ১১ ৪০ মিনিটে তেজগা বিমান বন্দবে অবতবণ কবে। বিমান বন্দবে বিপুল সংখ্যক নবনাবী কাবকে সম্বর্ধনা জানান। জনতা উৎসাহেব সঙ্গে জযধ্বনি দিতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবব বহমান, প্রধান বিচাবপতি আবু সাঈদ চৌধুবী কবিকে অভ্যর্থনা প্রদান কবেন। কবিকে মাল্যভূষিত কবতে গিয়ে প্রধান বিচাবপতি বলেছেন : "আমি এসেছি সাতকোটি বাঙালী আব বাংলাদেশ সবকাবেব তবফ থেকে মহান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে।"

কবি নজরুলেব বাংলাদেশে আগমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমবা নজরুলেব কাছ থেকে অশেষ অনুপ্রেবণা লাভ কবেছি। তিনি আবো বলেছিলেন "নজরুলেব কাব্যসম্ভাব, গীতিমাল্য, স্ববলিপি ও অন্যান্য বচনা সংবক্ষণেব দাযিত্ব দেশেব বুদ্ধিজীবী সমাজকে গ্রহণ কবতে হবে।"

ধানমণ্ডীতে কবিব জন্য ২৮ নম্বব সড়কে বাসস্থানেব ব্যবস্থা কবা হয়েছিল। কবিব জন্য মাসিক এক হাজাব টাকা ভাতা, নার্স ও ডাক্তাব মঞ্জুব কবা হয়েছিল।

সাহিত্যে বিশেষ অবদানেব স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ সালেব ৯ই ডিসেম্বব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয কবিকে সম্মানসূচক ডক্টবেট ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবেব আযোজন কবেছিলেন। সম্মানপত্রে লেখা হয়েছিল।

"দেশকালেব জবা শোক অবক্ষয অন্ধকাবকে নীলকণ্ঠেব মত ধাবণ কবে প্রজ্জ্বলন্ত আকাঙ্খাব, আনন্দেব, সংগ্রামেব আলোকিত চেতনাকে যাঁবা বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম তাবাই মহৎ। তেমনি এক মহৎ প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ নিযন্ত্রিত বাংলাব অসম্পূর্ণ পুনর্জাগবণেব আহৃত সকল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন নষ্টস্বপ্নে মজ্জমান, তাদেব চেতনাস্রোত যখন অন্ধকাব বৃত্তে আবর্তিত, বাংলা সাহিত্যে তখন আপনাব আবির্ভাব প্রমিথিউসেব মত।

আপনাব অত্যুজ্জ্বল আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যেব প্রাণে ও শবীবে সঞ্চাব কবেছিল বিপুল তাকণ্যেব ঐশ্বর্য, বেগেব আবেগ, গতিব উচ্ছ্বাস, স্বাস্থ্যবান কল্পনাব উদ্দামতা। আপনি কবি; এবং আপনাব কবি প্রতিভাব প্রাণশক্তি বাঙালী জীবনেব বৃহত্তব ঐতিহ্যিক-ঐক্যে ছিল প্রতিষ্ঠিত। সে কাবণেই আপনাব সৃষ্টি নিপীড়িত জন-মানুষেব আকাঙ্খাব, সম্ভাবনাব, প্রতিবাদেব, বিদ্রোহেব ব্যতিক্রমী উচ্চাবণ। আপনাব সাহিত্যে কর্ম সত্যসুন্দব আব মানবতাব উচ্চকণ্ঠ শিল্পরূপ। আপনি ছিলেন আপসহীন সত্যাসন্ধ কবি।

ব্রিটিশের রাজরোষ, কারাগার আপনাকে বন্দী করেছে, কিন্তু অকুতোভয় আপনি দ্বিগুণ আনন্দে প্রজ্জ্বলিত হয়েছেন সত্যের সপক্ষে। আপনি সর্বহারার সাম্যবাদী কবি, কল্যাণ আর প্রেমসাধনার কবি। তাই আজ পর্যন্ত আপনি জনগণ প্রিয় কবি, এবং আপনিই সমকাল ও শিল্পরীতির সাথে ঘটিয়েছেন বিস্ময়কর একান্ত সমন্বয়।

কেবলমাত্র জীবনের বহিরঙ্গ সংলাপে নয়, অন্তরঙ্গ অস্তিত্বে আপনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। মানুষের ধর্মে, আত্মশক্তির আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতায, প্রবন্ধে, সঙ্গীতে আপনি তরুণ সমাজকে মানবতার উদার আদর্শে প্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙালী জাতির সাম্প্রদায়িক সংকটে আপনার লেখনী ছিল সদাসতর্ক, সৃষ্টিশীল ঐক্যবদ্ধ আত্মশক্তির উদ্বোধনে নিরলস।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনিই একমাত্র কবি প্রতিভা যিনি ঐতিহ্য সন্ধানে এবং নির্মাণে ছিলেন স্বচ্ছন্দ, নির্দ্বন্দ্ব। হিন্দু ও মুসলমান, জাতিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ঐতিহ্যকেই আপনি আপনার স্বায়ত্তশাসিত চেতনার শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। আপনার জীবন সম্পৃক্ত ঐতিহ্যবোধ, ধর্মকথার সীমাবদ্ধতা থেকে ঐতিহ্যকে মুক্তি দিয়েছে। আপনি বাঙালীর ঐতিহ্যের পুর্ননির্মাতা, নবভাষ্যকার। আপনি ছিলেন শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারের বিস্ময়কর কারুশিল্পী। গ্রন্থবদ্ধ এবং অভিজাত শব্দ-শৃঙ্খলিত সীমানাকে আপনি প্রসারিত করেছেন মৌখিক শব্দ সম্ভারের এলাকায, কখনো বা বিদেশী ভাষার সীমানায়। আপনার কবি[illegible]ভার প্রবল আবেগে বিচিত্র উৎসের শব্দাবলী ব্যঞ্জনায় হয়েছে পুষ্পিত। সঙ্গীত জগতে আপনার অবদান অতুলনীয, বিচিত্রধর্মী ও স্বতন্ত্র। আপনার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সর্বকালের বাঙালীকে করবে উদ্দীপিত, উদ্বোধিত। আপনি কেবল বিপুল সংখ্যক গানের রচয়িতাই নন, সুরের সৃজনী শক্তিতে আপনি সঙ্গীত জগতের নতুন পথ-নির্দেশক। আজও আপনি বাঙলাদেশের বিচিত্রমুখী সঙ্গীতের অনতিক্রমণীয় নিরীক্ষাধর্মী সার্থক সুরকার।

আমাদের দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ বত্রিশ বছর আপনি স্তব্ধ। আপনার দু'দশকের সৃষ্টি সম্ভারের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্বের উত্তরাধিকারের সৌভাগ্যে চিরকৃতজ্ঞ বাঙালী জাতি নিয়ত প্রার্থনা করে যে, আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠেন। আজ আপনাকে সম্মান জানাবার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।"

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের কারাগারের অভ্যন্তরে গুলি চালিয়ে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। নজরুল ইসলামকে যাঁরা আগ্রহে ঢাকায নেওয়া সম্ভব হয়েছিল তিনিই যখন নিহত হয়েছেন এবং গণতন্ত্র বিধ্বস্ত হয়েছে তখন আর তাঁকে ঢাকায রাখা কেন ? এই প্রশ্ন তখন পশ্চিমবঙ্গে অনেকের মনে উঠেছিল। কিন্তু ভারত সরকার কোনরূপ কথা বলেনি। সরকারের কাছে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গে নজরুল-একাদেমি ও কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল নজরুলকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ভারত সরকার কোন চিঠির জবাব দেয়নি। ভারত সরকার নজরুলকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা দূরের কথা, একবারও বলেনি যে ভারতের নাগরিক ও জনগণের কবিকে তাঁরা বাংলাদেশকে দান করেছেন। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল নজরুলের উপস্থিতিতে পাল্টা-পাল্টিভাবে এক বছর ঢাকায় আরেক বছর কলকাতায় নজরুলের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই কথা ভারত সরকার একবারও তুললেন না, বাংলাদেশ সরকারও নীরব থেকে ১৯৭৬ সালের জানুযারী মাসে নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দান করলেন।

বাংলাদেশে কবিকে যথেষ্ট সম্মান ও যত্নে রাখা হয়েছিল, চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত ছিল। চিকিৎসক টিমের তত্ত্বাবধানে তাঁকে রাখা হয়েছিল। ঢাকায় নজরুল চর্চার দিকটাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নজরুল চর্চার নামে অশালীনতার দিকটাও দৃষ্টিতে পড়ে। যেমন নজরুলের ব্যক্তিগত জীবন, প্রেম-প্রীতি স্নেহের

ভুল ব্যাখ্যা করে এমন বই প্রকাশ হয়েছে যাতে মনে হবে নজরুল বুঝি একজন প্রেম পাগল লোক ছিলেন। বাংলাদেশে এটাও এক গবেষণার বিষয় হয়েছে, তিনি কতজন নারীর সঙ্গে প্রেম করেছেন। নজরুল সজ্ঞানে কোন বিশেষ ধর্মমতের অনুসরণ করেন নি, নামাজ রোজার দিকেও যাননি। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী, সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। এজন্য ব্যক্তিগত জীবন ছিল স্বতন্ত্র, ধর্মীয় শাসনের উর্ধ্বে। কিন্তু বাংলাদেশে গবেষণার নামে কেউ কেউ তাঁকে কেবল মুসলমান বানাবার কি চেষ্টাই না করে যাচ্ছেন। যে কবির শ্যামা-সঙ্গীত ও কীর্তন মুসলমানবা শোনে ও গায়, যাঁর ইসলামী গান হিন্দুরা শোনে ও চর্চা করে, যিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় আনতে পেরেছেন, ভবিষ্যতে এই মিলন আরো প্রসারিত হবে, তাঁর গায়ে ধর্মের ছাপ লাগাবার অপচেষ্টা কেন ? তিনি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে সকল মানুষের প্রতিনিধি, মানবিকতার পূজারী, ধর্মনিরপেক্ষতার একজন আদর্শ পুরুষ, এটাইতো যথেষ্ট এবং শ্রেয়তর পরিচয়। নজরুলকে ভক্তি করেন অথচ নজরুলের হিন্দু স্ত্রীকে স্বীকার করতে কারো কারো আপত্তি। কুমিল্লায় যে গৃহে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম সেই বাড়িটি অবাঞ্ছিত অবস্থায় রয়েছে। সরকারী বোর্ডে লেখা আছে এই বাড়িটিতে পুলিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট নজরুলকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। প্রমীলাদেবীর পিতৃগৃহ এবং বাড়িটির সঠিক পরিচয় পর্যন্ত লেখা হয়নি। অথচ ধর্মীয় কুপমণ্ডুকরা নজরুলকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ এই অসম্মান কি করে সহ্য করছেন বুঝি না।

১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাঁকে ঢাকাব পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করেন ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। ২৯শে আগস্ট, রবিবার সকাল থেকে জ্বর বাড়ার দিকে, ১০৫° ডিগ্রীর উপর। চিকিৎসকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন জ্বর কমাবার জন্য। সকাল দশটার দিকে কবি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। দশটা-দশ মিনিটে তাঁর জীবনাবসান হয়।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে নরনারী আসতে থাকেন কবিকে শেষ দর্শনেব জন্য। সারা শহরে শোকের ছায়া নামে। ১১৭ নম্বর বেডেব সামনে দর্শন প্রত্যাশীরা যাচ্ছেন। সবাই যাতে কবির মরদেহ দেখতে পায় আউটডোরের দোতলার হল ঘরে উঁচু মঞ্চে রাখা হয়েছিল। কবরের স্থান বাছাই করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে। জানাজার নামাজে সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেন। জুনিযার টাইগার নামে পরিচিত সেকেণ্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিউগলে শেষ বিদায়ের করুণ সুর তোলে। একুশবার তোপ ধ্বনির সাথে কবির নশ্বর দেহ কবরে সমাহিত হয়। বিউগলে বেজে উঠে লাস্ট পোস্টের করুণ সুর। সত্যই জাতীয় কবির মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টি কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশে দুই দিন জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়, একদিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়।

কবির জীবনাবসানের অপ্রত্যাশিত সংবাদ কিছুক্ষণের মধ্যে ভারতে এসে পৌঁছয়। খবরের কাগজের অফিসগুলিতে টেলিপ্রিন্টারে এই দুঃসংবাদ এসে যায়। সংবাদপত্র অফিস থেকে সংবাদটি কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিস থেকে কবিপুত্র কাজী সব্যসাচীকে জানান হয়, এবং তাঁকে ঢাকা যাবার ব্যাপারে বিমানের সুযোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধের স্ত্রী কল্যাণী কাজী বিলম্ব না করে প্রথমে ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসে, তারপরে বিমান বন্দরের দিকে রওনা হন। যাবার আগে তাঁর বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার অফিসের মাধ্যমে ঢাকায় অনুরোধ বার্তা পাঠিয়েছিলেন কবির মরদেহ বিশেষ বিমানে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার জন্য। কবিপত্নী প্রমীলাদেবীর অন্তিম ইচ্ছা ছিল কবির সমাধির পাশে যেন তাঁকে কবর দেওয়া হয়। এই ইচ্ছানুযায়ী চুরুলিয়ায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে এবং কবি পত্নীর পাশে নির্দিষ্ট স্থান রাখা হয়েছে। কিন্তু কবি পত্নীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। সব্যসাচী এবং কল্যাণীদেবীকে দমদম বিমান বন্দরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তারপর বিমানে ওঠার পরেও বসিয়ে রাখা হয়। বিমান ছাড়তে অস্বাভাবিক দেরীর

জন্য তাঁরা ঢাকায় পৌঁছবার কিছুক্ষণ আগে কবির অন্ত্যেষ্টিকার্য শেষ হয়ে যায়। সমাধি স্থানে পৌঁছে সব্যসাচী কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন-- আমার পিতাকে শেষবারের মত দেখার সুযোগ দিলেন না আপনারা। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সব্যসাচী বলেন--- আমার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর কবরের পাশে স্থান নির্ধারিত ছিল বাবার কবরের পাশে। তারপরে শোকার্ত পুত্র কবরের মাটি আঁকড়ে ধরেন। কবরের মাটি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সেই মাটি প্রমীলাদেবীর কবরের পাশে রাখা হয়েছে। নজরুল একাডেমী চুরুলিয়া, সেইস্থানে প্রমীলাদেবীর সমাধিকে যুক্ত করে স্মারক নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পুত্রকে তাঁর শেষ কাজ করার সুযোগ না দিয়ে তড়িঘড়ি কবর দেওয়ার পেছনে কোন কারণ ছিল জানি না। বিশেষ করে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের মত বিখ্যাত ব্যক্তি যেখানে উপস্থিত করেছিলেন প্রমীলাদেবীর শেষ ইচ্ছার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। কাজী সব্যসাচী যদি পিতার মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আসার কথা সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন তা হলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে নৈতিক অসুবিধা দেখা দিত। সম্ভবত এই কারণে কাজী সব্যসাচী পৌঁছনোর পূর্বেই অন্ত্যেষ্টিকার্য দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

কলকাতায় টেলিপ্রিন্টারে খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমীর সম্পাদক কল্পতরু সেনগুপ্ত, সহ-সম্পাদক মজহারুল ইসলাম এবং সদস্য জিয়াদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে যান, এবং লিখিতভাবে অনুরোধ করেন কবির মরদেহ কলকাতায় পাঠাবার জন্য, তিনি ভারতের নাগরিক। তাঁর কবি জীবনের বিকাশ পশ্চিমবঙ্গে। ডেপুটি হাই কমিশনার অফিসের জনৈক অফিসার বলেছিলেন রেডিওগ্রামে এই পত্রের বিষয় ঢাকায় জানানো হচ্ছে। আরেকদিকে চুরুলিয়ায় নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক কাজী রেজাউল করিম, কাজী মজাহার হোসেন ও কয়েকজন সদস্য আসানসোলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে অনুরোধ করেন কবির মরদেহ কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করতে। তিনি সেদিন আসানসোলে ছিলেন। শ্রীরায় বলেন --- এটা তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। তবে তিনি দিল্লীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ইতিমধ্যে সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জীকে কবির মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক অনুরোধ করেন তিনি উত্তরে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে এই প্রস্তাব জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী তখন আসানসোলে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে টেলিপ্রিন্টারে দেখা গেল সুব্রত মুখার্জী বিবৃতি দিয়েছেন কবির মরদেহ কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার দাবী করে। তখন সময় বেলা একটা। এই বিবৃতি টেলিপ্রিন্টারে দেখে সংবাদপত্র অফিসে সকলে আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু বেলা দুটো বাজতেই দেখা টেলিপ্রিন্টারে কয়েকবার Top priority লাইন দেখা গেল। জরুরী সংবাদ দেবার জন্য যে সঙ্কেত দেওয়া হয়। তারপর তিনবার ফুটে উঠলো Kill-Kill Kill সঙ্কেত বাক্য। এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের পর টেলিপ্রিন্টারে নির্দেশ এল সুব্রত মুখার্জীর বিবৃতি যেন প্রকাশ করা না হয়। এই বিবৃতি বাতিল গণ্য করতে হবে। সুতরাং কবির মরদেহ ভারতে আনার প্রসঙ্গ এবং সুব্রত মুখার্জীর বিবৃতির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ হল না। কাজী সব্যসাচী, সুব্রত মুখার্জী এবং নজরুল একাডেমী যে কবির মরদেহ ভারতে আনার দাবী করেছিলেন একথা চাপা পড়ে গেল, কেউ কোন দিন তা জানলো না।

কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় শায়িত আছেন, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে শায়িত আছেন। সান্ত্বনার কথা যে দুই জনের স্মৃতি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আজ সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনা করেছে। নজরুল ইসলাম মৃত্যুর পরেও তাই দুই বাংলার মিত্রতার মাধ্যম হয়ে আছেন।

কাজীদার স্মৃতি

রা ম কু মা র চ ট্টো পা ধ্যা য়

গ্রামোফোন কোম্পানিতে ঢুকে কমলদার উদ্যোগে কাজী নজরুলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলেও তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পাই রেডিওতে।

তখন রেডিও আপিসে আমার যাতায়াত প্রায় রোজকার ঘটনা। শুধু আমি নই, আমাদের একটা দলই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সাঙ্গীতিক দল। তাতে থাকতুম আমি, চিত্ত রায়, দুর্গা সেন, নিতাই ঘটক, গোপেন মল্লিক। আর আমাদের গুরু হয়ে উঠেছিলেন কাজীদা। রেডিওতে তখন প্রায়ই একটা উপলক্ষ্ক বার করে নিয়ে অনুষ্ঠান হত। বলা হত— স্কেচ প্রোগ্রাম। কালীপূজো, দুর্গাপুজো, বড়দিন, হোলি এইসব আর কি। সেসব অনুষ্ঠানের জন্য গান তৈরি করতেন কাজীদা। গাইতাম আমরা সবাই মিলে। ওইরকম একটা স্কেচ প্রোগ্রামের প্রস্তুতি লগ্নে কাজীদার শিল্পীসত্তাকে অদ্ভুতভাবে আবিষ্কার করেছিলুম।

হোলি বা দোলযাত্রার স্কেচ প্রোগ্রামের প্রস্তুতি চলছিল জোর কদমে। কাজীদা আমোদিত হয়ে আছেন সুর বাণীর ছন্দে। দোলের জন্যে গান বাঁধাও হয়েছে চমৎকার। কথাটা ছিল।

'রঙীলা আপনি রাধা তারে হোলির রঙ দিও না'

সে রিহার্সালে সুপ্রভা সরকারও ছিলেন।

রিহার্সাল শুরু হয়েছিল সেই সকাল থেকে। কাজীদার হারমোনিয়াম কোলে নিয়ে বসা মানে ফাঁকির কোনও সুযোগই নেই। হারমোনিয়ামের রিডে তাঁর আঙুল সরছে দ্রুত লয়ে আর সুর ছড়িয়ে পড়ছে ফুলঝুরির ফুলকির মতো। সকলেই আবিষ্ট। হঠাৎ কাজীদার চোখটা কী কারণে যেন গিয়ে পড়ল দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে। ব্যাস্! সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম থামিয়ে দিলেন তিনি। কণ্ঠস্বরটাকে একেবারে উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায় পৌঁছে দিয়ে রীতিমতো চিৎকার জুড়ে দিলেন। কে বলবে একটু আগেই এই মানুষটা নিজস্বতা নিয়ে সুর সাধনায় মেতেছিলেন। বড় বড় চোখ দুটো তখন প্রায় বিস্ফারিত। ঠোঁটের হাসিহাসি ভাবটাও উধাও। কাজীদার চিৎকারে তটস্থ হয়ে পড়েছে সকলে। রেডিও আপিসের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি তখন বলে চলেছেন, 'ছিঃ ছিঃ এদের কোনও একটা কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নেই। সেই কোন সকাল থেকে রিহার্সাল চলছে। কারও একটা হুঁশ বলে কিছু নেই। এককাপ চা পায় না কেউ। কী ভেবেছে কী। আমাদের কি খিদে তেষ্টা বলে কিছু নেই। রইলো সব—'

আরও কিছু বলতেন বুঝি, এমন সময়ে ওই ঘরে এসে ঢুকলেন রেডিও আপিসের কয়েকজন কর্তা ব্যক্তি। প্রায় জোড় হাত করে তাঁরা বললেন, 'কিছু মনে করবেন না কাজীদা। মস্ত ভুল হয়ে গেছে— এখুনি চা-জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

শেষ পর্যন্ত খাবার এল। চা-ও। তখনকার গার্স্টিন প্লেসের রেডিও আপিসের বাড়ির একদিকের কোণে ছিল চমৎকার ক্যান্টিন। ওমলেট চা থেকে শুরু করে চপ কাটলেট সবই পাওয়া যেত।

রেডিও আপিসের কর্তাদের পাঠানো খাবার যখন এল কাজীদার কাছে, তখন তিনি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিহার্সালে। বেয়ারাটাকে ওরই মধ্যে ইশারায় বলতেই সে খাবারের প্লেটটা রেখে দিল ঘরের একাধারে। একখানা চপ ছিল একটা কাট্‌লেট। আর ছিল গরম চা। সেটাও দিল প্লেট ঢেকে।

তারপর কীভাবে যে সময় কেটেছে আমরা কেউই খেয়াল করিনি। কাজীদাও নয়। সেই খেয়াল হল ঘণ্টা খানেক বাদে। আমাদেরই মধ্যে একজন কথাটা পাড়তেই কাজীদা হেসে ফেললেন। শান্ত সৌম্য মানুষটি হাসির প্রলেপে ঠোঁট ভিজিয়ে বলে উঠলেন, 'এই যা: অত করে দু কথা শুনিয়ে দিলুম খাবারের জন্যে, আর সেই খাবার জুড়িয়ে পানসে হয়ে গেল। এই তো মুশকিল। কাজে, ঢুকে পড়লে কী করে যে সময়টা পেরিয়ে যায়...।'

কাজীদার জীবন ছিল বিচিত্র। তার সেই বিচিত্র জীবনের সঙ্গে কত বিখ্যাত জন কোনও না কোনও ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নেতাজি সুভাষ, লেখক শৈলজানন্দ, গায়িকা আঙুরবালা। আঙুরবালাকে বড় ভালবাসতেন কাজীদা। প্রায় একই বয়সী ছিলেন ওরা দু'জনে। কিন্তু গান তোলার সময়ে একজন গুরু, অন্যজন শিষ্য।

মনে আছে আজও। আঙুরদির বাড়িতে আমার তখন অনায়াস যাতায়াত। আমায় ভীষণ স্নেহ করতেন আঙুরদি। এদিকে ওর বাড়িটাও ছিল আমাদের শোভাবাজারের বাড়ির কাছে। সেই আঙুরদির বাড়ি গেলেই প্রথমে দেখা হত অমলের সঙ্গে। অমল ছিল আঙুরদির পালিত পুত্র। আমায় দেখলেই হাসত। হেসে বলত, 'কী দিদির কাছে যাবে তো, যাও ওপরেই আছে— '

কিন্তু একদিন আঙুরদির বাড়িতে পৌঁছেই শুনতে পেলুম গানের আওয়াজ। অমল ছিল একতলায়। ওই বললে, 'দিদি তো ওপরে রেওয়াজ করছে, কাজী নজরুল এসেছেন।'

আর কিছু বলবার আগেই কানে এল কাজীদার গলায় গানের কলি। কথাটা ছিল

'বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ
ঘনায়ে নয়নে অন্ধকার
হে প্রিয় আমার যাত্রা পথ...

কাজীদার গান শেষ হতেই ধরলেন আঙুরদি। কাজীদার কণ্ঠের সঙ্গে তার বুঝি কোনও তুলনাই চলে না। যেমন মিষ্টি স্বর, তেমনি সুরের দখল। কাজীদা অসাধারণ বড় কবি সুরকার হলেও তাঁর কণ্ঠ ছিল ভাঙা। তবে শেখানোর ক্ষমতা ছিল দেখবার মতো। তাই আঙুরদির ওই তৈরি গলার গানকে থামিয়ে কাজীদা বলে উঠলেন, 'আহা হচ্ছে না. তুমি ঠিক গাইতে পারছ না। সুরটা ওইভাবে ভাঙবে না'-— বলে আবার গাইতে শুরু করলেন কাজীদা।

একতলার দাঁড়িয়েই শুনছি সব। শোনা তো নয় যেন তন্ময় হয়ে যাওয়া।

ওই গান শেখানোর মাঝে একবার আঙুরদি বলে উঠলেন, 'তোমার কথা মানলুম। কিন্তু আমার কথাও তোমার রাখতে হবে বলে দিচ্ছি।—' বলে কাজীদার দেওয়ার অন্তরার সুরটাকে সামান্য ভেঙে গিয়ে দেখালেন তিনি। সুরটার ভাঙার ধরনটা বোধহয় পছন্দ হল কাজীদার। সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম— 'বাঃ বেড়ে ভাঙলে তো। ঠিক আছে এমনই থাকবে—'

এসব ঘটনাও অনেকদিন আগের। তবু কত স্পষ্ট সব আজও আমার কাছে। ওই ঘটনার পরও আঙুরদির বাড়িতে বার কয়েক দেখেছিলুম কাজীদাকে। ওপরের ঘরে ফরাস বিছিয়ে বসে গান তোলাতেন আঙুরদিকে। কোলে হারমোনিয়ম, মুখে পান, চোখে হাসি।

শুধু আঙুরদি নন, ইন্দুদিও কাজীদার কাছে গানের তালিম নিয়েছেন কতবার। ইন্দুবালা। আঙুরদির মতো ইন্দুদিও মাঝেমাঝে কাজীদাকে অনুরোধ করতেন কোনও সুরকে নিজের মতো করে দিতে। কাজীদার দেওয়া সুরকে অন্যভাবে খেলানোর জন্যে দারুণ কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল সেবার।

তখন কাজীদা স্তব্ধ হয়ে গেছেন চিরতরে। নীরব কবি। কথা বলেন না। স্মৃতিকেও আর খুঁজে

পান না। শুধু বেঁচে থাকা, এই পর্যন্ত। সেই সময়ে একটা জলসায় গাইতে গিয়েছিলেন ইন্দুদি আঙুরদি দু'জনেই।

সন্ধ্যে উৎরেছে সবে। জলসাও জমে উঠেছে। একজন বাঈ গহরজানের মন্ত্র শিষ্যা। অন্যজন মিঞা জমিরুদ্দিনের কাছে তালিম নিয়ে নিজেকে তৈরি করেছেন। কেউ কারও চেয়ে কম যান না। আঙুরবালা যদি 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা' গেয়ে মন ভরান তো, ইন্দুবালা ধরেন লাগসই ঠুমরি। 'বৈঠে সোচে ব্রজবান' গেয়ে ওঠেন। শ্রোতারা খুশি হয়ে ওঠে।

একেবারে শেষের দিকে প্রথমে ইন্দুদি গাইলেন কয়েকটা নজরুলগীতি। তারপর আঙুরদি। আর আঙুরদি গাইবার সময়েই শুরু হল চাপা গুঞ্জন। এই আসরে গান শুনতে এসেছিল কিছু অল্পবয়সী ছেলে। তাদের তখন উঠতি বয়স। গানটানের চর্চা করতে শুরু করেছে বোধহয়। তাদের একজন হঠাৎ আঙুরদির গানের মাঝেই উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলে, 'একটা নিবেদন ছিল--'

আঙুরদি গান থামিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। চোখে মুখে কৌতূহল। পাশে বসা ইন্দুবালাও তাকালেন ওই প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে।

ছেলেটি দু'জনের উদ্দেশেই বললে, 'আচ্ছা আপনারা যে নজরুলগীতি গুলো গাইছেন তার সঙ্গে নজরুলের স্বরলিপির তো কোনও মিলই নেই—'

সে প্রশ্নের জবাবে আঙুরবালা কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণে তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দুবালা বলে উঠছেন, 'হ্যাঁ মিল নেই। তাতে কী হয়েছে?'

ছেলেটা এতটা আশা করেনি। তাই একটু অবাক হয়েই আবার শুধোলে, 'তাহলে ওগুলো কি নজরুলগীতি নয়?'

ইন্দুবালা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, গানের কথা সবই কাজী নজরুলের লেখা। সুরও কতকটা তাঁরই দেওয়া। তবে সবটা নয়। যে কারণে আপনি এত কথা বলছেন। তাহলে জেনে রাখুন, আমরা যে নজরুলের লেখা কথাগুলো বলে যাচ্ছি এই তো ঢের। সুরের ব্যাপারে আমরাও যা আর কাজী নজরুলও তা। সে তুমি বুঝবে না বাবা। সে বুঝত কাজী নিজে। আর বুঝত বলেই...' ইন্দুবালা নিজেকে সামলে নিলেন তাড়াতাড়ি। আসরের সব লোকজন তো থ!

অথচ সেই আসরে ইন্দুদি কিন্তু কাজীদাকে কোনওভাবে ছোট করবার জন্যে ওসব কথা বলেননি। তাঁর সঙ্গে আঙুরদির সঙ্গে কাজীদার সম্পর্কটা কী ছিল সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

তেমনই কাজীদা নিজেই একবার আমায় বলেছিলেন, 'জানিস আমার গান না শুনলে তোদের সুভাষ বোস আবার ভাল বক্তৃতা দিতে পারে না।'

একথাটাও অতিশয়োক্তি নয়। তার সাক্ষীও আমি নিজে। আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা সেসব।

গার্স্টিন প্লেসের রেডিও আপিসের আড্ডায় তখন রোজই যাচ্ছি। কাজীদার পিছন পিছন ঘুরি। আমি আর সঙ্গে সেই দুর্গা সেন, গোপেন মল্লিক, নিতাই ঘটক। হঠাৎই একদিন কাজীদা হন্তদন্ত হয়ে এলেন। এসেই বললেন, 'এই, আজ তোরা চল আমার সঙ্গে।' জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় কাজীদা?' উনি হেসে বললেন, 'চল না, গিয়ে দেখবি খন।' তারপর ধরাধরি করতে বললেন, 'হেদুয়ায় সুভাষ বোসের একটা মিটিং আছে। আমায় তার আগে গাইতে হবে। তোরা সব গলা মেলাবি আমার সঙ্গে। জানিস তো সুভাষ বোসের বক্তৃতার আগে আমায় গাইতে হয়। তবে তার বক্তৃতায় দম আসে।'

আমরা ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিলুম হেদুয়ার মাঠে পৌঁছে।

সে সময়ে দেশভাগ হয়নি। কলকাতায় এত লোকের বাসও ছিল না। তবু ওরই মধ্যে প্রায় পাঁচশো লোক জমা হয়েছিল সেদিন। কী ব্যাপার, না সুভাষ বোসের মিটিং। তখনও সুভাষ বোস নেতাজি হননি। তবে তাঁর লোকপ্রিয়তা ছিল উল্লেখ করবার মতো।

মিটিং শুরু হল। মাইকে ঘোষণা করে দেওয়া হল, এবারে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কাজী নজরুল

ইসলাম। তারপর বুকের কাছটিতে হারমোনিযাম ঝুলিযে নিযে কাজীদা ধরলেন—

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট'

কাজীদা সোলো ধরেন। আর আমরা কোরাসে গলা মেলাই। সব মিলিযে হেদুযার মাঠের পরিবেশটাই অন্যরকম হয়ে ওঠে। গান গাইতে গাইতেই নজর পড়ে সুভাষ বোসের ওপর। খদ্দরেব ধুতি পাঞ্জাবি। খদ্দরের চাদর। মাথায় গান্ধী টুপি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তার মধ্যে দিয়ে তাঁর দুটো চোখ যেন আরও দীপ্ত আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

এক সময়ে গান থামে। মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে ওঠেন সুভাষ বোস। মাইকটাকে ধরে বলে ওঠেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা তো কাজীর গান শুনলেন। নিশ্চযই ভাল লেগেছে। এবারে জেনে রাখুন একটা অতি সত্য কথা। কাজীব গান কিন্তু যথার্থই আমায উদ্দীপ্ত করে। বিশেষ করে ওর গানের বাণী' একথা বলেই তিনি শুরু করে দেন তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতা।

এতো হল একদিনের ঘটনা। পরেও কাজীদার গানের সঙ্গে ধুযো ধরতে আমরা বহু জাযগাতেই গেছি। হেদুযাব মাঠ তো ছিলই। ছিল কলেজ স্কোযার বিডন স্কোযাব আরও কত জাযগা।

সেদিন হযতো অত বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝি, কাজীদার গান লেখার ক্ষমতাটা সত্যিই ছিল অসাধারণ। শুধু দি...দেব গান তো নয, প্রেমেব গান, প্রকৃতিব গান, ভক্তি মূলক কি শ্যামাসঙ্গীত বচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অথচ কিছু কিছু গান কত না হেলায অনাদরে লিখেছেন। খেলাব ছলে বললেও ভুল হয না।

কাজীদারও গান লেখাব একটা জাযগা ছিল হাতিবাগানেব বাসন্তী বিদ্যাবীথি। কলকাতার প্রথম গানের ইস্কুল। এটি ছিল সাবেক চিত্রা সিনেমার কাছে। চালাতেন মোনাদা। আসল নাম ছিল মনোরঞ্জন সেন। বেঁটেখাটো মানুষটি। সদা হাসি লেগে থাকত মুখে। অমাযিক। পরিচয ছিল সে যুগের কলকাতার তাবৎ সঙ্গীতজ্ঞদেব সঙ্গে। কে সেখানে মাস্টারি করেননি। অনাদি দস্তিদার, পঙ্কজ মল্লিক থেকে শুরু করে রত্নেশ্বর মুখুজ্যে, সুবল দাশগুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত, অনিল বাগচি। জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব এমন কি দীনেন ঠাকুরও ওখানে শিক্ষকতা করেছেন, আর কাজীদা তো ছিলেনই। তখন কথা ছিল— যে মোনাদার গানের ইস্কুলে মাস্টাবি না করেছে সে গানের মাস্টারই নয়।

ওই বাসন্তী বিদ্যাবীথিতে গান শেখাতে গিয়ে আড্ডার খোশগল্পে জমে যেতেন কাজীদা। চা আসত। মুড়ি তেলেভাজা। আড্ডা মারতে মারতে হঠাৎ কী ভেবে চুপ করে যেতেন কাজীদা। তারপর মোনাদাকে বলতেন লেখার কাগজ এনে দিতে। তারপর সত্যি সত্যি তিনি লিখতে বসেও যেতেন। মাথা নামিযে নিবিষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ লিখেই চোখ বুলিযে নিতেন। পছন্দ না হলেই সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজটাকে মুঠো করে মুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন মেঝেতে। এমন করে মোড়া কাগজ যে কতগুলো মেঝেতে পড়ত তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিছুক্ষণ এইভাবে লেখার পর উঠে পড়তেন কাজীদা। কলমটাকে ঢুকিয়ে নিয়ে বলে উঠতেন, 'চললাম, আজ কিছু হল না।'

কাজীদা চলে যাওয়ার পর মোনাদা ওই সব দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজগুলোকে তুলে আনতেন মেঝে থেকে। পর পর পাট করে আবার সাজিয়ে রাখতেন। দেখা যেত ওই ফেলে দেওয়া কাগজের বেশির ভাগের ওপরেই লেখা হয়েছে অসাধারণ সব গান যা কাজীদার নিজের পছন্দ হয়নি।

পরে ওইসব গান কাজীদাকে মোনাদা দেখাতেন। তখন আবার কিছু কিছু গান দেখে খুশি হয়ে উঠতেন কাজীদা, হেসে বলতেন, 'বাঃ বেশ হয়েছে তো। সেদিন কেন ভাল লাগল না বল দিকিনি?'

এসব ঘটনা কিছু কিছু শুনেছিলুম মোনাদার কাছে। আমিও তখন নিয়মিত যাতাযাত করি তাঁর বাসন্তী বিদ্যাবীথিতে। গান শেখাই। পাঁচ টাকা করে মাস মাইনে। সে সময়ে পাঁচ টাকারই অনেক দাম। আমার থেকে যাঁরা নামী গুণী তাঁরাই পেতেন ছ' থেকে সাত টাকা মাসে। তাও আবার কামাই

করলে ওই মাইনে থেকে পয়সা কেটে নিতেন মোনাদা। সোজা বলতেন, 'না হে, এবারে যে প্রায় ছ-সাতদিন কামাই হয়ে গেছে।' রসিক মানুষ কিন্তু ভীষণ কড়া।

শুধু মোনাদা নয়, হিসেবের ব্যাপারে কিছু বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকেও দেখেছি অকারণে কঠোর হয়ে উঠতে। একটা ঘটনা ঘটেছিল ওই কাজীদাকে কেন্দ্র করেই।

গানের চর্চা করি, গান গাই বলে তখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে প্রায়ই যাচ্ছি। এমন একদিনের ঘটনা সেটা। আমিও গেছি আর কাজীদাও। আমাকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বললেন, 'তুই আছিস। যাক ভালই হল। তবে তোকে দিয়েই কাজটা করাই—'

আসলে কাজীদার সেদিন টাকার দরকার ছিল। বউদির কাছে প্রয়োজনের কথাটা শুনেই তাই সোজা চলে এসেছিলেন গ্রামোফোনের আপিসে। এটাই ছিল তাঁর সব থেকে জোরের জায়গা।

বরাবরই কাজীদা আপনভোলা মানুষ। বিয়ে করলেও সাংসারিক জীবনের ধার ধারতেন না। কিছুটা ভবঘুরের জীবন ছিল তাঁর। গানের সন্ধানে কার কাছে না গেছেন। কোথায় না ঘুরেছেন। বড় ওস্তাদের নাম শুনলেই গিয়ে দেখা করতেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতেন। ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের ডেরায় দিনের পর দিন পড়ে থেকেছেন একসময়। খাঁ সাহেবের কাছ থেকে দাদরা গানের মুখড়া নিতেন। তারই সঙ্গে নিজের সুরকে দিতেন মিশিয়ে। নতুন সুর সৃষ্টি হয়ে যেত। কাজীদা এমন হুট হাট করে প্রায়ই কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে যেতেন।

সেখানে আবার ছিলেন বিখ্যাত মানুষ মঞ্জু সাহেব। মঞ্জু সাহেবের গানের প্রতি কাজীদার ছিল একান্ত অনুরাগ। আরও বহু জায়গায় ঘুরে আসতেন কাজীদা। ভাল সুর চাই, সুর।

বাউণ্ডুলে ভবঘুরে স্বভাবের কাজীদা কলকাতায় থাকলেও যে সবসময়ে বাড়িতে যেতেন তাও কিন্তু নয়। তাঁর আড্ডার জায়গা ছিল অনেক। সব থেকে বিখ্যাত জায়গাটি বোধহয় বিবেকানন্দ রোডের মটরবাবুর বাড়ি। মটরবাবুদের কবিরাজি তেলের কোম্পানি ছিল। সুধাসিন্ধু তেল। সেই মটরবাবু ছিলেন কাজীদার গানের পরম ভক্ত। ফলে বৈঠকখানা ঘরের আসর সন্ধ্যে পেরিয়ে রাতে পৌঁছে যেত। গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হয়ে যেত কলকাতায়। কাজীদা মটরবাবুর পীড়াপীড়িতে সে রাত বৈঠকখানা ঘরেই ফরাসের ওপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দিতেন কাটিয়ে। সকাল হলে চা খেয়ে চলে যেতেন নিজের কাজে। এ যেন তাঁর নিয়মিত রোজ নামচা। তাই ওরই ফাঁকে কোনও কোনওদিন নিজের বাড়িতে ফিরলে সাংসারিক জীবনের মুখোমুখি হতে হত তাঁকে। সেইরকম ঘটনাই বুঝি ঘটেছিল সেবার। বাড়িতে গিয়েই শুনেছিলেন টাকার দরকার। তাই সোজা চলে এসেছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে।

কাজীদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছি, এমন সময়ে একটা ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি। চেয়ারে বসে কাগজের ওপর লিখতে শুরু করলেন আপনমনে। কিছুক্ষণ পরেই সেই কাগজটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা একটা গান! জানিস তো গ্রামোফোন আবার নিয়ম করে দিয়েছে, গান লিখে জমা দিয়ে তবে পয়সা নিতে হবে। এটা ওই ঘরে গিয়ে হেমবাবুকে দিয়ে আয় তো। বলবি কাজীদা পাঠালে—'

হেমবাবুই তখন এসব ব্যাপার দেখতেন। তাই গেলুম তাঁর ঘরে। ওই গান লেখা কাগজটা ওঁর হাতে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে হল 'না হে কাজীকে বলে দাও এ গান তেমন ভাল হয়নি। তাই এ দিয়ে এখন রেকর্ড টেকর্ড হবে না—'

কথাটা কাজীদাকে বলতেই কেমন থম্ মেরে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা বাংলা কথার মানে বলতে পারবি?' বললুম, 'কী কথা?' কাজীদা বললেন, 'বল দিকিনি গুণাতীত কথাটার সহজ বাংলা অর্থ কী?' অবাক হওয়ার পালা আমার। কাজীদার মুখের দিকে কয়েক পলক হাঁ হয়ে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলুম, গুণাতীত মানে গুণের অতীত— মানে খুবই গুণসম্পন্ন—

এবারে আমার কথায় হেসে ফেললেন কাজীদা। হেসে বললেন, 'না হল না, তুই যেটা বললি

সে মানে আমি জানতে চাইনি।

ও কথাটার অন্য একটি সোজা মানে আছে। গুণাতীত মানে হল বেশি গুণ থাকলেই সেটা তেতো হয়ে যায়। এই যে হেমবাবুকে দেখলি। গুণী মানুষ। কিন্তু বেশি গুণ আছে বলেই কেমন তেতো হয়ে গেছেন।' বলে মিটি মিটি হাসতে লাগলেন কাজীদা।

তারপর হাসি থামিয়ে বলে উঠলেন, 'নাঃ আমি আর জীবনেও গ্রামোফোনের দিক মাড়াব না। এ আমি তোকে বলে রাখলুম —'

বললেও তিনি আবার ফিরে আসতেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে। গ্রামোফোনের ওরাই কাজীদাকে ডেকে আনতেন। আবার দেখতুম স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পাশে পানের ডিবে নিয়ে হারমোনিয়ামে গান তোলাতে বসে গেছেন। কাজীদার থেকে বয়সে ছোটরা তো থাকতই, অনেক সময়ে বিখ্যাত সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বদেরও দেখেছি কাজীদার পাশে বসে গান তুলতে।

জ্ঞান গোঁসাইকে দেখেছি কাজীদার পাশে বসে তাঁর কথা মতো গান তুলছেন। সে এক বিখ্যাত গান।

'আমায় বোল না ভুলিতে বোল না।' তারপর আগমনীর ওপরে— 'ভারত শ্মশান হল মা।'

সে এক বিরল দৃশ্যও বটে। দুই দিকপালের মহাসম্মেলন যেন।

কিন্তু এই কাজীদা সম্পর্কে তারাপীঠের বিরল সাধক তারাখ্যাপা বাবার একটা মন্তব্য একদিন আমার শিরদাঁড়ায় অমন করে কাঁপন ধরিয়ে দেবে কে ভেবেছিল! তারাখ্যাপা বাবা আবার ছিলেন আমার গুরু। সিদ্ধ তান্ত্রিক। রক্তবস্ত্র পরতেন সর্বদা। যা বলতেন তাই অমোঘ। সেই তারাখ্যাপা বাবা একদিন বললেন, 'রাম, তোরা কাজীকে আর বেশিদিন পাবি না। দেখে নিবি মিলিয়ে—'

তারাখ্যাপা বাবার সেই অমোঘ বাণী সত্যি ফললও বটে। অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটল। যার সাক্ষী ছিলুম আমিও।

তবে সে ঘটনার পূর্বাভাস বোধহয় পেয়ে গিয়েছিলুম এর কিছুদিন আগেই।

রেডিও আপিসে গিয়েছিলুম। দেখা হল বীরেনদার সঙ্গে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আমায় দেখে বললেন, ''তোমার কোনও কাজ আছে?' নেই শুনে বললেন, 'তাহলে এস আমার সঙ্গে, একবার কাজীর বাড়ি যেতে হবে। প্রোগ্রাম ডিরেক্টার নৃপেনবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন।'

সে সময় কাজীদা থাকতেন হরি ঘোষ স্ট্রিট আর মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের মাঝামাঝির একটা বাড়িতে। সে বাড়ির সামনে পৌঁছে রাস্তা থেকেই বীরেনদা হাঁক পাড়লেন। 'কাজী-কাজী' দু-একবার ডাকবার পর দেখলুম বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন বউদি। বীরেনদাকে দেখে বললেন, 'ও বীরেনদা, বলুন কী ব্যাপার। আমায় বলুন না।'

শুনে বীরেনদা বললেন, 'কেন কাজী নেই?'

বউদি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ বাড়িতেই আছে। তবে এখন তাকে পাবেন না।' বউদির কথায় আমরা দু'জনেই অবাক হলুম বলাবাহুল্য। সেটা বুঝেই বউদি বলে উঠলেন, 'দাঁড়ান একটু, আমি কপাট খুলে দিয়ে আসছি।'

বউদি বাড়ির দরজা খুলতেই আমরা গিয়ে ঢুকলুম। তারপর দোতলায় কাজীদার শোবার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চমকে উঠলুম দু'জনেই। এ কাকে দেখছি আমরা।

পট্টবস্ত্র পরে খালি গায়ে কম্বলের আসনের ওপর ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন আমাদের কাজীদা। দুটো চোখ বোজা। সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থা।

কাজীদার ওই রূপ দেখে বউদির সঙ্গেই দু-একটা কাজের কথা সেরে বীরেনদা আর আমি নেমে এসেছিলুম রাস্তায়। বীরেনদা বলেছিলেন, 'দেখলে রাম, কাজী আজকাল কেমন আধ্যাত্মিক জগতে থাকছে।'

বীরেনদার কাজের তাড়া ছিল তাই পা চালিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসেছিলুম আমাদের বাড়িতে। কাজীদার ওই বাহ্যজ্ঞানহীন রূপ আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছিল সেদিন। বাড়ি ফিরেও অন্য কোন কাজে মন দিতে পারিনি চট্ করে। কারণ আগে চোখে না দেখলেও শুনেছিলুম অনেক কিছুই। শুনতুম তান্ত্রিক বরদাবাবুর সঙ্গী হয়েছেন কাজীদা। বরদাবাবুর কথামতো নানান জায়গায় যাচ্ছেন। বরদাবাবুও নাকি তন্ত্র সাধনায় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছেন কাজীদাকে। কাজীদাও বরদাবাবুর আজ্ঞাবহ হয়ে উঠেছেন। যা বলছেন বরদাবাবু তাই শুনে যাচ্ছেন প্রতিবাদ না করে। আমি দু-একবার দেখেওছিলাম দু'জনকে একসঙ্গে। সেদিন কিছু মনে হয়নি। মনে হয় বাড়ির শোবার ঘরে কাজীদার ওই রূপ প্রত্যক্ষ করে। আর তার অল্প কিছুদিন বাদেই তারাপীঠের তারাখ্যাপা বাবা আমায় বললেন, 'তোরা কাজীকে আর বেশিদিন পাবি না। দেখে নিবি মিলিয়ে—'

শুধু আমি কেন, গোটা বাংলার হাজার হাজার গুণগ্রাহীই কাজীদাকে চিরকালের মতো হারাল একদিন। সেসব দিনের ঘটনাও কম উল্লেখযোগ্য নাকি। সে ঘটনার নেপথ্যেও লুকিয়ে ছিল কিছু জটিল এবং গোপন রহস্য। যার সমাধান করতে গিয়ে কত লোকই তো কত কথা বলেছে। কিন্তু আসল সত্যটা বোধহয় চিরকালের মতো অজ্ঞাতই রয়ে গেল। যে সত্যের কিছুটা ইঙ্গিত আমায় দিয়েছিলেন আমার গুরু তারাখ্যাপা বাবা। তন্ত্রসাধনার তত্ত্ব কথা সেসব। তন্ত্র সাধনার একেকটি কঠিন স্তরের কথা। সে স্তরে পৌঁছনোর আগে নাকি ততোধিক কঠিন মানসিক জোরের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় কঠিন সংযমের। না হলে ক্ষতি। বিরাট। ব্যাপক। এ যেন অনেকটা অতলস্পর্শী খাদের ধার ঘেঁষে যাওয়ার মতো।...কাজীদা বোধহয় পারেননি সেই বিপদসঙ্কুল পথটাকে পার হতে। হয়তো প্রলোভিত হয়েছিলেন। হয়তো তাঁকে কেউ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছিল।

'হয়তো', 'যদি'র গ্রন্থিতে জড়ানো কাজীদার শেষ জীবনের বেদনাদায়ক পরিণতি দেখার সময়ে বারবার মনে পড়ে যেত তাঁর কয়েকটা কথা।

কাজীদা আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'দেখ রাম, কালের করাল গ্রাসে কিছুই চিরকাল থাকবে না। আমিও থাকব না এই পার্থিব শরীরটা নিয়ে। কিন্তু আমার লেখা গান কোনওদিন কেউ ভুলতে পারবে না। এ আমার বিশ্বাস। দৃঢ় বিশ্বাস। তোকে ভালবাসি বলেই কথাগুলো বলছি। না হলে বলতুম না।'

কাজীদার ওসব কথা মনে পড়ত যখন আমার বাড়িতে আসত কাজীদার বড় ছেলে সানি। আমি সানি বলেই ডাকতুম বরাবর। পোশাকি নাম কাজী সব্যসাচী। কাজীদা বড় ভালবাসতেন ওকে। 'সানি' আর 'নিনি' দু'জনেই ছিল কাজীদার প্রাণ। নিনি বলতে কাজী অনিরুদ্ধ। কাজীদার ছোট ছেলে।

সানি আমার কাছে এসে প্রায়ই বলেছে, 'তুমি একটা কাজ করতে পারবে?' শুনে আমি বলতুম, 'কী কাজ?'

সানি বলত, 'একটা ঘরোয়া আসরের আয়োজন করেছি বাড়িতে। বাবাকে সামনে বসিয়ে রেখে একবার শেষ চেষ্টা করব স্মৃতি ফেরানোর।'

সে সময়ে কাজীদা মানিকতলাতে। সেই মানিকতলার বাড়িতেই আমি যেতুম। সানি সব ব্যবস্থা করে রাখত। পুরো জলসা যেন। মধ্যে বসানো হত কাজীদাকে। তাঁর লেখা, সুর করা গান গেয়ে যেত সবাই। গাইতুম আমিও। তাঁর একসময়ে বাছাই করা সব পছন্দের গান। ইন্দুদির আঙুরদির গাওয়া গানও গেয়েছি সে আসরে। ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে তিনি আমার দিকে কখনও কখনও তাকিয়েছেন এই পর্যন্ত, কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটেনি কোনওদিনই। কাজীদার সে উদাস হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টির ভাষা আমাকে বিষণ্ণ করে দিয়েছে। দেখতুম ওঁর ছেলেরাও মনে মনে বিষণ্ণ হয়ে উঠত আসর ভাঙার পর। সানির চোখে স্পষ্ট ভাসত ব্যর্থতার কালিমা। তারপর আবার একদিন বসত ওইরকম আসর। সেখানেও পুনরাবৃত্তি ঘটত সেই আগের ঘটনারই। ফুলের জলসায় সত্যিই নীরব তখন কবি। সে অখণ্ড নীরবতা ভাঙানোর ক্ষমতা আমি আর পাব কোথায়!

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং

গোলাম কুদ্দুস

গ্রামোফোন ক্লাবে বাংলা ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা ছিলেন ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য। সবাই তাঁকে ডাকত বড়বাবু বলে। একদিন নলিনীকান্ত সরকার নামে এক ভদ্রলোক এসে বড়বাবুর হাতে একখানা গানের খাতা দিয়ে বলল, 'দেখুন তো এই বাংলা গজল গানগুলি রেকর্ড করা যায় কিনা ?'
বড়বাবু প্রশ্ন করলেন, 'কে লিখেছে ?'

কাজী নজরুল ইসলাম।'

বড়বাবু কে মল্লিককে ডাকলেন, 'দেখুন তো এই খাতাখানা। আর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলুন।'

কে মল্লিক খাতা পড়ে দেখল গজল ছাড়া অন্য গানও আছে। ওর মধ্যে থেকে দুখানা গান সে লিখে নিল। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।' আর 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।' খাতাটা নলিনী সরকারের হাতে ফেরত দিলে বলল, 'এ দু'খানার বাজার দেখে তারপর অন্য গান গাওয়া যাবে।'

এই গান দুখানার রেকর্ড যখন বাজারে বেরুল তখন প্রায় এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। বড়বাবু কে. মল্লিককে ডেকে বললেন, 'যাক একটা নতুন লাইন পাওয়া গেল। এ্যাদ্দিন কেবল তুমি দেহতত্ত্ব, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত গেয়েই কাল কাটালে। এবার দেখা যাক কী হয়।'

'আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।'

'কাজী সাহেবকে আনিয়ে আরও গান নাও না।'

কে মল্লিক কাজী নজরুলকে গ্রামোফোন ক্লাবে নিয়ে এল। সেখানে কোম্পানির পরামর্শ অনুযায়ী শুরু হল তাঁর গান লেখা। বিদ্রোহের রণদামামা এখানে বাজানো যাবে না। ঝাঁঝালো স্বদেশী গান এখানে চলবে না। ব্রিটিশ কোম্পানির আওতায় এ সব বাদ দিয়ে লিখতে হবে গান, যাতে শুধু পয়সা আসে। ধর্মীয় গানে একদম কারো আপত্তি নেই। আর মানুষ তো দেশে ধর্মপ্রবণ। অন্যান্য গানের সঙ্গে তাই একই লেখনী দিয়ে বেরুতে লাগল দেবদেবীর উপাসনা, নমাজ, পীর পয়গম্বরের গান। এতদিন হিন্দু সঙ্গীত দিয়ে মুনাফা হচ্ছিল। এখন ইসলামি সঙ্গীত দিয়ে আরো একটি বড় বাজার দখল করবার চেষ্টা করল ব্রিটিশ কোম্পানি। কাজী নজরুল দুয়েরই যোগান দিয়ে চললেন অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে। এখন তিনি দুবেলা আসতে লাগলেন গ্রামোফোন ক্লাবে। কে মল্লিকের কণ্ঠে বেজে উঠল কাজী নজরুলের প্রথম যুগের অনেক জনপ্রিয় গান। ফলে কে মল্লিকের জনপ্রিয়তা যেন দেখা দিল নতুন করে।

এমন সময় তাকে একদিন এসে ধরল তার এক দেশের লোক। বলল, 'আপনার তো নামডাক খুব। আমাকে একটু উঠতে দেবেন ?'

'তার মানে?'

দেখুন মল্লিকবাবু, আপনি কালনার লোক, আমার বাড়ি কাটোয়ায়। এক দেশের লোক বললেই হয়— উঠতে দেবেন আমাকে?'

কে মল্লিক হাসি চেপে বলল, 'আপনি আমার দেশের লোক। আপনি উপরে উঠলে তো খুশির কথা। কী নাম আপনার?'

'প্রফেসর জি দাস। দেখুন দেশের লোকই দেশের লোককে উঠতে দেয় না কিনা!'

মল্লিক বলল, 'কিন্তু দেখুন, আমাদের গান দেওয়ার আগে একটু পরীক্ষা করতে হয়।'

উত্তর এল, 'বেশ, দেব পরীক্ষা।'

প্রফেসর জি দাসের পরীক্ষা নেওয়া হল। একবারেই অচল। কথাটা শুনে প্রফেসর জি. দাস ঠিক হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কে মল্লিক যতই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে — 'একদিন হবেই' ততই সে দ্বিগুণ কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠে বলতে লাগল, 'আমি আঙুরবালাকে মা বলেছি, ইন্দুবালাকে মাসি বলেছি আর আমাকে কিনা'—

কথাটা শেষ না করেই প্রফেসর জি দাস আবার কাঁদতে লাগলেন। তখন বড়বাবু এসে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

প্রফেসর জি দাস চোখ মুছে বললেন, 'রেকর্ডে নাকি আমার গান গাওয়া হবে না?'

বড়বাবু জবাব দিলেন, 'এখনও তোমার গান ভাল হচ্ছে না, সুর তাল ঠিক থাকছে না।'

হঠাৎ প্রফেসর জি দাস প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি আমার সীতাভোগ মিহিদানা খাওয়ানো ব্যর্থ হল?'

বড়বাবু অবাক হয়ে শুধোলেন, 'কে তোমার মিষ্টি খেয়েছে?'

উত্তর এল, 'বীরেনবাবু আর কমলবাবু। কে মল্লিক আমাকে হিংসে করে গান গাইতে দিচ্ছে না, ওরা আমাকে বলেছে।'

বড়বাবু হেসে ফেললেন। এই বোকা লোকটাকে ঠকিয়ে ওরা মিষ্টি খেয়ে কে মল্লিকের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে মজা দেখার জন্যে!

এমন সময় কাজী নজরুল এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রফেসর বলেই যাচ্ছে, 'ওরা আমাকে কথা দিয়েছিল একখানা রেকর্ড অন্তত হবেই, আজ কিনা বলে কিছু হবে না।'

কাজী নজরুল সব শুনে বললেন, 'দেখুন মল্লিক, এঁকে যখন একখানা রেকর্ড নেওয়ার কথা দেওয়া হয়েছে তখন সে কথা রাখতেই হবে।'

মল্লিক বলল, 'বলেন কী, লোকটা পাগল দেখছেন না।'

'কিন্তু বাংলা দেশটাও কম হুজুগে নয় মল্লিক', বললেন কাজী নজরুল। তারপর প্রফেসরের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি আজ যাও, কাল এস— আমি তোমাকে শিখিয়ে রেকর্ড করাব।'

জি দাস একগাল হেসে চলে গেল। পরদিন কাজী নজরুল দেখেন অনেক আগেই প্রফেসর হাজির। তাকে বললেন, 'মল্লিককে ডেকে আন।'

প্রফেসর জবাব দিল, 'কাজী সাহেব, মল্লিক আমার শত্রু। আমার গান খারাপ করে দেবে।

কাজী নজরুল আশ্বাস দিলেন, জান না, কে মল্লিক খুব ভাল লোক। তোমার সঙ্গে কেমন সুন্দর হারমোনিয়াম বাজাবে দেখ।'

কে মল্লিক ঘরে ঢুকতেই কাজী নজরুল বললেন, 'আসুন মল্লিক সাহেব। আর জি দাস, তুমি কপাটে খিল এঁটে দাও। তার আগে তবলাওয়ালাকে ডাক।'

ঘরে রইল তখন চারজন।

কাজী নজরুল বললেন, 'শোন জি দাস, কেউ জিজ্ঞাসা করে — কী গাইবে, কিছুতেই বলবে না। খুব সাবধানে। বাজারে রেকর্ড বের হলে তখন শুনবে।'

জি দাস সানন্দে ঝাঁকিয়ে বলল, 'না কাউকে আগে শোনাব না।'

কাজী নজরুল বললেন, 'আচ্ছা তাহলে পর এইবার গান :

'কলগাড়ি যায় ভষড় ভষড়, / ছ্যাকরা গাড়ি যায় খচাং খচ্/

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং / কুলকুচি দেয় করে ফচ্।'

পরের দিন কাজী নজরুল এই গানের জোড়া লিখে আনলেন :

মরি হায় হায় হায় / কুব্জার কী রূপের বাহার দেখ। তারে চিৎ করলে হয় যে ডোঙা / উপুড় করলে হয় সাঁকো / হরিঘোষের চার নম্বর খুঁটো / মরি হায় হায় হায়।'

প্রফেসরকে চতুষ্পদ বানানো হচ্ছে তাও সে বুঝলে না। খুব উৎসাহে চালাতে লাগল রিহার্সাল। রেকর্ডিং ম্যানেজারকে বলা হল না কী গান রেকর্ড করা হচ্ছে। আর সে সাহেব, বাংলা প্রায় বোঝেই না। কাজেই কেউ হঠাৎ টের পেয়ে বাধাও দিতে পারল না। খুব গোপনেই গান দুখানা রেকর্ড হল। কয়েকদিন পর বেরুল বাজারে।

কাজী এসে বললেন, 'মল্লিক দেখুন তো একবার বাজারে খোঁজ নিয়ে।'

'খোঁজ নিয়েছি। খুব বিক্রি! খদ্দেররা কিনছে আর বলছে, কলগাড়ি যায় ভষড় ভষড়।'

হিগিন্‌স তো ভীষণ খুশি। বড়বাবুকে ডেকে বলল, 'ভট্টচায! তুমি বল লোকটা ক্ষ্যাপা। বেশ তো সেল হচ্ছে! আরো গান গাও।'

শুনে কাজী নজরুল বললেন, 'মল্লিক সাহেব, এবার কিন্তু গালাগাল খেতে হবে। হুজুগে দেশে ওরকম একবারই চলে।'

ক্রমে ক্রমে কাজী নজরুলের সঙ্গে কে মল্লিকের সম্পর্কটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

নজরুলের সৃজনশীল প্রতিভা স্ফূরণের কয়েকটি পর্যায়

রফিকুল ইসলাম

কলকাতায় নজরুলের সাহিত্যিক সাংবাদিক জীবনের শুরু ১৯২০ খৃস্টাব্দে, সেনাবাহিনী ফেরত তরুণ সৈনিক কবি কলকাতায় সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বছরেই তাঁর বহুমুখী সৃজন-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। প্রথম বছরেই 'বাঁধন হারা' উপন্যাস, 'রিক্তের বেদন', 'সালেক', 'অতৃপ্ত কামনা', 'বাদল বরিষণ', 'দুরন্ত পথিক', 'সাঁঝের তারা', 'রাক্ষুসী' গল্প; 'শাত ইল-আরব', 'বাদল প্রাতের শরাব', 'খেয়া পারের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহরম্', 'ফাতেহা ই-দোয়াজ-দহম' (আবির্ভাব) কবিতা; 'বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও', 'আজ নতুন করে পড়ল মনে', 'বন্ধু আমার থেকে থেকে', 'যুগের পরে ঘরকে ফিরে', 'হয়ত তোমায় পাব দেখা', 'পথিক ওগো চলতে পথে', 'কোন মরমীর মরণ ব্যথা', 'আমার ঘরের পাশ দিয়ে' গান এবং 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' হাফিজের কয়েকটি গজলের অনুবাদ প্রকাশনার মাধ্যমে নজরুল-প্রতিভার বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। উল্লিখিত রচনাগুলির মধ্যে গল্প ও কবিতায় নজরুল-প্রতিভার মৌলিকতার আভাস ছিল। প্রথম বছরে রচিত গানগুলি ছিল কবিতার নামান্তর আর সুর প্রচলিত ঐতিহ্যের অনুসারী। গীতিকার সুরকার নজরুলের মৌলিক প্রতিভার ছাপ ১৯২০ খৃস্টাব্দে রচিত গানগুলিতে নেই।

১৯২০ থেকে ৩০ খৃস্টাব্দ— দশ বছরের মধ্যে নজরুলের উল্লেখযোগ্য কবিতাবলীর অধিকাংশ রচিত যা পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯২১-২২ খৃস্টাব্দে নজরুল উপহার দেন 'রণ-ভেরী', 'দিল-দরদী', 'আগমনী', 'আনোয়ার', 'কামাল পাশা', 'বিদ্রোহী', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম', 'বিজয়িনী', 'প্রলয়োল্লাস', 'ধূমকেতু', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আনন্দময়ীর আগমনে' এবং 'দুঃশাসনের রক্ত' প্রভৃতি কবিতা। ১৯২৩-২৪ খৃস্টাব্দে 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'দোদুল দুল', 'বেলা শেষে', 'অবেলার ডাক', 'পূজারিনী', 'অভিশাপ', 'আলতা-স্মৃতি' 'রৌদ্র-দগ্ধের গান' প্রভৃতি কবিতা। ১৯২৪-২৫ খৃস্টাব্দে 'ঝড়' (পশ্চিম ও পূর্ব তরঙ্গ) 'বিদ্রোহীর বাণী', 'অভিশাপ', 'মুক্ত-পিঞ্জর', 'শহীদী ঈদ', 'সর্বনাশের ঘণ্টা', 'সুবেহ উম্মিদ' (পূর্বাশা) প্রভৃতি কবিতা ১৯২৬-২৭ খৃস্টাব্দে 'চৈতী হাওয়া', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'বিজয়িনী', 'নিশীথ প্রতীম', 'গোকুল নাগ', 'ফরিয়াদ', 'সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'বারাঙ্গনা', 'নারী', 'কুলি-মজুর', 'মাধবী প্রলাপ', 'অনামিকা', 'অতল পথের যাত্রী', 'গোপন পিয়া', 'দারিদ্র্য', 'সিন্ধু', (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ) 'অঘ্রাণের সওগাত', 'বার্ষিক সওগাত', 'খালেদ', 'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার মঞ্জরী', প্রভৃতি কবিতা। রচনার ঐ তালিকা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে নজরুলের মৌলিক কবি-প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল ১৯২১ থেকে ১৯২৭ খৃস্টাব্দের মধ্যেই এবং ১৯৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়েছিল।

বিশের দশকে নজরুলের বিভিন্ন কাব্যে কবিতা

১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
অগ্নিবীণা	দোলনচাঁপা	বিষের বাঁশী	চিত্তনামা	সর্বহারা
১৩টি	২১টি	৮টি	৪টি	৫টি
কবিতা	কবিতা	কবিতা	কবিতা	কবিতা
		ভাঙ্গার গান	ছায়ানট	ঝিঙে ফুল
		৩টি	১৪টি	১৪টি
		কবিতা	কবিতা	কবিতা
		পূবের হাওয়া	সাম্যবাদী	
		৬টি	১১টি	
		কবিতা	কবিতা	

১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
ফণি মনসা	সিন্ধু-হিন্দোল	চক্রবাক	প্রলয় শিখা
১৭টি	১৮টি	১০টি	১৪টি
কবিতা	কবিতা	কবিতা	কবিতা
	জিঞ্জীর	সন্ধ্যা	
	১৪টি	১৮টি	
	কবিতা	কবিতা	

নজরুলের উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কবিতাবলীর অধিকাংশই রচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পরে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। ঐ সব গ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ২০১টি; উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে অবশ্য কবিতার সঙ্গে অনেক গানও সংকলিত ছিল, তবে গানগুলি হিসেবে ধরা হয় নি। অনুবাদ কবিতাও ঐ হিসেবের মধ্যে নেই। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থে সংকলিত নজরুলের দুই শতাধিক কবিতার মধ্যে নিম্নোক্ত কবিতাগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধুমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ ভেরী', 'শাত্ ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম্'। 'বিষের বাঁশীর' 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম' (আবির্ভাব ও তিরোভাব) 'সেবক', 'জাগৃহি', 'বিদ্রোহীর, বাণী', 'অভিশাপ', 'মুক্ত-পিঞ্জর', ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ)। 'দোলন চাঁপা' গ্রন্থের— 'দোদুলদুল', 'বেলা শেষে', 'ব্যথা-গরব', 'উপেক্ষিত', 'সমর্পণ', 'চোখের চাতক', 'অবেলার ডাক', 'চপল সাথী', 'পূজারিণী', 'অভিশাপ', 'আশান্বিতা', 'পিছু ডাক', 'মুখরা'। 'ছায়ানট' এর— 'বিজয়িনী' 'কমল-কাঁটা', 'চৈতী হাওয়া', 'বেদনা-অভিমান', 'নিশীথ-প্রতীম', 'অ-বেলায়', 'হার-মানা-হার', 'লক্ষ্মীছাড়া', 'শেষের গান', 'নিরুদ্দেশের যাত্রী', 'চিরন্তনী প্রিয়া', 'পরশ-পূজা', 'অনাদৃতা', 'শায়ক-বেঁধা পাখী', 'হারা-মণি', 'মানস বধূ', 'বিদায় বেলায়', 'প্রিয়ার রূপ', 'বাদল-দিনে', 'কার বাঁশী বাজিল', 'অমর কানন', 'পূবের হাওয়া', (ঝড়: পূর্ব তরঙ্গ), 'আল্‌তা-স্মৃতি', 'রৌদ্র-দগ্ধের গান'। 'ভাঙ্গার গান'-এর দুঃশাসনের 'রক্ত-পান', 'শহীদী ঈদ'। 'চিত্তনামা'র 'সান্ত্বনা', 'ইন্দ্রপতন', রাজ ভিখারী'। 'সাম্যবাদী'র— 'সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী', 'নারী', 'রাজা-প্রজা' 'সাম্য', 'কুলি-মজুর'। 'সর্বহারা'র— 'সর্বহারা', 'ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'প্রার্থনা', 'গোকুল নাগ'। 'ফণি-মনসা'র— 'সব্যসাচী', 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', 'প্রবর্তকের ঘুরচাকায়', 'মুক্তিকাম', 'সাবধানী ঘণ্টা', 'বিদায়-মাভৈঃ', 'অশ্বিনী কুমার', 'ইন্দু-প্রয়াণ', 'দীল-দরদী', 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ', 'সত্য-কবি', 'পথের

দিশা', 'যা শত্রু পরে পরে', 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ', 'সিন্ধু', 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা', 'বিদায়-স্মরণে', 'পথের স্মৃতি', 'উন্মনা', 'অতল পথের যাত্রী', 'দারিদ্র্য', 'বাসন্তী', 'ফাল্গুনী', 'মঙ্গলাচরণ', 'বধূ-বরণ', 'অভিযান', 'রাখী-বন্ধন', 'চাঁদনী রাতে', 'মাধবী প্রলাপ', 'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার মঞ্জরী'। 'জিঞ্জীর' কাব্যের— 'বার্ষিক সওগাত', 'অঘ্রাণের সওগাত', 'মিসেস এম. রহমান', 'নকীব', 'খালেদ', 'সুবেহ্ উম্মেদ', 'খোশ্-আম্‌দেদ', 'নওরোজ', 'ভীরু', 'অগ্রপথিক', 'ঈদ মোবারক', 'আয বেহেশতে কে যাবি আয', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'উমর ফারুক', 'এ মোর অহংকার'। 'চক্রবাক' কাব্যের- - 'তোমারে পড়িছে মনে', 'বাদল-রাতের পাখী', 'স্তব্ধ রাতে', 'বাতায়ন পাশে গুবাক-তরুর সারি', 'কর্ণফুলী', 'শীতের সিন্ধু', 'পথচারী', 'মিলন মোহনায়', 'গানের আড়াল', 'তুমি মোরে ভুলিযাছ', 'হিংসাতুর', 'বর্ষা বিদায়', 'সাজিয়াছ বর মৃত্যুর উৎসবে', 'অপরাধ শুধু মনে থাক', 'আড়াল', 'নদীপারের মেয়ে', '১৪০০ সাল', 'চক্রবাক', 'কুহকি'। 'সন্ধ্যা' গ্রন্থের 'সন্ধ্যা', 'তরুণতাপস', 'আমি গাই তারি গান', 'জীবন বন্দনা', 'ভোরের পাখী', 'কালবৈশাখী', 'নগদ কথা', জাগরণ', 'জীবন', 'যৌবন', 'তরুণের গান', 'যৌবন জল তরঙ্গ', 'রীফ-সর্দার', 'বাংলার আজিজ', 'সুরের দুলাল', 'শরৎচন্দ্র', 'অন্ধ স্বদেশ দেবতা', 'পাথেয', 'দাড়ি বিলাপ', 'তর্পণ', 'না আসা দিনের কবির প্রতি'। 'প্রলয শিখা', 'গ্রন্থের—'প্রলয শিখা', 'নমস্কার', 'হবে জয', 'পূজা অভিনয', 'বহ্নি-শিখা', 'মণীন্দ্র প্রয়াণ', 'নব-ভারতের হলদি ঘাট', 'যতীন দাস', 'বিংশ শতাব্দী', 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র', 'রক্ত তিলক'।

নজরুলের ১৯৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কবিতাবলীর যে তালিকা ওপরে দেওয়া হল নজরুলের মৌলিক সৃজনশীল কবি প্রতিভার মূল্যায়ন ঐ সব কবিতার ভিত্তিতেই করতে হয। যদিও ১৯২০ খৃস্টাব্দের পূর্বে, ১৯৩০ খৃস্টাব্দের পরেও নজরুল কবিতা রচনা করেছিলেন কিন্তু সংখ্যা বা গুণগত মান কোন দিক দিয়েই সে সব কবিতা বিশের দশকে রচিত কবিতার সমকক্ষ নয। লক্ষণীয যে, ত্রিশের দশকে নজরুলের কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। 'নতুন চাঁদ' প্রকাশিত হয়েছিল চল্লিশের দশকে নজরুলের অসুস্থতার পরে। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত শেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ 'প্রলয শিখা'। নজরুলের সুস্থাবস্থায রচিত গ্রন্থের বাইরে উল্লেখযোগ্য কবিতা, 'আরবী ছন্দের কবিতা', 'আনন্দময়ীর আগমেন', 'আবাহন', 'নবীনচন্দ্র', 'প্রথম অশ্রু'। 'নতুন চাঁদ' গ্রন্থের কবিতা -- 'নতুন চাঁদ', 'চির জনমের প্রিয়া', 'আমার কবিতা তুমি', 'নিরুক্ত', 'সে যে আমি', 'অভেদন', 'অভয সুন্দর', 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি', 'কিশোর রবি', 'কেন জাগাইলি', 'তারা', 'দুর্বার যৌবন', 'আর কতদিন', 'ওঠ রে চাষী', 'মোবারক বাদ', 'কৃষকের ঈদ', 'শিখা', 'আজাদ', 'ঈদের চাঁদ'। 'নবযুগ', 'শেষ সওগাত', এবং 'ঝড' এই তিনটি গ্রন্থ নজরুলের অসুস্থতার পরে প্রকাশিত, এ সব গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলির অধিকাংশ ত্রিশের দশকের শেষ দিকে বা 'নজরুলের অসুস্থতার পূর্বে চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে রচিত। এ সব কবিতায নজরুলের কবি প্রতিভার স্ফুরণ মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হলেও সে কবিতায বিশের দশকের কবিতার অভিনবত্ব নেই বরং পুনরাবৃত্তি রয়েছে।

আলোচ্য সময়ের অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯২৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে নজরুল তাঁর প্রধান প্রধান উদ্দীপনামূলক ও প্রেমের কবিতাসমূহ রচনা ও প্রকাশ করেন। ঐ উদ্দীপনামূলক কবিতার মধ্যে বিদ্রোহ, বিপ্লব, সাম্যবাদ, হিন্দু ও ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতা ছিল। যেমন ছিল প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য বিষয়ক কবিতাবলী। এ সব কবিতা বাংলা কাব্য সাহিত্যে ছিল মৌলিক ও অভিনব সংযোজন। বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের গতানুগতিক অনুসৃতি থেকে মুক্তিদানে নজরুলের উপরোক্ত সংযোজন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কেবল উদ্দীপনামূলক কবিতার মাধ্যমেই নয় প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও নজরুলের অভিনবত্ব ছিল। প্রেমের শরীরী আবেগের স্বীকৃতি নজরুলের প্রেমের কবিতায় ছিল অকুণ্ঠ যা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মপ্রেমের সর্বাত্মক প্রভাব থেকে বাংলা প্রেম-কবিতাকে মুক্ত করতে কম সহায়তা করেনি। প্রেমের

কবিতা রক্ত মাংসের নর-নারীর আবেগ অনুভূতির কবিতা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময় বাংলা প্রেম-কবিতা আধ্যাত্মিকতার চোরাবালিতে পথহারা হয়ে পড়েছিল, নজরুল বাংলা প্রেমের কবিতাকে তার নিজস্ব মহিমায় পুনস্থাপন করেন। নজরুল সৃষ্ট প্রেম কবিতার মাধ্যমে বাংলা প্রেম-কবিতা পুনরায় নিজস্ব পথে চলতে শুরু করে। উদ্দীপনামূলক কবিতার সাহায্যে নজরুল বাংলা কবিতায় নতুন পেশী সংযোজন করেন, প্রেম কবিতার মাধ্যমে সংযোজিত হয় রক্ত মাংসের মানুষের আবেগ অনুভূতি। ঐ দুরূহ কর্মটি নজরুল সম্পাদন করেন ১৯৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই।

১৯২০ খৃস্টাব্দে নজরুল বাংলা গানের প্রচলিত ধারার অনুসৃতিতে কিছু গান রচনা করেছিলেন আর ১৯২১ থেকে ২৩ খৃস্টাব্দে নজরুল রচিত গানের সংখ্যা খুব কম। নজরুলের সংগীত রচনার কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে নিম্নরূপ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ১৯২৪-২৪ খৃস্টাব্দে স্বদেশী, উদ্দীপনামূলক ও জাগরণী গান, ১৯২৬-৩০ খৃস্টাব্দে রাগভিত্তিক গজল গান, ১৯৩০-৩৫ প্রেম প্রকৃতি বিষয়ক আধুনিক এবং হিন্দুভক্তি গীতি ও ইসলামী গান। অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে এই দশ বছর নজরুলের সৃজনশীল সঙ্গীত-প্রতিভার স্ফুরণের সময়। ১৯৪২ খৃস্টাব্দে অসুস্থতার পূর্বে কয়েকটি বছর তাঁর কবি প্রতিভা অপেক্ষা সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে অধিকতর। নজরুলের সঙ্গীত-জীবন কবি জীবনের তুলনায় প্রলম্বিত তার কারণ বাহ্যিক। ১৯৩০ খৃস্টাব্দ থেকে নজরুল এক একে মঞ্চ, ছায়াছবি, গ্রামোফোন কোম্পানী ও বেতারের সঙ্গে যুক্ত হন। নজরুলের সুস্থ জীবনের শেষ কয়েকবছর ১৯৩৮ থেকে ৪২ তিনি কলিকাতা বেতারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। থিয়েটার, সিনেমা রেকর্ড ও রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ত্রিশের দশকে নজরুলের সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল অধিকতর।

নজরুল ১৯২৪ খৃস্টাব্দে রচনা করেন 'চরকার গান', 'শিকল ছেঁড়ার গান', 'কারার লৌহ কপাট' ভাঙার গান। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে তিনি সৃষ্টি করেন শ্রেণী সচেতন ও পেশাজীবীর— কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, জেলেদের গান, ছাত্রদলের গান, ১৯২৬-২৭ খৃস্টাব্দে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্তপতাকার' গান। ১৯২৪ থেকে ২৭ খৃস্টাব্দ তিন চার বছরের মধ্যে নজরুল যে সব উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত রচনা করেন তার যে সংক্ষিপ্ত তালিকা ওপরে দেওয়া হল তা থেকে বোঝা যায়, নজরুলের ঐ সব গান বিষয়, বাণী এবং সুরের বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। নজরুলের ভাঙার গান বা কাণ্ডারী হুঁশিয়ার এর মতো গান আর রচিত হয়নি যেমন হয়নি নতুনের গানের মতো কুচ্‌কাওয়াজের গান বা 'চল্ চল্ চল্' যেটি রচিত হয়েছিল ১৯২৮ খৃস্টাব্দে। নজরুলের উদ্দীপনামূলক গানগুলি প্রথমে প্রচলিত স্বদেশী রীতিতে রচিত হত যেমন 'আজি এ রক্ত নিশি ভোরে' কিংবা 'বল ভাই মা ভৈঃ মা ভৈঃ' বা 'ঘোররে ঘোর আমার সাধের চরকা ঘোর'। এমন কি 'শিকল পরা ছল মোদের' গানটিতেও স্বদেশী ঢং লক্ষণীয়। পরিবর্তন আসে 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'ওঠ্‌রে চাষী জগৎবাসী ধর কষে লাঙ্গল', 'ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল ধর হাতুড়ি ধর কাঁধে শাবল' প্রভৃতি গান। কিন্তু এ সব গানেও স্বদেশী গানের রীতি ও প্রভাব সম্পূর্ণ অপসৃত হয়নি। উদ্দীপনামূলক গানের রীতি ও ঢঙে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'জাগ অনশন বন্দী ওদের যত' এবং 'চল্ চল্ চল্' প্রভৃতি গানে। নজরুলের স্বদেশী বা উদ্দীপনামূলক বা জাগরণী গানের বানী, সুর ও ঢং পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে নজরুলের মৌলিক সৃজনশীল সঙ্গীত-প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটেছিল ১৯২৪ থেকে ২৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত সে সব গানে যেগুলোকে আমরা সাধারণভাবে স্বদেশী গান বলতে পারি যার মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপনা ও জাগরণী গানও রয়েছে।

নজরুলের সঙ্গীত-প্রতিভার আরো বড় স্ফুরণ দেখি ১৯২৬-২৮ খৃস্টাব্দে গজল গান রচনার মধ্যে। নজরুল ত্রিশের দশকে গ্রামোফোন কোম্পানীর সংস্পর্শে আসবার আগে কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদের সংসর্গে এসেছিলেন কি-না আমাদের জানা নেই। কিন্তু নজরুলের প্রথম গীতি-সংকলন 'বুলবুল'

(১৯২৮) গ্রন্থে সংকলিত ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত নজরুলের গজলগুলির সুর সবই রাগভিত্তিক। নজরুল তাঁর গজল সংকলন 'বুলবুল' উৎসর্গ করছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়কে, যিনি রাগ-সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন এবং নজরুলের রাগভিত্তিক গজলগুলোকে প্রথম তাঁর কণ্ঠে ধারণ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি নিজেকে নজরুলের গজল গানের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি আখ্যায়িত করেছেন।

নজরুলের উল্লেখযোগ্য গজল গান রচনার কালানুক্রমিক তালিকা ১৯২৬খৃস্টাব্দে---- 'বসিয়া বিজনে', দুরন্ত বায়ু পরবাইয়া', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে কে', 'আসিলে কে গো অতিথি'। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে — 'এত জল ও কাজল চোখে', 'করুণ কেন অরুণ আঁখি', 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে', 'কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে', 'আসিলে এ ভাঙা ঘরে', 'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায়', 'চেয়োনা সুনয়না', 'কে বিদেশী বন উদাসী', 'বসিয়া নদী কূলে', 'পরদেশী বধূয়া', 'নিশি ভোর হল জাগিয়া'। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে 'এ বাসি বাসরে', 'এ আঁখি জল মোছ পিয়া', 'নহে নহে প্রিয এ নহে আঁখি জল' 'আজি এ কুসুম হার', 'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায়' প্রভৃতি। ঐ গজল গুলোর সুর ও ঢং রাগ বা মিশ্র রাগ ভিত্তিক।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে নজরুলের দশটি গীতি-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে ৭৬৫টি গান সংকলিত হয়, এ গানগুলির বিষয় ও সুর বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্ট হবে।

১৯২৮— ৩০ খৃস্টাব্দ

গ্রন্থ	গানেব সংখ্যা	সুর	রাগ ভিত্তিক কীর্তন সুর	লোক ও	হাসি	স্বদেশী
বুলবুল	৪৯	৪৯	০	০	০	
চোখের চাতক	৫৩	৪৫	৮	০	০	
চন্দ্রবিন্দু	৬০	৩৮	৫	১৭	০	
নজরুল -গীতিকা	১২৭	১১২	৯	০	৬	
১৯৩২– -১৯৩৪						
সুরসাকী	৯৮	৮৬	১২	০	০	
জুলফিকার	২৪	২৪	০	০	০	
বনগীতি	৭১	৫৪	১৭	০	০	
গুলবাগিচা	৮৭	৭৮	১২	৭	০	
গীতি শতদল	১০১	৭১	০	০	০	
গানের মালা	৯৫	৮০	১৫	০	০	
১০	৭৬৫	৬৩৭	৭৮	২৪	৬	

ঐ তালিকা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নজরুল তাঁর সঙ্গীত-জীবনের প্রথম পর্বের গানে প্রধানত স্বদেশী ও রাগ সঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেছেন, তারপরেই ব্যবহৃত হয়েছে কীর্তন সহ লোকসুর। ১৯২৪-২৬ খৃস্টাব্দের স্বদেশী গানের পরপরই নজরুলের ১৯২৬ থেকে ৩৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত গানগুলি মূলতঃ রাগ ভিত্তিক আর এ সব গানে নজরুলের মৌলিক সৃজনশীল সংগীত-প্রতিভার স্ফুরণ আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৩৪ থেকে নজরুলের গানে বৈচিত্র্য আসে। কেবল স্বদেশী

বা উদ্দীপনামূলক কিংবা প্রেম প্রকৃতি বিষয়ক গজল বা লোক ঐতিহ্য ভিত্তিক সুরে পল্লী বিষয়ক গান নয়, কেবল ইসলামী ও ভজন কীর্তন নয়, বিচিত্র বিষয় ঢং ও রীতির গান রচিত হতে থাকে যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্যাম ও শ্যামাসঙ্গীত এবং ঝুমুর। নজরুলের হিন্দু ভক্তিগীতির সংখ্যা প্রায় আটশত, এসব গান তিনি ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে অধিক সংখ্যায় সৃষ্টি করতে থাকেন এবং যার অধিকাংশই বিধৃত গ্রামোফোন রেকর্ডে। এসব গানের অধিকাংশ রচনার সমসাময়িক কালে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বা গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার ফলে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা', 'গীতিবিচিত্রা' অনুষ্ঠানত্রয়ের জন্যে সঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ হয় নজরুলের যা চল্লিশ দশকের শুরু পর্যন্ত চলতে থাকে। এ পর্যায়ে নজরুলের সঙ্গীত প্রতিভার শেষ স্ফুরণ ঘটে, যখন তিনি অবলুপ্ত রাগরাগিণীর উদ্ধার বা নতুন রাগের সৃষ্টিতে এবং সুর ও শ্রুতি নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। নজরুল তার গানে রাগের ব্যবহার করেছেন ১৯২৩ খৃস্টাব্দ থেকে কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তিনি প্রচলিত রাগের কাঠামোতে বা বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে তার গানে সুর বেঁধেছিলেন কিন্তু ১৯৩৮ খৃস্টাব্দ থেকে তিনি অবলুপ্ত বা প্রচলিত রাগ উদ্ধার করে কিংবা নতুন রাগ সৃষ্টি করে তার ভিত্তিতে রাগ প্রধান বাংলাগান রচনা করতে শুরু করেন। হিন্দী ভাঙ্গা খেয়াল, ঠুংরি বা দাদরা আঙ্গিকে বাংলা কথা সহযোগে রাগাশ্রিত সঙ্গীত পূর্বে তিনি বহু রচনা করেছেন, এবার আর হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের অনুসরণ বা অনুকরণ নয় এবং সরাসরি রাগ সঙ্গীত সাধনা। এভাবেই ত্রিশের দশকের তিনি সুরের রাজ্য মন্থন করেছেন আর সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা গানকে।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় যে নজরুলের সাহিত্যিক তথা কবি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল বিশের দশকে কিন্তু সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল বিশ ও ত্রিশ উভয় দশকেই। কবি প্রতিভার স্ফুরণ ১৯২০ থেকে ১৯৩০ খৃস্টাব্দ আর সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ ১৯২৪ থেকে ১৯৪০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। ধাপে ধাপে নজরুলের সৃজনশীল মৌলিক সঙ্গীত প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়েছে স্বদেশীগান, গজল, বাউল ভাটিয়ালি, কাব্যগীতি, ইসলামী গান, ভজন কীর্তন, শ্যাম ও শ্যামাসঙ্গীত এবং রাগপ্রধান বাংলা গান, এক কথায় সমগ্র বাংলা গান। আর সে কারণেই নজরুল সঙ্গীতকে বলা যায় বাংলা গানের অনুবিশ্ব।

নানারঙের দিনগুলি

যোবায়দা মির্যা

প্রথম দেখা কাজী নজরুল ইসলামকে আমার চোখে বড়ই সুন্দর, জ্যোতির্ময় লেগেছিল। উজ্জ্বল কমলা রঙের মোটা খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবী, ধুতিটাও ঐ একই রঙে ছোপানো। পরতেন কাছা দিয়ে (কোচা দিয়ে নয়)। ইউনির্ভাসিটির অনেক অধ্যাপককে দেখেছি ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরী ধুতিব কোঁচাটা এক হাতে ধরে হেলেদুলে হাঁটবার সময় একটা পা সম্পূর্ণ উদোম হয়ে থাকত। ঐ লম্বা দোহারা মানুষটিকে দূর থেকে মনে হত যেন পেশোয়ারীদের মত শালওয়ার পেরেছেন, সাদার বদলে রঙিন। কোনোক্রমেই পা বেরিয়ে থাকার উপায় নেই। গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা। কাঁধে আলগোছে একটা চাদর ফেলা, মাথায় গান্ধীটুপি। সবই খদ্দরের। পায়ে বিদ্যাসাগর চটি। দেশে তখন চরকা আন্দোলনের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আমাদের বাড়িতেও চবকা একটা কেনা হয়েছিল। কিছুদিন মহা উৎসাহে সুতো কাটার হিড়িক চলল। তারপর সেই চরকা অনাদরে-অবহেলায় বারান্দার কোনায় পড়ে থাকত। বাড়ির, এবং পাড়ারও, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এলোপাথাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অল্প দিনেই তাব দফারফা করে দিল। আম্মু আর ফুফুদের তক্‌লী দিয়ে হাতে হাতে সুতো কাটতেও দেখেছি। সে হুজুগ কিছুদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল।

কবির উপস্থিতি বহু দূর থেকে টের পাওয়া যেত— চলন বলন সবই দশদিক কাঁপিয়ে। সেই সঙ্গে বেপরোয়া অট্টহাসি। গুণগ্রাহী যুবকের দল সারাক্ষণ তাঁকে ঘিরে থাকত, ঠিক যেমন করে তারা সক্রেটিসের চারপাশে ভিড় জমাত অতি প্রাচীনকালে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কাজী সব্যসাচী এসে উঠেছিল হোটেল পূর্বাণীতে। সেখানে গিয়েও ঐ একই দৃশ্য দেখলাম। ছেলেছোকরার দল তাকে এমনভাবে ছেঁকে ধরেছে যে ঐ ঘরে তিলধারণের জায়গা নেই। তার উপর টেপ রেকর্ডার একখানা চালানই আছে অনবরত। সব্যসাচীর প্রত্যেকটি কথা তো বটেই, তার হাঁচ কাশি পর্যন্ত সবই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এমনই নিবেদিত ভক্তের দল!

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের বাড়িতে যতদিন ছিলেন, বিরামবিহীন ভূতের তাণ্ডব চলত দিনরাত। ছেলেবুড়ো সব সেই দলে, কোনো বাছবিচার নেই। হৈ-হৈ করে হুজুগে মাতা আর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মাতিয়ে তোলাই ছিল কবি চরিত্রের বিশেষত্ব। চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছেন ছুটতে ছুটতে। সেটা হচ্ছে তাঁর লোক জড়ো করার কায়দা— ওয়ার ক্রাই— অর্থাৎ সবাই এসে সিঁড়ির গোড়ায় খোলা জায়গাটায় জমা হত। এ ডাক এড়াবার সাধ্য নেই কারো। এ ডাক আসতো প্রায়ই ছুটির দিনে সকালে নাস্তা খাওয়ার পর। তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল 'নারী' আবৃত্তি, মহুয়া' গীতিনাট্যের 'নদের চাঁদে'র সংলাপ: রবীন্দ্রনাথের 'আজি এ প্রভাতে রবির কর'— এই সব। শেষ সিঁড়ির এক ধাপ উপরে দাঁড়িয়ে তিনি, সমবেত দর্শকমণ্ডলী চিত্রার্পিতের মত স্থির হয়ে শুনত এবং কাণ্ডকারখানা দেখত। মাঝে মাঝে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়তেন, টপাটপ দুচারটে বাচ্চাকাচ্চা তুলে নিয়ে কাঁধে পিঠ-বগলদাবা করে গান গাইতে গাইতে দে ছুট, দে ছুট উঠোন পেরিয়ে

একেবারে পুকুর ঘাট পর্যন্ত, সেই সাথে ধিড়িং ধিড়িং নৃত্য— হিন্দী ফিল্মের দৃশ্য যেন! গানগুলোও বাছাই করা :

১. তাইরে নাইরে নাইরে না
রইমু ঘরে বাইরে না।
কাইল আইমু বউ লইয়া
থাকবি তরা ফ্যালফ্যালাইয়া।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

২. আদায় আর কাঁচকলার মিলন
মোদের স্বামী স্ত্রীতে।
আমি বলি, ইস্তিরির চেয়েও
স্বামী সে ঢের ভালো,
তা হোক সে মোট্‌কা পিলে পট্‌কা
হাদা খাদা কালো।

এই হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাসিটা একদম ওরিজিন্যাল কাজী নজরুল ইসলাম ব্র্যাণ্ড হাসি। রেকর্ডেও ঠিক এমনি হাসিই আছে। তাঁর 'প্রীতি-উপহারের' বসালাপ সবাইকে হেঁকেডেকে শোনাতে খুব পছন্দ করতেন।

তাঁর সে প্রাণচাঞ্চল্য সবাই উপভোগ করত। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। সেই হাত পা মুখ চোখ নাচিয়ে অপরূপ মুদ্রা বর্ণনা করা অসম্ভব। ধূমকেতুও নয়, উল্কার মতো গতিবেগ। গানের গুঁতোয় সব কাজকর্ম বন্ধ :

বেয়াই তুমি জানোয়ার লোক,
জানো অনেক কিছু...

বলার ভঙ্গিতে না হেসে থাকতে পারবে না কেউ। স্কুলে কেউ বেশি হাসলে অন্যরা গম্ভীর হয়ে উপদেশের ছলে বলতো, 'যত হাসি তত কান্না বলে গেছেন রাম সন্ন্যা।' তাঁর সেই হাসি ফুরিয়ে যাবে বলেই কি তিনি একসঙ্গে সব হাসি হেসে নিয়েছিলেন। তিনি কি আগে থেকেই জানতেন যে সব হাসি কান্নার পাট চুকিয়ে একদিন এসে এই বর্ধমান হাউসের থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে মসজিদের পাশে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে থাকবেন! কোথায় হারিয়ে গেল সেই আনন্দ-মুখর দিনগুলো, সেই হৈ হুল্লোড় ?

আম্মু সেই সময় ঘোর পর্দানশীন ছিলেন, কবির সামনে যেতেন না। আর কবি ঘরের মধ্যে একটু চুড়ির শব্দ কি শাড়ির খস্‌খসি শুনতে পেলে আড়াল থেকেই চেঁচিয়ে বলতেন, 'ঐ আমার সতীন আশেপাশেই আছেন।' আব্বুকে অনেকবার বলেছেন, 'তোমার বউকে লুকিয়ে রেখেছ, আমায় দেখাবে না ?' আব্বুর তেমন আপত্তি ছিল না। আম্মু রীতিমতো আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কবিদের নাকি বিশেষ রকম আকর্ষণী শক্তি থাকে। তাছাড়া তাঁর সম্বন্ধে ফজিলাতুন্নেসা, নোটন, জাহানারা বেগম চৌধুরী ইত্যাদি অনেককে জড়িয়ে নানা কথা শোনা যেত, তাই আম্মু অতি সন্তর্পণে পালিয়ে বেড়াতেন। একদিন টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে, আরেকটা তরকারি বেড়ে এনে আম্মু রাখতে গেছেন এমন সময় হো হো শব্দে অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন কবি কাকা। রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে আসার ঐ সময়টুকুর মধ্যে তিনি চুপিচুপি এসে টেবিলে বসে ছিলেন ডাকার আগেই। সাধারণত সব দেওয়া হয়ে গেলে আম্মু সরে যেতেন, আমি গিয়ে খবর দিতাম, আব্বু নিজে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে নেমে আসতেন। সেদিন এরকম দুষ্টুমি করে তিনি মহাখুশি। আব্বুকে বললেন, আজ তোমার

বৌকে দেখলাম আড়ি পেতে, ঘাপটি মেরে, কত কৌশলে। যেমন করে হেঁটে আসছিল ঠিক তেমনি করেই ফিরে চলে গেল। ঘোমটা টেনে অথবা ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল না। জিভ কাটল না। এতেই বোঝা যায় শরীফ ঘরের মেয়ে। অতি শান্ত সংযত আচরণ। আমি হেরে গেছি। কিন্তু আম্মুর 'সতীন' নামটা ঘুচল না। কবির ১০-৩-২৮ তারিখে আব্বুকে লেখা চিঠিতে দেখা যায় :

তোমার বৌ-এর ভাগ্য ভালো, হিংসে হয় এক একবার। দেখো, তোমার বৌও এই চিঠি লেখায় আর প্রিয় সম্ভাষণের ঘটা দেখে আমায় সতীন না ঠাওরান।

হিংসেটা ছিল কবিরই একচেটিয়া। আম্মু কখনো এ সব নিয়ে মাথা ঘামান নি একটুও। কবি বলতেন,

সতীন মিতীন গোলমরিচের ঝাল
সতীন তুমি বাঁচবা কতকাল ?

আরেকদিন টেবিলে খেতে বসেছেন কবি কাকা আর আব্বু। আমারও ঐখানেই বসার কথা। কিন্তু ইলিশ মাছ বাছতে পারবো না বলে রান্না ঘরে খেলাইকে (আজকাল যাকে বলে 'আয়া') দিয়ে মাছ বাছিয়ে নিয়ে এলাম। থালার কিনারে গোল করে ঘিরে প্রতি লোকমায় (গ্রাসে) যতটুক মাছ খাবো তা ভাগ করে সাজিয়ে দিয়েছে। কাকা দেখে বললেন, বাঃ! বেশ তো ! আমি বললাম এক একটা এক একজনের ভাগ। প্রত্যেকের নাম নিয়ে আমিই খেতে লাগলাম সবগুলো ভাগ। এতেও তিনি মজা পেলেন। এটা হচ্ছে ছেলে পিলেদের ফাঁকি দিয়ে সব ভাত খাওয়ানোর ফন্দি। নইলে, তারা সাধারণত মাছ তরকারি টপাস করে তুলে খেয়ে নিয়ে ভাত ফেলে চলে যায়। আমি খেতে খেতে আব্বুর পাতের 'মাছের শাড়ি' আর 'হরিণের মাংস' দাবি করে বসলাম। উনি খুশি হয়ে উঠলেন 'মাছের শাড়ি' শুনে। বাঃ! দিব্যি নাম রেখেছো তো! এই তেল তেলে চামড়াটা? আমার মাছের শাড়িটাও তুমি নাও। আর হরিণের মাংসটা কি? আমি গড়গড়িয়ে আব্বুর কাছে শোনা গল্পটা সম্পূর্ণ বলে ফেললাম :

হরিণ আর মাছের রেস হয়েছিল— মাছ নদীর ধার ঘেঁষে পানির মধ্যে আর হরিণ সেই বরাবর ডাঙার উপর দিয়ে ছুটলো। মাছের সঙ্গে হরিণ পারল না, হেরে গেল। তাই নিজের গায়ের কিছুটা মাংস কেটে মাছকে দিয়েছিল। মাছের চামড়ার সঙ্গে যেটুকু চকলেট রঙের হয়ে আছে সেইটাই হরিণের মাংস।

খুব খানিকটা হা হা করে হাসলেন গল্প শুনে। আমাকে তাঁর নিজের মাছের থেকে হরিণের মাংসটুকুও দিয়ে দিলেন আর আব্বুকে বললেন, 'এ গল্প আমার চিরদিন মনে থাকবে। বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে খেতে বসাই উচিত। ওরা সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়ে খেতে শেখে।'

কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হয়ে। উঠেছিলেন সম্পাদকের বাসায়, বর্ধমান হাউসে। তিনি এই অধিবেশন উদ্বোধন করলেন 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি দিয়ে। এ গানের উদ্দীপনাই আলাদা। মার্চের সুর তাই সর্বাঙ্গ নেড়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে শরীরের রক্ত গরম করা গান। এই সময় আরেকটি গানের রেকর্ড হয়েছিল, 'টলমল, টলমল, পদভরে বীর চলে সমরে'। এটিও তিনি অন্তরের সব আবেগ ঢেলে দিয়ে গাইতেন। আমাদের বাড়িতে যতদিন তাঁকে দেখেছি, যেন টগবগিয়ে ছুটছেন, তেজী ঘোড়া 'চোখ হাসে মোর মুখ হাসে' এরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এক মুহূর্ত চুপ করে বা থেমে থাকতে দেখিনি। হাসি, গান, কথা, আবৃত্তি, অনর্গল চলেছে রাস্তার ধারের মাথা-উড়ে যাওয়া কলের জলের মতো বিরামহীন। সেই সঙ্গে অঙ্গভংগী, অভিনয় তো আছেই। কেমন করে জেলে কাটিয়েছেন সে কথা তার মুখে অতি চমকপ্রদ— চোখে ঘুম নেই, আকাশে তারা উঠছে ডুবছে, এই দেখেই কেটেছে! কোন্‌টা কোন্

সময় আকাশের কোন্ জায়গায় অবস্থান করে সব বলে দিতে পারেন। দু'হাতের কড়া ঝনঝনিয়ে বাজিয়ে 'শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল' গান গাওয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের আতংক, শীতের কষ্ট, রেশনের কষাকষি, এসব গল্প সেকেণ্ডহ্যাণ্ড— শুনতে অত মজা লাগে না, যত ভালো লেগেছে তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। অবসর পেলে জ্যোৎস্নারাতে পুকুরঘাটে কিংবা রেসকোর্সের ময়দানে বসে বাঁশি বাজানোর প্রতিযোগিতা হত আমার সেজ কাকা আর ছোট কাকার সঙ্গে। বলতেন, বিদ্যেটা ঝালিয়ে নিচ্ছি।

যিনি এক তিথির অধিককাল অবস্থান করেন না তিনিই হচ্ছেন 'অতিথি'। এটা কবি কাকার বেলায় খাটেনা। তিনি বেশ অনেক তিথিই কাটিয়েছেন আমাদের বাড়িতে। খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আব্বুর কথা লিখতে গিয়ে এঁর প্রসঙ্গ আপনা আপনিই এসে গেছে অনেক। লিখেছিও কয়েক জায়গায়। যে কথাগুলো লিখিনি তাই চেষ্টা করব এবার লিখতে। তখন আমি আঠালুর মত লেগে থাকতাম সারাক্ষণ তাঁর কোলে, পিঠে ও কাঁধে, অর্থাৎ সবচেয়ে কাছে। কিন্তু তিনচার বছর বয়সের ঘটনাগুলো অনেক মনে থাকলেও সব মনে থাকা সম্ভব নয়। হয়তো এর কিছু পরবর্তী সংযোজন। বাড়িতে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলেই সকলেই মহা উৎসাহে আলোচনায় যোগ দিতেন, সেই সব কথার কিছু তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছে আমার মনের অতল তলে। তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁকে পাকড়াও করে যেখানেই নিয়ে যান আমি সঙ্গে গিয়েছি। এভাবেও কিছু স্মৃতি সংগ্রহ হয়েছে। হয়ত আমার ঠিক মনে নেই, তবু প্রসংগটা উঠলে চট্ করে সম্পূর্ণ ছবিটা এক নিমেষে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেমন, আমি নাকি পাঁচ বছর বয়সে কলকাতায় এক বিরাট সাহিত্য সভায় তাঁর কোলে বসে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' গেয়েছিলাম। এ কথা আমার মনে খুবই অস্পষ্ট, তবু যাঁরা ঐ সভায় ছিলেন তাদের অনেকেই এ ঘটনা উল্লেখ করে প্রশংসা করায় আমার মনে পড়ে গেছে, কবি কাকা জোড়াসন হয়ে বসে আমাকে কোলে বসিয়ে হার্মোনিয়াম বাজিয়েছিলেন মস্ত বড়ো হলঘরে লাল রঙের গালিচা পাতা স্টেজের উপর। আমার সামনে অসংখ্য লোকের ভিড়। তারা আমার গানের সঙ্গে হেসে হেসে হেলেদুলে মাথা নেড়ে তাল ঠুকেছিল। গান শেষ হলে 'সাবাস', 'বাঃ বা' হাতে তালি দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, এর কোল থেকে ওর কোলে লোফালুফি হয়ে আমি আশ্চর্য উপায়ে আমার আব্বুর কোলে চলে গিয়েছিলাম— কবি তখন বক্তৃতা দিতে উঠেছেন— আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে আব্বু সভার শেষ প্রান্তে দরজার কাছাকাছি বসেছিলেন। সম্পূর্ণ দৃশ্যটা সিনেমার মতো খেলে যায় আমার মনের চোখে।

সঙ্গীতচর্চা আমাদের বাড়িতে আগে থেকেই ছিল। আব্বু নিজে সেতার ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতেন ওস্তাদ রেখে। চাচারা প্রত্যেকে গান গাইতেন, বাঁশি বাজাতেন। ফুফুদের এমনকি আম্মুকেও হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে শুনেছি (দেখেছিও) : 'রাজপুরীতে বাজায় বাশী বেলাশেষের গান', 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে' ইত্যাদি। কবি কাকা এসে যেন সেই হুজুগের মাত্রা বেড়ে গেল, জোয়ার এলো। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, ছোটো বড় যেই হোক, একটা সুর ভাঁজলেই ক্রমশ সে 'সুরের আগুন' যেন সারা বাড়িতে ছড়িয়ে যেত তি- চার মিনিটের মধ্যে। দেখা যেত, ঐ একই গান প্রত্যেকে গাইছে, কেউ গুন্‌গুনিয়ে, কেউ গলা ছেড়ে। সাহিত্য সভা, রাজনীতি, আলোচনা ছাড়াও কবির বহুবিধ তৎপরতা ছিল ঢাকায় থাকাকালীন। তিনি গান শেখাতেন বেশ কয়েকজনকে। এদের মধ্যে প্রিন্সিপ্যাল মৈত্রের মেয়ে নোটন, মিস ফজিলাতুন্নেসার বোন শফিকুন্নেসা, উয়াড়ীর রানু সোম (বর্তমানে বিখ্যাত লেখিকা প্রতিভা বসু, বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী)। এ সব বাড়িতে নিয়মিত আমিও গিয়েছি, স্পষ্ট মনে আছে কোলে কিংবা পিঠে ঝুলিয়ে অথবা কাঁধে বসিয়ে নিয়ে যেতেন কাছের বাড়িগুলোতে। যেমন, ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাড়ি, সুরতজামালের ঢালে মিস ফজিলতুন্নেসার বাড়ি। উয়াড়ীতে যেতেন প্রায়ই আব্বুর সাইকেলে। যেদিন ও পাড়ার কিছুসংখ্যক গুণ্ডা ছেলে লাঠিসোটা নিয়ে তাঁকে তেড়ে

এসেছিল সেদিন ভাগ্যিস আমি সঙ্গে ছিলাম না। সেদিন ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সবাই উদ্বিগ্ন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কবি কাকার সেই চিরাচরিত হো হো শব্দের অট্টহাসি শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তিনি তখন এ্যাকটিং করে দেখাচ্ছিলেন, কেমন করে ওরা হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেললো, সাত আটজন। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, হকিস্টিক। তিনি ওদেরই একজনের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরাতে ঘুরাতে ব্যূহ ভেদ করে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এলেন— একটি আঁচড়ও লাগে নি। 'শালারা পালাতে পথ পায় না।' তাঁর লাঠি ঘুরানোর কায়দা দেখে সবাই চমৎকৃত। আমি অনুযোগ করলাম, 'আমাকে নেন নি বলেই তো।' হাসির তোড়ে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাগ্যিস নিই নি। নইলে বিপদ আরো বেড়ে যেতো।' ব.লই এক হাতে আমাকে চট্ করে কাঁধে নিয়ে অন্য হাতে পাঁই-পাঁই করে লাঠি ঘুরাতে লাগলেন। সেই ঐতিহাসিক লাঠিখানা বেশ মজবুত হান্টার গোছের কিন্তু আরেকটু লম্বা। গাঢ় খয়েরি রঙের, মাথাটা মুঠো পাকিয়ে ধরার উপযোগী গোল, চামড়া দিয়ে টাইট করে বাঁধানো, দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখার জন্যে চামড়ার একটা সরু ফিতে দিয়ে লুপ করা। লাঠির অপর প্রান্তে কালো রঙের লোহার গুলটি লাগানো। কবি কাকার বীরত্বের সাক্ষী ঐ লাঠিখানা বহুদিন আমাদের বাড়িতে ছিল। গরুছাগল বারান্দায় উঠলে তাড়ানো হতো ওটা দিয়ে— নজরুল মারা লাঠি।

কবি কাকা একদিন পর্যায়ক্রমে চারজনকে গান শেখাতে গেলেন। শাফিকুন্নেসাকে 'হে ক্ষণিকের অতিথি', নোটনকে 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি', রাণু, সোনাকে 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' এবং চতুর্থ জনের নাম ঠিকানা মনে নেই। তবে গানটা হচ্ছে 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চল লো গোরী'।

প্রায়ই গানের আসর বসতো বর্ধমান হাউসের একতলার হলরুমে। সারারাত চলত চা, পান আর গান। বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়েরা আসতেন। এঁদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়ও ছিলেন। সঙ্গীতচর্চার কতরকম কায়দাকানুন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলতেন। গলা সাধা তো আছেই। এর সঙ্গেই ব্যায়াম, ভোরে উঠে মাইল খানেক দৌড়ে আসা, ইত্যাদি নিয়মিত অভ্যাস করতেন দিলীপ বাবু। একদিন আম্মুকে ডাকিয়ে পর্দার ওপাশ থেকে বললেন, 'বৌদি, আমাকে একটা জিনিস তৈরি করে দিতে হবে, ওষুধও বলতে পারেন।'

কি জিনিস ?

সেটা হচ্ছে, ছোটো পেঁয়াজী (ছোট সাইজের এক কোষওয়ালা পেঁয়াজ) ডোবা ঘি এর মধ্যে ছেড়ে খুব ঢিমে আঁচে নেড়েচেড়ে লাল করে ভেজে দিতে হবে। তিন পোয়া জিনিস ধরে এম্নি একটা বয়াম ভরে আম্মু ঐ পেয়াজ ভেজে দিলেন ফরমাশ অনুযায়ী। দেখতে ঠিক কিসমিসের মতো হলো ওগুলো। প্রতিদিন ভোরে ঐ কিস্‌মিস গোটা চারেক খেয়ে গলা সাধতে বসতেন। এক এক ওস্তাদের এক এক ফতোয়া। মুহম্মদ হোসেন খাঁ বলতেন গুল বানাফ্‌শা— পশারীর দোকানে পাওয়া যায়। চিরতার মতো খুব ছোটো ছোটো ফুল, শাদা রঙের কাঠি-কুঠি ডালপালাসুদ্ধ শুকনো — চায়ের মতো সেদ্ধ করে ছেঁকে একটু দুধ চিনি দিয়ে গরম চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলে নাকি গলা খোলে। পরে আমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছি। অত্যন্ত বিশ্রী লাগে খেতে। কিন্তু স্বরভঙ্গে ম্যাজিকের মতো ফল পাওয়া যায়। আরেকটা ওষুধ এই ওস্তাদজী শিখিয়েছিলেন, ফ্যারেঞ্জাইটিসের দোষ থাকলে অর্থাৎ আলজিভ বেড়ে গেলে গলা খুশ্‌ খুশ্‌ করে শুকনো কাশির মতো হয়। তখন গোল মরিচের সঙ্গে একটু তালমিছরী মিশিয়ে গুঁড়ো করে, এক চিমটি নিয়ে আলজিভে টিপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আরাম হয়। কবি কাকার এসব কিছু লাগতো না। মাঝে মাঝে গলা ব্যথায় ভুগতেন বটে তবু তাই নিয়েই তেড়ে গান গেয়ে যেতেন, গ্রাহ্যই করতেন না ওসব ছোটোখাটো ব্যথা। কখনো ভুলতেই দিতেন না, তিনি যে মহাযুদ্ধফেরত বিজয়ী বীর যোদ্ধা। দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দিলীপবাবুর সঙ্গে। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ লেগেই থাকতো।

কোনো সুযোগ ছাড়া হত না। এও একবকম কবিব লড়াই যদিও এক তবফা। দিলীপবাবুব ছাত্রী বেণুকা সেনেব দুটি গানেব বেকর্ড বেবিয়ে গেল এবং দুটিই হিট - 'পাগলা মনটাবে তুই বাধ, আব 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো সখি গো'। একি কখনো সহ্য হয। তৎক্ষণাৎ ছাত্রীব নামেব অক্ষবগুলো উল্টে নিয়ে মাস্টাবেব নামকবণ হয়ে গেল, 'কানুবে'। নিজেও উঠে পড়ে লাগলেন, বাণু সোমকে দিয়ে ওব চেয়েও ভালো গান গাওয়াতে হবে সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই অত ঘন ঘন উযাড়ীতে যাওয়া আব বাত দুপুবে ফেবা। এতে কোনোই দুবভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁব প্রতি নোটনেব অনুবাগেব কথা ও তাব নিজেব ফজিলাতুন্নেসাব প্রতি দুর্বলতাব কথা বাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। ফলে কেউ আব তাব সাধু সংকল্পেব কথা বিশ্বাস কবে না। ভুল বোঝাবুঝিব দরুণ বাণু সোমেব বাড়ি থেকে ফেবাব পথে লাঠিসোটা হকিস্টিক নিয়ে তেড়ে এসেছিল গুণ্ডা প্রকৃতিব ছাত্রদল। এব পব তিনি হঠাৎ ঢাকা থেকে চলে যান, একবকম 'লেজ গুটাইয়া' গান বেকর্ড কবানো হয়ে ওঠে নি আব।

কিছুদিন আগে কলকাতা বেতাব কেন্দ্র থেকে প্রচাবিত প্রতিভা বসুব লেখা একটি নাটক শুনলাম। নাম 'আযনা'— এক দিদিমা নাতনীব বয়ফ্রেণ্ডদেব সঙ্গে ডেটিং, টেলিফোনে আলাপেব ব্যগ্রতা দেখে নিজেব ফেলে আসা যৌবনেব দিনগুলিতে ফিবে গেছেন - কত পবিবর্তন হয়েছে অতীত থেকে বর্তমানেব তবু তাঁব নাতনীব মনেব মুকুবে নিজেব এত অমিলেব মাঝেও কোথায যেন মিল দেখতে পান '[illegible]ায থাকতেন, এক খ্যাতনামী কবি গান শেখাতেন, একটি গান গেয়েও শোনালেন। সেখানে আবেকজন বিখ্যাত গাযকেব সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যিনি পবে পণ্ডিচেবীতে অববিন্দেব কাছে দীক্ষা নিয়ে ঐ আশ্রমেই বয়ে গেলেন। ইনি দিলীপকুমাব বায। কোথাও কোনো নামেব উল্লেখ না থাকলেও আমি একই আযনায দিদিমাব সেইকালেব মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। জাযগায জাযগায আত্মগোপনেব ব্যর্থ চেষ্টাও হয়েছে। যেমন দিদিমা বলছেন, 'আমবা সে সময ভুল সুবে ববীন্দ্রসংগীত গাইতুম।' নাতনী অবাক হয়ে বলছে, 'কেন? ভুল সুবে গাইতে কেন?' বাঙাল দেশে থাকতুম তো সেখানে ঠিক সুবটা ধবিয়ে দেবাব কেউ ছিল না। তাছাড়া সবাই ভুল সুবে গাইতো।' আমি কিন্তু এ কথা কিছুতেই মেনে নিতে পাবি না। সেকালেও 'প্রবাসী', ভাবতবর্ষ', 'বসুমতী' ইত্যাদি পত্রিকায ববীন্দ্রনাথেব অনেক গানেবই স্ববলিপি বেবতো। আব্বু সেই স্ববলিপি অনুযাযী গাইতেন। কবি কাকা নিজেও স্ববলিপি দেখে গান শেখাতেন। ঢাকাব বিখ্যাত গাযক ও গানেব মাস্টাব খগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নিত্যগোপাল বর্মণ এবং আমাদেব ইডেন গার্লস হাই স্কুল এণ্ড ইন্টাবমিডিয়েট কলেজেব গান বাবু (ডি.কে.বি.) পাকিস্তান হবাব আগে পর্যন্ত এখানে সেই সব গান শিখিয়ে গেছেন। ববীন্দ্রনাথেব জীবদ্দশায সেগুলো বহুল প্রচলিত ছিল, আমাব কানে সে সুব এখনো লেগে আছে। পবে ক্রমশ মহা মহা ব্যাকবণবিদ্‌বা (গানেব) ববীন্দ্রসংগীতকে পিটিয়ে ছাঁচে ঢালাই কবে নতুন স্ববলিপি বেধে দিয়েছেন এবং খড়্গ উঁচিয়ে আছেন, এব বাইবে কেউ গেলেই পদস্খলন, ভুল সুব! এখন বাজাবে একই গানেব বহু শিল্পীব গাওয়া বেকর্ড বেবিয়েছে, কোনো দুটো একবকম নয। কাবটা ঠিক আব কাবটা ভুল কে তাব বিচাব কববে।

বাজা পঞ্চম জর্জেব সিলভাব জুবিলিব বছব, ১৯৩৫ সালে, গ্রীষ্মেব ছুটিতে আমবা কলকাতায গিয়েছিলাম। উৎসবমুখব মহানগবী— চাবিদিক থেকে সুব ভেসে আসে 'গড সেইভ দ্য কিং', বাজা বাণী ও তাদেব দুই কন্যা এলিজাবেথ আব মার্গাবেট বোজ-এব ছবি টাঙানো ঘবে ঘবে, বাইবে পার্কগুলোতে, হোটেলে, দোকানে, বাস্তাব মোড়ে মোড়ে। আমবা খুব বেড়াচ্ছি চিড়িয়াখানা, যাদুঘব, আত্মীয স্বজনেব বাড়ি। আব্বু একদিন আমাদেব প্রোগ্রাম ফেল কবিয়ে চুপিচুপি ভাগলেন। কোথায? শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব বাড়িতে দাবা খেলতে গিয়ে অবশ্য লাভই হয়েছিল। এব আগেব বাব ছাতা, কলম, টর্চ যা যা সেখানে ফেলে এসেছিলেন কিচ্ছু খোয়া যায নি -। যেটা যেখানে যেমন করে ফেলে এসেছিলেন ঠিক তেমনি অবস্থাযই পেয়েছেন। কেউ নেড়েও দেখে নি। আব্বু তো অবাক। কত

নির্লোভ চাকরবাকর সে বাড়ির। এই দাবার সূত্র ধরে চট করে মনে পড়লো, আচ্ছা কাজী নজরুল ইসলামের বাড়িতেও তো দাবা খেলতে যাওয়া যায়। আব্বু বললেন, 'হ্যাঁ তা তো যায়ই।'

— আমাদেরকেও একদিন নিয়ে যেতে হবে। আব্বু রাজি হলেন।

কবি কাকা তখন থাকলেন ইন্টালীতে। বাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে লাগানো। ছাদে ছাদে একাকার— ঠিক আমাদের নবাবপুর ইসলামপুর রোডের বাড়িগুলোর মতো ঘিঞ্জি। দোতলা— এক এক তলার উচ্চতা চৌদ্দ কি পনের ফিট হবে। ঠিক মাঝখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে পরের দিকে তাকালে, চৌকো এক টুকরো আকাশ দেখা যায়। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট— একটার ঘরগুলো পশ্চিম আর দক্ষিণমুখো, অন্যটার উত্তর আর পূর্বমুখো। ল্যানডিং এর উপরেই দাঁড়ে বসে একটা পাখি অদ্ভুতরকম মোটা গলায় বলে উঠতো, 'কে এলো? কে এলো? পাখিটা দেখতে টিয়াপাখির মতো। কিন্তু অনেক বড়ো। বিচিত্র তার বর্ণ। ঠোঁট আর মাথার কাছে খানিকটা টকটকে লাল। ডানা দুটো ময়ূরকণ্ঠী নীল। শরীরের পিঠের দিকটা গাঢ় সবুজ। পেটের দিকটা হলুদ। প্রত্যেকটির রঙই অত্যন্ত চড়া, শার্প কনট্রাস্ট। আমাদের দেশে এ পাখিকে বলে লালমোহন। এদের আদি বাস অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকায়— ওরা বলে ম্যাকাও। পরে লণ্ডন চিড়িয়াখানায় দেখেছি প্রকাণ্ড আকারের এক মানুষ থেকে তিন মানুষ সমান ম্যাকাও, নানারঙের। এটি ছিল আব্বুর বুক সমান। অনর্গল কথা বলে— তবে গলাটা বড়ই কর্কশ। ওর কথা শুনে ভিতর থেকে আপনিই দরোজা খুলে গেল, 'চিচিং ফাঁক' বলার দরকার হলো না। এইটিই কাকুর ফ্ল্যাট। প্রথম ঘরটা বৈঠকখানা। বড়ো বড়ো পাঁচটা ঘর, বেশ আলোবাতাস। ছাদে কবির শাশুড়ীর ঠাকুর ঘর। জানালাগুলো দরোজার সমান, লম্বালম্বি লোহার শিকের মোটা মোটা গরাদে দেওয়া, চারটে পাল্লা। ইচ্ছা করলে নিচের দুপাট বন্ধ করে উপরের দুটো খুলে রাখা যায়। এখানে সবগুলোই খোলা। সাদা কাপড়ের পর্দা আছে বটে, কোনোটা এক পাশে সরানো, কোনোটা জড়ো করে গুটিয়ে তুলে রাখা। ওপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা এ ফ্ল্যাটের লোকেদের চলাফেরা, ওঠাবসা সব দেখতে পাচ্ছে। বাইরের ঘরে ঢালাও ফরাশ পাতা। তার উপর কয়েকটা সাদা ধবধবে গেলাফ পরানো কোলবালিশ, একটা হার্মোনিয়াম আর বাঁয়া তবলা। ঢুকেই আব্বু বললেন, 'আজকে এরা দাবা খেলতে দেবে না মনে হচ্ছে। তার চেয়ে এদেরকে একটা গান শেখাও। গিয়েছিলাম ওবায়দা আর আমি। কবি কাকা মহাউল্লাসে হার্মোনিয়াম টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। আমরা বসেই দেখি, বাইরে থেকে কয়েক জোড়া চোখ চেয়ে আছে ড্যাব ড্যাব করে। আমি উঠে পাশের জানালার নিচের পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলাম। কবি হেসে বললেন, 'বন্ধ করছো করো, কিন্তু সাবধান, হঠাৎ দাঁড়াতে গেলে উপরের পাল্লাটা দিয়ে মাথার চাঁদি ফুটো হয়ে যাবে। আমাকে দেখছো না? আমার মাথায় কি এম্নি টাক ছিলো? ঐ ভাবে হয়েছে! চেয়ে দেখি, সত্যিই তো। অমন ঝাঁকড়া কোঁকড়া কালো বাবরি কোথায় গেল! শরীরের বাঁধুনীও তেমন আট সাঁট নেই। কেমন একটা শিথিল থপথপে ভাব এসে গেছে, তক্ষুণি একটা সাদা কাগজে ফাউন্টেন পেন দিয়ে খস্ খস্ করে গান লিখে শিখিয়ে দিলেন আর বললেন, 'এ গানটা রেকর্ড বের না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কোনো আসরে গেয়ো না। মনটা দমে গেল, সে আবার কী কথা! গাইতেই যদি না পারবো তবে অত কষ্ট করে শিখলাম কেন! সেই গান অবশেষে বেরুলো বছর দুই পরে সম্পূর্ণ অন্য সুরে, 'উতল হলো শান্ত আকাশ। তোমার কলগীতে'— আমাদের মেহনত বরবাদ গেল।

একজন শিশু শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। বৈঠক ঠিক ঘরোয়াও নয়, আবার খুব একটা বিরাট রকমের আসরও নয়। এখানে কবি কাকা গিয়েছিলেন শ্রোতা হয়ে, গান গাইলেন না। প্রথমে জাহানারা বেগম চৌধুরী, তখনো 'মিস' ছিলেন, সবাইকে স্বাগত জানালেন। তারপর দিলীপ রায় মঞ্চে এলেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গাঢ় গেরুয়া রঙের ধুতি পাঞ্জাবী, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। আমি এর আগে কখনো সিল্কের পাঞ্জাবী পরা সন্ন্যাসী দেখিনি। বর্ধমান হাউসে আমাদের বাড়িতে সাদা

খদ্দবেব ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন – এত দিনে ক্রমশ বঙ লেগেছে। বেশ শৌখিন মনে হলো। গানের পব একটু বিবতি। অপূর্ব! স্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ কবে ফেললেন প্রত্যেককে। দুটো গানেব পব একটু বিবতি। আবাব দুটো গান, এইভাবে ছযটি গান গেযেছেন। আমাব মনে হয এই বিবতিটুকু না থাকলেই ভালো ছিল -- এতে শ্রোতাদেব অখণ্ড মনোযোগে বিঘ্ন হযেছে। দিলীপ বাযেব মতো শিল্পীব পক্ষে পব পব ছযটা গান গাওযা এমন কিছুই কষ্টসাধ্য নয ক্রমাগত বাবো চৌদ্দটা গান গাওযাব অভ্যাস আছে এব। তিনি গাইলেন :

১. মৃত্যো বাঙা জবা কে দিল তোব পায।
২. 'মবি রূপে বর্ণে ছন্দে'। (এটি সে যুগেব অত্যন্ত জনপ্রিয গান। শিল্পী নিজে এটি উমা বসুকে দিযে বেকর্ড কবিযেছিলেন।)
৩. 'এবাব রুদ্ধ প্রাণেব পাষাণপুরীব
দ্বাব খোলো গো দ্বাব খোলো।'
৪. কি সুব বল, কি গুণ জানে
হবি হে তোমাব বাঁশেব বাঁশী।
৫. সেই বৃন্দাবনেব লীলা অভিবাম ছবি
আজো পড়ে মনে...
৬. কত গান তো হলো। গাওযা
আব মিছে কেন গাওযাও।'

সবই ভক্তিমূলক গান। আশ্চর্যেব বিষয, এই আসবে কাজী নজরুল ইসলাম একেবাবেই উচ্চবাচ্য কবেন নি। এটা তাব প্রকৃতি বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক। দিলীপ বায তাব কতকালেব প্রতিদ্বন্দ্বী।

সস্তানে শেষবাবেব মতো ঢাকায এসেছিলেন কবি কাকা অনুষ্ঠান কবতে দলবল নিযে। ঢাকা বেতাব (অল ইণ্ডিযা বেডিওব) কেন্দ্রে প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে। তাঁব সঙ্গীতেব মধ্যে শৈল দেবীব কথা আজ বিশেষ কবে মনে পড়ে।

গান শেষ হলে অন্য ঘবগুলোতে যাবাব ছুটি মিললো। কবিব দুই ছেলে, স্ত্রী আব শাশুড়ী গিবিবালা দেবী বেশ আলাপী। খাবাব সময বাটিতে মুর্গিব মাংস দেখে কোনো প্রশ্ন কবিনি। তবু আপন মনেই শাশুড়ী ঠাকরুণ বললেন, 'আমাব কি আব জাত ধর্ম আছে? এখনো এ সব খাওযা ধবি নি, শুধু ওদেব জন্য বান্না কবে দিই। ছাদেব কোণে একটা ঠাকুবঘব আছে বটে, পূজো আহ্নিকেব সমযই পাই না।' বেশ ঝাঁঝালো সুবেই বললেন কথাগুলো। কেউ কোনো জবাব দিলো না, মুখ টিপে হাসলো সবাই। ঘবেব দেযালে টাঙানো মস্ত মস্ত বাঁধানো ফটো। নাবদেব ভূমিকায অভিনয কবেছিলেন কাকা প্রহ্লাদ ছবিতে -- তাবই নানান দৃশ্য!

আবেকবাব গিযেছিলাম স্টেটস্‌ম্যান অফিসে অল ইণ্ডিযা চেস্ টুর্ণামেন্ট চলা কালে। এস. সি. আড্ডি কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্যদেব সঙ্গে আব্বুও তখন এই প্রতিযোগিতায অংশ নিযেছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি খুলে যাচ্ছে, আব্বু [illegible] খেলতে পাববেন না, এই কথা বলতেই যাওযা। সেদিন কবি কাকাব খেলা ছিল না। তিনি এসেছিলেন অন্যদেব খেলা দেখতে আব তাবি ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লিখতে। অনিযমই ছিল তাঁব পক্ষে নিযম। নইলে ঐ হাটেব মধ্যে কেউ কবিতা লেখাব কথা চিন্তা কবতে পাবে। ঐখানে বসে সদ্য লেখা দুটো গান গেযে শোনালেন— 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' আব 'বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ।' আমবা ঢাকায ফিবে কিছুদিনেব মধ্যেই এই গান দুটোব বেকর্ড পেলাম— প্রথমটা গেযেছেন সন্তোষ সেনগুপ্ত, দ্বিতীযটা আঙ্গুববালা।

হিজ মাস্টাবস্ ভযেস কোম্পানিব প্রত্যেকটা রেকর্ডেব দাম ছিল তিন টাকা। কবি কাকা তাঁব নিজেব লেখা গানেব বেকর্ড একাধিক কপি পেতেন ফ্রি। তাব একটি কবে কপি আব্বুকে দিতেন। এছাড়া

অন্যদের লেখা গানের রেকর্ড তিনি কনসেশন রেটে পেতেন, দাম দু টাকা চার আনা। আমরা আব্বাসউদ্দীন, কে. মল্লিক, আবদুল করিম, এঁদের গাওয়া রেকর্ড তাঁর মাধ্যমে কিনতাম। তালিকা পাঠালেই রেকর্ড চলে আসতো। দামটা কখনো মনিঅর্ডার কিংবা নিজে কলকাতায় গেলে গিয়ে দিতেন আব্বু।

সিলভার জুবিলীর বছরে আরেকটা সঙ্গীত সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম বিখ্যাত সুন্দরী জাহানারা বেগম চৌধুরীর বাড়িতে। খুব ভালো লেগেছিল। যেতেই আপ্যায়ন করা হলো এক গ্লাস শরবত দিয়ে-- যেমি স্বাদ, তেমনি তার সুগন্ধি। প্রচুর পরিমাণ বাদামপেস্তা বাটা দুধের সঙ্গে গুলে কিষাণভোগ আম কিংবা তারি সুগন্ধির এসেন্স দিয়ে তৈরি। অনেকটা মালাই কুলপির মতো কিন্তু আরো তরল , খেতে দাঁত কন্‌কন্‌ করে না। আরম্ভটা যার এত ভালো, শেষটাও অনুরূপ হতেই হবে। প্রধান শিল্পী দিলীপ রায়। তাঁর গলাকে একটু স্বস্তি দেবার জন্যেই বোধ হয় মাঝে মাঝে দু'জনের 'পূরব দেশের পুরনারী' গানটা অসাধারণ রকম ভালো হয়েছিল। পরে বাংলাদেশের লায়লা আর্জুমান্দ বানুর গলায়ও এ গানটি শুনেছি অনেকবার রেডিওতে এবং আমাদের বাড়িতে।

দেশ বিভাগের পর আব্বু প্রায়ই ব্যারাকপুরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে যেতেন। মাঝে মাঝে আম্মুও তাঁর সঙ্গে যেতেন বাপের বাড়িতে আসার জন্যে। একবার ওরা দুজনেই অসুস্থ কবিকে দেখতে গেলেন। কবি তখন ঘোরতর অসুস্থ, কিন্তু খুবই শান্ত। কোনোরকম জোরজুলুম করেন না। সারাক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে বসে থাকেন। প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পাশের বিছানায় শুয়ে। দু'পা অবশ। হাত দুটো নাড়তে পারেন বলে একটু বাঁচোয়া। কোনো রকম খাবার তুলে স্বামীর মুখে এবং নিজের মুখে দিতে পারেন মাত্র। নইলে এটুকুও ঐ বৌমাকে করতে হতো। মুখটা অবশ হয় নি বলে অসুবিধাটা কোথায় তা বলতে পারেন। কবি যে কিছুই পারেন না, একেবারে সদ্যোজাত শিশুর মতো। বিছানায় শুয়েই প্রমীলা দুহাতে নাতিকেও সামলাচ্ছেন। তবেই তো ওর মা সংসারের সমস্ত কাজ করে উপরন্তু রুগীর সেবা করতে পারছে! ছোটো ছেলের বৌ সেই সময়টাতে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। বড় বৌ উমা নিজের বাচ্চার সঙ্গে এই বড়োবাচ্চা দু'টিরও সব রকম পরিচর্যা করে যাচ্ছে দিনরাত হাসিমুখে। আম্মু ওর একনিষ্ঠ সেবার খুব প্রশংসা করলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের যে প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বসিত ব্যক্তিত্ব দেখেছি তা ভস্মীভূত অবস্থায় সহ্য করতে পারবো না বলেই দেখতে পরে বেশী যাই নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। যে স্বাধীনতার দাবিতে তিনি দশকে দশকে উত্তপ্ত লাভা উদ্‌গীরণ করেছেন সেই স্বাধীনতার পরে ঢাকায় আনা হলো তাঁর নির্বাপিত, অসাড় দেহটাকে। ওতে প্রাণের স্পন্দন থাকলেও অনুভূতি নেই। আর সাড়া জাগায় না, উদ্বুদ্ধ করে না। সুখে-দুঃখে গান গেয়ে ওঠে না। ১৯৭৬ সালে টেলিভিশনে দেখলাম, হুইল চেয়ারে ঠেলে সভাস্থলে নিয়ে আসা হলো তাঁকে স্বর্ণপদক দেবার জন্য। তাকিয়ে আছেন, কিছুই দেখছেন না। ভাবলেশহীন, নিঃসাড় নির্লিপ্ত। যে চোখ হেসে হেসে নেচে নেচে কথা বলতো, যার দৃপ্ত জ্বালাময়ী ভাষা কোটি কোটি দেশবাসীর আগুন ধরিয়ে দিত প্রতি রক্তকণায়, আজ সব স্তব্ধ, নিথর। তাঁর দৈহিক মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে এ প্রহসনের প্রয়োজন ছিল না--- এ যে তাঁর আত্মার অবমাননা। স্বর্ণপদকের তাৎপর্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল যাঁর, তাঁকে নিয়ে এ নিষ্ঠুর পরিহাস হৃদয়বিদারক। কী করুণ সে দৃশ্য! এই কি সেই 'চল্‌ চল্‌ চল্‌' গানের লেখক ও গায়ক? তাঁর আত্মার মৃত্যু বহু আগেই ঘটেছিল। তবে কেন অসাড় দেহটা নিয়ে এমন পৈশাচিক উল্লাস?

তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দলে দলে লোক গিয়েছেন তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে কিংবা পি.জি. হাসপাতালের ক্যাবিনে কিংবা শবযাত্রায় ঠেলাঠেলি করতে। আমি কক্ষণো যাই নি সে সব জায়গায় ভিড় বাড়াতে, যেতে পারি নি। আমি ঘরে বসেই চোখ মুছেছি আর মোনাজাত করেছি--- জানি না আমার এ অদ্ভুত শ্রদ্ধানিবেদন যথাস্থানে পৌঁছেছে কিনা!

'যে দিন ভেসে গেছে...'

প্র তি ভা ব সু

তখন আমার পনের কি ষোল বছর বয়েস হবে বোধহয়। এখনকার সময়ে শুনলে শিশুই মনে হবে। এখন তো পঁচিশ বছরেও কৈশোর কাটে না মেয়েদের। যা হোক, নজরুল ইসলামকে ঘিরে আমার সব কথাই ওই সময়টুকুর পরিমণ্ডলে বাধা। ইদানিং ভুলে যাই ভীষণ। অতীত হাতড়ালে অনেক কথা একসঙ্গে ভিড় করে আসে। ঘটনাগুলোর ওপর অনেক দিনমাস বছরের প্রলেপ পড়েছে। তবু এখনো ভুলতে পারি না সেইসব গান। গান খুব ভালোবাসতাম। গান গাইতেও পারতাম। খুব প্রিয় ছিল আমার নজরুল গীতি। সেই যে 'মন হারালে না পাওয়া যায় মনের রতন...' 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে ..' অপর্ব সেই গানের পথ ধরেই স্মৃতিতে ভেসে আসেন তিনি। টুকরো অনেক ঘটনা মনে পড়ে যায়। একটা সময় নজরুল গীতিকে ছড়িয়ে ছিলাম। তবে নিজের মত করে গেয়ে, এখন যা সব হচ্ছে, কথা বদলে তেমন নয়। ওর নিজের শিখিয়ে দেওয়া সুরে গান গাইতাম। ভীষণ ভালো লাগত। খুব চেষ্টা করতাম ওর গানের কথাগুলিতে জীবন্ত করে তুলতে। সেইজন্য নজরুলও কখনো কখনো বাড়াবাড়ি করতেন। এমনিতেই মানুষটা ছিলেন সবল, প্রাণবন্ত। ছেলেমানুষের মত কিছু পাগলামি ছিল ওঁর মধ্যে। অনেকের সামনে এমন প্রশংসা করতেন লজ্জা পেয়ে যেতাম। ওই গানটার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আজকাল শুনি 'না পাওয় যায় মনের রতন' কথাটির পরিবর্তে 'মনের মতন' বলা হচ্ছে। খুব কষ্ট হয়। গানটাকে যে কতখানি অবমাননা করা হয় কেউ বোঝে না।

নজরুলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কলকাতাতেই হয়েছিল। আমি গানের রেকর্ডিং-এর কাজে মাঝে মধ্যে কলকাতা আসতাম। তেমনি কোনও একটি আসরে ঠিক মনে পড়ছে না দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। ভারি সুন্দর চেহারা ছিল নজরুল ইসলামের। একমাথা ঘন চুল। ঝকঝকে চোখ নাক মুখ একবার দেখলে ভোলা যায় না। আর সবচেয়ে মজার কথা হল ওঁর হাঁটা চলা, কথা বলা, সাজপোশাক সব কিছুর মধ্যে এমন একটা অগোছালো সৌন্দর্য্য লুকিয়ে থাকত। ভালো লাগতে বাধ্য। কক্ষনো কথা রাখতে পারতেন না তিনি। চেষ্টাও করতেন না। রেগে গেলে বলতেন, 'বোঝো না কেন, ভদ্রলোকের এক কথা, আমি কথা রাখতে পারি না এটা ভাঙি কি করে।' আশ্চর্য এক প্রাণশক্তি ছিল ওঁর মধ্যে। যতক্ষণ থাকতেন গানে গল্পে একেবারে মাতিয়ে রাখতেন। সেই সময়টুকুর জন্য সকলের দুঃখ কষ্ট যেন উধাও। অথচ তারই মধ্যে গান লিখছেন, সুর দিচ্ছেন, গান শেখাচ্ছেন। ঢাকায় এলেই আমাদের বাড়ি আসতেন। আর তখন যেন ওটা আমাদের বাড়ি নয় শুধু। অতিথি ব্যক্তিটি অজান্তেই কেমন প্রিয়জন হয়ে উঠতেন আমাদের। প্রচুর গান শিখেছি ওঁর কাছে। বাড়িতে এলেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়তেন। সেই সময় দিলীপ রায় আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন।

গান শিখেছি ওঁর কাছেও। প্রথম আলাপেই তো আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি মন্টুর ছাত্রী না, ঠিক চিনেছি।'

সে সময় তিনটি যুবক একেবারে মাতিয়ে রেখেছিলেন বাংলাকে। দিলীপ রায়, সুভাষচন্দ্র বসু ও নজরুল ইসলাম। নজরুলের কবিতা ও অন্যান্য লেখালেখি আমাকে মুগ্ধ করতে পারে নি তেমন। আসলে যে সব কবিতা ও কবিদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি তাঁরা তো নক্ষত্র বিশেষ। যেমন রবীন্দ্রনাথের পরে অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় নজরুলের কবিতা সেই স্তরে পৌঁছতে পারেনি। যদিও তাঁর কবিতা আমি খুব বেশি পড়িনি। তাহলেও এটা বরাবর মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর গান অনবদ্য। এবং যেখানে নজরুল তাঁর যাবতীয় সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছেন যেন। আজও নজরুলগীতি আমার প্রাণের গান। নজরুল এক ছন্নছাড়া, ওলটপালট জীবন কাটাতেন। দেখলেই মনে হত এ মানুষ জীবনের সোজা পথে চলবার মানুষ নন। পরবর্তীকালে তো কত কথা শুনেছি ওঁর সম্পর্কে। যোগাযোগ ছিল না একেবারেই। তবু কানে আসত। মন খারাপ হয়ে যেত। মেনে নিতে বড় কষ্ট হত। ওঁর পাগলামি নানাবিধ এলোমেলো কাজ। অন্যেরা এসব নিয়ে কথা বললে মোটেই ভালো লাগত না আমার। আসলে বয়সটা কম হলেও নজরুল আমার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। ওই যে বললাম বয়সটা পনের ষোল কিন্তু আমি মানসিক দিক থেকে খুব বড় ছিলাম। ছোট থেকেই বাড়িতে প্রচুর বইয়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। খুব বই পড়তাম। ফলে খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছিলাম আমি। বাবা জানতেন আমি পড়তে ভালোবাসি বইপত্রও জোগাড় করে দিতেন। তো, সেইসময় নজরুল দিলীপ রায় প্রমুখদের সঙ্গে নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। ওঁরাও আমার সঙ্গে সমবয়স্কর মতো আচরণ করতেন। যেন বন্ধু। সেই হাসি ঠাট্টা, তর্ক, ভাববাচ্যে কথা সব কিছুর মধ্যেই আমার পরিণত মন সক্রিয় ছিল। তাছাড়া হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে গিয়েছিলাম। ফলে চেহারাতেও বড় বড় ভাবটা খারাপ মানাত না।

বিয়ের পর নজরুলের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। বই উপহার দিতেন অনেক সময়। কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ আর হয়নি। জানতে পেরেছি ওঁর খামখেয়ালিপনা কমে নি। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করছেন। নানা আঘাতে জর্জরিত। সকলে পুত্রশোকটাকেই বড় করে দেখাতে চায়। কিন্তু আমি কোনও সরলীকরণে বিশ্বাসী নই। পুত্রশোক তো আমিও পেয়েছি। কি অদ্ভুত যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটাতে হয় সে আমি জানি। তবু তো একজন মা সন্তানের শোক নিয়েও বেঁচে থাকে। আসলে নানা জটিলতা নিয়ে জীবন এগিয়ে ছিল ওঁর। প্রথম দিকে বেশ কষ্ট করে বড় হতে হয়েছে। আর যখন কিছু খ্যাতি হয়েছে তখন ভেসে গিয়েছেন অন্যপথে। সে সময়ে নাটক গানবাজনার জগতে ভদ্রঘরের মেয়েরা আসত না তেমন। আসতো অন্য ধরনের মেয়েরা। নজরুলের জগত ছিল নাটক, আবৃত্তি, গান। ফলত জীবনের অন্ধকার বাঁকগুলোও ছুঁতে হয়েছিল ওঁকে। খারাপ অসুখবিসুখও হয়েছিল। ওঁর পরবর্তী মানসিক ভারসাম্যহীনতা এসবের পরিণতি কিনা কে জানে। তাছাড়া চূড়ান্ত একটা হতাশার ভূমিও তৈরি হয়েছিল ওঁর চারপাশে। যোগ্য সম্মান তো পাননি। এখনই দেখছি নজরুল ইসলামকে নিয়ে ধূম পড়ে গিয়েছে যেন। বাংলাদেশ, ভারত সবাই মহা ব্যস্ত। অথচ জীবিতকালে মানুষটা ছিল অবহেলিত হাস্যাস্পদ, সাম্প্রদায়িক বেড়াজালে রুদ্ধ।

যুবক বয়সে রাজনীতি করেছেন। জেল খেটেছেন। সেলে কাটিয়েছেন দীর্ঘদিন। আন্তরিক একটা বিশ্বাস থেকেই নজরুল রাজনীতিতে আসেন। কোনো চমকে বা হুজুগে পড়ে নয়। অথচ সবটাই যেন ওঁর বেখাপ্পা আচরণের একটা চলনসই ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্বিক সময়ে সার্বিক মূল্যায়নের বড় অভাব এখানে। আবার ফুটবলের দারুণ ভক্ত ছিলেন নজরুল ইসলাম। নিয়মিত খেলা দেখতেন। একটা মানুষের মধ্যে একসঙ্গে এতকিছু ভাবা যায় না যেন। সেইজন্যেই তিনি একেবারে অন্যরকম, অনন্য।

পরে মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। ভারি করুণ সেই শেষ দেখা। একবার আমার বড়

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে যাচ্ছি কোথাও। জায়গাটা অতটা মনে নেই। বুদ্ধদেব বসুও সঙ্গে আছেন। হঠাৎ দেখি সেই মানুষ। আমি তো চমকে উঠেছি একেবারে। এর আগে চারপাশে নানা কথা শুনছি ওঁর সম্পর্কে। যা হোক আমি তো ছুটে গেছি। গিয়ে বললাম, 'আপনি এখানে'। কোনও কথা বললেন না। মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি তো খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেছি। কোনমতে বললাম, 'কি হল আমাকে চিনতে পারছেন না?' সেই তাকিয়ে আছেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'শোন রানু, কাল আমার সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।' বুঝতে পারলাম উনি কিছু অন্যরকম কথা বলছেন। কেননা, শ্রী অরবিন্দ তো বছরে একবারই বের হন। কলকাতার রাস্তায় কিভাবে আসবেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'রানু তোমার মেয়ে খুব সুন্দর'। এরও পরে ট্রেন থামলে আমরা নামলাম। নজরুল নামলেন। আমি ওঁকেই দেখছিলাম। খানিকটা হতাশা আর ক্ষোভ নিয়েই ওঁর অদ্ভুত ব্যবহার লক্ষ্য করছিলাম। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, 'রাগ করেছো, মাঝেমধ্যে কি যেন হয় আমার। কিছু মনে করো না। আজ বিকেলে তোমাদের ওখানে যাবো'। কিন্তু আর আসেননি। সেই বিকেলে কেন, আর কোনও বিকেলে তাঁর দেখা পাইনি।

বাড়ি ফিরে বুদ্ধদেব বসুও বলেছিলেন, 'ওঁর আচরণ কিন্তু স্বাভাবিক মনে হলো না রানু'। কথাটা সত্যি আমি জানতাম। কিন্তু তবু কেমন যেন রাগ হয়ে গেলো। মনে আছে খুব তর্ক চালিয়েছিলাম সেইসময়। মেনে নিতে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

আজ এই এত আড়ম্বর। ওঁকে নিয়ে এই উৎসব দেখে একটা কথা মনে হয়—মানুষটা কিভাবে নিতেন এটা। খুব কি আনন্দ পেতেন! দুঃখ পেতেন! ঠিক বুঝতে পারি না।

নজরুলের হুগলি-নৈহাটির দিনগুলি

র ণে ন মু খো পা ধ্যা য় (কৃত্তিবাস ওঝা)

নৈহাটি-চুঁচুড়াকে কেন্দ্র করে নজরুল ইসলামেব জীবনের দিনগুলি হলো আগুনেব অক্ষরে লেখা। নজরুল ইসলামের জীবনে ১৯২১-১৯২৬ সাল এই পাঁচটা বছর সবচেয়ে সৃষ্টিধর্মী ও বহুমুখী প্রতিভায প্রস্ফুটিত। এই পাঁচ বছরে এই সময়ে বেশিরভাগই কেটেছে নজরুলের হুগলি, নৈহাটি ও কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করে। এই সময়ের মধ্যেই কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সংগ্রাম পুষ্ট হয গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, হকসাহেব ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সংস্পর্শ লাভে। সাহিত্যিক ও কবিরা নজরুলকে ঘিরে ছিলেন মৌচাকের মৌমাছির মত। নজরুলের আবির্ভাবকালটা ছিল রক্তস্নাত। রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল বিদ্রোহের আর এই সময় নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িযে বাংলার মানুষের সামনে এসে দাঁড়ালেন বিদ্রোহী কবি হিসাবে। জালিওযানওযালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। গান্ধীজীর অসহযোগ ও বিলাতী বর্জন চলছে। রাশিযায় বিপ্লব শেষ হয়ে পৃথিবীতে প্রথম রক্তপতাকা তুলে লেনিন প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রমিকের রাজ। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ মধ্যগগনে, চিত্তরঞ্জন দাশ রাজবেশ ছেড়ে দেশবন্ধু হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র আই সি এস পাশ করে দেশে ফিরে হ্যাটকোট ছেড়ে খদ্দর পরেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তাসখন্দে। লেনিনের সঙ্গে প্রবল বিতর্ক করে মানবেন্দ্রনাথ রায় ভাবতে এসে কমিউনিস্ট পার্টি বিস্তারে হাত দিয়েছেন। এই সময়টাতেই অগ্নিনিশান বাজিয়ে নজরুলের আবির্ভাব।

স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলি জেলার একটা বিশেষ অবদান আছে। অহিংস আন্দোলনই হোক আর বিপ্লবী আন্দোলনেই হোক হুগলি জেলা অতি গৌরবের। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ দুর্বারভাবে লেগেছিল হুগলি জেলায়। ছেলেরা স্কুল, কলেজ ছেড়ে দেশসেবার সঙ্গে যাতে শিক্ষাক্ষেত্রেও পিছিয়ে না পড়ে তার জন্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, তার অধীনে বিদ্যালয়। হুগলি বিদ্যামন্দির ছিল এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বিদ্যামন্দিরের প্রবীণদের মধ্যে ছিলেন ভুপতি মজুমদার। ১৯২১ সালের শেষদিকে ভুপতি মজুমদার হুগলিতে নিয়ে এলেন কাজী নজরুল ইসলামকে। নজরুল ইসলাম তখন কলকাতায মুজফ্ফর আহ্মদের আস্তানায় থাকেন। হুগলি বিদ্যামন্দিরে এসে যুবক কবি গান গেয়ে, আবৃত্তি করে বিপ্লবী যুবকদের মনকে আরও সংকল্প বদ্ধ করে দিলেন। বিজয় মোদক, হামিদ উল হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, সিরাজুল হকেরা নজরুলের সঙ্গে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে নজরুল যখন কলকাতায় ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন হুগলির ছেলেরা ধূমকেতুর প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলার ১৩৩১ সালে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে যখন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ হয় নজরুল তখন হুগলির বাসিন্দা। সেই হিসাবে সমগ্র জেলাকে তিনি আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্রষ্টা দে'বন্ধু, সেনাপতি সুভাষচন্দ্র

বসু আর প্রচারসচিব নজরুল ইসলাম। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের কারণ হল মোহান্তদের ধারাবাহিক অপকীর্তি। স্বামী বিশ্বানন্দ নামে এক স্বামীজি মোহান্তদের ধারাবাহিক কুকীর্তি দেখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে প্রতিকার কামনা করেন। দেশবন্ধু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নামে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জে এম সেনগুপ্ত, মৌলানা আক্রাম খাঁ, অনিলবরণ রায় ও পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য। দেশবন্ধুর অনুরোধে নজরুল ইসলাম প্রচার কাজে নেতৃত্ব নিয়ে হুগলি জেলার সর্বোচ্চ শহর সারা দেশে 'মোহ-অন্তের গান' নামে একটি গান লেখেন এবং সর্বত্র এই গানটি গেয়ে বেড়ান। গানটি হল:

"জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ঐ ডুবালো পাপ চণ্ডাল তোদের বাংলাদেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী।
মোহের যার নাইকো অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত
মা-বোনের সর্বস্বান্ত,
করছে বেদী মূলে।
তোদের পূজার প্রসাদ বলে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গুলে
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস, পাপ ব্যভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী।"

'তদন্ত কমিটির তদন্তে দেখা যায় তারকেশ্বর নিবাসের শ্রীমন্তগিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্মকর্ম সংস্থাপনার্থে এক বেশ্যা রাখিয়াছিলেন। তাহাতে জগন্নাথপুর নিবাসী রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি ওই বেশ্যার সঙ্গে কি প্রকারে প্রসিদ্ধি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়া ২রা চৈত্র (১২৩০) শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন... তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সময় পাইয়া ওই ব্রাহ্মণের বক্ষস্থলের ওপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছুরিকাঘাত করিল যে তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণবিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা ওই সমাচার শুনিয়া ওই সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করেন...(১৬ চৈত্র, ১২৩৪)।' এই ব্যাপারে ওই মোহান্তের ফাঁসি হয়। এরপর আর একটি ঘটনা। "মোহান্ত মাধবগিরি এলোকেশী নামক এক মহিলার সতীত্ব নাশের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন।"এই এলোকেশী কুরুমঙ্গল গ্রামের নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের সুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁহার বিবাহ হয় নবীন নামক এক যুবকের সঙ্গে। নবীন ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এই দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মোহান্ত এলোকেশীর পিতা নীলকমলকে হাত করেন এবং এই অপমানেও স্বামী নবীন স্ত্রীকে ক্ষমা করে কলকাতায় পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মোহান্তের নিয়োজিত লাঠিয়াল বাহিনীর জন্য নবীন পালিয়ে যেতে পারেন না। অবশেষে আঁশবটি দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে থানায় আত্মসমর্পণ করে সব বলেন, নবীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, আর পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশের জন্য মাধবগিরির হয় কারাদণ্ড। পরে দেশের বহু গণ্যমান্যদের চেষ্টায় নবীন কারামুক্ত হয়।"*

এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বহু ছাত্র যুব গ্রেপ্তার বরণ করে, স্বামী বিশ্বানন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র প্রভৃতি এতে ছিলেন। এরপর মামলা শুরু হয় সতীশ গিরির বিরুদ্ধে। মামলায় মোহান্তের সব দেবোত্তর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে জেলাশাসকের ওপর অর্পণ করা হয়। কোর্টের রায়ে বলা হয় যে, জেলাশাসক যদি মনে করেন কোন মোহান্তকে অপসারণ করে অন্য উপযুক্ত নিয়োগ করা উচিত তবে তিনি তা করতে পারেন। এই ভাবে পাপিষ্ঠ, অত্যাচারী যারা ধর্মের নামে যথেচ্ছাচার ও পাপাচারে

* প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, 'কাজী নজরুল' গ্রন্থ হইতে।

লিপ্ত হচ্ছিলেন তা থেকে তারকেশ্বর মুক্ত হয়। এই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ইসলাম চারণ কবির ভূমিকায় দেশবাসীকে মাতিয়ে তোলেন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজী নজরুল ইসলাম এই সময়ের যে সকল সঙ্গীত রচনা করে পাপাচারী মোহান্তদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন আর দেশবাসীকে জাগ্রত করেন সেইরূপ গানের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল :

১। 'পুন্যের ব্যবসাদারী
চালায় সব এই ব্যাপারী,
জমাচ্ছে হাঁড়ি-হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায় ছাই মেখে সে ভিখারী শিব বেড়ান ভিক্ষা করে।
ওরে তাঁর পূজারী দিনে দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসী।
জাগো বঙ্গবাসী।"
২. "এই সব ধর্ম ঘাগী
দেবতায় করছে দাগী ;
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ নরকে বসে।
সে যে পাপের ঘন্টা বাজায় পাপীদের দেউলে পাশে
আর ভক্ত তোরা পুজিস তারেই ? যোগাস্ খোরাক সেবা দাসী।
জাগো বঙ্গবাসী।"
৩. "দিয়ে নিজ রক্ত বিন্দু
ভরালি পাপের সিন্ধু
ডুবলি তায় ডুবলি হিন্দু, ডুবালি দেবতারে ?
দ্যাখ্ ভোঁগের বিষ্ঠা পুড়ছে তোদের বেদীর ধুপাধারে।
পূজারীর কমণ্ডলুর গঙ্গা জলে মদের ফেনা উঠছে ভাসি।
জাগো বঙ্গবাসী।"
৪. "দিতে যায় পূজা আরতি
সতীত্ব হারায় সতী
পুণ্য খাতায় ক্ষতি লেখায় ভক্তি দিয়ে।"
৫. "তার ভোগ মহলে জ্বলছে প্রদীপ তোদের পূণ্য ঘিরে।
তোদের ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামীতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।
জাগো বঙ্গবাসী।"
৬. "তোরা সব ভক্তিশালী
বুকে নয়, মুখে খালি।
বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছের কাঁটা যে রে।"

এই গানগুলি প্রায় সবই কাজী নজরুল ইসলাম চুঁচুড়ায় বসবাসকালে রচনা করেছিলেন। সে সময় তিনি চুঁচুড়ার মোঘলটুলি লেনের ঠিকানায় থাকতেন।

(২)

কাজী নজরুল ইসলাম হুগলি জেলায় আসেন ১৯২৩ সালের ১৪ এপ্রিল। নজরুল সে সময় ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদক। ধূমকেতু যখন প্রকাশিত হয় কবি যখন ৩২ নম্বর কলিনস্ স্ট্রীটে থাকেন। তাকে ঘিরে থাকতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রেজাউল করিম। ধূমকেতু প্রকাশিত হয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী থাকত চার পৃষ্ঠার সম্পাদকীয়ের মাথায়। পরবর্তীকালে ধূমকেতু

পত্রিকার অফিস প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে স্থানান্তরিত হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাসস্থানের পাশেই ধূমকেতুর অফিস। ধূমকেতু পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যা যা ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়, সেই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আনন্দময়ী আগমনের বিখ্যাত সেই কবিতাটি। এই কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্ত হওয়ার আগে কবি আত্মগোপন করেন, কিন্তু কুমিল্লায় থাকাকালে গ্রেপ্তার হয়ে যান। কবিকে কুমিল্লা থেকে হাতে হাতকড়া, কোমড়ে দড়ি বেঁধে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি বিচারে কবির একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কবিকে প্রথমে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে নজরুলকে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে সরকার কবিকে ১৯২৩ সালের ১৪ এপ্রিল সেণ্ট্রাল জেল থেকে স্থানান্তরিত করা হয়। হুগলিতে রাজনৈতিক বন্দিদের রাখা নিরাপদ ছিল। কারণ এই জেলে বন্দীদের দমনপীড়নের যথেষ্ট সুব্যবস্থা ছিল। কলকাতার জেল থেকে দূরে মফস্বল শহরের একটি জেলে সরকার খুশিমত, ইচ্ছামত বন্দীদের নির্যাতন উৎপীড়ন করতে পারত সেকথা ভেবেই সম্ভবতঃ নজরুলকে হুগলি জেলে আনা হয়েছিল।

হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি বাঁধা নজরুলকে জেলের গেটে ঢোকানো মাত্র নজরুল তাঁর বিশেষ কণ্ঠে আওয়াজ তুললেন, "দে গরুর গা ধুইয়ে" এই কথাটা শুনেই জেলের আটক, রাজবন্দীরা চকিত হয়ে উঠলেন। তারপর কবির গান ও কবিতায় হুগলি কারাগার হয়ে উঠল মস্ত বড় রাজনৈতিক আড্ডাখানা। হুগলি জেলে আছেন কবি, আর হুগলি ঘাট স্টেশন থেকে হুগলি জেলের বন্দিদের বাইরে থেকে দেখবার একটা মস্ত বড় সুযোগ ছিল। জুবিলী ব্রিজের কারণে হুগলি ঘাট স্টেশনটি ছিল পাঁচতলা সমান উঁচু। হুগলি ঘাট স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে জেলের কয়েদীদের সব দেখা যেত। সিরাজুল হক, কবি সুবোধ রায়, বিজয় মোদক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এই স্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ঢিলে বেঁধে কবির উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠাতেন। কয়েদীদের কাজে লাগাতে পারে সেকথা বুঝে গামছা-সাবান-বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি ছুঁড়ে দেওয়া হত। অনেকদিন পর এটা কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ায় হুগলিঘাট স্টেশনের ২ নং প্লাটফর্মে সাদা পোশাকে পুলিশ ও পরে বন্দুকধারী পুলিশ নিয়োগ করা হল। তাতেও যখন সুবিধা হল না তখন প্লাটফর্মে অনেক উঁচু করে টিনের বেড়া দেওয়া হল। জেল সুপারিটেনডেন্ট নজরুলের কারণে জেলে প্রবল অশান্তি হতে পারে এই কথা ভেবে কয়েদিদের ওপর আরও কড়া নজর রাখতে শুরু করলেন। নজরুলকে দেখলে সুপরিনটেনডেন্ট সাহেব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। এই ইংরেজ জেলা অফিসারের কণ্ঠস্বর ছিল বড় কর্কশ। কবি জেল সুপারের নাম রেখেছিলেন হার্সটন। তাকে উদ্দেশ্য করে নজরুল একটি কবিতাও রচনা করেছেন 'সুইপার বন্দনা' নামেঃ

"তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারই গান তোমারই ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে,
রেখেছ সাস্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয় ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আঁকাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছো আমার রসনা লোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লপসী' শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।

ধর ধর ঘুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সগুষ্টি
ওল-ছোলা দেহধবল কুষ্ঠ
তুমি ধন্য ধন্য হে।”

জেলেতে রাজনৈতিক বন্দীরাই শুধু নয় সাধারণ বন্দীরাও নজরুলের অনুগামী হয়ে উঠেছিল। নজরুল যখন গান ধরতেন।

“কারার ওই লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কবরে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পুজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদী।”

এই গানটি যখন গাওয়া হত তখন জেলের সাধারণ কয়েদিরাও নজরুলের সঙ্গে গলা মেলাতেন। 'বন্দীশালা' শব্দটা নিয়ে কয়েদিদের বেশ কিছুটা ভুল বোঝানো হয়েছিল। কিন্তু 'শালা' শব্দের অপব্যবহারের সত্যটা সাধারণ কয়েদীদের বুঝিয়ে দেন জেলে নজরুলের সহবন্দী বরিশালের সতীন সেন। সতীন সেন, ধরানাথ ভট্টাচার্য, দূর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় এই জেলে কবির সহবন্দী ছিলেন। জেলের মধ্যে খবরের কাগজ পাচার ছিল মস্ত বড় অপরাধের কাজ। তখন বাংলা পত্রিকাগুলি বিশেষ করে আনন্দবাজার পত্রিকাতে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদকীয় লেখাগুলো ছিল আন্দোলনকে সুষ্ঠু ও অগ্নিস্পর্শী করবার প্রেরণাস্বরূপ। কাগজ পাচার করতে গিয়ে দু'একজন বন্দীর যেমন সাজা হল তেমনি বাইরে থেকে কাগজ সরবরাহ করতে গিয়ে দু-চারজন গ্রেপ্তারও হলেন। খবরের কাগজ নিয়ে যখন নানারকম চাপসৃষ্টি শুরু হল তখন জেল সুপার জেলে আরও কড়া জুলুম শুরু করলেন। আটক বন্দীদের যেটুকু সময় বাইরে থাকবার সুযোগ দেওয়া হত সে সুযোগও কেড়ে নেওয়া হল। নজরুলকে বন্দী অবস্থায় জেলের ভিতরের দিকে পাঁচ নম্বর সেলে বন্দী করা হল। শুধু তাই নয়, সতীন সেন ও নজরুল ইসলামকে সেলের মধ্যে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি দেওয়া হল। কবি হাতকড়া বাঁধা হাত দুটি লোহার গরাদের সঙ্গে বাজিয়ে গাইতেন।

(এই) শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল,
(এই) শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল!
(তোমার) বন্দীকারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
(ওরে) ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়!
(এই) বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়?
(এই) শিকল বাঁধা পা' নয় এ শিকল ভাঙা কল।”

কাগজ নেই কলম নেই কবি নিজের মনে গান রচনা করেন আর নিজের লেখা কবিতাগুলি আবৃত্তি করেন। জেল সুপার তার হাতে যতরকম অস্ত্র ছিল তা সবই একে একে বন্দীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। অবস্থা অসহনীয় হয়ে পড়ায় জেলবন্দিরা অনশন ধর্মঘটের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। সকালবেলা বন্দীদের ফাইলে দাঁড় করানোকে কেন্দ্র করেও গোলমাল শুরু হল। এমনকি মারপিটও হয়ে গেল। বন্দীদের জেলের ব্যবহার অসহনীয় হয়ে পড়ায় বন্দীরা আমরণ অনশন শুরু করল। নজরুল এসময় দুখানি গান সবচেয়ে বেশি গাইতেন। প্রথম গানটি হল,

"এস এস এস ওগো মরণ
এই মরণভীতু মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ।
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের পরে
ভীমরুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন ভরা চরণ।"

এই সময় আরেকটি গান নজরুল গাইতেনঃ

"আজি রক্ত নিশিভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দীশৃঙ্খলে
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়াতলে।"

অনশন ধর্মঘট শুরু হল। জেল কর্তৃপক্ষ এই অনশন ধর্মঘটের কথা যাতে বাইরে না প্রকাশ পায় তার সম্যক ব্যবস্থাই করেছিলেন। কিন্তু আগুন চাপা রইল না। এই সংবাদ বাইরে যখন প্রকাশিত হল তখন বেশ কয়েকজন বন্দীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু যে অনশনের নেতৃত্বে আছেন কাজী নজরুল ইসলাম, সতীন সেনগুপ্তের মত মানুষ সে অনশন দাবি না মেটা পর্যন্ত ভাঙা অসম্ভব। এই অনশন ধর্মঘটের কথা শুনে দেশের সাধারণ মানুষ তো বটেই স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বিচলিত হয়ে পড়লেন। হাত পা চেপে ধরে নাকের মধ্যে নল দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা হল। ফল হল বিপরীত। এই জোর করে খাওয়াতে গিয়ে অনেক বন্দীর অবস্থার আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল। নজরুলের কথা "হয় সকলকে নিয়ে মরব না হয় সকলে অনশনে প্রাণ দেবো।" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে টেলিগ্রাম করলেন, অনশন ত্যাগ কর আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায় (Give up hunger strike our literature claims you) রবীন্দ্রনাথের এই টেলিগ্রাম চলে যায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। কিন্তু টেলিগ্রামটি রাজ্য সরকার হুগলি জেলে পাঠায় না। জেল থেকে কবিকে জানিয়ে দেওয়া হয় Addressee not found. রবীন্দ্রনাথ তারপরে রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানান আমি নজরুলকে অনশন ভঙ্গের জন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। টেলিগ্রামটা ফেরত এসেছে। ওরা নজরুলকে আমার টেলিগ্রাম দিতে চায় না। ওরা হয়ত নজরুলের আত্মহত্যাই চায়।

অনশন চলছে। নজরুলের গর্ভধারিণী জননী এসেও অনশন ভাঙতে পারেননি। চুরুলিয়া থেকে আসা মায়ের সঙ্গে নজরুল দেখাই করলেন না। এমনি সময় হুগলি জেলের গেটে হাজির হলেন কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবী। যাকে নজরুল ইসলাম মা বলে ডাকতেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বিরজাসুন্দরীকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে আছেন হামিদ উল হক, বিজয় মোদক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিশ্বকবির হস্তক্ষেপে ও বিরজাসুন্দরীর বহু সাধ্য সাধনায় এবং সরকার বন্দীদের দাবি মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই ১৮ জুন ১৯২৩ সালে নজরুলকে বন্দীদের সব দাবি পূরণ করে বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

(৩)

কাজী নজরুল ইসলাম আবার হুগলিতে ফিরে এলেন।

কাজী বহরমপুর জেল থেকে মুক্তিলাভের পর কিছুদিন বহরমপুর থেকে তিনি অবশেষে কলকাতায় চলে আসেন। কাজী বহরমপুর থাকাকালে নলিনাক্ষ সান্যালের সঙ্গে গভীর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। নজরুল ইসলাম কলকাতায় এসে ৬ নম্বর হাজী লেনে আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলা দেবীকে

বিয়ে করেন। ৬ নম্বর হাজী লেনে এই বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেকের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এ কে ফজলুল হকও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পরই এই বিবাহ নিয়ে কিছু পত্রিকা বিরাট সোরগোল তুলল। সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হয়েছিল ব্রাহ্মদলের নেতারা। ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল এই বিয়ের পর নজরুল ইসলামের কলকাতায় বসবাস প্রায় দু:সাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? কে তাঁকে আশ্রয় দেবে? সংবাদ পেয়ে হুগলির বন্ধু ও অনুগামীরাই সবচেয়ে আগে এগিয়ে এলেন। এই সময়টা নজরুলের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল, কারণ মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ, ভূপতি মজুমদার পর্যন্ত সকলেই জেলে। কাজেই যারা কাজীর জন্য কিছু করতে পারেন সেইরকম সব লোক না থাকায় হুগলিতে হামিদ উল হক, বিজয় মোদক, সিরাজুল হক, বরেন ঘোষ এক বৈঠকে বসে ঠিক করেন যে কাজীকে হুগলিতেই নিয়ে আসা হবে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় কলকাতাতে কাজীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে নিয়ে হুগলিতে চলে আসেন। সপরিবারে কাজীকে হুগলিতে বসবাসের জন্য আনতে হলে একটা বাড়ি ঠিক করতে হয় সেটা কিন্তু নজরুল পাগল যুব বিপ্লবীরা হিসেব করে দেখেনি। নজরুলকে হুগলিতে নিয়ে আসার পর বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন সবাই। কবিকে রাখা হল বিপ্লবী বরেন ঘোষের দাদা খগেন ঘোষের কাঠঘরার বাড়িতে। কিন্তু বাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল হিন্দু মুসলমান কোন বাড়িওয়ালারাই নজরুলকে বাড়িভাড়া দিতে আগ্রহী নয়। নানান অসুবিধা থাকার কারণে খগেন ঘোষের বাড়িতে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। তখন হামিদ উল হক নবী মোক্তার সাহেব মোঘলটুলিতে গলির মধ্যে একটা বাড়িতে কবির থাকার ব্যবস্থা করেন। এইসময় প্রমীলা দেবী আসন্ন প্রসবা। তাই মোঘলটুলির বাড়িতে কবি আশ্রয় পেয়ে নিজেকে অনেকটা নিরাপদ বোধ করেন। একটু স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে কাগজ কলম নিয়ে বসেন। বিয়ের পর নানা অস্থিরতায় কবি লেখার দিকে মন দিতে পারেনি। এই মোঘলটুলির বাড়িতেই জন্মাষ্টমীর দিন নজরুলের প্রথম পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হয়। জন্মাষ্টমীর দিন জন্ম হয়েছে বলে কবি ছেলের নাম রাখেন কৃষ্ণ মহম্মদ। কিন্তু ছেলেটি মাত্র কয়েক মাসই বেঁচে ছিল। ডিসেম্বর (১৯২৪) মাস নাগাদ শিশুটি মারা যায়।

হুগলি বা চুঁচুড়ার এই বাড়িতে নজরুলকে কেন্দ্র করে রাজনীতি ও সাহিত্যের আড্ডা জমে ওঠে। রাজনীতির আড্ডাতে সতীশ ঘোষ, ভূপতি মজুমদারদের সঙ্গে শহীদ গোপীনাথ সাহার মত তরুণ বিপ্লবীরা জড়ো হতেন। আর সাহিত্যের আড্ডায় আসতেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুল নাগ, খগেন ঘোষ, সুবোধ রায়। খগেন ঘোষ ও সুবোধ রায় দু'জনই ছিলেন নৈহাটির মানুষ এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক। খগেন ঘোষ ছিলেন নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুলের একজন শিক্ষক। কবির বন্ধু হিসাবে সুবোধ রায়, খগেন ঘোষ, কবি বিজয় ঘোষ, গীস্পতি ভট্টাচার্য, মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিকে ঘিরে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতেন। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, হামিদ উল হক, বিজয় মোদকের তো কথাই নেই। হুগলিতে থাকাকালেই নজরুল একদিন শুনতে পান দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রয়াত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনে কবি বেশ কিছু সময় নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তারপর কাগজ কলম নিয়ে লিখে ফেলেন 'অর্ঘ্য' বলে একটি কবিতা বা গান:

"হায় চির ভোলা; হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীল কণ্ঠের
মৃত্যু গরল পিয়া
কেন এত ভাল বেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধুলি?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি।"

সংবাদ রটে যায় দেশবন্ধুর মরদেহ দার্জিলিং মেলে কলকাতায় আসছে এবং নৈহাটি স্টেশনে সেই গাড়ি থামবে। কাজী নজরুল ইসলাম নৈহাটি স্টেশনে চলে যান। দেশবন্ধু শবাধারে একটা মালার সঙ্গে সেই অর্ঘ্য কবিতাটি ঝুলিয়ে দেন। নৈহাটি থেকে ফিরে দেখেন হুগলির সব নেতৃবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবকরা জড়ো হয়েছেন শোক মিছিল বের করার জন্য। সকলের খালি পা, নজরুল সকলের সামনে দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠলেন, "খোল মা দুয়ার খোল প্রভাতেই সন্ধ্যা হল দুপুরেই ডুবল দিবাকর গো।"

এরপর ১৮ আষাঢ় একটা শোকসভার আয়োজন করা হল চুঁচুড়ার কৈরী টকী হাউজে। এই সভাব আহ্বায়ক ছিলেন রমেশচন্দ্র মণ্ডল ও ইমামবারার মহম্মদ জাফেরী। কৈরী টকী হাউসে শোকসভার জন্য কবি 'রাজভিখারী' বলে একটি গান লেখেন আর 'ইন্দ্রপতন' নামে দুশো লাইনের এক কবিতা। 'রাজভিখারী' গানটিতে লেখেন,

"কোন ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশী শুনে উঠেছিলে জাগি
ওগো চির বৈরাগী।
দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি—
ওগো চির-বৈরাগী।

* * *

'দেহি ভবতি ভিকষাম্', বলি' দাঁড়ালে রাজভিখারী,
খুলিল না দ্বার, পেল না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী।
বলিলে, 'দেবে না ? লহ তব দান
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ।'—
দিল না ভিক্ষা, নিল না'ক দান, ফিরিয়া চলিল যোগী।
যে জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি।"

কবি সভার উদ্বোধন করেন এই কবিতাটি আবৃত্তি করে। আবেগ উদ্বেলিত সমস্ত সভা নীরব পাষাণে পরিণত হয়। বক্তৃতার পর কবি 'রাজ ভিখারী' গানটিও সভার সকলকে গেয়ে শোনান।

দেশবন্ধুর যখন প্রযাণ হয় তখন মহাত্মাজি কলকাতাতেই ছিলেন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গান্ধিজী দেশবন্ধুর মরদেহ গ্রহণ করেন। তারপর ঐতিহাসিক শোকমিছিল করে মরদেহ কেওড়াতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। শোকমিছিল এবং কেওড়াতলায় দেশবন্ধুর মরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হওয়া পর্যন্ত মহাত্মাজী সমস্ত সময় এই দেহ সৎকার কাজ তদারকী করেন। গান্ধিজী কলকাতা থেকেই একদিন হুগলিতে আসেন। ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী গান্ধিজীকে হুগলিতে নিয়ে আসেন। বিরাট সভা হয় হুগলির চাঁদনীঘাটে গঙ্গার চড়ার ওপর। নজরুল গান্ধিজীর অভ্যর্থনার জন্য একটি গান লেখেন :

"আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে ?
কংসকারার দ্বার ঠেলে।
শব শ্মশানে শিব নাচে ঐ
ফুল ফুটানো পা ফেলে
আজ জাত বিজাতের বিভেদ ঘুচি,
এক হল ভাই বামুন মুচি।
প্রেম গঙ্গায় নেয়ে সবাই শুচি রে
আ মরি হায় রে...

আয় প্রেম গঙ্গায় ঝাঁপ দিবি কে
"বন্দেমাতরম বলে"—ইত্যাদি

গান্ধিজীর গানটি খুব ভাল লেগেছিল। "চরকার গানটি"ও গেয়ে কবি গান্ধিজীকে শোনান।

"ঘোর ঘোরবে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই, শুনতে যেন পাই
ঐ খুলল স্বরাজ-সিংহদুয়ার আর বিলম্ব নাই
ঘুরে আসল ভারত ভাগ্যরবি, কাটল দুঃখের রাত্রির ঘোর
ঘর ঘর তুই ঘোররে জোব
ঘর্ঘর ঘর ঘুর্ণীতে তোর
ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
তোর ঘুর চাকাতে বলদর্পী তোপকামানের টুটুক জোর"।

"এই গানটি কবির মুখে থেকে গান্ধিজী অনেকবার ওই সভাতেই শোনেন। কিন্তু বাংলাভাষা তিনি ভাল বুঝতেন না। সেই না বুঝবার অবস্থাটা নজরুলের কবিবন্ধু চুঁচুড়ার শ্রী সুবোধ রায় পাশে থেকে বোঝাতে পেরেছিলেন। সেইজন্য কবি সুবোধ রায় উক্ত "চরকার গানটি" অতি যত্নে ইংরাজিতে অনুবাদ করে রেখে দেন। কবি সুবোধ রায় সেই সময় সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন। এককালে শান্তিনিকেতনে ছাত্র থেকে শিক্ষক ও হয়েছিলেন। গান্ধিজী সেই সময় শান্তিনিকেতনে আশ্রমেব কোন একটি উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন, শ্রীসুবোধ বায তাব সঙ্গে উক্ত গাড়িতে ছিলেন। শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পথে ট্রেনে সুবোধ রায় "চরকার গানের" ইংরাজি অনুবাদখানি গান্ধিজীর হাতে তুলে দেন।" ("প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ঃ কাজী নজরুল")

মোঘলটুলী লেনেব বাড়ি থেকে উঠে এসে কবি চকবাজাবে "রোজভিলা"তে বসবাস করতে শুরু করেন। কবি সুবোধ রায়, গীস্পতি ভট্টাচার্য, হামিদ-উল-হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, নিত্যদিনের সঙ্গী নিবারণ ঘটক (যিনি একদা নজরুলের শিক্ষক ছিলেন), নলিনী গুপ্ত, সিরাজুল হক, ধীরেন মল্লিক, শৌরি পাল প্রমুখ কবির বাড়িতে নিত্য যাতায়াত করেন। নজরুল এই সময় হুগলি এবং নৈহাটিকে কেন্দ্র করে গঙ্গার এপাব-ওপার সর্বত্র ঘুরে গান গেয়ে কবিতা আবৃত্তি করে সেই সঙ্গে বিপ্লবীদের অস্ত্রশিক্ষা দেন। গান্ধিবাদী ও বিপ্লবীদের একসঙ্গে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। পববর্তীকালে সাম্যবাদী আন্দোলনে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের সূচনা হয। কবি যেন তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন সারা দেশ ঘুরে। অসুস্থ হযে পড়েন তিনি। তবুও বিরাম নেই। গঙ্গার কূলে কখনও গঙ্গার স্রোত, কখনও বাতাসের তাণ্ডব মুগ্ধ নেত্রে দেখেন আর মাঝে মাঝে স্বগোতোক্তি করেন, "আমি ঝড, আমি ঝড়!" এমনি এক ঝড়বৃষ্টির দিনে অসুস্থ অবস্থায় 'ঝড়' কবিতাটি লেখেন।

"ঝড কোথা? কই?
বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ
ঐ শোন, শোন তার হ্রেষার চিক্কুর
ঐ তার ক্ষুর হানা মেয়ে।
না না আজ যাই আমি
আবার আসিব ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর

তুমি থেকো জেগে।
তুমি রক্ষী এ রক্ত অশ্বের
হে বিদ্রোহী অন্তর দেবতা!"

ঝড়ের পর বৃষ্টি আসে। কবি ছন্দের নিপুণতায় 'পূবের হাওয়া' কবিতাটি লেখেন।

"আমি পূবের হাওয়া
বাদলের নাচন পাওয়া
কার্ফায় কাজরী গাওয়া
নটির পা ঝিনঝিন"

নজরুল ইসলাম হুগলিতে থাকাকালেই নৈহাটি থেকে কবি খগেন ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, নির্মল সুর, মৃণালকান্তি ঘোষ, বেলঘরিয়ার চণ্ডীচরণ মিশ্র প্রমুখের যাতায়াত শুরু হয়। নানা সভা সমিতি অনুষ্ঠানে তখন কবি যান। শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, হুগলি বিদ্যামন্দিরকে ধরমপুর নামক একটা জায়গায় পঞ্চাশ বিঘা একটা জমিতে চাষাবাদ করবার জন্য বিপ্লবী সিরাজুল-হক, অবনী চৌধুরী এবং নগেন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এই কৃষিজমিতে কবির সঙ্গে মিলিত হতেন। এই কৃষিজমির তথা কৃষিফার্ম উদ্বোধন করেন দেশবন্ধু দাস। ১৯২৫ সালে হুগলির বিপ্লবীরা হুগলিতে মুকুন্দ দাসের যাত্রার দলকে নিয়ে আসেন। চকবাজারের বারোয়ারী তলায় সাতদিনের যাত্রা হয়েছিল। মুকুন্দ দাস যে ক'দিন হুগলিতে ছিলেন সকাল বিকেল নজরুলের সঙ্গেই আড্ডা দিতেন। তিনি কবির বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। মুকুন্দ দাস তার নাটকেও কবির রচিত একাধিক গান সংযুক্ত করেন। তার মধ্যে "জাতের নামে বজ্জাতি" অন্যতম। মুকুন্দ দাসের অনুরোধে কাজী নজরুল মুকুন্দ দাসের মত পোশাক পরে অর্থাৎ গেরুয়া বসন ও মাথায় পাগড়ি পরে কয়েকটি বৈপ্লবিক গান গান। আমৃত্যু মুকুন্দ দাসের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক ছিল।

১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে 'বিজলী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিজলী পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। সহ-সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার ও সুবোধ রায়। এই সুবোধ রায় তখন নৈহাটির মিত্রপাড়ায় বাস করতেন। নজরুলকে কেন্দ্র করে সুবোধ রায়ের বাড়িতে জমাটি আড্ডা হত। ফলে অনেকদিন নৈহাটি থেকে কবির চুঁচুড়ায় ফেরা হত না। থেকে যেতেন একাধিক দিন। নৈহাটির আড্ডাকে কেন্দ্র করেই নজরুল ইসলাম একদিকে ভাটপাড়া আর একদিকে গরিফায় এসে আড্ডা দিতেন। গরিফাতে আড্ডা হত কাশীপতি মজুমদার, মণি সেন ও সুবোধ মজুমদারদের বাড়িতে। গরিফায় আড্ডা দিতে দিতে রাত্রি বারোটা বেজে যেত। তখন সেনপাড়ার ছেলেরা রামঘাটে গিয়ে কবিকে গঙ্গার পাড়ে চুঁচুড়ায় পৌঁছে দিতেন। গরিফায় শুধু আড্ডা দেওয়া নয়, নজরুলের আড্ডা মানে গান গাওয়া। আর এই গান গাওয়া হত কোনদিন সুবোধ মজুমদারের বাড়িতে, কোনদিন মনোনীত সেনের বাড়িতে। পরবর্তীকালে মনোনীত সেনদের বাড়ি ছেড়ে অমর সেন হিজ মাস্টার ভয়েসে কবির সঙ্গী হরির সান্নিধ্যে আসেন।

বঙ্কিম, হরপ্রসাদ, কেশব সেন, প্রতাপ মজুমদার স্মৃতিপূত নৈহাটি গরিফাকে নজরুল খুবই আপন করে নিয়েছিলেন। সত্যি নৈহাটি, গরিফা, ভাটপাড়ার মানুষদের একেবারে মাতিয়ে রেখেছিলেন কবি। মাদ্রালের কালিদাস ঘোষাল, প্রখ্যাত সম্পাদক যতীন মজুমদার, মন্মথ ভট্টাচার্যও নৈহাটিতে কবির থাকাকালে সর্বসময়ের সঙ্গী হতেন। সেই সময় অসহযোগ আন্দোলন শেষ হওয়ার মুখে। বিপ্লবী আন্দোলনও নেপথ্যে চলছে। নৈহাটিতে এই দুই স্রোতকেই কবি একইভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রকৃতপক্ষে দুই আন্দোলনেরই গতি প্রায় সমান সমান ছিল। চন্দননগরের 'সন্তান সংঘ' তার বিপরীত পাড়ে ভাটপাড়ার 'তরুণ সংঘ' কখন এপারে কখনও ওপারে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করত। আর নজরুল থাকতেন এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক হয়ে। নৈহাটিতে শ্যামাসুন্দরী তলায় কবির বন্ধু খগেন ঘোষের

বাড়ি। সেখানেও আড্ডা চলত। খেয়ালী পত্রিকার সাংবাদিক সাহিত্যে আড্ডা হত ব্যানার্জি পাড়ার যতীন মজুমদারের বাড়ি। খেয়ালী পত্রিকার আড্ডাতেই সুবিমল বসু, হেম বাগচী নিভৃতে এসে জুটতেন। খগেন ঘোষের সঙ্গে নজরুলের সখ্যতা খুব গভীর ছিল। দু'জনের জন্মসাল ১৮৯৯ সাল ছিল। খগেন ঘোষের কবিতা বইয়ের নামকরণ নজরুল করেছিলেন 'চিত্রলেখা'। সেই সময় কবি বইটির ভূমিকাও লেখেন। ৫৬টি কবিতা নিয়ে 'চিত্রলেখা' কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স থেকে। নজরুল ইসলাম নৈহাটি থাকাকালে বিশেষভাবে তাঁর সান্নিধ্যে আসেন সুগায়ক নির্মল সুর। নির্মল সুর শুধু গায়ক নন। তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী দলেরও সংযোগ ছিল। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ভাটপাড়ার পুরনাথ ভট্টাচার্য এই বিপ্লবী দলের পুরোধা ছিলেন। ভাটপাড়ার তরুণ সংঘের আড়ালে যুগান্তর দলের বিপ্লবী কর্মধারা পরিচালিত হত গঙ্গার এপার নৈহাটি ভাটপাড়া কেন্দ্র করে। এই বিপ্লবীদের অনেককে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন নজরুল। এই অস্ত্রশিক্ষা হত নৈহাটি বরদা ব্রীজের ওপারে মাঠ এবং জঙ্গলের মধ্যে। নির্মল সুর ছিলেন নজরুলের গানের গায়ক এবং অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত একজন।

ভাটপাড়া হল বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত একটি গ্রাম। গ্রাম বলছি বটে কিন্তু ভাটপাড়া হল ঘনবসতির ক্ষেত্রে রাজ্যের মধ্যে সম্ভবত প্রথম। ভাটপাড়ার গলিতে কোন মোটর বা অন্য কোন যান চলাচলের সুযোগ নেই। কথিত আছে স্বামী বিবেকানন্দ একবার নৌকা করে ভাটপাড়ায় এসেছিলেন। কিন্তু ভাটপাড়ার কট্টরপন্থী ব্রাহ্মণরা ভাটপাড়ার ঘাটে বিবেকানন্দের নৌকা ভিড়তে দেয়নি। এই গোঁড়া বামুনদের পাড়ায় নজরুল যাতায়াত শুরু করেন এবং তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাটা ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণদের বিশেষ অপছন্দ ছিল। এইসময় কংগ্রেস অচ্ছ্যুৎ ও দলিত যাত্রীদের জলচল আন্দোলন শুরু করেন। নৈহাটি ভাটপাড়ার যুবকরা নমশূদ্র ও অচ্ছ্যুৎ জাতিদের সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করায় ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণরা খুবই রুষ্ট হন। এই সময় ভাটপাড়ায় ব্রাহ্মণরা ব্রাত্যদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সম্মেলন ডাকেন। ভাটপাড়া নৈহাটির মাঝখানে গঙ্গার ধারে সেই নিখিল ভারত ব্রাহ্মণ মহা সম্মেলনের অধিবেশন বসে। ভাটপাড়া নৈহাটির যুবকরাও পিছিয়ে থাকেনি। এই যুবকরাও বলরাম সরকারের ঘাটে ব্রাহ্মণ মহা সম্মেলনের অনুকরণে আরেকটি সম্মেলন করে। ব্রাহ্মণ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। উদ্বোধন করেন প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তরুণদের সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক নরোত্তম দাস ঘোষ। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তরুণদের সম্মেলনে বিশেষভাবে গতি পায় বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত সীতানাথ বেদান্ত শাস্ত্রীর সমর্থনসূচক বক্তব্য। তিনি শূদ্রের জলচল সমর্থন করে একটা 'পাঁতি' লিখে পুত্র দিশপতি ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সম্মেলনে পাঠিয়ে দেন। তরুণদের সম্মেলন থেকে সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রীর 'পাঁতি' ব্রাহ্মণ সম্মেলনের সভাপতি লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু সম্মেলনে ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা সীতানাথ বেদান্ত শাস্ত্রীর 'পাঁতি' মিলিয়ে না নেওয়ায় পণ্ডিতদের মধ্যে মহা বিতর্ক শুরু হয় এবং অবশেষে পণ্ডিতদের সম্মেলন ভেঙে যায়। নজরুল তরুণদের সম্মেলন থেকে ব্রাহ্মণদের সম্মেলনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে কবিতা পড়েন ও গান করেন। গান এবং কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি বোঝান মানুষের অধিকার হরণ একটা পাপ। ভাটপাড়ার সম্মেলনে বাইরে থেকে আসা পণ্ডিতরাও নজরুলের গানে বিশেষভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কবিবন্ধু হেমন্ত সরকার কৃষ্ণনগরের লোক। হেমন্ত সরকারের নেতৃত্বে এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আব্দুল হালিমের সহযোগিতায় কবি এক নতুন রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করেন। ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় লাঙল পত্রিকা। নজরুল লাঙল পত্রিকার পরিচালক ছিলেন, সম্পাদক ছিলেন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সেবারও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী চেয়ে পাঠানো হল। রবীন্দ্রনাথ ধূমকেতুর মত লাঙল পত্রিকাতেও আশীর্বানী পাঠালেনঃ—

"জাগো জাগো বলরাম ধরো তব মরুভাঙা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।"

হুগলিতে বসবাসকালে লাঙল পত্রিকা প্রকাশন ছিল নজরুলের শেষ ও বড় কাজ। লাঙল পত্রিকাতে পরিচালক হিসাবে থাকাকালেই নজরুল হুগলি ছেড়ে কৃষ্ণনগর চলে যান। কৃষ্ণনগরে চলে যাওয়ার প্রধান কারণ হল বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারের বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগর। নজরুলের সেই সময় ম্যালেরিয়া হয়। হেমন্তকুমার সরকার তাই নজরুলকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। লাঙল পত্রিকায় সর্বপ্রথম ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটে। লাঙল কাগজে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র বাদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্পষ্ট ধারণা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীকালে লাঙল পত্রিকা বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্রে পরিণত হয়। প্রথম সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। নজরুল যখন হুগলি ছেড়ে কৃষ্ণনগরে যান তখন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। নজরুল ইসলাম এই লাঙল পত্রিকাতেই পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা চালু করেন। এই বিশেষ সংখ্যাটার মধ্যে ছিল সুভাষচন্দ্র বসুকে নিবেদিত বিশেষ সংখ্যা। 'লাঙল' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যাতে নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়।

"সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি!
জাগো রে জোয়ান। বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।"

নজরুলের লেখা সেটা কবিতাই হোক আর প্রবন্ধই হোক সেখানে তিনি সাম্যবাদ ও দেশবন্ধুর নীতিতে কংগ্রেসের চিন্তাভাবনা ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নীতিকে একই রকমভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। নজরুল ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের প্রথম ইস্তাহার ও কর্মসূচি রচনা করেন। এই কর্মসূচি যা লাঙল পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় এবং নজরুল ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক। এই প্রথম ভারতবর্ষে একটি রাজনৈতিক দল তার উদ্দেশ্যে এবং কর্মসূচিতে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন। নজরুল পরিচালিত দলের ইস্তাহারের মধ্যে উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল 'নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।' লাঙল পত্রিকার জয়গান সেই সঙ্গে কৃষক শ্রমিক পার্টির কথা লাঙলের মাধ্যমেই শুধু দেশের মধ্যে নয় বিদেশেও পৌঁছে ছিল। দেশে সরোজিনী নাইডু ও বিদেশে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত মানুষরাও এই পত্রিকার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের লেখায় এই পত্রিকায় জয়গান আছে।

বন্দরের কাল হল শেষ। নজরুল ইসলাম নৈহাটি, ভাটপাড়া, চুঁচুড়া, চন্দননগর ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। নজরুল তখন হুগলিতে শুধু অসুস্থ নন, বেহিসাবী জীবনযাত্রার পরিণতিতে প্রায় অনাহারের সম্মুখীন। হেমন্তকুমার সরকার সব কিছু বুঝে কবিকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাওয়া পরিকল্পনা করলেন। হেমন্তকুমার সরকার বুঝেছিলেন হুগলিতে কবির আকর্ষণ কমে গেছে। হুগলির লোকেরাও কবিকে যেন আর আগের মত ভালো চোখে দেখছেন না। তাই বন্দরের কাল শেষ করে হেমন্তকুমার সরকার সপরিবার নজরুলকে নিয়ে ব্যাণ্ডেল লোকালে নৈহাটি স্টেশনে এলেন। কৃষ্ণনগর যাওয়ার জন্য নৈহাটি স্টেশনে তিন নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছেন ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে দাঁড়িয়ে দার্জিলিং মেলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন। নজরুল কৃষ্ণনগরের গাড়িতে উঠলেন। বিদায় জানলেন হুগলি, চুঁচুড়া, নৈহাটির উদ্দেশ্যেই স্টেশনে সমবেত বন্ধু-বান্ধব সকলের উদ্দেশ্যে নজরুল হাত নেড়ে চললেন ততক্ষণ যতক্ষণ চলন্ত গাড়ি থেকে স্টেশনের বন্ধুদের হাত নাড়া দেখা যায়। বিদায় হুগলি! বিদায় নৈহাটি!*

---

* নৈহাটি বাসন্তী কেবিনের একদশকের আড্ডাতে আমি সমরেশ বসু ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই খগেন ঘোষ মাননীয় কবি বিজয় ঘোষ এবং প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের মুখে যেসব নজরুল বিষয়ক ঘটনা শুনেছি সেই সমস্ত সূত্র ধরেই এই নিবন্ধ।

নজরুল— দ্রোহে, দাহে, অনুরাগে

স রো জ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

কবির সব থেকে বড় অভিজ্ঞান তাঁর ভাষা। তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ধৃত থাকে তাঁব স্মৃতিলোকে। তাঁর স্মৃতিধৃত সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যে ভাষাকে খুঁজে নেয, যে ভাষাকে গডে নেয, প্রথম প্রথম পাঠকের কাছে তা থাকে আগন্তুক — শেষ পর্যন্ত কবিই তাঁর পাঠকমণ্ডলীকে নিজ ভাষায় দীক্ষিত করে নেন। এর প্রমাণ গত শতাব্দে মধুসূদন, এ শতাব্দে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' সুরেশ সমাজপতির কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। প্রত্যেক কবি জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করেন নিজের ব্যাকরণে— সে ব্যাকরণকে সেই কবি জীবনের নানা প্রকরণে সিদ্ধ করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে এই প্রকরণ সিদ্ধির নিদর্শন প্রথম যাঁদের কাছে আমরা পেলাম তাঁদের একজন নজরুল ইসলাম অপরজন যতীন্দ্রনাথ। এই দুজন কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য এঁদের কবিতায় প্রত্যক্ষের জলহাওয়া স্পষ্ট। বাস্তবজীবনের লক্তাক্ত এবং স্বেদাক্ত কোনও চিহ্নকে এঁরা অপাংক্তেয় রাখেননি। নজরুল দ্রোহের কবি হয়েও প্রেমের গীতিকার। যতীন্দ্রনাথ দুঃখের কবি হযেও এক জটিল আস্তিক্যে গূঢ়ভাষী। বাগভঙ্গিমায় দুজনেই যথাসম্ভব স্বাবলম্বী। এক অপরূপ গণতান্ত্রিক মহিমায় তাঁদের ভাষায় প্রথমাবধি অনুভূত হয়েছে এক নতুন জোয়ার। একেবারে পথচলিত মানুষের মুখের ভাষা, লোকায়ত পুরাণের প্রসঙ্গসূত্র, ছক ছাড়া বাগভঙ্গি নজরুল এবং যতীন্দ্রনাথকে আলাদা আলাদা বাণীসিদ্ধি এনে দিয়েছে। এই দুজন কবির ভাষাই প্রমাণ করে এঁরা বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি অধ্যায়ের কাছে বার বার ফিরে গেলে নিজেকে পাওয়া যায না, রবীন্দ্রনাথকেও হারিযে ফেলা হয়।

যৌক্তিক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু নিষ্প্রাণ এবং নিরাবেগ, তার কোন নান্দনিক মূল্য নেই। স্ববিরোধ প্রচুর কিন্তু বরুফে নিশ্চলতা নয়, বরং আছে ভুলপদক্ষেপী অথচ ছুটন্ত গতিস্পন্দন— তা অনেক বেশি বরণীয়। নজরুল জীবনে এবং শিল্পে সর্বত্র অত্যন্ত illogical— আর এটাই আশ্চর্যের বিষয তাঁর শক্তির এবং দুর্বলতারও 'লজিক'। সেদিক থেকে নজরুল শুধু অনন্য নন— অসাধারণও বটে। নজরুল আবেগ সর্বস্ব— একথা বললে অবশ্যই ভুল হবে। যদি তাই হত তাহলে নজরুল হতেন দ্বিতীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস। তা তিনি হননি। একটা মোট হিসাব আগেই দিয়ে রাখা ভাল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি আমজনতার প্রাণের কবি নজরুল। সে ব্যাপারটি এমনি এমনি হয়নি। সবুজের অভিযাত্রীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে ভুলগুলি সব আনরে বাছা বাছা', বলেছিলেন 'ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথিপোড়োর কাছে পথে চলার বিধি বিধান যাচা'— আসলে ইতিহাসের দ্বন্দ্বনির্যাস পান করে ভদ্রলোকের তকমা তাবিজ ছিঁড়ে রবীন্দ্রনাথ এক বিদ্রোহীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আহূত সেই বিদ্রোহী নজরুলের 'আমি'। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) এবং 'সোনারতরী'-র (১৩০০) দুটি উচ্চারণ এখানে স্মরণ করি। 'মানসী'-র (দুরন্ত আশা) ১৮ জ্যৈষ্ঠ

১২৮৮ বঙ্গাব্দ) কবিতায় ইংরাজের কলোনিতে কেরানিরক্তের গঞ্জনাতাড়িত চরিত্রের উক্তি বিস্ফোরক মূর্তি পরিগ্রহ করেছে কবিতাটির শেষ দুটি স্তবক। এ যে সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত উক্তি মাত্র নয়, সে উপলব্ধি আমাদের জন্মায় 'সোনার তরী-র 'বসুন্ধরা' (২৬ কার্তিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ) কবিতার এই অংশে ;

পরিতাপ জর্জর পরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি উল্লাসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালবাসি ;

'নাহি কোনও ধর্মাধর্ম, নাহি কোনও প্রথা' — এমন জীবনের জন্য ব্যগ্রতা উনবিংশ শতাব্দের শেষ দশকে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পোষমানা ভব্যতা ভারাক্রান্ত জীবন বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানদের যে জীবনচর্যার দান, তার তলায় তলায় বারুদ যে জমতে শুরু করেছিল তার প্রমাণ তা হলে দেখা যাচ্ছে দুর্লক্ষ্য ছিল না। ইংরাজি স্কুলের ছাচে ফেলা গুড কনডাক্টের প্রাইজ পাওয়া ম্লান অনুগত ছেলেদের চেয়ে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের জীবনে আছে ভবীকালের বীজ— এ কথাও রবীন্দ্রনাথের গলাতেই আমরা প্রথম শুনেছি।

নজরুলের যে কবিতাটি তাকে এনে দিল তাঁর কালান্তরগামী কবি ব্যক্তিত্বের প্রধান অভিধা সেই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আমাদের পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে একটু আলাদা করে বিশ্লেষণ করা যাক। সকলেই জানেন কবিতাটির একটি লক্ষ্যভেদপ্রয়াসী প্যারডি শনিবারের চিঠি-তে (অক্টোবর ১৯২৪) প্রকাশিত হয়েছিল। প্যারডিটির নাম 'ব্যাং'। কবিতার জগতের সাধারণ সূত্রটি এই যে, মূল কবিতা অতীব জনপ্রিয় হলে, সেটি মূলত রসসার্থক কবিতা হলে, তবেই প্যারডি জমানো যায়। জেলখানায় নজরুলের করা জেলর সাহেবের উদ্দেশে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডি এখানে স্মরণীয়। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের লেখা অতি বিখ্যাত কবিতা 'শরৎ' কবিতার যতীন্দ্রনাথ-কৃত প্যারডি। সুতরাং শনিবারের চিঠির 'ব্যাং' নজরুলের 'বিদ্রোহী'-র প্রতি পরোক্ষ অভিবাদন। এতো গেল একটি তুচ্ছ কথা। আসল কথা হল 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি'। এই 'আমি' নজরুলের সত্তার অবৈকল্যের প্রতিনিধি। ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্স অফ মাইসেলফ-এর 'আই' (I) যেমন Sours like a Greek God through time and space— সেভাবে না হলেও নজরুলের এই 'আমি'ও বিশ্বাত্মার প্রতিভূ। 'শান্তিনিকেতন'-এ 'নববর্ষ' (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন 'তুমি বীর'। তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মত আর তো সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না। তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে।' রবীন্দ্রনাথের বলবার কথাটি রবীন্দ্রনাথেরই ; নজরুলের বলবার কথা নজরুলের। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির পিছনে রয়েছে ইতিহাসের অভিঘাত— সে ইতিহাস স্বদেশী যুগে সর্বৈব প্রতিকূলতার প্রতিস্পর্ধী বাঙালির মাথা তুলে দেওয়ার ইতিহাস। নজরুলের 'আমি' প্রথম মহাযুদ্ধ পার হয়ে আসা বিশ্বনাগরিকের জটিল 'অহং'। এ 'আমি'-কে বুঝে নেবার আগে স্বদেশী যুগে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের 'আমরা'-কে আমরা স্মরণ করতে পারি। বিস্তারিত এই ঐতিহাসিক 'আমরা' পৃথক ঐতিহাসিক পটে বিস্ফোরিত সপ্রাণতার তীক্ষ্ণ 'আমি'-তে রূপ নিয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি'-তে।

নিবিষ্ট বিশ্লেষণে ফুটে ওঠে এক Panoramic image— তাৎপর্যময় এর বহু বিপরীতের সমাবেশ :

সৃষ্টি	ধ্বংস
সাইক্লোন	মলয়-অনিল
সন্ন্যাসী	সৈনিক
মৃন্ময়	চিন্ময়
আগ্নেয়াদ্রি	বাড়বহ্নি
বিধবার বুকে ক্রন্দনশ্বাস	প্রথম পরশ কুমারীর
বাঁশের বাঁশরী	রণতূর্য
লোকালয়	শ্মশান
আকুল নিদাঘ তিয়াষা	মরুনির্ঝর
আমি দেবশিশু	জাহান্নমের আগুন।

আরও কথা আছে। শব্দমাত্রেই অভিজ্ঞতার প্রতীক। সে হিসাবে এ কবিতায় এমন সব শব্দকে স্বয়মাগত হতে দেখি যারা এর পূর্বে বাংলার কবিতায় ব্যবহৃত হয়নি, হবার কথাও নয়; সাইক্লোন, টর্পেডো, মাইন, কুর্নিশ, হাবিয়া দোজখ, হিম্মৎ-হ্রেষা, হুতাষী, হর্দম, ঠমকি ছমকি, পঞ্জা ইত্যাদি।

লক্ষণীয় দুটি স্তবকের ভাব বৈপরীত্যের বিষম অবস্থান— ষষ্ঠ স্তবক (আমি সন্ন্যাসী সুর সৈনিক...) এবং সপ্তম স্তবক (আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী)। কিন্তু দুটি স্তবকের সুর বৈপরীত্যে সৃষ্ট হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্টে এক মেলডি। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য, কিশোরীর প্রথম চুম্বন — দুইই ছক ভেঙে বেরিয়ে পড়া। সেই অর্থে দুটোই বলে দিতে চাইছে— 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' রবীন্দ্রনাথ প্যারাডক্সের সম্রাট— নজরুল রাজা :

(ক) আমি যুবরাজ মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক
(খ) আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি
(গ) করি শত্রুর সাথে গলাগলি ধবি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা
(ঘ) আমি কভু প্রশান্ত— কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী
(ঙ) আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী তন্বী নয়নে বহ্নি
(চ) আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন চিতে চেতন।

বস্তুত পক্ষে বলতে কি সমগ্র কবিতাটিই এক মহাপ্রসারিত প্যারাডক্স। আনুগত্যক্রান্ত, প্রথাদাস জীবনের সঙ্গে অভিপ্রায়ী বিদ্রোহীর যে সংঘাত এই বিস্তারিত প্যারাডক্সের অভিব্যক্ত ও নিহিত স্তর তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

কবিতাটির মাত্রাবৃত্তের মুক্তক চাল— নিয়মিত শ্লোকবন্ধন থেকে মুক্তিও কবিতাটির নিজস্ব ভাবাত্মার অভিজ্ঞান। ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত নজরুলের ছন্দোরীতি। মিশ্রবৃত্তে তাঁর লেখা কবিতা অবশ্যই আছে— কিন্তু ষন্মাত্রিক কলাবৃত্তেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল বেশি। 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত অতিপর্ব সেই ছন্দে গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক। পাঠক দেখেন কবিতাটিতে ভবিষ্যৎবাচী ক্রিয়াপদ মাত্র দু'বার প্রযুক্ত। নিত্য বর্তমান এবং ঘটমান বর্তমান ক্রিয়ারই প্রাধান্য। আরও দেখি বাক্যগুলি মাঝে ক্রিয়ামুক্ত থাকলেই অধিকতর গতিশীল থাকে। অতিপর্ব দু'এক স্থলে পংক্তিমধ্যেও নিজের স্বাধিকার ঘোষণা করছে। ক্রিয়াপদগুলির একটি নাতি উচ্চারিত কিন্তু নিঃসংশয় বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ভেদিয়া', 'ছেদিয়া', 'দীর্ণকরা', 'ফাড়ি', 'ভিন্ন করা' প্রভৃতি ক্রিয়া এক দুর্বার রতিরঙ্গের পুরুষ সম্ভব সক্রিয়তার স্মারক। তখন অতি পর্ব সেই গূঢ়ার্থকে একটু স্পষ্টতা দেয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততায় দম নেবার জন্য যেন ওই অতিপর্বের মৌহূর্তিক বিরাম। কবিতাটির প্রথম স্তবক যার আরম্ভ, শেষ স্তবকে তার শান্তি। এই পুরুষার্থ সম্ভব সবেগ সক্রিয়তায় হাম্বীর ছায়ানট হিন্দোলের সঙ্গে একাত্মতা— কোনো রাগিণীর নাম আসে নি।

মন্তাজের মতো পরপর 'শট' গুলির উপস্থাপনা কোনো যোগফল রচনার জন্য নয়— একটি অন্যতর ব্যঞ্জনাসৃষ্টির জন্য। তা অবশ্যই বিদ্রোহাত্মক।

যে গতিস্পন্দ এবং থট্ রিদম নজরুলকে দুঃসাহসিক শব্দসমন্বয় ঘটাতে তৎপর করে তুলছে তারও মূলে আছে নজরুলের জীবন। যে স্বরস্বাতন্ত্র্যের জন্য নজরুল প্রধান রবীন্দ্রোত্তর কবি সে স্বরস্বাতন্ত্র্য নজরুলের স্বতন্ত্র জীবনচর্যার দান। লেটোর দলে ঢুকে পড়া, সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করা, সৃজনী সাহিত্য বাবদে ইংরাজের কারাগারে জেলখাটা, জেলে অনশন— এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে তিনি কোনো পূর্বসূরী দ্বারা প্রভাবিত হননি। টেকনিকের ওপর তাঁর নিজস্ব দখল তাঁর জীবন যাত্রার নিজস্ব চালের প্রতিচ্ছায়া। বাংলা বাক্যে আরবি ফার্সির মিশ্রণ— কখনো কখনো পুরো পংক্তিটাই হিন্দি-উর্দু মিশ্রিত— নজরুলের 'পার্সন' এবং 'পার্সোনা'র এজরা পাউন্ড কথিত কবির রূপ-স্বরূপের প্রকৃত রহস্যের হদিস দেয়। তিনি কতখানি শক্তিমান কবি তা আলাদাভাবে উপলব্ধিতে আসে যখন আমরা তিনজন প্রধান আধুনিক কবি— যাঁরা নজরুলের অব্যবহিত অনুজ— তাঁদের প্রাথমিক পদচারণায় নজরুলের প্রভাবকে প্রত্যক্ষ করি। এই তিনজন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু। নজরুলের মতোই এঁদের প্রত্যেকের প্রথম কাব্যগ্রন্থেব 'আমি' প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অস্থির হাওয়া এবং ধুলো, ধোঁয়ার সঙ্গে সরেজমিনে লড়াকু 'আমি'। অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণযে পৌরোহিত্যে অভিপ্রায়ী 'আমি'। নজরুলেব 'আমি দেবশিশু বুদ্ধদেবে হযেছে শাপভ্রষ্ট দেবশিশু। কিন্তু নজরুল যে প্রবলভাবে স্বকণ্ঠনির্ভর হযে উঠলেন, হযে উঠলেন স্বতন্ত্রবাচী তার মূলে রযেছে নজরুলের জীবনের স্পিড— তার জীবনের গতিবেগ। এ প্রসঙ্গে সব কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর বৈপ্লবিক বিবাহ, মুক্তি আন্দোলনের অংশগ্রহণ সাম্যবাদী আন্দোলনের আবেগ সৃজন 'ধূমকেতু', 'লাঙ্গল' পত্রিকা, শ্রমজীবী শ্রেণীর অভ্যুত্থান সম্বন্ধে নিশ্চয প্রত্যয়, সবকিছুই আজও আমাদের অভিবাদনীয়। মধ্যবিত্ত আতুপুতু জীবন চর্চা ভেঙে তিনি জীবন এবং কবিতাকে রক্তে মাংসে ঘামে জড়ানো মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেজন্যই নজরুলের কবিতায় গতিছন্দ একটা বড় ব্যাপার। আমরা তিনটে কবিতা বেছে নিচ্ছি নিবিষ্ট পাঠের জন্য। 'বিদ্রোহী' কবিতায় বিপরীত বৈষম্যেব নাট্যরস এর আগে উল্লেখিত হয়েছে। এর সঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি কামালপাশাকে। এক সম্পূর্ণ অভিনব আঙ্গিকে কবিতাটি গঠিত। কামাল শব্দের যমক প্রয়োগ থেকে সে নাটকীয়তার শুরু। তারপর ঘটনাগতির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যরস ঘন হতে হয়েছে। অনুভূতিতে দৃশ্যময়, দৃশ্যকে প্রগাঢ় এবং সে তন্ময় গাঢ়তাকে প্রমূর্ত করে তোলায় নজরুলের যে সার্থকতা সেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই নাট্যগতি বাংলা কবিতায় নজরুল এনেছেন নিজের আশৈশব গতিশীলতার অভিজ্ঞতা থেকে। আমি 'লিচুচোর' কবিতাটি স্মরণ করছি। এমন কোনো যুবক বাঙালি নেই যিনি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি জানেন না। এমন কোনো বাঙালি বালক নেই 'লিচুচোর' কবিতাটি জানে না। চারমাত্রার চৌচাপট দাপট কতখানি উপভোগ্য হতে পারে, তিনের চাল কত দ্রুতগামী হতে পারে কবিতাটি তার প্রমাণ। পুরো কবিতাটি একটি সদ্য ঘটে যাওয়া বালকোচিত অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনা। বন্ধুর কাছে বন্ধু কাহিনীটি বলছে। সবে সে কোনোক্রমে পালিয়ে বেঁচেছে। সুতরাং সে হাঁফিয়ে গেছে। 'বলি থাম একটু দাঁড়া'— থামতে বলার কারণ হল সে একটু দম নিতে চায়। আমি এক বালক আবৃত্তিশিল্পীকে জানতাম যে কবিতাটি শুরু করতো যেন অনেকখানি ছুটে এসেছে এমন ভাবে। 'বলি থাম' বলার পর সে নিজেও দু'সেকেণ্ড থেমে যেত। সমস্ত ঘটনায় আছে একটা দ্রুতগতি। পুকুরের কাছে লিচুগাছটাকে দেখা, কাস্তে নিয়ে গাছে চড়া, ছোট ডালটি ধরা, গাছ থেকে হঠাৎ পতন, মালি গাছের আড়ালে অপেক্ষমান, তার বর্ষিত কিল ঘুসি, হাইজাম্প দিয়ে দেওয়াল ডিঙিয়ে পলায়ন প্রয়াস— এইবার চূড়ান্ত ঘটনা— ডালকুত্তা আর আমাদের নায়কের দৌড় প্রতিযোগিতা। এক চুলের জন্য বেঁচে গেল ছেলেটি। আমরা বেশ বুঝতে পারি এই দুরন্ত দামালের শেষ শপথ— কি বলিস ফের হপ্তা/ তোবা নাক খপ্তা, শুধু তাৎক্ষণিক উক্তিমাত্র। সে আবার যাবে। আশ্চর্য কবিতাটির গঠন। প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পংক্তি

পর্যন্ত কবিতাটি ছুটছে— কোনো পংক্তিতে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায়নি। আমি সকল মাননীয়কে গণনীয় রেখেই বলছি, কীটস্‌-এর There was a naughty boy (A song about myself) কবিতাটি ছাড়া কোথাও এ কবিতার জুড়ি নেই।

চারমাত্রার মাত্রাবৃত্তে নজরুল কী ম্যাজিক সৃষ্টি করতে পারতেন তার জন্য আমাদের সামনে আছে 'ফাল্গুনী'। এ কবিতাতে চারমাত্রা আর কথ্য ভাষার— বিশেষ এক সময়ের বাঙালি মেয়ের মেয়েলি বাক্‌রীতির চাল আলোর ফুলকি ছড়িয়েছে। আগেই বলেছি নজরুল রবীন্দ্রনাথের সাবালক উত্তরাধিকারী। 'বিদ্রোহী' কবিতার কতকগুলি বিরোধাভাসের কথা আগে উল্লেখ করেছি। এখন 'ফাল্গুনী' কবিতার কতকগুলি বিরোধাভাসের কথা বলি :

(ক) এল খুন মাখা তূণ নিয়ে খুনেরা ফাগুন
(খ) তাহাদের মধু ক্ষরে— মোরে বেঁধে হুল
(গ) সখি মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল একি বায়
এযে বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায়
(ঘ) ফুলে এত বেঁধে হুল
ভাল ছিল হায়
ছিঁড়িত দুকুল যদি কুলের কাঁটায়।

এই কবিতাটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর প্রত্যেকটি স্তবকের নিহিতার্থ। যা প্রতীয়মান সেটা বলার কথার ছদ্মবেশ। ভিতরের কথাটি ব্যাখ্যেয় নয়, অনুমেয় :

এ যে শরাবের মত নেশা
এ পোড়া মলয় মেশা
ডাকে তাহে কুল নাশা
কালামুখো পিক
যেন কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক।

উৎপ্রেক্ষাটি অভিনব। অথচ কী সজীব। 'আলো রাধা', 'জোছনা আবির', 'নিমখুন', 'নাজেহাল', 'আব-রাঙা', 'ফুল ঝামেলা', 'ডগমগ' প্রভৃতি সাবলীল শব্দ কবিতাটিতে এনে দিয়েছে অভিপ্রেত তরঙ্গ লভ। কবিতাটিতে ছেকানুপ্রাস ও যমক এই তরঙ্গকল্লকে তৃতীয় মাত্রা দিয়েছে। পরিণামী স্তবকটি উদ্ধৃত না করলে অন্যায় হবে ;

আজ সঙ্কেত শঙ্কিতা বনবীথিকায়
কত কুলবধূ ছেঁড়ে শাড়ি কুলের কাঁটায়।
সখী ভরা মোর এ দু'কুল।
কাঁটাহীন শুধু ফুল ?—
ভাল ছিল হায়,
সখি ছিঁড়িত কূল যদি কুলের কাঁটায়।

আমি যে প্যারাডক্সের কথা বার বার বলছি সেই সূত্রে এ কথা কি বলা যায় না যে নজরুল নিজেই একটি বিরাট প্যারাডক্স। আসক্ত এবং অনাসক্ত, অনুরাগী এবং বৈরাগী, বিদ্রোহী এবং প্রেমিক এই প্রেক্ষক এবং সংবেদী কবি কী করে একই সঙ্গে হয়ে ওঠেন একই কালের ক্রোধের কবি এবং প্রধান ভক্তি গীতিকার তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমি ভুলে যাচ্ছি না নজরুলের সীমাবদ্ধতা। তিনি প্রেমের কবিতায় আনমনে গিয়ে পড়তেন রাবীন্দ্রিক বেড়াজালে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয়। তাঁর প্রেমের কবিতাতেও এমন পংক্তি আছে :

অনন্ত অগস্ত্য তৃষাকুল বিশ্ব মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু সম, মাগে সিন্ধু আর!

অথবা

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটিরে,
খুশীর রঙে করবে সোনা ধূলি মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ পরে
উঠবে যবে গরব ভরে।
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে,
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।

এবং আমাদের অবশ্য আলাদা করে মনে পড়বে দীর্ঘ কবিতা 'সিন্ধু' — কি রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'পূরবী'র সমুদ্র (২১ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতার পরেও মনে পড়বে। 'সিন্ধু' কবিতাটির তিন ভাগ-- প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ, তৃতীয় তরঙ্গ। 'সিন্ধু' নজরুলের বিকল্প অহং। প্রথম তরঙ্গে বিরহী সমুদ্র, দ্বিতীয় তরঙ্গে বিদ্রোহী সমুদ্র, তৃতীয় তরঙ্গে তৃষিত ক্ষুধিত সমুদ্র--

মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্নপুর
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশীপ্রিয়া
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত সুধা- তোমার জীবন!
সব গেছে আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল,
আছে ব্যথা, আছে স্মৃতি ব্যথা উতরোল!
ঊর্ধ্বে শূন্য- নিম্নে শূন্য— শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধির সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্র' কবিতার সঙ্গে নজরুলের সিন্ধু চেতনার আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু দু'জনের অনুভূতির ব্যবধানেও তো ভুল করা যাবে না।

যুগসন্ধ্যা কবে এল তার,
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। কর্পনিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধুলায় ধুলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্ত রূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল।
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল। (সমুদ্র/পূরবী)

'হাহাকার' এই শব্দসাদৃশ্য সত্ত্বেও দুই কবির টোন টিউন দুয়েরই পার্থক্য অস্বীকার করা যাবে না। পৃথক জীবনার্থ সেই টোন টিউনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

এ সব সত্ত্বেও নজরুলের অনন্য এবং একক কৃতিত্ব অন্যত্র। সেখানে তাঁর কোনো যথার্থ পূর্বগামী নেই, সঠিক উত্তরপুরুষও অংশত একজন কি দুজন। নজরুল প্রথম বাঙালি কবি যিনি বিশুদ্ধ ক্রোধকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। 'ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'সব্যসাচী', 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতা নজরুলের পরিচিতিকে উন্নীত করেছে প্রগাঢ় জনপ্রিয়তায়। এ সব কবিতায় এমন এমন পংক্তি আছে যা আজও অগ্নিমন্ত্রের মত উদ্দীপক। একথা ঠিক যে নজরুলের সময়টাও ছিল এই বিশিষ্ট ভাবের অবলম্বন উদ্দীপন বিভাবের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক উত্তাপে চঞ্চল। এই সব উক্তি এখনো কত সজীব।

(ক) নিতি নব ছোরা গডিয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান
(খ) মনের শিকল ছিঁড়েছি পড়েছে হাতের শিকলে টান
(গ) আমরা তো জানি স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এসেছি খাস
(ঘ) প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখেব গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।
(ঙ) বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে একবাব মবে বাঁচি।
(চ) পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত
তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত।
(ছ) লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারতলক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহারি আঁখিব সুমুখে কাল বাবণেব চিতা।
(জ) যে লাঠিতে আজ টুটে-গম্বুজ, পড়ে মন্দিব চূড়া
সেই লাঠি কালি প্রভাতে কবিবে শত্রু দূর্গ গুঁড়া।

এবং এই রৌদ্ররসের আতপে ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ স্বনির্ভব নজরুলি প্যাবাডক্স;

(ক) ভায়োলেন্সের ভায়োলিন আমি
(খ) ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন স্বর্ণ লঙ্কা পুড়া
(গ) সজীব হইয়া উঠিযাছে আজি শ্মশান গোবস্থান
(ঘ) ভারত ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবাব
(ঙ) ভোগের পেয়ালা উপচাযে পড়ে তব হাতে
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পেযালাতে।
(চ) তোরা ছেলের মুখে থুথু দিযে মাব মুখে দিস ধূপেব ধোঁযা
(ছ) তোরা সব ভক্তিশালী
বুকে নয়, মুখে খালি
বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছেব কাটা যে বে।
(জ) এ দুনিয়া পাপ শালা,
ধর্মগাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা।

তথাপি একথা বলা আমার আদপেই উদ্দেশ্য নয়, যে নজরুল কেবল ক্রোধসিদ্ধ কবি। দুর্বাসা নয়, বরং শিবের সঙ্গেই তাঁর মিল। শেয়ানা পাগল নন, তিনি সত্যই পাগল ভোলানাথ। তা নইলে তিনি এ কথা বললেন কেমন করে;

রাখাল বলিযা কারে করো হেলা, ও হেলা কাহারে বাজে।
হয়তো গোপনে ব্রজের রাখাল এসেছে রাখাল সাজে।
চাষা বলে করো ঘৃণা!
দেখো চাষা রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না।
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল
তারাই আনিল অমর বাণী— যা আছে রবে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিণী,
তারি মাঝে কবে এল ভোলানাথ গিরিজায়া তা কি চিনি।

মননে নয়, হৃদয়ধর্মে তিনি ধার্মিক— তত্ত্বে নয় আবেগে তাঁর আশ্রয়— আশ্রয়দাতাকে তিনি প্রশয় দিয়েছেন তাতে কিছু না রেখে। অসাধারণ ছিল তাঁর চোখ-কানের ক্ষমতা। বাঙালির জীবনের

আনাচ কানাচ অন্ধিসন্ধি তাঁর নখদর্পণে। তাঁর কবিত্বের দরদালানে কোন রস অপাংক্তেয় নয়। অকৃত্রিম সাংসারিক আনন্দ নিয়ে তাঁর কবিতা 'অঘ্রাণের সওগাত'। একটি মুসলমান গ্রামীণ কৃষক পরিবার অঘ্রাণের আনন্দ এবং ছোটখাট সাংসারিক সংবাদ আঁকাড়া বাঙালি শব্দে কবিতাটিতে একটা টাটকা বাতাবরণ রচনা করেন। 'গিন্নিপাগল চাল' (আজকালকার ছেলেমেয়েরা নামই শোনেনি) 'তেলেসমাত', 'লবেজান', 'দলিজ', 'শাশবিবি', 'নেকাব' বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত সেই সব শব্দ মুসলিম পরিবারের অন্তঃপুর থেকে উঠে এসেছে – তিনটি ছবি ফুলের পাপড়িতে ধৃত সৌরভের সারাৎসার :

(ক) মাঠের সাগরে জোয়ারের পর লেগেছে ভাটির টান।
(খ) বধূব পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ
(গ) হেমন্ত গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত।

এতো গেল সাংসারিক চিত্রলতায় ভরা কবিতা- - সে অতিজাগতিক চেতনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পাশে নজরুল নিজের একটি ছোট্ট অথচ নিজস্ব আসন রচে নিয়েছিলেন, সেই মহাজগতে নজরুল আমাদের চেনা জীবনের নানা মিষ্টি অভিজ্ঞতার ছায়া ধরে দিয়েছেন 'চাঁদনী রাতে' কবিতায়। কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য কল্পনা এবং ফ্যান্টাসির সূক্ষ্ম ভেদরেখাটি মুছে দেওয়ায়। যে নজরুলী ডিকসন একমাত্র নজরুল সম্ভব তা এখানে পূর্ণ হয়েছে। নজরুল সম্বন্ধে প্রায়ই তাঁর কবিতালভ্য সত্যেন্দ্রীয় আমেজের কথা বলা হয়। যেভাবে দেখলে তাঁর সাম্যবাদী পর্যায়ের কবিতায় বাগ্‌ভঙ্গিতে যতীন্দ্রীয় আঁচও পাওয়া যাবে। কিন্তু এই দুই কবি থেকে নজরুলের আসল পার্থক্যকে চিনতেও আমাদের ভুল হয় না। সত্যেন্দ্রীয় আমেজকে নজরুল অতিক্রম করেছেন নজরুলী ইমেজে -- যতীন্দ্রীয় দুঃখবাদকে তিনি পাশ কাটিয়েছেন নিজের অকৃত্রিম প্রাণোল্লাসে। সত্যেন্দ্রনাথ আপন ছন্দের প্রেমে অভ্যাসিক সিদ্ধিকে প্রায়শ যান্ত্রিক করে তুলেছেন। যতীন্দ্রনাথ আপন অভিজ্ঞতায় আপনি বন্দী। নজরুল সম্বন্ধে এসব কথা একেবারে খাটবে না। তাঁর দুর্বলতার কথা আমরা জানি। তিনি বিরহকে মনে করতেন মিলনের অভাব। মিলনকে মনে করতেন আসঙ্গ ভোগ। কিন্তু অনন্যসাধারণ তাঁর অন্যাকে সঞ্জীবিত করে তোলার ক্ষমতা। এ ব্যাপারে প্রধান সহায় তাঁর নির্বিকার শব্দচয়ন। 'চাঁদনী রাতে' কবিতায় 'কোদালে মেঘ' শব্দটি খনার বচন থেকে আলগোছে তুলে নেওয়া। 'মউজ', 'ছুঁড়ি', 'সংসার', 'শাম্পান', 'নেটের মশারী' সব কিছুই তার কবিতায় ছবির উপাদানে কাজে লাগে :

সপ্তর্ষির তারাপালঙ্কে ঘুমায় আকাশ রাণী,
'সেহেলি' 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলী মশারি টানি।
দিক চক্রের ছায়াঘন ওই সবুজ তরুর সারি
নীহার নেটের কুয়াশা মশারি-- ওকি বর্ডার তারি ?

মঙ্গল গ্রহ মঙ্গল দ্বীপ জ্বালিয়েছে, কালপুরুষ উল্কাজ্বালার সন্ধানী আলো নিয়ে বিনিদ্র প্রহরায় রত। এরই মাঝে :

কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকী
চাঁদের 'সসারে' কলঙ্ক ফুল আনমনে যায় আঁকি...

গানেও নজরুল প্রথাবিমুক্ত শব্দ চয়নে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। বাংলাগানের যে ঐতিহ্য মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে--- কথা ও সুরের হরগৌরী মিলনের রূপ, রস, সৃজন, নজরুল সেই ধারাবাহী। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া নজরুল এ যুগের দ্বিতীয় বাঙালি গীতিকার যাঁর জনপ্রিয়তা এখনো ক্রমবর্ধমান। তাঁর গানে গায়কের বা শিল্পীর স্বাধীনতা আছে বলেই এমনটি ঘটেছে একথা বললে ব্যাখ্যাটি আংশিকতা দুষ্ট হবে। বহু অযত্নকৃত বাণী সন্নিবেশ সত্ত্বেও গানের বাণীতে বেশ কখনো রবীন্দ্রবীথিতে পরিক্রমা সত্ত্বেও নজরুলের যে কোনো গান ধরতাইয়ের মুখ থেকে নজরুলের গান বলে চিনতে আমাদের ভুল হয় না। তাঁর গানের লিরিক কবি নজরুলেরই সৃষ্টি। গানের মিত পরিসরে আবেগ সেখানে সংহত হয়েছে বলে

তা অবিস্মরণীয়। তাঁর গানে— বিশেষ তাঁর গজল গানে তিনি প্রথা বিমুখ শব্দ চয়নের অবকাশ পেয়েছেন বেশি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তিনি যে সব নবাগত শব্দের প্রাথমিক প্রতিরোধকে গলিয়ে গলিয়ে তাদের পুরোদস্তুর গতিসম্মত করে তুলেছেন। 'লোপাট' এবং 'খুন' শব্দ যে গানে ব্যবহৃত হতে পারে নজরুলের আগে আমরা জানতাম না।

সঙ্গীত আলোচনার ক্ষেত্রে সে জন্যই সব থেকে যোগ্য, সঙ্গীতের ইতিহাস জ্ঞান, সুরজ্ঞান এবং সহজাত রসবোধ যাঁর সঙ্গীত চেতনাকে একযোগে সমৃদ্ধ করে তোলে। 'পরিচয়'-এর লেখক শ্রীঅনন্তকুমার চক্রবর্তী এমন একজন। 'গীতিকার নজরুল ইসলাম' (১৯৭৭) শীর্ষক— একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে এই শতবার্ষিকীয় আলোড়নের অনেক আগে অনন্তকুমার লিখেছিলেন :

> "প্রথমত পল্লী-বাংলার জীবনের সঙ্গে, বিশেষ করে তার সাঙ্গীতিক সংস্কারের সঙ্গে শৈশবের ও পরবর্তী জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। দ্বিতীয়ত কৈশোরে ও যৌবনে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয়। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া সঙ্গীতের বিরাট উত্তরাধিকার। চতুর্থত রাজনৈতিক আন্দোলন ও কৃষক মজুরের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে মিলতে পারার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর গান এই আকাঙ্ক্ষারই এক বিশিষ্ট শিল্পবাগ। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার স্বভাবসিদ্ধ সঙ্গীতবিভোরতা। সব কিছুর যৌগিক পরিণতি, হয়তো কিছুটা অপরিণতি সমেত, যাকে বলা হয় নজরুলগীতি।"

এই যৌগিক পরিণাম শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে নজরুলের শৈল্পিক অস্তিত্বের প্রধান অভিজ্ঞান। আমি আগেই বলেছি নজরুল ছিলেন পথিক মানুষ তাঁর পথচলার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল তাঁর দেখা এবং শোনা। জীবন বিমুগ্ধ নজরুল জীবন রস পান করেছেন নানা আধারে, 'ভৃঙ্গারে গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।' আশ্চর্য রসগ্রাহিতায় অনন্তকুমার বলেন ;

> স্বদেশের মাঠে-ঘাটেই ছড়িয়ে আছে অজস্র সুর, অজস্র স্বরবিন্যাস ও স্বরভঙ্গি, তারা জনজীবনের বেগবান ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একটু কান পাতলেই তাদের শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাবালক উত্তরাধিকারী। তাঁর কণ্ঠেই আমরা প্রথম শুনেছি আলাদা কণ্ঠস্বর, আলাদা উচ্চারণ, আলাদা ইডিয়ম। কোকিলের পাশে বুলবুলের মতোই তাকে আমরা চিনেছি নির্ভুলভাবে। 'সাবালক উত্তরাধিকারী' আমার এই শব্দবন্ধটি অসতর্ক উচ্ছ্বাস নয়। নজরুল এমন একটি চরিত্র যিনি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরেও তাঁর জীবৎকালের মতই সমান জনপ্রিয়তার অধিকারী রয়েছেন— বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর অবজ্ঞেয় ঔদাসীন্য সত্ত্বেও তিনি রবীন্দ্রনাথের পরেই সাধারণ্যে বিপুল সমাদরের গৌরব পেয়েছেন। এটা লক্ষ করার ব্যাপার যে, নজরুলের বর্ণবহুল বিচিত্র জীবন কথা নিয়ে এখনকার কালের কোনো বাঙালি ঔপন্যাসিক উপন্যাসোপম জীবনী লিখলেন না। এখনকার মানুষ নজরুলকে জানেন কেবলমাত্র সঙ্গীত স্রষ্টা হিসাবে। সে জানাকে আমরা অশ্রদ্ধা করছি না, কেমন করে তিনটি দিকে নজরুলের প্রথমত্ব তাঁর ব্যক্তিত্বকে বোঝার পক্ষে অপরিহার্য।

১) তিনি প্রথম বাঙালি কবি, যিনি বাঙালি মধ্যবিত্তের গতানুগতিক জীবিকা গ্রহণ করেন নি, কিছুকালের জন্য গ্রহণ করেছিলেন সৈনিক বৃত্তি।

২) তিনি প্রথম বাঙালি লেখক যিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কলম ধরে কারাবরণ করেছেন। *জেলখানায় অনশন করেছেন।*

৩) *তিনি প্রথম বাঙালি* মুসলমান লেখক যিনি প্রেমের কারণে শরিয়তী গণ্ডি লংঘন করে অমুসলমান তরুণীকে বিবাহ করেন।

সকলদিক থেকে তিনি প্রতিবাদী— রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক সকল অচলয়াতনকে আঘাত হেনে তিনি হয়ে উঠেছেন জনমানসের প্রতিনিধি। '**বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসনাশন**' একথা যদি কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে হয় তবে তিনি নজরুল ইসলাম।

* ১৪০৫ সালের শারদীয় পরিচয় পত্রিকায় ভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের প্রচুর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ বর্তমান লেখাটি।

নজরুল-গ্রন্থের প্রচ্ছদ

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

১৯২২ সালে নজরুল ইসলামের প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়। অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলি বিভিন্ন প্রকাশক প্রকাশ করেন। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ গ্রন্থই সুদৃশ্য প্রচ্ছদে শোভিত ছিল। নজরুলের আদি সংস্করণের গ্রন্থাদি দুষ্প্রাপ্য। কোন গ্রন্থাগারে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলেও তার অধিকাংশই মলাটবিহীন অথবা নতুন করে বাঁধাই করা। প্রাপ্ত গ্রন্থাদি এবং অন্যান্য সূত্র অনুসরণে নজরুল গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিচিতি এখানে তুলে ধরছি।

নজরুলের প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯২১) প্রকাশ করেন মোসলেম পাবলিশিং হাউসের আফজালুল হক। এ গ্রন্থে রঙ্গীন প্রচ্ছদচিত্র ছিল না, কিন্তু রঙ্গীন কাপড়ের মলাটটি বেশ সুদৃশ্য ছিল। সমকালীন 'প্রভাতী' পত্রিকায়ও বলা হয় 'মলাট সুন্দর' (বৈশাখ, ১৩২৯)।

১৯২২ সালে নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল বাংলা কাব্যজগতে একটি স্থায়ী আসন অধিকার করে নেন। এ গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন আর্য্য পাবলিশিং হাউসের শরৎচন্দ্র গুহ। ঠাকুরবাড়ীরই আর এক মনীষী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলির স্পর্শে ধন্য হয় 'অগ্নিবীণা'র প্রচ্ছদ। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'অগ্নিবীণা'র আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়— 'কবি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটখানি পুস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে'। 'অগ্নিবীণা' প্রকাশের পাঁচ মাস পরে ১৯২৩-র মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ তার 'বসন্ত' নাটিকাটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন।

'অগ্নিবীণা' ১ম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্রে দেখা যায়— উপরে গ্রন্থনাম, নীচে লেখকের নাম এবং মাঝখানে কয়েকটি সারিতে অগ্নিশিখা। এই প্রচ্ছদচিত্রের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল আরবী লিপিচিত্রের অনুসরণে লেখা গ্রন্থ ও লেখকের নাম। 'কাজী নজরুল ইসলাম' — এই বর্ণলিপিটি হঠাৎ দেখলে মনে হবে আরবী হরফে লেখা কোন নাম।

পরবর্তীকালে 'অগ্নিবীণা' প্রকাশ করেন ডি.এম.লাইব্রেরী। প্রকাশক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ-গ্রন্থের প্রচ্ছদও বদল হয়। ডি.এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা'র প্রচ্ছদে শোভা পায় বহ্নিমান একটি বীণা। এই প্রচ্ছদচিত্র কে এঁকেছিলেন জানি না, তবে প্রচ্ছদে স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় J C।

নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দোলনচাঁপা'-র (১৯৩২) প্রকাশকও ছিল আর্য্য পাবলিশিং হাউস। এ-গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ছিল রঙ্গীন। প্রচ্ছদচিত্র কে অঙ্কন করেন জানা যায়নি। প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যায়, মলাটের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে একটি আয়তক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রের মধ্যে চিত্র ও গ্রন্থ নাম এবং তার বাইরে লেখকের নাম। লক্ষণীয় বিষয়, নজরুলের পরবর্তী বেশ কয়েকটি গ্রন্থে

এই প্রচ্ছদ পরিকল্পনাই অনুসৃত হয়েছে। আয়তক্ষেত্রের চিত্রে রয়েছে গাছের ডালে দুটি ফুল এবং সাপ হাতে (সম্ভবতঃ চশমাধারী) একজন লোক। কৌতুকের বিষয় প্রচ্ছদচিত্রে যে দু'টি ফুল আঁকা হয়েছে, তা দোলনচাপা নয়, চাঁপা ফুল। পরবর্তীকালে ডি.এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত সংস্করণের প্রচ্ছদে দোলনচাঁপার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করাব মত, তা হচ্ছে 'বিষের বাঁশী'র প্রচ্ছদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য। সন্দেহ জাগে, 'দোলনচাঁপা'র প্রচ্ছদও কি তবে দীনেশরঞ্জন দাশ এঁকেছিলেন ?

সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদে সংরক্ষিত 'দোলনচাঁপা' গ্রন্থের প্রচ্ছদে দেখেছি লেখকের নাম টাইপে মুদ্রিত। কিন্তু কোন কোন বইয়ে মুদ্রিত এ গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্রে লেখকের নাম স্বাক্ষর চিহ্নিত, প্রেসের হরফে নয়। এটি সম্ভবতঃ হস্তক্ষেপজনিত পরিবর্তন।

'অগ্নিবীণা'র ন্যায় 'বিষের বাঁশী' (শ্রাবণ, ১৩৩১) গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের সঙ্গেও জড়িত আছে সেই একটি নাম-দীনেশরঞ্জন দাশ। প্রখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকার তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। 'বিষের বাঁশী' প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে নাম ছিল 'নজরুল ইসলাম, হুগলী'। নামপৃষ্ঠায় সোল এজেন্ট ও প্রাপ্তিস্থান লেখা ছিল ডি.এম. লাইব্রেরী। প্রথম সংস্করণের রঙ্গীন প্রচ্ছদপটটি আঁকেন দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১)। ছবি আঁকা ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা। কর্ম-জীবনেব প্রথম দিকে তিনি চিত্রাঙ্কনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্ভবতঃ নজরুল ইসলামের অনুরোধেই তিনি 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকেন। প্রচ্ছদের প্রায় সবটা জুড়ে একটি আযতক্ষেত্রের মধ্যে গ্রন্থনাম ও চিত্র। আযতক্ষেত্রের বাইরে নজরুলের স্বাক্ষরচিত্র 'কাজী নজরুল ইসলাম'।

'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের নাম রাখার কথা ছিল 'অগ্নিবীণা- দ্বিতীয় খন্ড'। সে কাবণে কিনা জানি না, 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের গ্রন্থনামের প্রেক্ষাপটে রয়েছে লেলিহান অগ্নিশিখা। মূলচিত্রে দেখা যায় লাল সূর্যের পটভূমিকায় উপবিষ্ট এক বংশীবাদক, যার আষ্টেপৃষ্টে বেষ্টন করে আছে এক সুবিশাল নাগ। বংশীবাদকের পাশে রযেছে ফণিমনসা গাছ। প্রচ্ছদচিত্রে লাল ও নীল রঙের প্রাধান্য লক্ষণীয। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নজরুল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন— "এই বাঁশীর গাযে অদ্ভুত বিচিত্র নক্সাটি কেটে দিয়েছেন প্রথিতযশা কবি-শিল্পী আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু- - 'কল্লোল' সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ"। 'বিষের বাঁশী' তদানীন্তন ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর নূর লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদেও প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র শোভা পায। পরবর্তীকালে ডি.এম. লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণেও তা অনুসৃত হয়েছে।

বর্মণ পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত 'ছায়ানট' (১৯৯৫) গ্রন্থের প্রচ্ছদপরিকল্পনায়ও লক্ষ্য করা যায় একটি আয়তক্ষেত্রের মধ্যে গ্রন্থনাম ও চিত্র এবং তার বাইরে লেখকের স্বাক্ষর চিত্র--'নজরুল ইসলাম'। চিত্রে দেখা যায বিস্তৃত ছায়াবিশিষ্ট এক বিশাল বটবৃক্ষ, যদিও 'ছায়ানট' নামের সঙ্গে ছায়া বা বটবৃক্ষের কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রচ্ছদচিত্রের শিল্পী কে ছিলেন তা জানা যায় নি।

১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'চিত্তনামা' গ্রন্থের প্রচ্ছদ ছিল একটু ভিন্নধর্মী। প্রচ্ছদে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিকৃতির পরিবর্তে সেখানে রয়েছে ভারতের মানচিত্রের পটভূমিতে ক্রন্দনরতা এক রমণীয় চিত্র। চিত্রের বাইরে রয়েছে প্রেস-টাইপে মুদ্রিত লেখকের নাম— 'কাজী নজরুল ইসলাম'। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম কিন্তু জানা যায় নি।

একই বছর, অর্থাৎ ১৯২৫ সালে নজরুল ইসলামের আরো দু'টি বই প্রকাশিত হল 'সাম্যবাদী' ও 'পূবের হাওয়া'। লক্ষ্য করা যায়, এ-দুটি গ্রন্থের প্রচ্ছদ ছিল সাদামাঠা। গ্রন্থনাম ও লেখকের নাম প্রেসের টাইপে মুদ্রিত 'ফণিমনসা' ও 'মহুয়ার গান' গ্রন্থের প্রচ্ছদেও প্রেসের টাইপ ব্যবহৃত হয়েছে।

নজরুলের প্রথম শিশু পাঠ্যগ্রন্থ 'ঝিঙেফুল' ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থের প্রচ্ছদে উপরে ও নীচে রয়েছে যথাক্রমে গ্রন্থনাম ও লেখকের নাম— শিল্পীর হাতে লেখা বর্ণলিপি। মাঝখানে শোভা পাচ্ছে হলুদ ও সবুজ রঙের সমারোহে একটি চিত্র। পটভূমিতে ঝিঙে ফুল ও ঝিঙে পাতা, তার

সামনে বসে আছে একটি শিশু প্রচ্ছদে শিল্পীর নাম লেখা আছে 'অশোক'।

এই অশোক সম্ভবতঃ শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায (মৃত্যু ১৯৬৯), যিনি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। তিনিই সম্ভবতঃ ছাত্রাবস্থায ঝিঙে ফুলের প্রচ্ছদচিত্র আঁকেন, কারণ এ-চিত্রে অপটু হাতের ছাপ সুস্পষ্ট।

১৯২৬ সালেই প্রকাশিত হয নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্য। গ্রন্থটি রাজরোষে পড়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাজেযাপ্ত হয়নি। দুষ্প্রাপ্য এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ দেখিনি, তবে 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে শিশির কর প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন – 'এর প্রচ্ছদে দুই কৃষকের ছবি, একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান'। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয সংস্করণে অনুরূপ প্রচ্ছদচিত্র আঁকেন শিল্পী খালেদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী কে ছিলেন তা জানা যায নি।

'সিন্ধুহিল্লোল' (১৯২৭) গ্রন্থেও একটি সুদৃশ্য প্রচ্ছদচিত্র ছিল। প্রচ্ছদের মাঝখানে একটি ছোট আযতক্ষেত্রে চিত্র ও গ্রন্থনাম বর্তমান। চিত্রে দেখা যায দূরে সমুদ্রতীর আর তার সামনে এক বলিষ্ঠদেহ যুবক, যার হাতে রযেছে একটি লাঠি। প্রচ্ছদের নীচে প্রেস হরফে রযেছে লেখকের নাম 'নজরুল ইসলাম'।

১৯২৮ সালে প্রকাশিত 'বুলবুল' এর প্রচ্ছদে একটি রঙীন চিত্র শোভা পায। প্রচ্ছদের মাঝখানে একটি আযতক্ষেত্র। আযতক্ষেত্রের চিত্রে দেখা যায এক রমণীর হাতে একটি বুলবুল পাখী। শিল্পীর নাম জানা যায নি।

'চক্রবাক' (১৯২৯) গ্রন্থের প্রচ্ছদের প্রায সবটা জুড়ে একটি প্রচ্ছদচিত্র রযেছে। জলাশয এবং বৃক্ষরাজির পটভূমিতে দেখা যায একটি চক্রবাক বা হংস ডানা মেলে উড়ে চলেছে। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে লেখকের নাম শুধু 'নজরুল'। প্রচ্ছদপটে শিল্পীর স্বাক্ষরটি সুস্পষ্ট। শিল্পীর নাম 'এইচ রায' (H Roy), সম্ভবতঃ ইনি হরিপদ রায। (১৮৯৫ ১৯৭১)। হরিপদ রায শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারের ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা করেন। ব্যঙ্গচিত্রকর ও কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তীকালে নলেজ হোম প্রকাশিত 'চক্রবাক' এর নতুন সংস্করণে প্রচ্ছদচিত্রেরও পরিবর্তন হয।

নজরুল গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে প্রচ্ছদচিত্রের বদলে শুধু শিল্পীর আঁকা বর্ণলিপি লক্ষ্য করা গেছে দুটি বইযে - 'জিঞ্জীর' (১৯২৮) এবং 'কাব্য-আমপারা' (১৯৩৩)। 'কাব্য আমপারা' গ্রন্থের প্রচ্ছদে বর্ণলিপিতে আরবী হরফে 'আমপারা' কথাটিও রযেছে।

১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'রুবাইযাৎ-ই হাফিজের' প্রচ্ছদটি খুবই সুদৃশ্য। প্রচ্ছদপটে রযেছে দ্রাক্ষাকুঞ্জে সুরাপাত্র হাতে এক সাকীর চিত্র। এ-গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠাও ছিল রঙীন ও অলঙ্কৃত। এর প্রকাশক ছিলেন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স। পরবর্তীকালে ডি.এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত সংস্করণে নতুন প্রচ্ছদচিত্র শোভা পায।

এম্পাযার বুক হাউস ১৯৩২ সালে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'জুলফিকার' ও 'বনগীতি'। দু'টি গ্রন্থের প্রচ্ছদই সচিত্র। 'জুলফিকার' গ্রন্থের প্রচ্ছদে দেখি দীপ্তিমান একটি তরবারীর চিত্র। 'বনগীতি' গ্রন্থের প্রচ্ছদে একটি আযতক্ষেত্রের মধ্যে অরণ্যের পটভূমিতে একটি হরিণের চিত্র শোভা পাচ্ছে।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স ১৯৩২ সালে প্রকাশ করে নজরুলের গানের বই 'সুরসাকী'। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্রটি খুবই সুন্দর। প্রায সারা পৃষ্ঠা জুড়ে রযেছে পেখম মেলা একটি ময়ূরের চিত্র। তার নীচে গ্রন্থনাম ও লেখকের নাম। ময়ূরের চিত্রটি সবুজ ও হলুদ রঙে অঙ্কিত। চিত্রে শিল্পীর নাম পাওযা যায ফণি গুপ্ত। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ফণিভূষণ গুপ্ত (১৯০০-১৯৫৬) ১৯২৮ সালে কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি কালি-কলমে চিত্রাঙ্কনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 'সুরসাকী' গ্রন্থের প্রচ্ছদপটেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয পাওয়া যায।

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের প্রচ্ছদে রয়েছে লাল ও সবুজ কালির সমন্বয়ে অঙ্কিত একটি সুদৃশ্য প্রচ্ছদচিত্র।

১৯৪৫ সালে নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'নতুন চাঁদ' প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলী কবির অসুস্থতার কিছুদিন পূর্বে রচিত। গ্রন্থটি কবির গ্রন্থ-পরিকল্পনা-প্রসূত বলেই মনে হয়। সেকারণে আমি এই গ্রন্থটি কবির শেষ রচনা বলে অভিহিত করি। 'নতুন চাঁদ' গ্রন্থের পরে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সময়ে রচিত অপ্রকাশিত রচনাবলীর সঙ্কলন। লক্ষণীয় বিষয়, কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকেন বাংলার প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।

বলা আবশ্যক, আমরা এ আলোচনা নজরুল ইসলামের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। প্রথম সংস্করণের কপি দুষ্প্রাপ্য বিধায় নজরুলের সবগুলি গ্রন্থের প্রচ্ছদপরিচয় প্রদান করা সম্ভব হোল না।

আমরা উপরের আলোচনায় নজরুল-গ্রন্থেব প্রচ্ছদপটের কযেকটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করেছিঃ

১. প্রচ্ছদ পরিকল্পনা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত—
   ক) শুধু শিল্পীর বর্ণলিপিভিত্তিক
   খ) প্রেসের টাইপে মুদ্রিত প্রচ্ছদ
   গ) পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী প্রচ্ছদ এবং
   ঘ) পৃষ্ঠার একাংশে মুদ্রিত আযতক্ষেত্রে চিত্রবিশেষ
২. লক্ষণীয়--শেষোক্ত প্রচ্ছদপরিকল্পনা, অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রভিত্তিক সচিত্র প্রচ্ছদ, অধিকাংশ গ্রন্থেই অনুসৃত হয়েছে। (বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশক হলেও)।
৩. 'গ্রন্থনামে লিপিকুশলতা লক্ষণীয।
৪. লেখনেব নামচিত্রণে প্রেসের টাইপ অথবা তাঁর স্বাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে।
৫. দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে গ্রন্থের সংস্করণভেদে বা প্রকাশভেদে প্রচ্ছদ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

কবি-স্মৃতি

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী

কাজী নজরুল ইসলাম, আজ থেকে কত বছর আগে এ নাম শুনেছি— সে কোন বাল্যে মনে নেই, শুধু মনে আছে তাঁর 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী' গানের এই চরণটি। এ গান তখন ঢাকা শ-্র রাস্তা-ঘাটে সকলের মুখে মুখে। গানটি যেন চমক লাগিযে দিয়েছিল। অবাক হযে শুনতাম আর ভাবতাম কি সুন্দব। একটু বড হলে তাঁর কতকগুলি গান শুনতাম। পরে জেনেছিলাম এসব গানেব রচযিতা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁকে তখনো দেখিনি। কিছুই জানতাম না তাঁর সম্পর্কে, তবু গানের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদেব অতি পরিচিত হযে গিযেছিলেন। এব কযেক বছর পরে আমরা কলকাতা চলে আসি। ১৯৩২ সাল — আমি তখন স্কুলের ছাত্রী। আমার খালাম্মা বেগম এম ফাতেমা খানম কবির অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাস পড়েছিলেন। একদিন তিনি বললেন, নজরুল এত বড একজন কবি, তাঁকে অবশ্যই দেখতে হবে। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে কবির গান ও আবৃত্তি হবে শুনে ছুটলাম তাঁকে দেখাব অদম্য কৌতূহল নিয়ে। হলে প্রবেশ করে দেখলাম কবিব স্ত্রী প্রমীলা নজরুল এবং তাঁর শ্বাশুডী শ্রীমতী গিরিবালা দেবী সামনের সারিতে বসে আছেন। প্রমীলা নজরুলের পরনে ছিল লাল পাড গরদের শাডি। কপালে সিঁদুরেব টিপ, বড বড দুটি চোখ। মুখে একটি প্রশান্ত স্নিগ্ধ ভাব। আমরা তাঁদের কিছুটা পিছনে বসলাম। একটু পরেই কবি মঞ্চে আগমন করলেন। সে তো আগমন নয়— আবির্ভাব। কবির দীর্ঘ সুঠাম দেহ, ঝাঁকডা ঝাঁকডা চুল, বড বড মাযাময় চোখ। উজ্জ্বল গায়ের রং পরনে ঘি রংযের পাঞ্জাবী। তাঁকে দেখেই মনে হযেছিল তিনি যেন স্ফূর্তি ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। তাঁর মধ্যে রযেছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ, যা মানুষকে মুগ্ধ না করে পারে না। বহু জনের মধ্যেও তিনি যেন আপন বৈশিষ্ট্যে একক অনন্য। কবি সেদিন আবৃত্তি করলেন তাঁর 'সব্যসাচী' কবিতা, 'ওরে ভয নাই আর দুলিয়া উঠিছে হিমালয চাপা প্রাচী'— ডান হাতটি লীলাযিত ভঙ্গিতে পরে তুলে তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন। তাঁর আঙুলগুলি অপরূপ সুন্দর। সারা ঘর গম্ গম্ করছে তাঁর ভরাট গলার আওয়াজ। মন্ত্রমুগ্ধেব মতো শুনে চলেছি, কখন আবৃত্তি শেষ হয়েছে জানি না— জোর হাততালির আওয়াজে চমক ভাঙল। 'আরও একটা, আরও একটা,' বলে সবাই চেঁচিযে উঠলো। কবি এবার হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন, শুরু হল গান— একটা শেষ হতেই 'আরও একটা' বলে অনুরোধ আসতে লাগল। আবার শুরু হল গান একটার পর একটা। সে সব গানের কথা মনে নেই, শুধু মনে আছে কি এক মোহাচ্ছন্ন মন নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন। খালাম্মা বললেন— 'নজরুলের গান শুনলে মরা মানুষও জীবন্ত হয়ে ওঠে। রক্তে যেন আগুন লাগিয়ে দেয়। এমন করে মানুষকে জাগিয়ে দিতে, এগিয়ে দিতে, উন্মাদ করে দিতে আর কেউ ত পারেনি এর আগে। রবীন্দ্রনাথের গান মিষ্টি, সে গানে আসে তন্দ্রালুতা এমন উদ্দীপনার ভাব জাগে না।' তখন অতশত বুঝতাম না,

পবে বুঝেছিলাম কথাগুলি কত সত্য। সেদিন কবিব প্রতি জেগেছিল অসীম শ্রদ্ধা। আব মোহময় এক আকর্ষণ। কলকাতায তখন সর্বত্রই সভা সমিতিতে, স্কুল-কলেজে, পথে ঘাটে নজরুল ইসলামেব গান। সিনেমা বেডিওতে তাব গান সে গান শুনে মানুষ চঞ্চল হযে উঠত, পাগল হযে উঠত। দূর্নিবাব আকর্ষণে ছুটি যেত গানেব জাযগায। বেকর্ড বাজলে আমবাও উৎকর্ণ হযে ছুটতাম ছাদে, কোথায কোন বাড়িতে গান বাজানো হচ্ছে দেখতে। ববীন্দ্রসঙ্গীতেব প্রচাব তখন এত বেশি ছিল না। নজরুল ইসলামেব গজল, ভাটিযালী, কীর্তন, ইসলামী সঙ্গীতেব মূর্চ্ছনায দেশেব আকাশ বাতাস মুখবিত। তাঁব সিনেমাব জন্য লেখা গানগুলিও এত জনপ্রিয ছিল যে, সাবাদিন লোকেব মুখে মুখে ফিবত। কবিব নিজেব গলায গান শুনেছি। আবৃত্তি শুনেছি বহুবাব। মন কেড়ে নেওযা সে সব গান। যত শুনেছি তত ভাল লেগেছে।

এব পব কযেকবাবই তাকে দেখেছি বিভিন্ন সভা সমিতিতে। মনে আছে, একবাব ওযাছেদ মোল্লা বিল্ডিং এব তিন তলাব বাবান্দায তাকে দেখেছিলাম এক ঘবোযা মজলিসে খুব কাছে থেকে। সেদিন তিনি গান গেযেছিলেন অনেক। গান গেযেছিলেন প্রচুব আব হেসেছিলেন অজস্র। অনেক কথাব মধ্যে তিনি সেদিন, বলেছিলেন, 'তোমবা আজকালকাব ছেলেবা তো হাসতেই জান না, ঠোঁট টিপে হাস, আমাদেব ছেলেবেলায, কি অদ্ভুত হাসতে পাবতাম। আমাদেব হাসিব চোটে ঘবেব ছাদ পর্যন্ত ফেটে যেত ' বলেই হা হা কবে হেসে উঠলেন। মনে হল সত্যি বুঝি ছাদ ভেঙে পড়বে। বাস্তবিকই কবিব মতো এত সবল প্রাণবন্ত তাজা হাসিব ফুলঝুবি ছড়িযে কথা বলতে, মজলিস জমাতে, আড্ডা দিতে আব কাউকে আমি দেখিনি। তাব সঙ্গে যাবা থাকত তাবাও যেন কবিব এই উচ্ছল প্রাণোচ্ছল ধাবায উজ্জীবিত হযে উঠত। নিজেদেব কাজকর্ম ভুলে ঘন্টাব পব ঘন্টা কাটিযে দিত কবিব সঙ্গে। এমনিই ছিল তাব তীব্র আকর্ষণ আব ব্যক্তিত্ব।

১৯৪০ সন থেকে আমি কলকাতা বেতাবে মহিলা মহল অনুষ্ঠানে প্রাযশঃ অংশগ্রহণ কবতাম। ঐ সময কযেকবাব কবিকে আবাব চাক্ষুষ দেখাব সৌভাগ্য হযেছিল আমাব। সামনে হাবমোনিযাম, তাব উপবে কাগজপত্র, চাযেব পেযালা। পবনে তাব গেরুযা পাঞ্জাবী, চাদব আব ঐ বংযেব টুপি মাথায। কবি কখনো লিখছেন, কখনো আনমনা হযে ভাবছেন, আবাব কখনো হাবমোনিযাম বাজিযে গান গাইছেন। মাঝে মাঝে আবও দু'একজনেব ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখেছি। পবে জেনেছিলাম, কবি বেতাব অফিসে বসে গান লিখে সুব সংযোজন কবে সঙ্গে সঙ্গে কোনো গাযক গাযিকাকে সে সব গান শিখিযে দিতেন।

কবিকে আবাবও দেখেছিলাম ভবানীপুবে আমাব ননদ শামসুন নাহাব মাহমুদেব বাড়িতে ঈদ প্রীতি সম্মেলনী উৎসবে। তাব বাড়িব সামনেব লনে ব্যবস্থা হযেছিল। অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্পী এসেছিলেন। এসেছিলেন শহীদ সোহবাওযার্দী সাহেব। ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরুও ছিলেন সেদিন। কবি তাকে বললেন গান গাইতে, তিনি বললেন কবিকে গান শোনাতে। অনেক গান হল, অজস্র হাসি গল্প, কথাব শেষে বাত বাবোটায সভা ভঙ্গ হযেছিল সেদিন। কবি অনর্গল কত মজাব কথা বলেছিলেন শ্রোতাবা হেসে আকুল হযেছিল।

কবিকে শেষবাবেব মতো সুস্থ অবস্থায দেখেছিলাম বঙ্গীয মুসলমান সাহিত্য সমিতিব বজত জুবিলিব অধিবেশনে। কবি এখানে সভাপতি রূপে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাব আবেগময় সুব যেন এখনো কানে লেগে বয়েছে। তিনি তখন তাব 'প্রিয ঘন সুন্দব, বস-ঘন সুন্দব, আনন্দ ঘন সুন্দব, প্রেম-ঘন-সুন্দবেব' স্বপ্নে মগ্ন। মনে হয় সেইটিই তাব শেষ অভিভাষণ। তাঁব কিছুদিন পব শুনেছিলাম কবিব স্বাস্থ্যেব অবনতি হযেছে। এব পব আস্তে আস্তে তাঁব কথাবার্তা স্তিমিত হযে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি একেবাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবিকে কতবাব এত কাছে থেকে দেখেছি, তাঁব গান শুনেছি, কথা শুনেছি, হাসি শুনেছি, কিন্তু কখনো তাঁব সঙ্গে কথা বলিনি বা তাঁব অটোগ্রাফ নেইনি।

একথা মনে করে পরে অনেক বেদনাবোধ করেছি। তাকে দেখে শুধু বিস্ময় আর সম্ভ্রমই জেগেছে মনে।

আমার স্বামী মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার নজরুল ইসলামের ভয়ানক অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনে কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব খুব বেশি। ১৯২৬ সনে প্রধানত তাঁর উদ্যোগে কবি চট্টগ্রামে আসেন এবং মাসখানেক তাঁদের বাড়িতে অবস্থান করেন। ঐ সময় শুধু আমার স্বামী নয়, চট্টগ্রামের সকল তরুণ ছাত্র ছাত্রী, সাহিত্যিক, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের লোক নজরুল ইসলামের গানে, কবিতায়, আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে যায়। তিনি যেন সারা শহরটাকে মাতিয়ে রেখেছিলেন তখন। সারাদিন তিনি সকলের সঙ্গে সভা সমিতি, গানবাজনা, সমুদ্র দর্শন, ভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকতেন। মৌমাছির মতো সবাই তাঁকে ঘিরে থাকত। রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে কবিতা লিখতেন আপন মনে। এইখানেই তাঁর বিখ্যাত "সিন্ধু হিন্দোল" এর কবিতাগুলির জন্ম। আমাদের চট্টগ্রামের বাড়ির সুপারিশাখার আন্দোলনই কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' – এই বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করতে। পরবর্তীকালে আমার স্বামীর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। "সিন্ধু হিন্দোল" বইটি কবি তাদের দুই ভাইবোনের নামে উৎসর্গ করেন। তখন এমন কোনো মুসলিম বা হিন্দু তরুণ ছিল না যে, কাজী নজরুল ইসলামের বিস্ময়কর প্রতিভা, অপূর্ব প্রাণচঞ্চল ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হত না।

দেশ ভাগের পর আমরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসি। ১৯৫৬ সনে কলকাতায় যাওয়ার পর কবিকে দেখতে গিয়েছিলাম, তাঁর মানিকতলার বাড়িতে। কবির স্ত্রী তখন শয্যাগতা, কিন্তু শুয়ে শুয়েই তিনি সংসার পরিচালনা করেন। নির্দেশ দেন কবির খাওয়াদাওয়া, শুশ্রূষার। তাঁর সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। সেখানে কবির কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী আবদুস সালাম ছিল। কবি চুপচাপ বসেছিলেন। কোনোদিকে খেয়াল নেই, আপন মনে সমাহিত হয়ে আছেন। এর পর ১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে আমরা সপরিবারে আজমীর শরীফ গিয়েছিলাম কলকাতা পৌঁছে আমার স্বামী কবিকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি নিজেও তখন অসুস্থ। কয়েক বছর আগে ব্লাডপ্রেশারে ও স্ট্রোক হয়ে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন, চাঞ্চল্য ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সব কথা বলতে পারতেন এবং সব কিছু বুঝতে পারতেন। তাঁর আগ্রহে কাজী সব্যসাচী আমাদের নিয়ে গেলেন কবিসন্দর্শনে। কবিকে দেখলাম সিল্কের পাঞ্জাবী ও পাজামা পরনে, বিছানায় বসে অনবরত কাগজ ছিঁড়ছেন আর বালিশের নিচে সেগুলো রেখে দিচ্ছেন। আমাদের দেখেই তিনি উঠে এসে বসবার ঘরে সোফায় বসলেন, আমার স্বামী তাঁর পাশে বসলেন। 'কাজীদা, কাজীদা কেমন আছেন ? কাজীদা আমাকে চিনতে পারছেন না ?' বলে অনেকবার তিনি ডাকাডাকি করলেন। কবি কথা বললেন না– ক্রমাগত একটি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাতে লাগলেন। একটু পরেই কবি উঠে তাঁর ঘরে বিছানায় বসলেন। বিছানার উপর কবির স্ত্রীর একটি বাঁধানো ফটো ছিল। কিছুদিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ফটোটি সামনে রেখে কবি কাগজ ছিঁড়তে লাগলেন। আমার স্বামী আবার গিয়ে ডাকলেন, 'কাজীদা--- কাজীদা, কথা বলছেন না কেন ? আমাকে চিনতে পারছেন না, কাজীদা ? আমি বাহার, কথা বলুন, কাজীদা, কথা বলুন,' কান্নায় উদ্বেলিত হয়ে তিনি কবির ডান হাতটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। কবি এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দিকে তাকালেন- - মনে হল পূর্ব স্মৃতি বুঝিবা তাঁর চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই কবি হাত টেনে নিয়ে আবার কাগজ ছিঁড়তে শুরু করলেন। ভারাক্রান্ত মনে সবাই ফিরে এলাম।

এই যে আমাদের কবি, যিনি তারুণ্যের প্রতীক, অফুরন্ত প্রাণশক্তির নির্ঝর, অন্যায় অত্যাচারে যিনি কষাঘাত হেনেছেন বারেবার, দেশের দুঃখ-পীড়িত জনগণের দুঃখে যাঁর অন্তর হাহাকার করে উঠত, যৌবন জলতরঙ্গের দুর্বার স্রোতে যিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সারা দেশকে, ঘুমন্ত জাতির প্রাণে

সঞ্চারিত করেছিলেন দেশপ্রেমের উদ্দীপনা -- তাঁর সারা জীবনই কেটেছে কষ্টে। তাই তাঁর দুখু নাম সার্থক। কবির অজস্র লেখা ছাপিয়ে প্রকাশকরা ফুলে ফেঁপে উঠেছেন— সরল, আত্মভোলা কবিকে করেছেন বঞ্চিত, তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে। শিশু-পুত্রের অকালমৃত্যুতে কবি প্রায় পাগল হযে যান। দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে কবির স্ত্রী পঙ্গু হয়ে গেলে কবির যে কি কাতরতা, যন্ত্রণা— যারা দেখেছেন তারা জানেন।

প্রায় তিন যুগ অসুস্থ হযে নির্বাক অবস্থায় আমাদের মধ্যে ছিলেন তিনি। মনটি ছিল তাঁর শিশুর মতো সরল। ফুলের মতো কোমল। কাউকে তিনি ব্যথা দিতে পারতেন না, কেউ ব্যথা দিলে তা ফিরিয়ে দিতেও তিনি পারতেন না। তাই বুঝি অভিমানে এতদিন তিনি নির্বাক, স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। এই মৃতকল্প মানুষটি তবু যেন আমাদের দুর্ভাগ্য জাতির কাছে, দেশের কাছে এক বিরাট আদর্শ, অপূর্ব দেশপ্রেম আর বীর্যের মহীয়ান প্রতীকরূপে বিরাজ করছিলেন এতদিন। তাঁকে বাদ দিলে আমাদের কি থাকে ? জীবনের কোন অবস্থায, জাতির কোন প্রযোজনে না আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

শেষ পর্যন্ত কালের অমোঘ গতিতে তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন— ছেড়ে গেলেন তাঁর অতি প্রিয় দেশবাসীকে, যাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন আজীবন— নিঃশেষে দান করেছেন নিজেকে।

পল্টনে নজরুল ও নজরুল-সাহিত্যে পল্টন

আ ব দু স সা মা দ

[এক]

নজরুল-জীবনের সর্বাধিক অন্ধকারাবৃত প্রদেশ তাঁর হতদরিদ্র হারিয়ে যাওয়া শৈশব; প্রায় অনুরূপ অনালোকিত দ্বিতীয় কোনো অঞ্চলের কথা ভাবতে গেলেই তাঁর পল্টন জীবনের কথা এসে পড়ে, যা হারিয়ে না গেলেও দৃশ্যপটের অন্তরালে পাষাণী অহল্যার মতো উদ্ধারলাভের অপেক্ষায় প্রহর গণনা করছে। প্রয়াত কবিব কালব্যাধিতে আক্রান্ত ও বীতবাক হওযার পরে আজ প্রায় চার দশক আক্রান্ত। কিন্তু এ যাবৎকালের নজরুল-গবেষণা যতোখানি আবেগাকুল তদনুরূপ পরিশ্রমী না হওয়ায় নিজের সৃষ্টির চেযেও মহত্তর স্রষ্টার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায আজও লোকলোচনেব অন্তরালবর্তী রযে গেল। যুদ্ধফেরত নজরুল প্রথম যৌবনে তাঁর সৈনিক জীবনের জন্য যথেষ্ট গর্ববোধ করতেন এবং নামের আগে সৈনিক বিশেষণের প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক দুর্বলতা ছিল। পরিতাপের বিষয়, তাঁর সেই সৈনিক জীবনের সামগ্রিক ইতিবৃত্ত আজও লেখা হল না।

নিজের পল্টনজীবন সম্পর্কে নজরুলের কৃপণ স্মৃতিচারণা আমাদের হাতে সামান্য যে একটুকরো তথ্য তুলে দিয়েছে তা এইমাত্রঃ

"আমি তখন স্কুল পালিযে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলভী থাকতেন। একদিন তিনি দিওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।"

লক্ষ্য করার বিষয়, বাঙালী পল্টনে নজরুল তাঁর যোগদানের সাল নির্দেশ করেছেন ১৯১৭। নজরুল প্রতিভার প্রথম ধাত্রী, লালনকারী, দিকনির্দেশক ও পরামর্শদাতা বন্ধু প্রয়াত মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবও তাঁর নজরুল-স্মৃতিচারণায় ১৯১৭ সালের কথা বলেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুজনের কেউই মাস বা তারিখের হদিশ দেননি। সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে নজরুলের অন্যতম প্রিয় ও প্রভাবশালী শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের উক্তি আরও অস্পষ্ট। তিনি একবার বলেছিলেন:

"আমি যে বছর গিরিফ্তার হই সে বছর নজরুল সিয়ারসোল রাজ স্কুলের ফার্স্ট বয় ছিল। ও যে আবার যুদ্ধে গেল তা আমি জানি না।"

নিবারণবাবু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দায়ে কোন্ বছর কতো তারিখে গ্রেপ্তার হন, উত্তরকালে সেটা তাঁর স্মরণ ছিল না। কিন্তু এ থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে, তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার একই বছরে নজরুল পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন। পরে আমরা নিবারণবাবু গ্রেপ্তারীর সুনির্দিষ্ট সময় নির্দেশ করব।

বঙ্গবাহিনীতে নজরুলের ভর্তি হওয়ার তারিখটি অদ্যাবধি অনাবিস্কৃত থাকায় অনুমানবিলাসীরা তারিখটি যদৃচ্ছা আগিয়ে-পিছিয়ে মনঃকল্পিত একটি সিদ্ধান্ত খাড়া করবার চেষ্টা করছেন। এই জাতীয় স্বকপোলকল্পিত গবেষণা বিলাসের নিরসনকল্পে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণসহযোগে আমরা পল্টন জীবনে নজরুলের যোগদানের খুব কাছাকাছি একটা সময় নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি এবং দেখিয়েছি যে, সময়টা ১৯১৭ সালের মধ্য এপ্রিলের আগে হতেই পারে না।

এখানে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রামাণ্যতর তথ্যের সহায়তায় আমরা অধিকতর নিকটবর্তী একটি সময় নির্দেশ করতে চেষ্টা করব।

সম্প্রতি সিয়ারসোল স্কুলের বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির (Managing Committee) কার্যবিবরণীর একটি বহু পুরাতন জীর্ণ খাতা খুঁজে পাওয়া গেছে। ১৯০৯ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির যে সমস্ত মীটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার সবগুলির কার্যবিবরণী খাতাটিতে নথিভুক্ত আছে। নব্যাবিস্কৃত ঐ খাতাটি থেকে ঐ সময়সীমার (১৯০৯-২৭) বিদ্যালযের তৎকালীন শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে ১৯১৭ সালের ২মে তারিখের মীটিংযের কার্যবিবরণী ও রেললিউশনসমূহ এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ একমাত্র এখানেই আমরা নজরুলের দেখা পাচ্ছি। উক্ত সভাটি ছিল মূলত ছাত্রদের ষ্টাইপেন্ড ও স্কলারশিপ সংক্রান্ত। ঐ সভার চার নম্বর রেজলিউশন প্রমাণ করছে, ১৯১৭ সালের ২মে পর্যন্ত স্কুলের খাতায় নজরুলের নাম ছিল। ঐ সালে তিনি তৎকালীন ফার্স্ট ক্লাস বা এখনকার দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। এবং ১৯১৮ সালে তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার কথা। চার নম্বর রেজলিউশনটুকু এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি।

"Kazi Nazrul Islam of the same class be given Rs. 5(five) a month from the time it has been discontinued up to the Matriculation Examination, 1918"

মীটিংয়ের কার্যবিবরণীর প্রথমেই যথারীতি স্পষ্টভাবে স্থানকালের উল্লেখ আছে:

"Proceedings of a meeting of the managing committee of the Searsole Raj H.E. School, held on Wednesday the 2nd May, 1917 at 5-30 P.M. at the new Rajbati. Searsole".

ঐ দিনের মীটিংয়ের উপস্থিত ছিলেন বাবু কালীকুমার মিশ্র, সম্পাদক (সভাপতি), বাবু যজ্ঞেশ্বর মিত্র, বি. এ. সৈয়দ হাকিম মহম্মদ ওসমান গণি, ডাক্তার শিখরেশচন্দ্র গুপ্ত, পণ্ডিত দ্বারকেশ তর্কভূষণ, বাবু নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বি.এ., হেডমাস্টার ও বাবু সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, এ্যাডিসনাল মাস্টার।

নজরুলের জীবনী পাঠকগণ সকলেই শেষোক্ত দুই ছাত্র-বৎসল শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের নামের সঙ্গে সুপরিচিত।

আলোচ্য কার্যবিবরণীর নজরুল প্রসঙ্গটুকু নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে যা সর্বাধিক জরুরি তা হল নজরুল পল্টনে ভর্তি হয়েছেন ১৯১৭ সালের ২মে তারিখের পরে, তার আগে নয়। কিন্তু কতো পরেই এ থেকে নিশ্চিতভাবে তা বলার উপায় নেই। তবে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, ১৯১৭ সালের মে থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে তিনি সৈনিকজীবনে প্রবেশ করেছিলেন।

জনাব এমদাদুল হক নূরের একটি পত্রে [দ্রঃ দেশ, ২৪ জুলাই, '৮২ 'চিঠিপত্র' বিভাগ] জানা গেছে, নজরুল ১৯১৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখে রাণীগঞ্জ মুসলিম হস্টেল থেকে তাঁর অন্যতম শিক্ষক মৌলভী আবদুল গফফর সাহেবকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যার ফটোকপি এর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। এতে রাণীগঞ্জে নজরুলের অবস্থান সন্দেহাতীতভাবে আরও ২ মাস ২১ দিন এগিয়ে গেল এবং নিশ্চিতভাবে জানা গেল উক্ত পত্রলেখার তারিখ (২৩ জুলাই, ১৯১৭) পর্যন্ত নজরুল শিয়ালসোল রাজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পল্টনে যোগ দিয়েছেন ১৯১৭ সালের ২৩ জুলাইয়ের পরে।

ফলশ্রুতি এই যে নজরুল প্রি-টেস্ট, মতান্তরে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে গেলে তাঁর পল্টন জীবনে প্রবেশের সময় ১৯১৭ সালের জুলাই অগাস্ট, টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে গেলে নভেম্বর-ডিসেম্বর। ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের মূল নথিপত্রের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত কিছু বলা অসম্ভব।

আগেই বলেছি, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দায়ে নিবারণ ঘটক কোন্ বছরে গ্রেপ্তার হন, উত্তরকালে তাঁর স্মরণে ছিল না। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির কার্যবিবরণীর খাতাটি থেকে তারও সুনির্দিষ্ট সময় জানা যাচ্ছে। সময়টা হচ্ছে ১৯১৭ সালের জানুয়ারী। ১৯১৭ সালের ২০ জানুয়ারী তারিখের মীটিংয়ে নিবারণবাবুকে কর্মচ্যুত করা হয়। কার্যবিবরণীর প্রথমেই লেখা হয়:

"....that the 5th master Babu Nibaran Chandra Ghatak has been arrested on suspicion on some political crime. Resolved that he be summarily dismissed (carried unanimously)....."

এদিক থেকেও পল্টনে নজরুলের যোগদানের বছর (১৯১৭) সমর্থিত হচ্ছে। তবে নিবারণবাবুর বক্তব্যের অপরাংশ,— নজরুল সে বছব ফার্স্ট বয় ছিলেন, ঠিক নয়। ফার্স্ট বয় ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র মুখার্জী, সৌভাগ্যক্রমে ইনি কিছুকাল আগেও বর্ধমান শহরে বসবাস করতেন।

[দুই]

এখন প্রশ্ন নজরুল কেন স্বেচ্ছায় কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল পল্টন জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। বিশেষত স্কলারশিপের টাকার তাঁর পড়াশুনার রাস্তা যখন মোটামুটি মসৃণ এবং মাত্র কয়েক মাস পরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশের পর কিছুটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা, ঠিক সেই সময়েই সব ছেড়েছুড়ে হঠাৎ পল্টন-জীবন বরণের কী কারণ থাকতে পারে। সম্ভাব্য সমস্ত কারণগুলি খতিয়ে দেখা দরকার।

নজরুলের ব্যক্তিস্বভাব (এবং কাব্যস্বভাবেও) দেখা যায় একটি দুর্বার আবেগপূর্ণ প্রাণশক্তির বল্গাহীন বহিঃপ্রকাশ। বয়ঃসন্ধির এই আবেগ ও এ্যাডভেঞ্চারপ্রবণতা পরিণত বয়সেও তাঁকে পরিত্যাগ করেনি— নির্বাচনে দাঁড়াবার মতো অবিমৃষ্যকারিতায় প্রণোদিত করেছিল। সুতরাং অবন্ধন জীবনাকৃতি তথা এ্যাড্‌ভেঞ্চারের আকর্ষণ তাঁকে সৈনিকজীবনের পথে নিয়ে গেলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

আবার নিছক দারিদ্র্যও এর কারণ হতে পারে। কারণ পল্টনে তখন সিপাইদের মাস মাহিনা ছিল এগারো টাকা। তদুপরি মহার্ঘভাতা সাড়ে তিন টাকা। প্রথম দিকে অবশ্য বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীর সিপাইদের ঐ টাকার মধ্যে খাওয়া খরচ চালাতে হত। কিন্তু নজরুল যখন বঙ্গবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন (১৯১৭-র শেষে), তখন সিপাহীদের থাকা-খাওয়া ছিল ফ্রী অর্থাৎ সরকারী খরচে। যুদ্ধের বাজারে থাকা খাওয়ার খরচা বাদে মাসিক সাড়ে চৌদ্দ টাকা কম টাকা নয়। কেউ কেউ নিছক এই বেতনের আকর্ষণেই পল্টনে নাম লিখিয়েছিলেন। যেমন যশোরের দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান বেলাত আলি। বেলাত আলি ডঃ এস. কে. মল্লিকের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকার করেন যে, দুঃসহ দারিদ্র্যের কশাঘাত সইতে না পেরে, তাঁর পরিবারকে কিছুটা আর্থিক সহায়তাদানের উদ্দেশ্যেই তিনি পল্টনে যোগ দিয়েছেন। এতে দেশপ্রেম বা শিভাল্‌রির কোনো ব্যাপার নেই।

টাকাপয়সার দিকটা পল্টনে উদ্যোক্তারাও ভেবেছিলেন এবং চেয়েছিলেন। "... to attract men who will join the army after hard calculation not only of sentimental but material value to themselves and their family" [দ্রঃ Bengalee, 2nd January, 1917, p. 4]

প্রসঙ্গত বলা যায়, পরবর্তী কালে বাঙালী পল্টনের সৈনিকরা প্রতি মাসে প্রায় তিরিশ টাকার উপর পেতেন। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক গভর্ণরের কাছে যে রিপোর্ট পাঠান তাতে লেখেন "Taking the army pay and allowance and adding Rs. 10 given by our committee in necessitous cases the amount that a soldier gets in cash and kind is over Rs. 30 per month

which ought to be sufficient from a financial point of view for many a struggling young man in civil life." [দ্রঃ Bengalee, 7th April, 1918. P. 4] ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারী সংখ্যা 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় 'Belat Ali's case' শিরোনামে তাঁর স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি :

"... a recruit named Belat Ali was sent to me and was duly enrolled. I asked him about his family affairs and he gave me the following facts : his household consists of eight male members. They have some land which after paying the Zemindars and other claims leaves them about Rs. 30 p.a. They have some 'Khamar land' or 'Neejjihot' which gives them their food. After paying for all clothing and household expenses they saved probably about Rs. 3 per head per year. One being asked whether under the circumstances annual contribution of Rs 60 to Rs. 70 from his army pay would not be of assistance to the family he said the idea never occured to them at home and he would do his best to get other members of his household to join" (The Bengalee : 2nd January 1917. p. 4)

নজরুলের আর্থিক অবস্থা, বলা বাহুল্য, বেলাত আলির চেয়ে কোনো অংশেই ভালো ছিল না। পাচ টাকার স্টাইপেণ্ড নির্ভর জীবনযন্ত্রণা থেকে স্বাধীন উপার্জনের সুযোগ ও দারিদ্র্যমুক্তির আশা নজরুলকে পল্টনজীবনে আকৃষ্ট করে থাকলেও থাকতে পারে।

ব্যর্থ প্রেমও এর একটা হেতু হওয়া অসম্ভব নয়। রাণীগঞ্জ শহরের জনৈক পুলিশ অফিসারের কিশোরী কন্যা স্বর্ণলতা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেম প্রার্থনা করে কবি ব্যর্থ হয়েছিলেন। 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থখানি এই কিশোরীকেই উৎসর্গ করে কবি লিখেছিলেন : "মানসী আমার মাথার কাঁটা চেয়েছিলাম, দাওনি বলে বুকের কাঁটা দিয়ে তাই প্রায়শ্চিত্ত করলুম।" ব্যর্থ ভালোবাসার জ্বালা ভুলবার জন্য, মনস্তত্ত্বে যাকে 'Sublimation' বলে, যুদ্ধে যোগদান অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ বিষয়ে শেখ আজিবুল হকের আলোচনা দ্রষ্টব্য। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা ভোলার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যোগদানের অন্তত আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। ছেলেটির নাম অরুণ। ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের এই যুবকটি বান্দ্রা জাহাজে মেসোপটেমিয়া যাওয়ার সময় কেবিনে শুয়ে তার প্রেমিকার জন্য কেঁদে বুক বাসিয়েছিল। ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী সুবেদার মন বাহাদুর সিংহ্ সেই দৃশ্যটি বর্ণনার পর লিখছেন : "একখানা কাগজে তার মানসীর নাম লিখে তার বুকের উপর রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম।"

কিন্তু এহো বাহ্য। পল্টনে নজরুলের যোগদানের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য কারণ সম্ভবত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার দরুণ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়। ১৯১৭ সালের ২ মে তারিখের পূর্বালোচিত ৪ নং রেজলিউশনে দেখছি, নজরুলের স্কলারশিপের টাকা কয়েক মাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ মনে হয় একই— গোপনে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগসাজস। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে নিবারণ ঘটক ধরা পড়ে যাওয়ার পর তাঁর প্রভাবাধীন ও মন্ত্রশিষ্য নজরুল অত্যন্ত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করেছিলেন। উত্তরকালে নজরুল মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের কাছে স্বীকারও করেছিলেন যে, তিনি নিবারণবাবুর রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নজরুলের ভাবাবেগপ্রবণ মানসপ্রকৃতি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল ছিল। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, নিবারণবাবু ডিসমিস্ হওয়ার পর অন্য কোনো শিক্ষক বা ছাত্র বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত আছেন কি না, তা খুঁজে বের করার জন্য সিয়ারশোল রাজ স্কুল কর্তৃপক্ষ গোপনে তদন্ত করেছিলেন। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির পূর্বোক্ত কার্যবিবরণীর খাতায় ১৯১৭ সালের

১ ফেব্রুয়ারী তারিখের মীটিংযে এই তদন্তের কথা আছে। বলা হয়েছে,

It is a matter of deep regret and abhorence that Babu Nibaran Chandra Ghatak, against whom a serious charge is now pending should have at all belonged to the teaching staff of this school. It is therefore, resolved that a sub-committee of the Headmaster, Pandit Dwarkesh Tarkabhusan and Munshi Mubarak Ali be formed to watch loosely the morals and conduct not only of those newly appointed but all those who are already on the teaching staff of this school as well as of the pupils The enquiry which should have a pace bearing upon the part. if any, taken by any of the teaching staff or the pupils in matters political, will have to be made carefully and efficiently.. ."

এই সময় থেকেই নজরুল সম্ভবত দূরে কোথাও আত্মগোপন করার সুযোগ সন্ধান করেছিলেন। বঙ্গবাহিনী তার কাছে সেই সুযোগ এনে দেয় এবং তিনি সুদূর করাচী সেনানিবাসে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

এটা নিছক অনুমানের ব্যাপার নয়। বাস্তবিক আইনের চোখে অপরাধী কেউ কেউ নিছক গা-ঢাকা দেবার জন্যই পল্টনে নাম লিখিয়ে দেশত্যাগ করেছিল। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত শচীন দাস। শচীন অপরাধী সাব্যস্ত হওযার পর জেলে যাওয়ার ভয়ে পল্টনে যোগ দিয়ে নৌশেরা পালিযেছিল। পরে সরকার তাকে কযেদী হিসাবে বাংলাদেশে ধরে আনে। [দ্রঃ ভারতী, আষাঢ, ১৩২৪, পৃঃ ২৯৩]

করাচী ক্যান্টনমেন্টে নজরুলের সৈনিক জীবন কেমনভাবে অতিবাহিত হত, সে বিষয়ে কৌতূহল জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ বিষয়ের নজরুল বিশেষ কিছু লিখে না গেলেও তাঁর সহযোদ্ধা অন্যান্য কোনো কোনো সৈনিকের বিবৃতি থেকে তার কিছু আভাস মেলে।

বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসৈনিক পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রথমে কিছুদিন নৌশেরা (পেশোযারের ২৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত) ক্যান্টনমেন্টে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করে কাটাতে হত। প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা রপ্ত হলে তাদের নিয়ে যাওয়া হত করাচী সেনানিবাসে। নজরুল নৌশেরায় কতোদিন ছিলেন অথবা সরাসরি করাচী গমন করেছিলেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় নেই। সে যাই হোক্, বাঙালী যুবকদের পল্টন জীবন মোটেই কঠোর বা নিরানন্দ ছিল না। এখনকার কলেজ-ছাত্রেরা এন.সি.সি. ক্যাম্পে গিয়ে যে ধরনের আনন্দ কোলাহলময় জীবন যাপন করে, বাঙালী পল্টনের সৈনিকদের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল অনেকটা সেই রকম। ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের অন্যতম সৈনিক সুবেদার মন বাহাদুর সিংহ সিপাই হিসাবে নৌশেরায পৌঁছাবার পর তাঁর অভিজ্ঞতার যে সরস বর্ণনা দিয়েছেন, কিঞ্চিত বিস্তারিতভাবে তা উপস্থাপিত করছি:

"স্টেশন থেকে মার্চ করে যখন চিত্রল লাইনে এসে পড়লাম, তখন আমাদের আগে যে সব রংরুট (রিক্রুট) এসেছিল তারা হৈ হৈ করে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই লেডিজ কমিটির দেওয়া থলেগুলি হস্তগত করলে।..... আমাদের পৌঁছবার পর থেকেই তারা আমাদের সাহায্যে লেগে গেল। শুনলাম ৪৬ নং পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের সঙ্গে শিক্ষালাভের জন্যে আমাদের যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যা হোক্, চা এবং হালুয়া সে সময়ের মত হল আমাদের প্রধান আকর্ষণ – যুদ্ধশিক্ষা যার সঙ্গে ইচ্ছা হোক আপত্তি নেই। জলযোগ শেষ করে শোবার ব্যবস্থাটা দেখা গেল। প্রত্যেকের জন্য একটি করে খাটিয়া। রান্নাঘর ব্যারাকের কাছেই। পাতকুয়ো প্রায় দু'তিন শ' গজ দূরে। শৌচাগার আরও দূরে। রাত্রে মাংস, রুটি ও দই যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করে খাটিযায চিৎপটাং হওয়া গেল। তখন ওখানে ভীষণ শীত। নিবারক কম্বল ইত্যাদির ব্যবস্থা ভালই ছিল। খুব হল্লা করেছিলাম। কিন্তু যখন লাস্ট পোস্টের বিউগল বেজে উঠল তখন সবাই নীরবে নিদ্রাদেবীর উদ্দেশে সাধনা আরম্ভ করলাম। ...সমাজ সংসার সমস্ত যেন আমাদের মন থেকে দূরে রয়ে গেছে। আমাদের মিলটারী আইন ছাড়া

কোথাও কোন বন্ধন নেই। কাজেই যার যা খুশী করছি, প্রাণ খুলে চেঁচাচ্ছি, গান করছি, এক এক প্লেটে দু তিনজন করে খেতে বসছি, হল্লা করছি, আর একজনের প্লেট থেকে কেড়ে খাচ্ছি, কাউকে খাইয়ে দিচ্ছি— আমরা সবাই মিলে যেন একটা নতুন সমাজ সেখানে গড়ে তুলেছি।..."

বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীর দ্বিতীয় ব্যাচের রিক্রুট মন বাহাদুরের এই বিবৃতি বাঙালী সৈনিকদের সামরিক জীবনের একটি সুস্পষ্ট আলেখ্য।

নৌশেরা থেকে প্রেরিত কোনো কোনো সৈনিকের চিঠিপত্র থেকেও বাঙালী যুবকদের পল্টন জীবনের সংবাদ পাই। ১৯১৬ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীর একজন সৈনিক বিমলেন্দু ব্যানার্জী একটি চিঠিতে তাঁর বন্ধুকে জানাচ্ছেন :

"Once in the morning at 7 A.M. we get out of our room and remain engaged for two hours. At 4 P M we again fall in and we are taught drill for a hours. So in all we are engaged for 4 hours in the drill. Our teachers are Sikh Subedars who like me and love me well. The Commandar, an Englishman is a very good gentleman "

দেখা যাচ্ছে, সেই সময (নভেম্বর, ১৯১৬) বাঙালী সৈনিকদের সকাল সাতটায় দু ঘণ্টা এবং বিকেল চারটেয পুনরায দু ঘণ্টা— দিনে মোট চার ঘণ্টা মাত্র ড্রিল শিক্ষা করতে হত। ড্রিল-শিক্ষক ছিলেন একজন শিখ সুবেদার ; কম্যাণ্ডার ছিলেন একজন ইংরেজ। ডিল শিক্ষক ও কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে বাঙালী তরুণেরা যে সস্নেহ ব্যবহার লাভ করতেন, বিমলেন্দুর পত্রে তা স্পষ্টাক্ষরে ধরা পড়েছে।

নৌশেরা ক্যান্টনমেন্টে বাঙালী যুবকেরা কীভাবে দিনযাপন করতেন, তার অধিকতর বিস্তারিত ও অনুপুঙ্খ বিবরণ পাই ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের স্বনামধন্য সৈনিক কুমার অধিক্রম মজুমদারের পিতা রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম. এ., বি. এল. মহাশয়ের একটি পত্রে। বেঙ্গলী দৈনিকে ১৯১৬ সালের ১০ অক্টোবর তারিখ প্রকাশিত এর পত্রটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

"I have just received a letter from my son Kumar Adhikram Mazumdar. B.L., one of the soldiers of the Bengali Double Company from Nowshera and the parents and relations of those that had joined the company will be glad to learn that they are all doing well They are just being drilled whithout arms and will soon be given arms. The commanding officer of the regiment col. Moekler is very kind and considerate to the young soldiers and he gives his personal attention to everyone of them. Kumar Adhikram also speaks highly of the captain and the Indian jamadar of the Bengali Double Company. The members of the Bengali Double company are feeling themselves at home at Nowshera. They were guests of Rai Bahadur Hazarimul for some days. They won's miss puja festivities at Nowshera. Dr. C. C. Ghosh of Peswar has invited them during the pujas. The whole of the Punjab has received the Bengalee soldiers with open arms. Let us maintain the tradition of the soldiers of His Majesty, our beloved Emperor. They are in the want of Newspapers and they will very much like to have Newspapers both in English and in Bengali. If any editor kindly sends any, it may be sent to Kumar Adhikram Mazumdar, B.L., Bengalee Double Company. Nowshera cantonment, Nowshera, Punjab."

নৌশেরায় এবং পরে করাচী সেনানিবাসে বাঙালী পল্টনের স্বেচ্ছাসৈনিকদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি যে

যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ছিল, উদ্ধৃত বিবৃতিটি থেকে তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই সব বিবৃতি নজরুল পল্টনে যোগ দেওয়ার অনেক আগে, পল্টন গঠনের আদি পর্বের ব্যাপার, ফলে এ সব ক্ষেত্রে নজরুলের নামোল্লেখ আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু নজরুলের পল্টন জীবনের চেহারাটা যে এই সব চিঠিপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। উপরোদ্ধৃত পত্রটি থেকে জানা যাচ্ছে, বাঙালী সৈনিকেরা শারদীয় দুর্গাপূজাতেও অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন।

ভদ্রলোক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী সন্তানেরা পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন, এই কারণে শিখ ট্রেনার থেকে শুরু করে ইংরেজ ক্যাপ্টেন পর্যন্ত সামরিক অফিসাররা বাঙালী সৈনিকদের একটু বিশেষ স্নেহ-সমীহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। নৌশেরা এবং করাচী ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাঠানো বাঙালী তরুণদের সমস্ত চিঠিপত্রে তার পরিচয় মিলেছে। মোট কথা, যথেচ্ছ স্বাধীনতা না থাকলেও সামরিক জীবনের কঠোরতা ও দুশ্ছেদ্য নিয়মবদ্ধতা বাঙালী সেনাদের সহ্য করতে হয়নি। যদি হত, তাহলে করাচী ক্যান্টনমেন্টের সৈনিক জীবনে নজরুলের পক্ষে পাঞ্জাবী মৌলভীর কাছ ফার্সি ভাষার পাঠ নেওয়া ও কাব্যচর্চায় মশগুল হয়ে থাকা কখনোই সম্ভব হত না।

ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনের দু একজন ছাড়া অন্য কারও চিঠিপত্রে বা সৈনিকজীবন সংক্রান্ত রচনায় নজরুলের কোনো রকম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না এবং ব্যাপারটা কিছুটা বিস্ময়কর বলে মনে হয়। ১৩২৪ সালের (১৯১৭ খ্রীঃ) আষাঢ় সংখ্যা ভারতী পত্রিকায় হাবিলদার ধীরেন্দ্রকুমার সেনের লেখা সুদীর্ঘ একটি কৌতুক কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম 'বাঙালী সেপাইয়ের রোজনামচা।"

"খেলোয়াড় বিশ্বেশ্বর বিবস গলাব স্বব
জন্ম তার নিজ বর্দ্ধমানে
ছাড়ি নবাবের খানা সীতাভোগ মিহিদানা
ধন্য ধন্য, এসেছে এখানে।"

অর্থাৎ তখনো পর্যন্ত নজরুল পল্টনে যোগ দেননি, দিলে কবিতাটিতে নিশ্চযই তাঁরও উল্লেখ থাকত।

করাচী সেনানিবাসে নজরুলকে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন কিছুকাল আগেও জীবিত ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত যাত্রাভিনেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বেনারস থেকে ১৯১৮ সালে ইনি ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনে যোগ দেন এবং ইনিই সম্ভবতঃ ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের শেষ জীবিত সৈনিক। শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শুনেছি, নজরুলকে তাঁরা 'হৈ হৈ কাজী' বলে সম্ভাষণ করতেন। কারণ প্রাণচঞ্চল নজরুল সব সময় আনন্দোল্লাসে টৈটম্বুর হয়ে থাকতেন এবং গোটা সেনানিবাসকে মাতিয়ে রাখতেন। সর্বদা হৈ হৈ করে বেড়াতেন বলেই তিনি 'হৈ হৈ কাজী' বলে সম্ভাষিত হতেন। আপন প্রাণের বেগে পাগলপারা, প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর তরুণ নজরুল করাচী সেনাবিনাসে থাকাকালীন সর্বত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, সেকথা শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ বাবুর আজও বিলক্ষণ স্মরণ আছে।

করাচীতে নজরুলের পল্টন জীবন সম্পর্কে আরও দুজন সৈনিকের বিবৃতি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের একজন হলে 'সৈনিক বাঙালী' গ্রন্থের লেখক স্বর্গত সুবেদার মন বাহাদুর সিংহ এবং অপরজন ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের সি কোম্পানীর হাবিলদার মোহিতকুমার মুন্সী। মন বাহাদুর সিংহ লিখে গেছেন যুদ্ধবিরতির পর মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্থান এক্সপিডিশন থেকে তাঁরা করাচীতে ফিরে আসেন ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে। ফেরার পর করাচী সেনানিবাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে মন বাহাদুর সিংহ লিখে গেছেনঃ

এখানে (করাচী ক্যান্টনমেন্টে) আমাকে প্রায় এক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। কদিন করাচীতে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া গেল। আমাদের সৈনিক কবি হাবিলদার কাজি নজরুল

ইসলামকে দেখতাম। অবসর সময় সৈনিক জীবনের সকল রকম ছন্দকে তিনি কাব্যছন্দে রূপান্তরিত করেছেন।

নজরুল সম্পর্কে মন বাহাদুর সিংহের এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখটুকু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে, সামরিক জীবন নজরুলকে কখনোই পোষ মানাতে পারেনি এবং অত্যাবশ্যকীয় ড্রিল-কুচকাওয়াজের মধ্যেও তাঁর সাহিত্যচর্চা সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল। অসির চেয়ে মসী ছিল তাঁর প্রিয়তর অনুধ্যানের বিষয়।

মোহিতকুমার মুন্সী করাচী সেনানিবাসে নজরুলকে দেখেছিলেন ১৯১৯ সালের জুনে। সেই সময় নজরুল 'কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার' পদে উন্নীত। লণ্ডনে ১৯১৯ সালের ১৯ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ভিক্টরি মার্চ উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে 'পীস সেলিব্রেশন কমিটি'র অন্যতম সৈনিক প্রতিনিধি হিসাবে বাঙালী পল্টনের পক্ষে ইনি ২৭ জুন (১৯১৯) তারিখে ভায়া-বোম্বাই লণ্ডন রওনা হন। সেই সময় মোহিতবাবু সহ অন্যান্যদের সামরিক পোষাক পরিচ্ছদে শোভিত করার দায়িত্ব পড়েছিল নজরুলের উপর। মোহিতবাবুর ভাষায় "আমাদের যথাযোগ্য বস্ত্রাদি ও অন্যান্য উপকরণে সুসজ্জিত করার ভার কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলামের উপর পড়িল।"

করাচী সেনানিবাসে সামরিক শিক্ষায় নজরুল কতোদূর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ জানা যায় না। তবে তিনি যে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হননি, তা অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পাঁচ পাঁচটি প্রোমোশন লাভের ঘটনা থেকে জানা যায়। ১৯১৭ সালের শেষার্ধে জুনের মধ্যে অর্থাৎ প্রায় দু বছরের মধ্যে তিনি সাধারণ সিপাহী থেকে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত উঠেছিলেন। অর্থাৎ সিপাহী থেকে ল্যান্স নায়েক, ল্যান্স নায়েক থেকে নায়েক, নায়েক থেকে হাবিলদার, হাবিলদার থেকে হাবিলদার মেজর এবং হাবিলদার মেজর থেকে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার এই পাঁচটি সিঁড়ি তিনি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং নজরুলের সামরিক কেরীয়ার নিশ্চয়ই প্রশংসা দাবী করতে পারে।

নজরুল অবশ্য কমিশণ্ড র‍্যাঙ্কে উঠতে পারেননি। তবে এন.সি.ও. বা নন্ কমিশণ্ড পর্যায় অতিক্রম করে ওয়র‍্যান্টেড অফিসার র‍্যাঙ্ক লাভ করেছিলেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে হাবিলদার মেজর ও কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার এই পদের অফিসারদের ওয়ার‍্যান্টেড বলা হত। কমিশণ্ড র‍্যাঙ্ক না পাওয়ার হেতু নজরুলের অযোগ্যতা নয়, সিনিয়ারিটির ব্যাপার। পল্টন আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে নজরুল নিঃসন্দেহে পরের ধাপ 'জমাদার' পদে উন্নীত হতেন এবং এই জমাদার পদই ছিল ভারতীয় কমিশণ্ড র‍্যাঙ্কের প্রথম ধাপ।

সামরিক পোষাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ক্রশবেল্ট শোভিত নজরুলের যে ছবিটির সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত, সেটি কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার নজরুলের ছবি। কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারের কাজ মূলত স্টোর কীপারের কাজ। সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সামরিক উপকরণ উক্ত পদাধিকারীর দায়িত্বে থেকে থাকে। এখানে মোহিতকুমার মুন্সীর পূর্বোদ্ধৃত বিবৃতি স্মরণীয়।

নজরুল পল্টন জীবন প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত বিষয়টি হল, তিনি মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিলেন কি না ? আমাদের ধারণা কবির মেসোপটেমিয়া যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি। তিনি করাচী ডিপোতেই ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

[তিন]

পল্টনজীবন নজরুলের সাহিত্যিক জীবনেরও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত ঘটেছিল, তথাপি নজরুল প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছে করাচীর সেনানিবাসে। ফার্সি কাব্যরসিক পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সহায়তা মানসিক দিক থেকে তাঁকে সৈনিকজীবন থেকে সরিয়ে সাহিত্য জীবনের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল।

করাচীর রুক্ষ পরিবেশ ও সামরিক শিক্ষার কঠ স্থূলতার মধ্যে ঘনিয়ে এনেছিল শ্যামল বাংলার শ্যাম স্নিগ্ধ কাজল মেঘের ছায়া, কুসুমিত কাব্যকাননের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য সৌরভ। আর এ সবের ফলেই স্বভাব কবি নজরুল ক্রমেই কাব্যমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে করাচী সেনানিবাসে কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাহিত্য মাসিক নিয়মিত প্রেরিত হত। সুতরাং সাহিত্যানুরাগী যুবকেরা সহজেই সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হতেন। যে সমস্ত সংবাদপত্র ও সাহিত্য পত্রিকা এখান থেকে যেতো এখানে তার সম্পূর্ণ তালিকাটি পেশ করছি :

বেঙ্গলী (ইংরেজী দৈনিক, দু'কপি), দৈনিক বসুমতী (দু'কপি) দর্শক (সাপ্তাহিক, দু'কপি), প্রবাসী (মাসিক, এক কপি), ভারতী (মাসিক, এক কপি)।

আবার শুধু সাহিত্যিক মানসভূমি সৃজন নয়, সাহিত্যিক হিসাবে নজরুলের প্রথম আত্মপ্রকাশও এই পল্টন জীবনেই। মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় নজরুলের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'মুক্তি' শীর্ষক গাথা কবিতাটি ছাত্রাবস্থায় রাণীগঞ্জে রচিত হলেও করাচী ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রেরিত ও প্রথম প্রকাশিত হয়। শুধু মুসলিম রচিত বলে নয়, সৈনিক রচিত বলেও ঐ শ্রেণীর কয়েকটি দুর্বল অপরিণত রচনা মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হয়েছিল। ঠিক এই কারণেই নজরুল করাচী থেকে কলকাতার কাগজে প্রেরিত রচনার নীচে "হাবিলদার, বঙ্গবাহিনী, করাচী" উল্লেখ করতে ভুলতেন না।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পধর্মী রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) করাচীতে বসেই লেখা। করাচী সেনানিবাসে থাকাকালীনই তার "বক্ষের বেদন' গল্পগ্রন্থখানি রচিত হয়। কবির প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ব্যথার দান' (ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) এর পটভূমি পল্টন জীবনেরই দান। দিনলিপির ঢঙে লেখা এই গদ্য কাব্যপ্রতিম রচনাটি কল্পনাশ্রিত হলেও পল্টন জীবনের অভিজ্ঞতা এখানে কবিকে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছে। 'হেনা' গল্পটি (প্রথম প্রকাশ মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৬) এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রচনাটির ছত্রে ছত্রে অনলবর্ষী রণক্ষেত্রের উত্তাপ ও ভীষণতা এবং গোলাবারুদের প্রচণ্ড কলরোল এমন প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিত হয়েছে যে, মনে হতে পারে, কাঁধে টোটাভরা রাইফেল নিয়ে এটি লেখা। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

"ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ লেফ্ট রাইট লেফ্ট। ঐ মলয়ে চলার শব্দটা কি মধুর। ও, বুঝি আমাদের রিলিভ করতে আসছে অন্য পল্টন।

উঃ। এতটুকু অসাবধানতার জন্যে হাতের এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল দেখছি একটা গুলীতে।... ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে নিই নিজেই।... আঃ, যুদ্ধের এই খুনোখুনির কি মাদকতা শক্তি। মানুষ মারার কেমন একটা গাঢ় নেশা।... লুইস্ গানে এক মিনিটে প্রায় ছয় সাতশো করে গুলী ছাড়ছি। যদি জানতে পারতুম, ওতে কত মানুষ ঘুরছে।-- তা হোক্, এই দু কোণের দুটো লুইস্ গানই শত্রুদের জোর আটকিয়ে রেখেছে কিন্তু। কি চীৎকার করে মরছে শত্রুগুলো দলে দলে। কি ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু মাধুরী।"

ডায়েরীধর্মী এই গল্পটির রচনাস্থল হিসাবে ভার্দুন ট্রেঞ্চ, ফ্রেন্স, সিন নদীর ধারে তাম্বু, ফ্রান্স, হিণ্ডনবার্গ লাইন, ইত্যাদি যুদ্ধশিবিরের উল্লেখ এখানে স্মরণযোগ্য।

নজরুলের দু'একটি সুপ্রসিদ্ধ কবিতাতে পল্টন জীবন সরাসরি ধরা দিয়েছে। তাঁর ছাত্রদলের গান বস্তুতপক্ষে সমরসঙ্গীত (March song) জাতীয় রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বহু গদ্য রচনাতেও জলের স্রোতের মতো ঘুরে ঘুরে এসেছে সৈনিক জীবনের অনুষঙ্গ। কোনো কোনো রচনা-নামেও 'সৈনিক' শব্দটির ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন 'আমি সৈনিক' (ধূমকেতু: ১৪ কার্তিক, ১৩২৯) নামের প্রবন্ধটি। অগ্নিগর্ভ স্বদেশপ্রেমমূলক এই সংক্ষিপ্ত রচনাটিতে যুদ্ধের তূর্যনিনাদ শুনতে পাওয়া যায়। যেমনঃ

"আমরা যে আশা করে আছি, কখন সে মহা-সেনাপতি আসবে যার ইঙ্গিতে আমাদের মত শত

কোটি সৈনিক বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত তার ছত্রতলে গিয়ে হাজির, হাজির বলে হাজির হবে সে আমার অজানা প্রলয়ংকর মহা-সেনানী, তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমি শুনেছি। আমার যুদ্ধ-ঘোষণার যে তূর্যবাদনের ভার দিয়েছ, সে ভার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। ...যেদিন তুমি আসবে সেদিন যেন তোমারই পতাকা তলে তোমার দেওয়া তরবারি করে রক্ত সৈনিক বেশে দাঁড়াতে পারি। ...যখন দুশমনের বর্শা ফলক আমার বুকে বিদ্ধ হয়ে গৌরবদীপ্ত মরণের অধিকারী করবে, যখন আমার রক্তহীন দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে সেদিন তুমি বলো প্রভু, বৎস। তুমি আমার কর্তব্য করেছ।"...

করাচী সেনানিবাসে বসে লেখা এবং সেখান থেকে প্রেরিত নজরুলের যে সমস্ত রচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশিত হয়, শ্রদ্ধেয় রফিকুল ইসলাম তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়েছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করছি:

১) বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী (গল্প)-সওগাত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬
২) মুক্তি (কবিতা)-বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৬
৩) স্বামীহারা (গল্প)-সওগাত, ভাদ্র, ১৩২৬
৪) কবিতা-সমাধি (হাসির কবিতা) সওগাত, ভাদ্র ১৩২৬
৫) তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা (প্রবন্ধ)-ঐ আশ্বিন, ১৩২৬
৬) হেনা (গল্প) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৬
৭) আশায় (হাফিজের গজল)-প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৬
৮) ব্যথার দান (গল্প)-নূর, মাঘ ফাল্গুন, ১৩২৬
৯) ঘুমের ঘোরে (গল্প)-নুর, মাঘ, ফাল্গুন, ১৩২৬

: উল্লেখপঞ্জী :

১. মুখবন্ধঃ রুবাইয়াত-ই-হাফিজ। ১৩৩৭
২. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ঃ কাজী নজরুল। ১৯৬৮
৩. নজরুল ও বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীঃ দেশ ১ মে ১৯৮২
৪. কাফেলা, নজরুল সংখ্যা ১৩৮৯
৫. আজিবুল হকঃ রাণীগঞ্জে নজরুল, টি.ডি.বি কলেজ ম্যাগাজিন ১৯৮০-৮১
৬. মন বাহাদুর সিংহঃ সৈনিক বাঙালী, ২য় সং ১৯৪০
৭. মুজফ্ফর আহ্মদঃ কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা ১ম সং
৮. The Bengalee 16th Nov 1916
৯. ভারতী, আষাঢ় ১৯২৪
১০. মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬
১১. রফিকুল ইসলামঃ কাজী নজরুল ইসলাম, জীবন ও সাহিত্য, মল্লিক ব্রাদাস, ঢাকা ১৩৮৯

* ১৯শে জুলাই ১৯১৯ তারিখে ভারতীয় কনটিনজেন্ট লন্ডনে পৌঁছতে না পারায় ২ আগষ্ট ১৯১৯ লন্ডনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভিক্টরী মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।— লেখক।

অনুবাদক নজরুল

সুশীলকুমার গুপ্ত

॥ ১ ॥

যে সব কবি অনুবাদের দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন নজরুল যে তাঁদের মধ্যে একজন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় স্বল্প থাকলেও আরবী ও ফারসী সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রথম জীবনেই তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দু মেশানো মুসলমানী বাঙলায অনেক পালাগান রচনা করেন। পরবর্তী জীবনে 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটকের জন্যে তিনি বহু উর্দু গান রচনা করে দেন। শুধু তাই নয়। আরবী ও ফারসী সাহিত্যের অমর ভাণ্ড থেকে ভাব, শব্দ, ছন্দ, সুর প্রভৃতি সংগ্রহ করে তিনি বাঙলা ভাষাকে ঐশ্বর্যশালী করতে সর্বদা যত্নবান ছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙলার নিজস্ব ভাব ও ভাষার প্রতিও তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল বলে অন্য সাহিত্য থেকে তিনি যা চয়ন করে এনেছেন তা বাঙলা ভাষার নিজস্ব জিনিস হযে উঠেছে। তাঁর অনুবাদের পরিমাণ তেমন বেশী না হলেও তাব উৎকর্ষের মান সামান্য নয়।

নজরুলের অনুবাদ গ্রন্থ তিনটি। এগুলি হচ্ছে—'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (আষাঢ় ১৩৩৭ সাল (১৯৩০), 'কাব্য আমপারা' (১৯৩৩) ও 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' ১৯৫৯)। এ ছাড়া নজরুল ইংরেজী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি কবিতার অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করেছেন। 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে'র মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি হাফিজের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজলের অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদ কবিতা ও গজল বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও তাঁর পুস্তকে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং যথাস্থানে সেগুলি প্রয়োজনানুযায়ী উল্লিখিত হয়েছে।

নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থদ্বয়ের মূল ফারসী পদ্য এবং 'কাব্য আমপারা'র ভিত্তি আরবী গদ্য। তিনি সবক্ষেত্রেই যথাসম্ভব মূলের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছেন। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' এবং বিশেষ করে 'কাব্য আমপারা'য় তাদের মূলের প্রতি বিশেষ অধীনতার জন্যে তাঁর অনুবাদ কোন কোন জায়গায় আড়ষ্ট ও শ্লথগতি হয়ে পড়েছে। এক ভাষা থেকে কতকটা বস্তু অন্য ভাষার ছাঁচে ঢেলে দিলেই প্রকৃত অনুবাদ হয় না। অনুবাদের সময় যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে তার বিশিষ্ট গতিকে অনুবাদের ভাষায় সঞ্চারিত করা উচিত। অনুবাদ যাতে মূলের মতোই পাঠকবর্গকে প্রভাবিত করতে পারে তা দেখা অবশ্যকর্তব্য। এদিক দিয়ে অনুবাদের মধ্যে প্রত্যেক কবিতাই নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠা দবকার। এই প্রসঙ্গে কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' পড়ে রবীন্দ্রনাথ ফিট্‌সজরাল্ড ও কান্তিচন্দ্রের অনুবাদ সম্পর্কে একটি পত্রে যা লিখেছেন (২৯শে শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল (১৯১৯) তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"....এ রকম কবিতা একভাষা থেকে অন্যভাষায় ছাঁচে ঢেলে দেওয়া কঠিন। কারণ এর প্রধান

জিনিসটা বস্তু নয়, গতি। জেরাল্ডও তাই ঠিকমত তর্জমা করেননি --মূলের ভাবটা নিয়ে সেটাকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। ভাল কবিতা মাত্রকেই তর্জমায় নতুন করে সৃষ্টি করা দরকার।

তোমার তর্জমা পড়ে আমার একটা কথা বিশেষ করে মনে উঠেচে। হচ্ছে এই যে বাংলা কাব্যভাষার শক্তি এখন এত বেড়ে উঠেচে যে, অন্য ভাষার কাব্যের লীলা অংশও এ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। মূল কাব্যের এই রসলীলা যে তুমি বাংলা ছন্দে এমন সহজ বহমান করতে পেরেচো এতে তোমার বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েচে।"

অনুবাদে এক ভাষার ভাব ও গতি অন্য ভাষায় ঢালার সঙ্গে সঙ্গে মূলের সৌন্দর্য-রহস্যের প্রতি ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জাগানোর চেষ্টা থাকা দরকার। গ্যেটের মতে অনুবাদক পাঠককে কোন এক অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাকে এ সৌন্দর্যের জন্য আকাঙ্খিত করে তোলেন। নজরুল তাঁর অধিকাংশ অনুবাদে বিশেষ করে হাফিজের গজল ও রুবাইয়ের অনুবাদেই মূল কাব্যের ভাব ও গতি বজায় রাখতে এবং সেই সঙ্গে তার সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্খা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

এবার নজরুলের গ্রন্থগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল যখন যুদ্ধে যান সেই সময় তাঁদের বাঙালী পল্টনের একজন পাঞ্জাবী মৌলবীর মুখে 'দিওয়ান ই-হাফিজে'র কতকগুলি কবিতার আবৃত্তি শুনে তিনি মুগ্ধ হন। ক্রমে তিনি সেই মৌলবীর কাছে ফারসী কবিদের অনেক বিখ্যাত কাব্য পড়ে ফেলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি হাফিজের গজল অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। সে সময় তিনি নিজের কবিত্বশক্তির বিষয়ে যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন না বলে হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ শেষ করেন (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে)। উৎসর্গে তার মৃত সন্তান বুলবুলের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, –

"তোমার মৃত্যু শিয়রে বসে "বুলবুল ই-শিরাজ" হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন তুমি --আমার কাননের বুলবুলি --উড়ে গেছ! যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর?

জানি না তুমি কোথায়! যে লোকেই থাক, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন বলে গ্রহণ করো।"

প্রথম দিকে হাফিজের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজলের অনুবাদ করে নজরুল ধৈর্যাভাবে এই কাজ থেকে বিরত হন। এই অনুবাদগুলি 'প্রবাসী', 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' 'কল্লোল', প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ হয়। এ ছাড়া তিনি হাফিজের গজলের ভাব ও রূপ অবলম্বনে অনেক গান ও কবিতা রচনা করেন।

ফারসী কাব্য প্রধানত কাচ্চিদা, গজল, মথনবী ও রোবাঈ এর আকারে লিখিত হয়। সাধারণতঃ ব্যঙ্গ স্তুতিকাব্য, স্তোত্র বা প্রেমগীতি, দীর্ঘ কাব্য ও গভীর ভাবাত্মক ক্ষুদ্র কবিতার জন্যে যথাক্রমে কাচ্চিদা, গজল, মথনবী ও রোবাঈ বিশেষভাবে উপযুক্ত। রোবাঈ ইংরেজীর epigram জাতীয় ক্ষুদ্র কবিতা। সারাসেন (Saracen) আক্রমণের পূর্বে ফারসী সাহিত্যে 'রিবাই' বলে এক জাতীয় ছন্দ ছিল। প্রাচীন আরবী সাহিত্যের 'দুবাই'-এর প্রভাবে উক্ত 'রিবাই' ছন্দ পরিবর্তিত হয়ে রোবাঈ বা রুবাই-এর রূপ গ্রহণ করে। ইতালীয় কাব্যে সনেটের মতো রুবাই ফারসী কাব্যের এক বিশেষত্ব। হাফিজের মতো ওমর, ওবাইদ ও শরমদ রুবাই- রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত। রুবাই চার ছত্রের কবিতা এবং এতে ছত্রশেষের মিল হয় সাধারণত ককখক। কককক মিলও দেখা যায়। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা হবে।

হাফিজেব রুবাইয়াৎ ও তাব অনুবাদ সম্পর্কে নজরুল তাঁব 'রুবাইয়াৎ ই-হাফিজ' গ্রন্থেব মুখবন্ধে যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,——

"সত্যিকাব হাফিজকে চিনতে হলে তাব গজলগান— প্রায় পঞ্চশতাধিক পডতে হয। তাঁব রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি পডে মনে হয, এ যেন তাব অবসব সময কাটানোব জন্য লেখা। অবশ্য এতেও তাব সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শাবাব সাকী তেমনি ভাবেই জডিযে আছে।....

আমি অবিজিন্যাল (মূল) ফার্সি হতেই এব অনুবাদ কবেছি।"

ফাবসী কবি ও কাব্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্রাউন ও মৌলানা শিবলি নোমানীব মতে হাফিজেব মোট রুবাইযেব সংখ্যা ৬৯। কিন্তু নজরুল কযেকটি ফাবসী 'দিওযান ই হাফিজে' ৭৫ টি রুবাই দেখে তাদেব মধ্যে ২টি বিশেষভাবে প্রক্ষিপ্ত মনে কবে তাদেব অনুবাদ মুখবন্ধে এবং বাকি ৭৩টি অনুবাদ মূল গ্রন্থেব মধ্যে দিযেছেন।

হাফিজেব রুবাইগুলিব মধ্যে শবাব, সাকী, হাসি, আনন্দ, বিবহ ও অশ্রুব অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায। হাফিজকে নজরুল সুফী দববেশ হিসাবে দেখাব চেযে কবিরূপেই বড কবে দেখেছেন। বস্তুতঃ হাফিজ ও ওমব খৈযামেব দর্শন প্রায় অনুরূপ। এবা উভযেই আনন্দবিলাসী। এদেব কাব্যে শবাব হচ্ছে প্রেমানন্দেব প্রতীক। মুসলমান শাস্ত্রে শবাব পান হাবাম বা নিষিদ্ধ। তাই গোঁড়া শাস্ত্রাচাবী মুসলমানদেব কাছে এবা কাফেব। এই দুজন খোদাকে বিশ্বাস কবলেও স্বর্গ, নবক, বোজকেযামত (শেষ বিচাবেব দিন) প্রভৃতি মানতেন না।

হাফিজেব আসল নাম শামসুদ্দিন মোহাম্মদ। হাফিজ তাব তখল্লুস অর্থাৎ কবিতাব ভণিতায ব্যবহৃত উপনাম। তাব কাব্য 'শাখ ই নবাত্' নামে কোনো ইবানী সুন্দবীব স্তবগানে মুখবিত। অনেকেব মতে এই নামটি কবিবই দেওযা এবং ইনিই তাব প্রিয়া ছিলেন। কেউ কেউ মনে কবেন যে, এব সঙ্গে কবিব প্রণয হয।

অনেকেব ধাবণায হাফিজ যৌবনে শবাব সাকীব উপাসক হযে পবে সূফী সাধক হিসাবে খ্যাত হন। তাব সুফীভাবাপন্ন কবিতাব ভক্ত ছিলেন এই বাঙলাদেশেবই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ধর্মসংস্কাবকবৃন্দ। ইংবেজীতে সুফীগণেব সাধাবণ নাম মিস্টিক। যে সব সাধক যুক্তিজ্ঞানেব সাহায্যে ঈশ্ববেব স্বরূপ নির্ণযেব চেষ্টা না কবে ভক্তি বা প্রেম সাধনাব দ্বাবা তাব সঙ্গে মিলিত হবাব চেষ্টা কবেন তাদেবই সাধাবণভাবে মিস্টিক বলা হয। ভগবান ও জীবেব এই মধুব ও নিগূঢ সম্পর্কই সকল মিস্টিক সাহিত্যেব উপজীব্য। এই সম্পর্কেব বহস্য ব্যক্ত কবাব জন্যে মিস্টিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থিব প্রেমেব উপমা ব্যবহাব কবেছেন। সূফীদেব পাবিভাষায শবাব বা সুবাব অর্থ ভগবানেব প্রেমামৃত, সাকীব অর্থ প্রেমময ঈশ্বব বা প্রেমদীক্ষাদাতা গুরু, পেযালাব অর্থ হৃদয, শৌণ্ডিকালযেব অর্থ সাধনাগাব ও সুবাপানেব অর্থ ভগবানেব প্রেম আস্বাদন। হাফিজ ছাডা ফিবদৌসী, আবুসাযেদ, ওমব খৈযাম, সাদী প্রমুখ ফাবসী কবিগণ বিশেষভাবে সুফীভাবাপন্ন ছিলেন।

বাঙলাভাষায হাফিজেব কবিতাব অনুবাদক হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদাব, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অজযকুমাব ভট্টাচার্য ও নজরুল ইসলামেব নামই বিশেষভাবে স্মবণীয। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদাবেব 'সদ্ভাবশতক' অর্থাৎ সদ্ভাবপূর্ণ কবিতাকলা [১লা ফাল্গুন, ১৭৮২ শক (১৮৬১)]। কবিতাগ্রন্থেব অধিকাংশ কবিতাই সুফী কবি হাফিজ ও সাদীব ফাবসী কবিতাব ভাবানুবাদ। 'সদ্ভাবশতক' এব কবিতাব উপাদান মুখ্যতঃ হাফিজেব 'দিওযান' থেকে গৃহীত। যে সব কবিতা প্রধানতঃ হাফিজেব মর্মানুবাদ সেগুলিতে তাঁব ভণিতা দেখা যায।একটি কবিতাব অংশবিশেষ উদ্ধৃত কবা যাক।

"বিবহ বাবিধি নীবে জীবনেব তবি
ডুবিল ডুবিল আহা! প্রাণে মবি মবি।
কেঁদ না হাফেজ বল কি ফল বোদনে?

কমল কোথায় আছে কন্টক বিহনে?"

নজরুলকে হাফিজের রুবাইয়াতের সত্যকার প্রথম অনুবাদক বলা যায় না। অজয়কুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থে (কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত)-র নিবেদনে নিজেকে হাফিজের রুবাইয়ের প্রথম অনুবাদক হিসাবে যে দাবি জানিয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য। নিবেদনে তিনি লিখেছেন,—

"আমি যতদূর জানি, তাহাতে মনে হয়, আমার এই অনুবাদই হাফিজের রুবাইয়াতের সর্বপ্রথম অনুবাদ।"

নিবেদনে অজয়কুমারের গ্রন্থের প্রকাশকাল দেওয়া আছে শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩৬ সল (১৯৩০)। নজরুলের অনূদিত হাফিজের ১০টি রুবাই ১৩৩৭ সালের (১৯৩০)। জ্যৈষ্ঠের 'জয়তী'-তে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালের (১৯৩০) ১লা আষাঢ় তারিখে। তবে নজরুল যেখানে মূল ফারসী থেকে অনুবাদ করেছেন অজয়কুমারের গ্রন্থ সেখানে সৈয়দ আবদুল মজিদ (Syed Abdul Majid) ও এল ক্রানমার-বিঙ (L.Cranmer-Byng) -এর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে মূল ৬৫টি রুবাইয়াতের ভাবানুবাদ। অজয়কুমার তাঁর রুবাইয়াতের অনুবাদে মিল দিয়েছেন ককখখগগ। বস্তুতঃ তৃতীয় পঙক্তিকে ভেঙে দুটি ছোট পঙক্তি করে তাঁদের অন্ত্যমিলের ব্যবস্থা লক্ষণীয়। রুবাইয়াতের অনুবাদে স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হওয়ায় যথেষ্ট গতি অনুভব করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ১নং রুবাইয়ের অনুবাদটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

"ঐ যে গোলাপ জাগল সুখে,—
ফুটল হাসি গুল্‌বাগেব।
ফুল-পিয়ালা পূর্ণ হল,—
শুনছি বাঁশী নওরোজের।
তরুণ সাকীব সরাব-সুধা
মিটায় যাহার মনের ক্ষুধা—
সুখের নেশায় বিভোর সে যে,—
রইল কোথায় দুঃখ তার?
রক্ত নাচে রুদ্রতালে,—
বন্দী সে কি থাকবে আর?"

বলা বাহুল্য অনুবাদ সাবলীল হলেও রুবাইয়ের মূল রূপ এখানে অবিকৃত নেই।

কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' সম্ভবত ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ইংরেজী অনুবাদ থেকে মোট ৭৫টি রুবাইয়ের অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রযুকত হয়েছে। তিনি অন্ত্যমিল দিয়েছেন ককখখ। রুবাইয়ের ঐতিহ্যগত রূপ রক্ষিত না হলেও তাঁর অনুবাদে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিশীলতার অভাব নেই। উদাহরণ হিসাবে ২৬ নং রুবাইটি উদ্ধৃত করা যাক।

"সাকীর সাথে স্বপ্ন রচন নদীর ধারে বসে
খেয়ালটা সেই মিটিয়ে নে গো—স্মৃতিটি যাক খসে।
ফুলের মতই প্রাণের আভাস—দিন কয়েকের নেশা
সেই কটা দিন পেয়ালা ভরে হাসির সঙ্গে মেশা!"

হাফিজের জীবন উপভোগের আগ্রহ ও প্রেমতৃষ্ণাই নজরুলকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনি হাফিজের কাব্যে বাঙলাদেশের যৌবনপ্রেমের সন্ধান পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে নজরুল যা লিখেছিলেন তা স্মরণ করা যেতে পারে।

"....পারসিক কবি হাফেজের মধ্যে বাঙ্গলার সবুজ দুর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান পেয়েছিল, সে সবই তো খাঁটি বাঙ্গলার কথা, বাঙ্গালীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য

অঙ্গ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমারোহ।....বাঙ্গালীর সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একাত্মবোধ যদি জাগাতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।”

১৩৩৭ সালের (১৯৩০) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাতে' নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ' এর প্রশংসা করে লেখা হয়,—

“কবি হাফিজের অপরিমেয় প্রতিভা, তাঁহার রুবাইয়াৎ অনুবাদ করিয়াছেন কবি নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, তাঁহারও প্রতিভা আমাদের প্রশংসার অনেক উর্ধ্বে। একজন মরমী কবি ভিন্ন ভাষাভাষী আর একজন মরমী কবির অন্তরকে নিজের অন্তরে বসাইয়া বাংলা কাব্যে তাঁহার পরিচয় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।....কবি মূল পারসী হইতে রুবাইগুলির তর্জমা করিয়াছেন এবং মূল পারসীর যে ছন্দ, অনুবাদে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কবি এ কৃতিত্বের মহিমা কেবল সমঝদার পাংকই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ কবি নজরুল ইসলামের হাতে যেরূপ মোহন সুন্দররূপে ফুটিয়াছে, বাংলার অন্য কোন কবির হাতে সেরূপ ফুটিতে পাবিত না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কারণ পারসী কবিদের অন্তবের সহিত তাঁহার অন্তবেব পরিচয় যেমন নিবিড় তেমন আর কাহারো নহে। মুখবন্ধে জীবনী দিয়া কবি নজরুল অনুবাদখানিকে আবো মনোরম, আরো উপভোগ্য করিয়াছেন। মোটের উপর আমবা এ কথা জোব কবিযাই বলিতে পারি যে, রসিক পাঠক এই অনুবাদখানি পড়িয়া অপূব রসে অভিষিক্ত হইবেন।”

এবাব বাঙালীর সচেতন মনের সঙ্গে ফাবসী কবির যে ভাবজীবনের ঐক্যস্থাপনেব জন্যে নজরুল একান্ত উৎসাহী তাব অনুসরণ করা যাক।

জীবন অনিত্য। তাই ফারসী কবি নিত্যপ্রেমানন্দের শরাব পান করে মৃত্যুজরার সব চিন্তা ভুলতে চান।

“পরান ভরে পিযো শবাব
জীবন যাহা চিরকালের।
মৃত্যু-জরা-ভরা জগৎ
ফিরে কেহ আস না ফের।
ফুলের বাহার, গোলাব-কপোল,
গেলাস-সাথী মস্ত ইয়ার,
এক লহমার খুশীর তুফান,
এই তো জীবন!—ভাবনা কিসের।”

৩৫ নং রুবাইয়েও এই একইভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জীবন ক্ষণস্থায়ী বলেই কবি তাকে উপভোগ করতে একান্ত আগ্রহী।

নজরুল তাঁর অনুবাদে রুবাইয়ের রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি সাধারণভাবে প্রথাগত চতুষ্পদীর অন্ত্যমিল দিয়েছেন ককখক। কিন্তু রুবাইয়ের রূপানুসারে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিকে একটানা রাখেননি। তৃতীয় পঙক্তিটিকে ভেঙে তিনি দুটি ক্ষুদ্র পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল দিযে বাঙলা কবিতার রূপ ফুটিযে তুলেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

“পূর্ণ কভু করে নাকো
সুন্দর-মুখ দিয়ে আশা।
প্রেমের লাগি যে বিবাগী
ভাগ্য তাহার সর্বনাশা।
প্রিয়া তব লক্ষ্মী সতী
তোমার মনের মূর্তিমতী ?

প্রেমিক-দলের নও তুমি কেউ
পাওনি প্রিয়া ভালবাসা।"

এই প্রসঙ্গে ৪১, ৪৩ ও ৪৮ নং রুবাইগুলি স্মরণীয়।

নজরুল তাঁর অনুবাদ-কাব্যে মৌখিক ভাষার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করাতে তা বিশেষভাবে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। তিনি তার অনুবাদে আরবী, ফারসী, ইংরেজী, তুর্কী, হিন্দী, চলতি ও গ্রাম্য বাঙলা শব্দ অত্যন্ত স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আরবীফারসী শব্দ বাঙলার একান্ত অন্তরঙ্গভাবে প্রযুক্ত হয়ে অনুবাদের শক্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট।

১॥ "কোন চোখে কাল দেখবে তোমায়
হায় রে বে-দিল সেই মুসাফির!"

২॥ "সকল কিছুর চেয়ে ভাল সুরাই –
যখন কাঁচা বয়েস,
প্রণয় বেদন মত্ততা, পাপ
যৌবনেরই একার আয়েশ।
এই সে তামাম দুনিয়াটা ই
বরবাদ আর খারাব রে ভাই,
মন্দ ধরায় মন্দ যা তার
প্রমত্ততাই মানায় যে বেশ!"

৩॥ "ফুল্লমুখী দিল পিয়ারী
বীণা, বেণু, একটু আড়াল,
এক পেয়ালি শিরাজী লা'ল, "

চলতি খাঁটি বাঙলা ও গ্রাম্য শব্দ নজরুল অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করে তার অনুবাদকে সহজ ও সাবলীল করে তুলতে পেরেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১॥ "ফুলকে ভোলায় ফুল্লমুখী
মিঠে হাসির ছিটেন দিয়া।"

২॥ "আলতো করে আঙুল রেখে
প্রিয়ার কালো পশমী কেশে...."

৩॥ "শূণ্য গেলাস টইটুম্বুর
কর রে ঢেলে শেষ শিরাজী।"

এ সব ব্যতীত নজরুল দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজী (গেলাস), তুর্কী (গালচে), হিন্দী (ঠমক) প্রভৃতি শব্দ এই অনুবাদে ব্যবহার করেছেন।

অনুবাদের মধ্য দিয়ে এলেও নজরুলের কয়েকটি সুন্দর চিত্রকল্প বাঙলা ভাষার সম্পদ বলে গণ্য হবে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১॥ "বিশ্বে সবাই তীর্থ-পথিক
তোমার পথের কুঞ্জ-গলির।
ছুটছে নিখিল মক্ষী হয়ে
তোমার আনন-আনার-কলির।"

২॥ "জড়িয়ে গেল ভীরু হৃদয়
তোমার আকুল অলক-দামে
সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধা

দেখছি ওবে ছাড়ানো দায়॥"
৩॥ "কুঁড়িবা আজ কার্বা-বাহী
বসন্তেব এই ফুল জলসায়।"

বাঙলা ভাষাব সর্বপ্রথম গদ্যে কোবানেব অনুবাদ কবেন কেশবচন্দ্র সেনেব অনুগামী গিবিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫ ১৯১০)। তাব 'কোবাণ শবিফ'-এব চতুর্থ সংস্কবণে (১৯৩৬) সংস্কবণ-পবিচয়ে লেখা হয়েছে, "প্রথম সংস্কবণ, ১০০০ কপি, অনুবাদেব সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডাকাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড শেবপুবে "চারুযন্ত্রে" মুদ্রিত হয়। পববর্তী দুই খণ্ড কলিকাতায় "বিধানযন্ত্রে" মুদ্রিত হয়। প্রায় পাঁচ বৎসবে ১৮৮১ ১৮৮৬ খৃঃ সম্পূর্ণ গ্রন্থেব মুদ্রণ কর্য সমাপ্ত হয়। অনুবাদক ভাই গিবিশচন্দ্র সেন স্বয়ং সমস্ত তত্ত্বাবধান কবেন। সম্পূর্ণ অনুবাদ ১৮৮৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়।" ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থেব মুদ্রণ আবম্ভ হলেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৮২, ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ কবে এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংস্কবণে 'কোবাণ শবিফে'ব স্থলে 'কোব্ আন্ শবীফ্' বানানেব ব্যবহাব উল্লেখযোগ্য। এব পব কোবান শবীফ বা তাব অংশবিশেষেব যে সব গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাদেব মধ্যে নইমুদ্দীনেব 'কোবাণ শবিফ' (প্রথম ও দ্বিতীয় বা শেষ খণ্ড কবটীয়া, যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে), আব্বাস আলীব 'কোবান শবীফ' (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে), মোঃ ম্ন আক্বম খাব 'কোব্আন শবিফ আম পাবা' (১৯৯২) খ্রীষ্টাব্দ), মৌলবী তসলীমুদ্দীনেব 'কোব্ আন' (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯২২, ১৯২৩, ও ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও বসন্তকুমাব মুখোপাধ্যায়েব 'পবিত্র কোবাণ প্রবেশ' (ঢাকা, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ) বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। কোবাণ বা তাব অংশবিশেষেব কাব্যানুবাদেব মধ্যে কিবণগোপাল সিংহেব 'কোবাণ শবিফ আমপাবা' (প্রথম সংস্কবণ, ১৯০৮; নূতন সংস্কবণ ১৯২৪), মীব ফজলে আলীব 'কোবাণ কাণকা' [ববিশাল, ফাল্গুন ১৩৩৭ (১৯৩১)] ও গোলাম মোস্তফাব 'আল্-কুব্আন' প্রথম খণ্ড ঢাকা, মার্চ ১৯৫৭) প্রসিদ্ধ। কিবণগোপাল তাঁব 'কোবাণ শবিফ আমপাবা'ব নূতন সংস্কবণেব ভূমিকায় লিখেছেন, "আমপাবাব এই নূতন সংস্কবণেব অনুবাদ এবং পবিশিষ্টেব টীকা বা তফসীবগুলি নূতন কবিয়া লিখিত হইয়াছে, সুতবাং এই গ্রন্থেব পূর্ব সংস্কবণেব সহিত ইহাব আদৌ মিল নাই।" গিবিশচন্দ্র সেনেব উপদেশানুসাবে সর্বসাধাবণেব হিতার্থে কিবণগোপালেব পদ্যানুবাদ পযাব ছন্দে কৃত। তবে একাধিক স্থলে ত্রিপদীব প্রযোগ আছে। অনূদিত সুবাব সংখ্যা ৩৮। মস্ত সুবাব প্রথমে "দাতা ও দযালু ঈশ্ববেব নামে আবম্ভ কবিতেছি" আছে। কযেকটি সুবাব অনুবাদে দীর্ঘ হলেও মোটামুটিভাবে তা প্রাঞ্জল। সুবা ফাতেহাব অনুবাদটি এখানে উদ্ধৃত হল।

"যা কিছু প্রশংসা আছে—যা কিছু গৌবব,
সবি বিশ্ব-বিধাতাব নিখিল প্রভাব।
দানে যিনি কল্পতরু, করুণাব নিধি,
কর্ম-ফল দান দিনে একমাত্র বিধি।
তোমাকেই মাত্র সেবা কবি আবাধনা,
তোমাব নিকটে কবি সাহায্য প্রার্থনা।
আমাদেব সেই পথ কব প্রদর্শন
সুদৃঢ় সবল যাহা, শপ্ত ভ্রষ্টগণ
যে পথে চলে না কভু, করুণা তোমাব
কবেছ বর্ষিত যাহে করুণা আধাব।"

মীব ফজলে আলীব 'কোবাণ কণিকা'ব ভূমিকা লিখেছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এই গ্রন্থে যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্ববৃত্ত ছন্দে ১৫টি সুবাব অনুবাদ গ্রথিত হয়েছে। মীব ফজলে আলীব অনুবাদ যথেষ্ট

স্বচ্ছন্দ ও গতিসম্পন্ন এবং এ পর্যন্ত যত পদ্যানুবাদ হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুরা ফাতেহার অনুবাদটি উদাহরণ হিসাবে আহরণ করা যেতে পারে।

"যত গুণগান 'তোমারি, মহান',
তুমি হে জগৎ-পাতা,
দয়াময় কৃপাদাতা।
বিচার দিনেব তুমি অধিপতি,
তোমারেই মোরা করি গো স্তুতি,
যাচি হে তোমার সহায শকতি।
যে পথে চলিযা পথিক সকল—
পেয়েছে তোমারি আশীষ-মঙ্গল ;
দেখাও সে পথ—সঠিক, সরল।
কুপিত হযেছ যাদের কারণ,
বিপথে যাহারা করেছে গমন,
ওদেব সে পথে নিও না কখন।"

গোলাম মোস্তফার অনুবাদের গতিময়তা সর্বত্র অভিপ্রেত মাত্রায় রক্ষিত হযনি এবং আরবীফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগে তার প্রাঞ্জলতা কোনো কোনো জায়গায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর সুরা ফাতেহার অনুবাদটি এখানে চযন করা যাক।

"সকল তারীফ্ সেই আল্লাহ্-তালার
নিখিলের রব্ যিনি পরোয়ারদিগার।
যিনি চিত্র-প্রেমময় চির-মেহেরবান
বিচার-দিনের যিনি মালিক মহান।
তোমারেই শুধু মোরা করি ইবাদৎ
তোমারি কাছেতে চাই-শকতি-মনন।
দেখাও সরল পথ—তাদের সে পথ
যাদের উপরে ঝরে তব নিয়ামৎ
নয় তাহাদের পথ—অভিশপ্ত যারা
কিংবা যারা পথ পেয়ে হল পথহারা।"

নজরুলের 'কাব্য আমপারা' ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। কয়েকটি কোরান থেকে সাহায্য নিয়ে রচিত তাঁর এই অনুবাদগ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরজে তিনি বলেছেন,—

"কোর-আন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হত না—যদি আরবী ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোন যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হতেন।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র—পুঁজি ধনরত্ন, মণি-মাণিক্য সব কিছু-কোর-আন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবী ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা-বাঙালী মুসলমানেরা—তা নিয়ে অন্ধ-ভক্তি ভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষায় যে কোন মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি।...

আমার বিশ্বাস পবিত্র কোর-আন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনূদিত হয়, তাহলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন—অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত কোর-আন হয়ত মুখস্থ করে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশী কৃতকার্য যে হয়েছি তা বলতে পারি নে—কেননা কোর-আন-পাকের একটি শব্দও এধার ওধার

না কবে তাব ভাব অক্ষুণ্ণ বেখে কবিতায সঠিক অনুবাদ কবাব মত দুরূহ কাজ আব দ্বিতীয আছে কিনা জানি নে। কেননা আমাব কলম, আমাব ভাষা, আমাব ছন্দ এখানে আমাব আযত্তাধীন নয।”

সমগ্র কোবান শবীফেব বাঙলা পদ্যানুবাদ কবাব আন্তবিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমপাবা ব্যতীত অন্য কোন অংশেব অনুবাদ কবে উঠতে পাবেন নি। এই গ্রন্থে সর্বসমেত আটত্রিশটি সুবাব অনুবাদ স্থান পেযেছে। আমপাবাব সঠিক অনুবাদ কবা নজরুলেব উদ্দেশ্য ছিল। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুসাবী হলেও নজরুল কাব্যেব স্বাভাবিক বেগ এখানে অনেক স্থলেই অনুপস্থিত। যৌগিক ছন্দে তাঁব স্বাভাবিক স্ফূর্তি কম বলে ‘কাব্য আমপাবা’ব যে সব সুবা যৌগিক ছন্দে অনূদিত হযেছে সেগুলিতে কবিত্বেব স্বাক্ষব তেমন উজ্জ্বল হযে ওঠে নি। উদাহবণস্বরূপ সুবা হুমাজাতেব অনুবাদটিব উল্লেখ কবা যেতে পাবে।

সুবা ‘ফাতেহা’তে কোবান শবীফেব মর্মকথা ও মহৎশিক্ষা ব্যক্ত হযেছে। এই জন্যে বসুলুল্লাহ্ (দঃ) এটিকে ‘উম্মুল কিতাব’ অর্থাৎ কোবানেব মাতা বলে অভিহিত কবেছেন। এই সুবাটিব অনুবাদে নজরুল অসামান্য সাফল্য অর্জন কবেছেন। সঠিক অনুবাদ হযেও এটিতে কোন আড়ষ্টতা নেই। অনুবাদটি চযন কবা যেতে পাবে।

“সকল বিশ্বেব স্বামী আল্লাব মহিমা,
করুণা কৃপাব যাঁব নাই নাই সীমা।
বিচাব দিনেব বিভু! কেবল তোমাবি
আবাধনা কবি আব শক্তি ভিক্ষা কবি।
সবল সহজ পথে মোদেবে চালাও,
যাদেবে বিলাও দযা সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আব পথভ্রষ্ট যাবা, প্রভু,
তাহাদেব পথে যেন চালাযো না কভু।”

সুবা ‘ইনসান’এব অনুবাদটিও সবল ও সুন্দব।

সুবা ‘আদিযাত’ এব অনুবাদে মাত্রাবৃত্তেব চালে নজরুল-কাব্যেব গতিশীলতাকে স্পর্শ কবা যায়।

এই গ্রন্থে বিধৃত বিভিন্ন সুবাব জন্যে নজরুল ইসলাম ধর্মেব মূল কথা ও সমগ্র কোবানেব উত্তমাংশ ‘বিসমিল্লাহিব বহমানেব্ বহিম’ এব যে অনুবাদ কবেছেন তাতে তাব অনুবাদক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হযেছে। মূল ভাব থেকে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হযেও অনুবাদগুলি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে পেবেছে।

গ্রন্থেব শেষে ‘শানে নজুল’ অংশে নজরুল সুবাগুলিব পবিচযসূত্রে যে টীকা দিযেছেন তাতে তাঁব বিশ্লেষণক্ষমতা ও জিজ্ঞাসু মনেব স্বাক্ষব পাওযা যায।

নজরুলেব ‘রুবাইযাৎ ই ওমব খৈযাম’ প্রকাশিত হয ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দেব ডিসেম্বব মাসে। এই গ্রন্থে ওমব খৈযামেব ১৯৭টি রুবাইযেব অনুবাদ স্থান পেযেছে। মৌলানা মোহাম্মদ আকবম খাঁ সম্পাদিত মাসিক ‘মোহাম্মদী’ [প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৩৪ (১৯২৭)] পত্রিকায নজরুল ওমবেব কযেকটি রুবাইযেব অনুবাদ কবেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত পত্রেব সপ্তম বর্ষেব প্রথম সংখ্যা [কার্তিক ১৩৪০ (১৯৩৩)] দ্বিতীয সংখ্যা [অগ্রহাযণ ১৩৪০ [১৯৩৩) সংখ্যা এবং তৃতীয সংখ্যা [পৌষ ১৩৪০ (১৯৩৩ ৩৪)] দ্রষ্টব্য। নজরুল ওমবেব এগুলি রুবাইযেব অনুবাদ কখন কবলেন সে বিষযে সঠিক জানা যায না। গ্রন্থেব দীর্ঘ ভূমিকায সৈযদ মুজতবা আলী এ বিষযেব উপব কোন আলোকপাত কবেননি।

নজরুল মূল ফাবসী থেকে ওমবেব অনুবাদ কবেছেন। সে দিক দিযে তাব অনুবাদেব প্রতি পাঠকেব একটি বিশেষ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তিনি ফিটসজেবাল্ডেব মতো তাঁব অনুবাদে রুবাইযেব ঐতিহ্যগত রূপটি সযত্নে বক্ষা কবাব চেষ্টা কবেছেন। পঙ্ক্তিব শেষে তিনি সাধাবণতঃ ককখক মিল দিযেছেন। কিন্তু এই মিলেব একাধিক ব্যতিক্রম তাঁব গ্রন্থে পাওযা যায। এই প্রসঙ্গে ৩৬ নং (কককক), ৪৬

নং (কখখখ), ১৩৮ নং (কককক), ১৫০ (কককখ), ১৬৬ নং (কককখ) ও ১৮৭ নং (কককখ) রুবাইগুলি দেখা যেতে পারে। তবে মনে হয় যে নজরুল সাধারণভাবে ককখক মিল রাখতে চেয়েছেন। এর ব্যতিক্রমগুলি নজরুলের অযত্নের ফলও হতে পারে। যাই হোক রুবাইয়ের পক্ষে ককখক মিলই সবচেয়ে উপযোগী। কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি শেষে মিলের ঝোঁক তৃতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে মিল না থাকার জন্যে পরিপূর্ণ তীব্রতায় চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে এসে সমাপ্তি লাভ করে মনকে বিশেষভাবে ধাক্কা দেয়। রুবাইয়ের প্রকৃতি বহুল পরিমাণে কোন নীরব শ্রোতাকে লক্ষ্য করে এক তরফা ভাষণের মতো। সেই জন্যে মুখের ভাষার ছন্দ এর পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। সে দিক দিয়ে নজরুল কান্তিচন্দ্র ঘোষের মতো তাঁর অনুবাদে মূলতঃ স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করে প্রখর কাব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

ওমরের রুবাইযাতের অনুবাদ আলোচনা করবার আগে তার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। ওমর পারস্যের নিশাপুরে একাদশ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুকাল মোটামুটি ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দ। তার পিতা ইব্রাহিম একজন খৈয়াম বা তাবু নির্মাতা ছিলেন। সেই কারণে তিনি ওমর বিন খৈয়াম বা খৈয়ামের পুত্র ওমর নামে পরিচিত হন। ওমর ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত। দর্শন, তর্কশাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতিশাস্ত্রে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি যে মূলতঃ কবি ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ওমরের মন সংসারবিমুখ প্রেমলীলায় মগ্ন হলেও দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানী। ভারতবর্ষের ত্যাগ ও ওমরের ভোগের মধ্যে একই জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যায়। ওমরের ভোগ্যবাদ ও জীবনের অনিত্য বোধের মধ্যে যে উদার ও ভয়শূণ্য অনাসক্তির সুর আছে তার সঙ্গে ভারতীয় বৈরাগ্যের অন্তরঙ্গ মিল লক্ষণীয়। এ জীবন যখন অনিত্য ও অর্থহীন, তখন এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনিত্য সমস্ত কিছুকেই ভোগ করবার জন্য তাঁর উদ্দীপ্ত, সেইখানে নজরুলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সমধর্মিতা অনুভূত হয়। এই সব ভাবসম্বলিত রুবাইয়ের অনুবাদে নজরুলের সফলতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,---

"খাজা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জী এই—
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই!
দৃষ্টি-দোষ দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমার ছেড়ে ভালো করো ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।"

মদ্যপানকে যে সব ধার্মিক নিষিদ্ধ বলে মনে করেন তাদের উদ্দেশ্যে ওমরের উক্তি,—

"শরাব ভীষণ খারাপ জিনিস মদ্যপায়ীর নেইকো ত্রাণ।
ডাইনে বাঁয়ে দোষদর্শী সমালোচক ভয় দেখান—
সত্য কথাই! আঙুরে নষ্ট করে ধর্মমত,
সবার উচিত—নিঙড়ে ওরে কর উহার রক্ত পান!"

ধর্মের বিষয়ে ওমর উদার প্রেমের সাধক এবং সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত। তাঁর ঘোষণা,—

"হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
মসজিদ মন্দির গির্জা, যথাই করুক অর্ঘ্য দান—
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম,
স্বর্গের লোভ ও নরক-ভীতির উর্ধ্বে তারা মুক্ত প্রাণ।"

নজরুল তাঁর অনুবাদে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাঙলা, গ্রাম্য ইত্যাদি শব্দ নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন। অপরিচিত ও অনতি পরিচিত আরবীফারসী শব্দ যে কি আশ্চর্য দক্ষতায় তৎকর্তৃক বাঙলায় ব্যবহৃত হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ যথেষ্ট। এই সব শব্দের জায়গায় সংস্কৃত বা বাঙলা শব্দ বসালে এমন ব্যঞ্জনা ফুটত না।

১॥ "জাগো সাকী! সকালে বেলার খোঁয়াবি ভাঙো আমার সাধ।"

২॥ "আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শীরীন ঠোঁট
গজল শোনাও, শিরাজী দাও, তন্বী সাকী জেগে ওঠ।"

৩॥ "তীব্র মিঠে খোশবো তাহার উঠবে আমার ছাপিয়ে গোর।"

৪॥ "মৃত্যুর ঝড উঠবে কখন, আয়ুর পিরান ছিঁড়বে তোর—

৫॥ "এক লহমায় বদলে গিয়ে দূত হয়ে যাই দেব-লোকের।"

খাঁটি চলতি বাঙলা, এমন কি প্রচলিত বা প্রায় অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দকে নজরুল অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। ফলে অনেক জায়গায় তার অনুবাদ বিশেষভাবে সুন্দর ও সাবলীল হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ চয়ন করে দেওয়া গেল।

১॥ "মনে ব্যথার বিনুনী মোর খোঁপায় যেমন তোর চুনোট।"

২॥ "আর চেয়ে তুই দর্শন কর প্রিয়ার বিনোদ বেণীর ঠাঁট....

৩॥ "নাই ইরাকী নূপুর ধ্বনির জমজমাটি সুর-উছল..."

এ ছাড়া নজরুল স্বল্পসংখ্যক ইংরেজী (গেলাস, বাক্স, টব প্রভৃতি) ও হিন্দী (তুরন্ত, সুরতওয়ালী প্রভৃতি) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অনুবাদে ... অনেক জায়গায় যে সব বিকল্প পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে ও তাদের আস্বাদন করতে ভাষান্তরে বন্ধনতন্ত্র বাধা সৃষ্টি হয় নি।

বিদ্রোহী কবির কাব্যশৈলী

নারায়ণ চৌধুরী

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যের গঠনে ভাবাবেগের একটা মস্ত বড জাযগা রযেছে। এই ভাবাবেগ এসেছে তাঁর কবিপ্রকৃতির সহজাত স্বতঃস্ফূর্তি থেকে, বক্তব্যবিষযেব অভিনবত্ব থেকে, অভিনব বক্তব্যবিষয়কে পাঠকমনে গভীরভাবে মুদ্রিত করে দেবার আকুলতা থেকে, সর্বোপরি বাংলাব কাব্যসংসারের প্রচলিত ধ্যান ধারণার প্রতি বিমুখতা ও বিপক্ষতার মনোভাব থেকে। বাংলা কাব্যের গতানুগতিক মূল্যবোধের আবহাওয়ায় এযাবৎ যাঁদের মন লালিত ও বর্ধিত হযেছে তাঁদের কাছ থেকে সম্ভাবিত প্রতিকূলতা কল্পনা করে নিয়ে নতুন কবিব মন সংকল্পে আরও বেশী কঠিন হযেছে আর সেই সংকল্পের দৃঢতা থেকে প্রকাশের ভাষায় ও ভঙ্গীতে এসেছে আরও বেশী আবেগপ্রাবল্য, আরও বেশী প্রকাশ ব্যাকুলতা। ভাবাবেগের উদ্বেলতায় নজরুলের কবিতা যেন শুরু থেকেই টগবগ করছে।

নজরুল কাব্যের আবেগসমৃদ্ধি বোঝাতে গিয়ে যে সমস্ত লক্ষণের দিকে অঙ্গুলিক্ষেপ করা হলো তার মধ্যে শেষোক্ত লক্ষণটির আবও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রযোজন। নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত বাংলা কাব্যের সংস্কার একান্তভাবে বুর্জোযা চিন্তা চেতনার দ্বারা শাসিত ছিল। হয় অভিজাত মূল্যবোধগুলির মাহাত্ম্যকীর্তন নয় তো মধ্যবিত্ত মানসিকতার জযগানে বাংলা কাব্যের অঙ্গন ছিল মুখর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে কল্পনার উত্তুঙ্গ শীর্ষশেখর স্পর্শ করলেও উদার মানবতার অস্পষ্ট দিগ্‌দেশের বাইরে যে স্পষ্টচিহ্নিত বিরাট বিপুল জনজীবনের স্তর আস্তৃত রযেছে তার বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর কল্পনাকে তিনি পরিব্যাপ্ত করতে পারেননি। শেষ বযসের কবিতায় এই দিকে একটা সচেতন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, লক্ষ্য করা যায় এইখানে তাঁর অপূর্ণতার বেদনার আর্তি, কিন্তু আর্তি আর্তিই থেকে গেছে, ছাড়া-ছাড়া উজ্জ্বল কবিতার দৃষ্টান্ত (যেমন 'জন্মদিনে', 'ঐকতান', 'বাঁশী', 'ওরা কাজ করে', ইত্যাদি) বাদ দিলে, সেই অপূর্ণতার আর পূরণ হয়নি। অন্ততঃ, জনজীবনের সুখদুঃখের ব্যাপক অভিব্যক্তি রবীন্দ্রকাব্যে অ-কৃতই রয়ে গেছে। খতিয়ে দেখলে দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর ঊর্দ্ধায়নের; অপেক্ষাকৃত কম সার্থকভাবে ব্যাপ্তির অভিমুখে তাঁব কবিতার ঝোঁক। অর্থাৎ কবিগুরু কল্পনার আবেগ দৃশ্যতঃ উল্লম্ব (vertical), অনুভূমিক (horizontal) নয়। বৃহৎ-বিশাল শোষিত-নিপীডিত মানুষের সংসার নিয়ে তাঁর কবিতার জগৎ নয় রচিত। তাঁর কবিতা ঊর্ধ্বাকাশের দিকে যেমন থেকে থেকে পাখা মেলেছে, তেমনভাবে চারপাশের ছড়ানো অনুভূমিক অর্থাৎ ভূমিতে বিস্তৃত জীবনের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারেনি। এই অকৃতকার্যতার স্বীকৃতি কবি নিজমুখের কবুলনামা থেকেই একাধিকবার ('এবার ফিরাও মোরে' 'ঐকতান' প্রভৃতি কবিতা দ্রষ্টব্য) পাওয়া গেছে, সুতরাং এ কথা বলায় আমাদের প্রত্যবায়গ্রস্ত হওয়ার দায় কম।

অন্যদিকে রবীন্দ্রোত্তর কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল হয় জাতীয়তায় আবদ্ধ, নয়তো

পল্লীপ্রাণতা ও গৃহগতপ্রাণতায় ভরপুর। এঁদের কবিতার সাধারণ কুললক্ষণ ছিল যদিও মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য মনোজীবিতা, মধ্যবিত্ত পরিবার সুলভ সাংসারিক সুখ-দুঃখের চেতনা ; তবুও প্রবণতা ভেদে কেউ জাতীয় ভাবোদ্দীপনার দিকে বেশী ঝুঁকেছেন (যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) কেউ পল্লীপ্রাণতা ও 'নষ্টালজিক' ঘরে ফেরার কাতরতার দ্বারা বেশ অস্থির হয়েছেন (যেমন কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়) ; আবার কেউ কেউ বা গার্হস্থ্য পারিবারিক রসের উদ্বোধনায় তাঁদের কাব্যের শক্তিকে প্রধানত নিয়োজিত করেছেন (যথা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ)। কিন্তু এরা যিনি যাই করুন, রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রতিভার বলয়ের বাইরে যাওয়ার শক্তি এদের কারুরই ছিল না। কাজেই মূলতঃ মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করলেও রবীন্দ্র অনুগামী কবিসম্প্রদায়ের ছাপ নিয়েই এদের বাংলা কাব্য সংসার থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের জাত একেবারে আলাদা। তিনি মৃত্তিকা সংলগ্ন কবি, কবি-কথিত "মাটির কাছাকাছি" স্তর থেকে সমুদ্ভূত হয়েছেন। এসেই রবীন্দ্রোত্তর কবি সমাজের মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংস্কারটিকে সজোরে আঘাত করলেন। নজরুল গণ-মানসের কবি, নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণী মানুষের বন্ধু, চাষী ও মজুরের সত্যিকারের সুহৃদ্। তিনি একদিকে বাংলা সাহিত্যে সাম্যতন্ত্রের উদ্‌গাতা, অন্যদিকে বিদ্রোহের বাণীবাহক, অন্য অর্থে একদিকে হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রতীক। এ সমস্তই বাংলা ভাষায় নতুন সংযোজন। হিন্দু-মুসলমান মিলনাদর্শের অবশ্য কিছুটা পূর্ব-নজীর ছিল, রবীন্দ্রনাথই সেই নজীর ; কিন্তু সাম্য আর বিদ্রোহের এমনকি অস্পষ্ট পদপাতও বোধহয় এর আগে বাংলা কাব্যের অঙ্গনে শ্রুত হয়নি। অত্যাচারিত শোষিত দুর্গত জনমানুষের দুঃখ বেদনার সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিতে নজরুলের কবিতা শুরু থেকেই এমন ভরপুর যে, এই নয়া আবির্ভাবের জাত গোত্র চিনতে কারুরই এতটুকু ভুল হওয়ার যো ছিল না। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল সর্বহারার কবি রূপে অভিনন্দিত ও সংবর্ধিত হলেন।

বিদ্রোহ অবশ্য নানা ধরনের হতে পারে। নজরুলের বিদ্রোহের ধরণটা কী প্রকার ছিল তা এক নজর পরখ করা যেতে পারে। নজরুলের বিদ্রোহ ছিল অত্যাচারী শোষক ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের পক্ষে ; শক্তিমানের মদমত্ততার বিরুদ্ধে দুর্বলের পক্ষে ; জাত্যাভিমান বর্ণাভিমান শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ধনাভিমান ধর্মাভিমান প্রভৃতি সকল প্রকার দম্ভ ও দর্পের বিরুদ্ধে ওই অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের শিকার সাধারণ মানুষের পক্ষে। এই বিদ্রোহের সুর একেবারে অভিনব, বাংলা কাব্যে এমনতর বিদ্রোহের অনুরণন আগে কখনও শোনা যায়নি। এই বিদ্রোহের সুরে যেমন আছে একটা দৃপ্ত প্রতিবাদের ভঙ্গী, তেমনি আছে একটা রুদ্র তেজের ঝলক। অন্যায় অসহিষ্ণুতা থেকে এই তেজোবহ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে— তার ছটায় ছটায় ক্রোধ ও রোষের স্ফুলিঙ্গ।

নজরুলের সমসময়ের কবি 'মরীচিকা' ও 'মরুশিখা' প্রণেতা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও তাঁর কাব্যে এক ধরনের বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে বিদ্রোহের ধাঁচ ধারার ভিতর শ্রেণী চেতনার কোন দ্যোতনা ছিল না, ছিল না লড়াইয়ের কোন মনোভাব। সে-বিদ্রোহ একান্তভাবেই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং নিছক কাব্যের স্তরে সীমিত। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক আনন্দবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দুঃখবাদকে প্রতিস্পর্ধী রূপে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এবং জীবন যে কেবলমাত্র আনন্দময়ই নয়, তার পাকে পাকে দুঃখের কষ্ট জড়ানো তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দুঃখী মানুষের বেদনার কথা বলেছেন কিন্তু যারা দুঃখী মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল তাদের বিরুদ্ধে দুঃখী মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে বলেননি। নজরুল সে-কাজটি করেছিলেন।

যদিও সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হবে যে পরবর্তীকালে ওই সংগ্রামের তূর্য ঘোষণা সুকান্তের কবিতায় যে রকম একটা ব্যাপ্ত তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে, নজরুলের কাব্যে তেমন ঘটবার অবকাশ মেলেনি। তবে এটা লক্ষ্য করবার মত যে নজরুল শোষিতদের প্রতি বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের কায়দায় শ্রেণী-সংগ্রামের

আহ্বান না জানালেও, নিজেই তিনি শোষিতদের হয়ে তাদের শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে সুতীব্র জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সকলের হয়ে একাই প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়েছিলেন।

এই একপাণি সংগ্রামের কারণেই তাঁর কবিতায় এমন আবেগের প্রাবল্য, শক্ত-হাতে-ছিলা-বাঁধা ধনুকের এমন ক্রেঙ্কার-টঙ্কার। 'বিদ্রোহী' কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা যেন আবেগের ঝড় বয়ে গেছে, সেই ঝড়ের দ্রুতগতি শব্দ-তুফানের মুখে দাঁড়িয়ে স্থির থাকা কঠিন। আগ্নেয়গিরির অগ্নি মুখ থেকে শব্দের লাভাস্রোত যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে এমনি ধারাসার ওই প্রবাহের অবিশ্রান্ততা। আবৃত্তির মাধ্যমে শুনলে মনে হয় যেন ধ্বনির অন্তহীন, ক্লান্তিহীন শিলা বৃষ্টি হচ্ছে।

কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার দাবি করেছিলেন যে, তাঁর 'আমি' নামক কাব্যভঙ্গিম গদ্য-প্রবন্ধের আদলে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচিত। এই অভিযোগের ভিত্তিহীনতা নজরুল নিজেই প্রতিপাদন করে গিয়েছেন একদা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গুরু শিষ্যের, দ্রোণগুরু ও একলব্য-শিষ্যের, ঐতিহাসিক উত্তর-প্রত্যুত্তরের লড়াইয়ের মধ্যে। তবুও তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বিদ্রোহী কবিতা 'আমি'-র আদলে রচিত, তাতেই বা কী? এই দুইয়ের রচনা ভঙ্গীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য একটি নিছক বিবৃতিমূলক গদ্যরচনা, অন্যটির কুহরে কুহরে 'সৃষ্টিসুখের উল্লাস' যেন ফেটে পড়তে চাইছে। বিদ্রোহী কবিতার ইতস্ততঃ চয়িত যে কোন স্তবক নিলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে।

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি;
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ
আমি হাম্বির, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চলচঞ্চল ঠমকি ছমকি,
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি,
ফিং দিয়া দিই তিন দোল!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল!

কিংবা অন্য একটি স্তবক:

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা--
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি
আমি ধূমকেতু জ্বালা বিষধর কাল-ফণী
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী
আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

এইরূপ কবিতাটির সর্ব অঙ্গ ছেয়ে এক ভাবাবেগের প্লাবন বয়ে গেছে। আগাগোড়া একটা অস্থিরতা, অশান্ততা, প্রাণশক্তির উদ্দামতা। শাসন-নাশন বারণ-বন্ধন না মানা প্রবৃত্তির অবারিত উচ্ছ্বাস। নজরুল তাঁর 'আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' কবিতায় লিখেছেন— "আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে/ বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!' বিদ্রোহী কবিতার সকল অবয়ব জুড়ে এই দুয়ার ভাঙা জোয়ারের কল্লোল লক্ষ্য করা যায়। আর শুধু বিদ্রোহী কবিতাই বা বলি কেন, 'সাম্যবাদী', 'আমার [illegible] 'কামাল পাশা' প্রবাহ

তরুর সারি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রচনাগুলির সব কযটির বাঁধুনির মধ্যেই কি এই আবেগের উচ্ছলতা লক্ষণীয় নয়? এমনকি তাঁর আপাত-মধুর প্রেমের গানগুলিও কি এই লক্ষণ মুক্ত? মানুষটি যিনি ছিলেন আপাদমস্তক আবেগে জরোজরো, আশৈশব প্রাণচঞ্চল চিত্তের সহজাত স্ফূর্তিপ্রাচুর্যে ভরপুর, তিনি তাঁর কবিতার গঠনে ও বিন্যাসে আবেগকে বাদ দিয়ে চলবেন, একি কখনও ভাবা যায়?

নজরুল কাব্যের এই আবেগ-সমৃদ্ধিকে উন্নাসিক সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ অনুৎকর্ষের একটি প্রমাণ বলে গণ্য করেন এবং বলতে চান যে, তাঁর কবিতার বাঁধুনিতে যে আঙ্গিকগত শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়, প্রায়শঃ যে শব্দের যথেচ্ছাচার চোখে পড়ে তাঁর কবিতার ধ্বনিবিন্যাসে, তার মূল লুক্কায়িত রয়েছে এই আবেগাতিশয্যের মধ্যে! অর্থাৎ কিনা, জবজবে আবেগের সংক্রমণের কারণে তাঁর কবিতায় অনেক সময়ই মাত্রাসাম্য রক্ষিত হয়নি, কবিতার গঠনগত পারিপাট্যের দিকটা প্রায়শঃ সেখানে অবহেলিত থেকে গেছে। নজরুল কাব্য রবীন্দ্রকাব্যের মত ছিমছাম, সুবিন্যস্ত নয়; 'ফর্ম'-এর সংহতি ও সংযম তাঁর কবিতার গুণাবলীর মধ্যে পড়ে না। ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই অভিযোগের বয়ানের ভিতর কিছুটা সারবত্তা আছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে এই অভিযোগ লক্ষ্যভেদী নয়। অভিযোগটির যথার্থতা স্বীকার করবার হেতু নেই। যে কবি বাংলা কাব্য সংসারের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিপরীতাচরণে সম্পূর্ণ নতুন কথা বলবার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন, যিনি বাংলা কবিতায় নয়া এক আয়তন যোগ করবার জন্য বদ্ধপাণি হয়েছেন, তাঁর রচনায় আবেগের প্রাবল্য না থাকাটাই তো একটা বড় রকমের বিচ্যুতি বলে গণ্য হওয়া উচিত। কাজেই যেটাকে আবেগের অতিরেক বলে মনে হচ্ছে সেটা নজরুল-কাব্যের অনুষঙ্গে আবেগের অতিরেক নয়, আবেগের ঐশ্বর্য।

আর তাছাড়া, সর্বহারা মানুষের কাছাকাছি স্তরে রয়েছেন এমন যে কবি, তেমন মৃত্তিকা সংলগ্ন শ্রেণী সচেতন জনজীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় এক কবি নাগরিক বৈদগ্ধ্যের পরিশীলিত আঙ্গিকে, পরিপাটি শব্দশৈলীতে, কবিতা রচনা করবেন এটা কেমন করে আশা করা যায়? নজরুলের কবিতায় আবেগের প্রাচুর্য কি অমনি এসেছে? এসেছে তাঁর শ্রেণী চেতনার সূত্রে, শ্রেণী-বিভক্ত মানসিকতা-সঞ্জাত বুর্জোয়া জীবনাদর্শের প্রতি বৈরিতার সূত্রে। কায়েমী স্বার্থবাদী সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষগুলির শোষক স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করবার জন্য যাঁর কবিতায় আয়োজনের সীমা-পরিসীমা নেই তিনি নাগরিক কবিসুলভ দরবারী শব্দকলার আশ্রয় নিখুঁত ছন্দ-মিল-ধ্বনি বিশিষ্ট ছিমছাম সাফ্ সুতরো কবিতাদেহ গঠন করবেন, জনতার কবির কাছ থেকে এ এক অসার প্রত্যাশা।

শিল্পের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে এ কথা আমাদের খেয়াল রেখে চললে ভাল যে আঙ্গিক পারিপাট্য সব সময়ই শিল্পের ঔজ্জ্বল্যের দ্যোতক নয়, কখনও কখনও সেটা শিল্পের রক্তহীনতাকে ঢাকবার একটা প্রকরণ। পোশাকের আড়ম্বর তথা সুদৃশ্যতা স্বতঃই দেহের সুস্থতা সূচিত করে না। তা বিপরীত অবস্থাকে আড়াল করবার একটা কৌশল হওয়াও সম্ভব। নজরুলের কবিতার বক্তব্য এত বেশী জোরালো আর তেজালো যে, তার জন্য সর চড়াবার কিছুটা প্রয়োজন ছিল বইকি। মিহি মোলায়েম ভঙ্গীতে কখনও কি বিদ্রোহের আমেজ আনা যায়, নাকি পরিপাটি সংহত সুবিন্যস্ত ভাষার আদলে সংগ্রামী মনোভাবকে প্রকাশ করা চলে?

দুই

নজরুলের কবিতায় মুসলমানী অর্থাৎ আরবী-ফার্সী শব্দের আধিক্য কারও কারও কাছে নাকি তেমন প্রীতিপ্রদ নয়। অনুমান করা কঠিন নয় এই আপত্তি গোঁড়া হিন্দুমহল থেকে আসাই স্বাভাবিক, যাঁদের অনেকেরই রুচি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংস্কারে গঠিত ও পঠিত। এঁদের কান সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব

শব্দেব ধ্বনিভঙ্গিমায এতটাই অভ্যস্ত যে, মুসলমানী শব্দেব বাহুল্য তো অনেক পবেব কথা, খাঁটি দেশজ শব্দেব বহুল প্রযোগটাও এবা সহজে ববদাস্ত কবতে পাবেন না। সংস্কৃতেব স্পর্শ বাহিত, যে কোন শব্দই ওঁদেব কুলীন কানে খট্ কবে গিযে বাজে। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে নিকষ হিন্দুয়ানী কর্ষিত কানে 'খুন', 'লুট', 'পানি', 'গোস্ত', 'বেহেস্ত' প্রভৃতি শব্দ যে কত অচল ঠেকবে তাতে আব আশ্চর্য কী। নজরুলেব একাধিক কবিতায আববী ফার্সী শব্দেব ছড়াছড়ি বযেছে। বিশেষ কবে তাব 'কামাল পাশা', 'শাতিল আবব', 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী' প্রভৃতি কবিতায এইসব শব্দেব সর্বাধিক বাহুল্য লক্ষ্য কবা যায। নজরুল এটা অকাবণে কবেননি। কবিতাব বিষযবস্তুতে যেখানে যে পবিবেশ বর্ণনীয, তাব ভাবটিকে পবিস্ফুট কববাব জন্যই কবি সচেতনভাবে এইসব শব্দ প্রকবণেব আশ্রয নিযেছেন। কখনও কখনও দেশী বা মুসলমানী শব্দেব সাহায্যে উদ্দিষ্ট অর্থ আবও বেশী ভাবদ্যোতক কবা যায, সেই কাবণেই তাঁব এইসব শব্দেব প্রতি পক্ষপাত।

নজরুলই যে প্রথম মুসলমানী শব্দেব প্রতি এমনতব পক্ষপাত দেখালেন তা নয। তাবই অব্যবহিত আগে ও সমসমযে হিন্দু কবি মোহিতলাল মজুমদাবও তাব 'স্বপন পসাবী' ও 'বিস্মবণী' কাব্যগ্রন্থদ্বযে আখছাব মুসলমানী শব্দ ব্যবহাব কবেছেন কবিতায অভিপ্রেত ভাব পবিস্ফুটনেব উদ্দেশ্যে। মোহিতলালেব 'নাদিব শাহ', 'কালাপাহাড', 'নবজাহান' প্রভৃতি কবিতা এ কথাব সবচেযে বড সাক্ষ্য। ঠিক ঠিক মনোমত ভাব ফোটাতে লাগসই শব্দ — তা সে শব্দ যে ভাষাবই হোক না কেন — যাদুব মত কাজ কবে মোহিতলাল আব নজরুলেব কবিতাব সংশ্লিষ্ট উদাহবণগুলি থেকে তাব প্রমাণ মিলতে পাবে। ('কামাল পাশা') কবিতাব 'কামাল, তু নে কামাল কিয়া ভাই' কথাটি এইভাবে না বলে যদি অন্যভাবে বলা হতো যে কামাল তুমি কী আশ্চর্য বিস্মষ সংঘটিত কবেছ — তাহলে থাকত না হাব ও জনপ্রাণেব দোলা, না থাকত বক্তব্য বিষযেব তির্যক তৎপর্য। লাগসই কথা লাগসই ভাবে বলতে পাবাব মত শিল্পসিদ্ধি আব কিছু কি আছে?

অন্যপক্ষে, কাজী সাহেবকে সম্পূর্ণ বিপবীত মহল থেকেও সমালোচনাব সম্মুখীন হতে হযেছে একই ধবনেব কাবণে। তিনি মুসলমান কবি হযে তাঁব কবিতায এত হিন্দু দেবদেবীব প্রসঙ্গেব উল্লেখ কবেন কেন, কথায কথায এত বেশী বামাযণ মহাভাবত পুবাণাদিব নজিব টেনে আনেন কিসেব ঝোঁকে — এই প্রশ্ন এবং অনুরূপ ধবণেব প্রশ্নে বাববাব তাব কবিতাব বিরুদ্ধে উদ্ধত হযেছে মোল্লা মৌলবী মহল থেকে কিংবা তাদেবই চিন্তাব দ্বাবা প্রভাবিত গোডা মুসলিম পাঠকসম্প্রদায থেকে। নজরুল নিজেই এই দুই ধাবাব আপত্তিকাবকদেব আপত্তিব ভাষাটাকে রূপ দিযেছেন এইভাবে—

'মৌ লোভী যত মৌলবী আব 'মোল্‌লাবা' কন হাত নেডে,
'দেব দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটাব জাত মেবে।
ফতোযা দিলাম কাফেব কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে বাজী ও।
'আম পাবা' পডা হাম বডা মোবা এখনো 'বেডাই ভাত মেবে।'
হিন্দুবা ভাবে, ফার্সী শব্দে কবিতা লেখে ও পা'ত নেডে।'

কবিতাব অনুপ্রাস ও তদন্তর্গত ব্যঙ্গ লক্ষণীয। কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপেব কথা থাক, আসল কথা নজরুল তাঁব কবিতায হিন্দু প্রসঙ্গ আব মুসলিম প্রসঙ্গেব সহাবস্থানেব মধ্য দিযে বিগত পাচশত বছবেব ভাবতীয সংস্কৃতি যে মূলতঃ হিন্দু-মুসলমানেব যৌথ চেষ্টায গঠিত সংস্কৃতি সমন্বযেব ফলশ্রুতি, সেই ভাবটিকেই প্রকাশ কববাব চেষ্টা কবেছেন কবিত্বেব আধাবে। হিন্দু মুসলমানেব মিলিত প্রযাসে গডা যুগ্ম সংস্কৃতিব ভাববস্তুব রূপাযণে কখনও তাব হিন্দু স্বরূপটাব উপব বেশী ঝোক পডেছে, কখনও প্রযোজনে মুসলিম স্বরূপটিকে পাঠকেব মনোযোগেব কেন্দ্রমধ্যে এনে উপস্থিত কবা হযেছে। কিন্তু ওই দুই বকমফেব সত্ত্বেও

এই দৃষ্টিতে যদি আমরা বিদ্রোহী কবির কাব্য-কবিতাকে বিচার করি তাহলে তাঁর রচনা কখনও কেন হিন্দুর পোশাক প'রে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনও মুসলমানী পোশাক প'রে— তার কারণটা ধরতে পারব। আর শুধু কবিতার কথাই বা বলি কেন, গানেও কি কবির একই মনোভাব কাজ করেনি ? এই যে নজরুল প্রায় একই সময়ে, বলতে গেলে প্রায় একই নিঃশ্বাসে, ইসলামী গান ও হিন্দু ভক্তিসঙ্গীত রচনা করেছেন— তাকে ধর্মের দৃষ্টিতে না দেখে কি এই দৃষ্টিতে দেখা চলতে পারে না? এ বড় আশ্চর্য যে, যিনি নবীর গান লিখেছেন, মারফতি মুর্শিদা ভাবের বাউল গান লিখেছেন, ঈদের চাঁদের বন্দনা লিখেছেন এমনকি মুসলমানী ছাদ-পেটানো গান লিখেছেন; তিনিই আবার মন মেজাজের আরেকটা ফেরতার সময় শ্যামাসঙ্গীত কীর্তন, কালীকীর্তন ইত্যাদি ধরনের গান লিখে লিখে গানের খাতা ছয়লাপ করে দিয়েছেন। যখন যিনি এসে যে ভাবের গানের ফরমায়েস করেছেন— তা ইসলামী গানই হোক আর হিন্দু দেবদেবীর গানই হোক— এক অসাধারণ সৃষ্টিকুশল কবি ও গীতিকারের স্বতঃস্ফূর্ত কলমের মুখে স্বতোৎসার ও অবিরল ধারায় সেই গানের স্রোত নির্বারিত হয়ে এসেছে!

এর ভিতর যাঁরা ধর্মের উন্মাদনা খুঁজতে যান তথা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আবিষ্কারে সচেষ্ট হন তাঁরা তাদের রুচি অনুযায়ী তা করতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে বিবাদ করবার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু আমাদের চোখে নজরুলের এই সাধনার তাৎপর্য ভিন্ন। তাঁর সাধনা ধর্মীয়তার সাধনা নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ী রূপটাকে তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরার সাধনা। গোটা প্রয়াসটার ঝোঁক হলো সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক নয়। এই কথাটা যত আমরা বেশী বুঝতে পারব, নজরুলের প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা তত কমবে। নজরুলকে আধ্যাত্মিক যোগী বানাবার চেষ্টা, তাও প্রকট হিন্দুত্বের রঙে রঞ্জিত করে— মহল বিশেষের কারসাজি মাত্র, তাতে সত্যের জোর নেই।

তিন

কিন্তু নজরুল কি শুধুই বিদ্রোহী কবি? সংগ্রামী কবি? তাঁর কাব্যবীণায় কেবলই কি রুদ্ররাগের ক্রেঙ্কার-ঝঙ্কার বেজে উঠেছে? তিনি কি একই কালে প্রেমিক কবিও নন? তা যদি না হয় তো 'অগ্নিবীণা', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলির পাশে পাশে 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সিন্দু-হিল্লোল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করলেন কেমন করে? শিশুর মনোলোভা 'ঝিঙেফুল' কবিতার বইটিই বা তাঁর লেখনী মুখ থেকে নির্গত হলো কী উপায়ে? এই আপাত-বিসদৃশ্য দুই ঘটনার সহাবস্থান বা সমবর্তিতা থেকে এই কথারই কি প্রমাণ হয় না যে যিনি বিদ্রোহী তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক? অথবা যিনি শ্রেষ্ঠ প্রেমিক তিনিই জীবনের কোন না কোন পর্বে বিদ্রোহের বেশ ধারণ করতে বাধ্য হন? মানুষের প্রতি ভালবাসার টানেই তিনি বিদ্রোহের পথে আসেন, তাঁর প্রেমই তাঁকে বিদ্রোহীর বর্ম অঙ্গে ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী-বিপ্লবীরাই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক এ কথার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় আমরা বারেবারেই পেয়ে এসেছি। বিপ্লব-বিদ্রোহ প্রেমের আবেগেরই একটা রূপান্তরিত বেশ মাত্র।

কবি নজরুল সৃষ্ট নবরাগ

অমলকুমার মিত্র

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিষয় হয়ে উঠেছিলেন নিজের বিশ বছর বয়েসে, বিংশ শতাব্দীব বিশের দশক থেকে। তখন থেকে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর কাল পর্যন্ত নজরুল বিষয়ক বচনার পাহাড জমে গেছে; গ্রন্থ বচনাব সংখ্যাও যথেষ্ট। এই অবস্থায তাঁর সম্পর্কে নতুন কথা কি বলবাব আছে সেটা ভাববার বিষয।

প্রথমেই মনে হয, কবির সাংগীতিক অবদান অন্যান্য সৃষ্টির অনুপাতে বৃহত্তম। আর এই বৃহত্তম অংশই আমাদের আংশিক আযত্তাধীন। তিনি মোট কতসংখ্যক গান লিখেছিলেন এখনও আমরা নিশ্চয করে বলতে পারিনা, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সব গীতি কবিতাব সুরও জানি না, যে সুর শুনি তার সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হতে পাবি না। অর্থাৎ বিষযটি গবেষণাধীন। সুখের বিষয় এই যে গবেষণা থেমে নেই, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায ঐকান্তিক অনুসন্ধান চলছে।

কবি নজরুল ইসলাম সৃষ্ট সতেরোটি নতুন রাগ আমরা পেযেছি কথা, সুর ও স্বরলিপি সমেত। এইগুলির আলোচনা যে একেবাবে হযনি তা নয। কিন্তু কখনও তা প্রশস্তিমূলক, কখনও বা অনাদর সূচক। সুতরাং এই আলোচনাটিকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করাব একটি কর্তব্য রযে গেছে। সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে এই বিষয়ে বিতর্ক এড়িয়ে।

সুদূর অতীতের ছয রাগ ছত্রিশ রাগিনী কালক্রমে সৃষ্টিশীলতা ও চিন্তার নানা বিবর্তনে বিপুলভাবে বিস্তৃত হয়েছে। রাগ-রাগিনীর সংখ্যা মোট কত হতে পারে এ সম্পর্কে একটি শাস্ত্রবাক্য পাওয়া গেছে। প্রাচীন বাংলার সংগীতশাস্ত্র আলোচিত যে গ্রন্থটি একালে পাওয়া গেছে সেটি লোচন পণ্ডিতের রচিত রাগতরঙ্গিনী। লোচন পণ্ডিত জানিয়েছিলেন, প্রাচ্য দেশে প্রচলিত রাগ বারোটি — ভৈরবী, গৌরী, কর্নাট, কেদার, ইমন, সারঙ্গ, মেঘ, ধানশ্রী, টোড়ি, পূর্বা, মুখারী ও দীপক। এইগুলি 'জনক' রাগ। এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে ৮৬টি 'জন্য' রাগ। 'জন্য' রাগ সম্পর্কে লোচনের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নানা রাগের মিশ্রণে নতুন রাগ সৃষ্টি হয় এবং ওইসব মিশ্র রাগের মিশ্রণে নতুন নতুন সংকর রাগের উৎপত্তি হয়। লোচনের কালে এইরকম যত রাগ প্রাপ্ত ছিল সেগুলির নামও গ্রন্থকার উল্লেখ করেছিলেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন একালে অনাবিষ্কৃত 'তুম্বুরু' নাটকের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে—

> "দেশভাষাবিভেদাশ্চ রাগ সংখ্যা ন বিদ্যতে
> ন রাগানাং ন তালা নামন্তঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।"

এর অর্থ দেশের ভাষা যেমন স্বল্পবিভেদে অনন্ত, তেমনি রাগের সংখ্যাও অনন্ত, রাগ ও তালের শেষ কোথাও দৃশ্যমান হয় না।

এমনি সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার পরিচয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে কদাচিৎ পাওয়া যায়। রাগতরঙ্গিনী ও তম্বরু নাটক বল্লাল সেনের সমসাময়িক মনে করা হয় অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। এতকাল

আগে যে সম্ভাবনা তুলে ধবা হয়েছিল, তাকে বিগত আটটি শতাব্দীব মধ্যে যাচাই কবা গেছে। স্পষ্টই দেখা গেছে নতুন নতুন বাগেব উদ্ভাবন এই বিংশ শতাব্দীতেও থেমে যাযনি, আমাদেব জীবনকালেই অনেকগুলি নতুন বাগ সৃষ্টি হযেছে বিভিন্ন গুণীজনেব সৃষ্টিশীলতায।

সুদব অতীতেব ছয বাগ ছত্রিশ বাগিনীব কাল এখন পুবোপুবি কেটে গেছে কিন্তু কিছু প্রাচীন সংস্কাব থেকে আমবা সম্পূর্ণ মুক্ত হইনি। তাই এখনো বাগেব সঙ্গে 'বাগিনী' কথাটিও মাঝে মাঝে এসে যায। এই স্ত্রীলিঙ্গ বাচব শব্দটিব প্রযোজন সংগীতচর্চাব ক্ষেত্রে ফুবিযে গেছে। কাবণটা সহজেই অনুমেয। বাগসংগীতেব পবিবেশনায নির্ধাবিত স্বব ঠিকমত না লাগলে অভিযোগ ওঠে — গাযক বাগভ্রষ্ট হযেছে। কিন্তু আজপর্যন্ত এমন কোন অভিযোগ ওঠেনি যে গাযক সুবেব লিঙ্গভেদ ঘটিযেছে' কোনও সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থেও এমন ধবনেব বসভঙ্গেব কোন আলোচনা নেই বলেই জানি। সংগীতেব ক্ষেত্রে নামেব ব্যাকবণ থেকে লিঙ্গভেদ অবশ্য হতে পাবে, যেমন ভৈবব শব্দ পুংলিঙ্গ অতএব এটি বাগ, ভৈববী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ সুতবাং একে বাগিনী বলা হবে। সম্ভবত এই সংস্কাব অনুসাবে নজরুল তাঁব সৃষ্ট দোলনচম্পা বেণুকা ইত্যাদি বাগকে বাগিনী বলে উল্লেখ কবেছেন বেতাব জগৎ পত্রিকায সুবেশচন্দ্র চক্রবর্তী নজরুলেব লেখায হস্তক্ষেপ কবেননি বা এ বিষযে কবিকে দিযে সংশোধন কবিযে নেননি মাত্র এইটুকু মনে [illegible] দিন, [illegible] 'বাগ [illegible]' পৃষ্ঠা ১৭তে লিখেছেন:

"এখন সবই বাগ, বাগিনী বলে কোন কিছু নেই, - অর্থাৎ ভৈবব যেমন একটি বাগ ভৈববীও তেমনি একটি বাগ।"

নবরাগ সৃষ্টিব কাজে নজরুলেব অন্যতম সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ পবামর্শদাতা ছিলেন সুবেশচন্দ্র, তাই ওই সংশোধনেব সুযোগটিব কথা বলা হল।

বেতাব জগতেব একটি পৃষ্ঠা ষাটেব দশকে হস্তগত হযেছিল, যাতে নববাগ প্রসঙ্গে নজরুলেব একটি ছোট লেখা মুদ্রিত হযেছিল। লেখাটি ইতিমধ্যে একাধিকবাব উদ্ধৃত হযেছে। আলোচনাব সুবিধাব জন্য লেখাটি পুনবায উদ্ধৃত কবছি।

"দুটি বাগিনী: বেণুকা ও দোলনচাঁপা"।

'বেণুকা' ও 'দোলনচাঁপা' দুটি বাগিনীই আমাব সৃষ্টি। আধুনিক (মডার্ণ) গানেব সুবেব মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেযে বেশি অনুভব কবি তা হচ্ছে 'সিমিট্রি' (সামঞ্জস্য) বা 'ইউনিফবমিটি'ব (সমতা) অভাব। কোন বাগ বা বাগিনীব সঙ্গে অন্য বাগ বা বাগিনীব মিশ্রণ ঘটাতে হলে সঙ্গীত শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা বসবোধেব প্রযোজন তাব অভাব আজকালকাব অধিকাংশ গানেব সুবেব মধ্যে লক্ষ্য কবা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কাবণেই আমাব নূতন বাগ-বাগিনী উদ্ধাবেব প্রচেষ্টা। বাগ-বাগিনী যদি তাব 'গ্রহ' ও 'ন্যাস' এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিযে সেই বাস্তায চলে তাহলে তাতে কখনও সুবেব সামঞ্জস্যেব অভাব বোধ হবে না। ক্লাসিক্যাল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যে অভিনব বসসৃষ্টি হতে পাবে, মানুষেব মনকে 'মহতো মহীযান' কবতে পাবে তা আধুনিক সুবেব একঘেযে চপলতায সম্ভব হতে পাবে না। আব যাবা মনে কবেন হিন্দী ছাড়া বাংলা ভাষায খেযাল ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হতে পাবে না, আমাব এই গান দুটিব স্ববসমাবেশ ও তালেব, লযেব ও ছন্দেব 'কর্তব্য' তাদের সে ধাবণা বদলে দেবে। গানেব 'আঙ্গিক' বা মিউজিক্যাল টেকনিক বজায বেখেও এই শ্রেণীর গান কত মধুব হতে পাবে আশা কবি আমাব এই গান দুটিই তা প্রমাণ কববে।

সুব: বেণুকা—তেতালা
'বেণুকা ওকে বাজায মহুযা বনে,
কেন ঝড তোলে তার সুর আমাব মনে।'
সুর: দোলন চাঁপা — তেতালা

দোলন চাপা বনে দোলে

দোল পূর্ণিমা রাতে চাদের সাথে", ... কাজী নজরুল ইসলাম

কবিব আলোচ্য উদ্ধৃতিব মধ্যে 'বাগিনী' কথাটি বাদ দিযেও কিছু কিছু বক্তব্য নির্দ্ধিধায মেনে নিতে অসুবিধা বোধ হচ্ছে।

প্রথম কথা, গ্রহ, ন্যাস, বাদী, বিবাদী, ও সম্বাদী স্বব সম্পর্কে অতিবিক্ত গুরুত্ব আবোপ কবা হযেছে, যা নজরুলেব অজস্র গান বাধাব অভ্যাসেব মাধ্যে অনুভব কবা যাযনি। ব্যাপাবটি পবিষ্কাব কববাব জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীব সংস্কাবমুক্ত সর্বাধিক বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যাযেব সুবিখ্যাত গীতসূত্রসাব গ্রন্থেব কিছু লাইন উদ্ধৃত কবছি।

"কেহ বা বাগিনী সম্বন্ধে গ্রহ স্বব ও ন্যাস স্বব উল্লেখ কবেন, কেহ গীত সম্বন্ধে গ্রহ স্বব বর্ণনা কবেন, -- অর্থাৎ যে সুব হইতে গীত আবম্ভ হয, তাহাই গ্রহ স্বব, এবং যে সুবে গীত শেষ হয, তাহাই ন্যাস স্বব। আমাব মতে ঐ শেষোক্ত বিষযই যুক্তি ও ব্যবস্থা সঙ্গত বলিযা বোধহয, তাহাব দৃষ্টান্ত 'ভজ ভজবে মন ...' নামক চৌতালেব ইমনকল্যাণেব হিন্দী ধ্রুপদ সা হইতে আবম্ভ হয, এবং বি এ সমাপ্ত হয, '...' নামক ঐ বাগেব ধ্রুপদ প হইতে উত্থাপিত হইযা সা এ সমাপ্ত হয, 'আল্লা ... আবদ্দ ...' নামক ইমনকল্যাণেব খেযাল নি হইতে উত্থাপিত হইযা সা এ শেষ হয, 'ব্রহ্মমযী পবাৎপবা' নামক দাওযান মহাশয (বঘুনাথ বায) কৃত ইমনকল্যাণেব খেযালটি বি হইতে আবম্ভ হইযা সা এ সমাপ্ত হয, ইত্যাদি। ঐ সকল উত্থাপন ও সমাপ্তি স্থানান্তবিত হইলে ব্যভিচাব ঘটে।

বাগ বাগিণ্যাদিব গঠন ও অবযব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীযমান হয যে, তাহাদেব উত্থাপন ও সমাপ্তি কোন এক নির্দিষ্ট সুবে আবদ্ধ থাকিতে পাবে না। যে গাটে উহা গীত হয, তাহাব প্রত্যেক সুব হইতেই বাগাদি উত্থাপিত হইতে পাবে। সকল বাগ বাগিনীব সম্বন্ধেই ঐ নিযম। কেবল যে বাগে যে সুব বর্জ্জিত, অর্থাৎ ব্যবহাব হয না সেই সুব হইতে সেই বাগ উত্থাপিত হইতে পাবে না......।

পুবাকালেব গাযকগণ গান হইতে বাগ বাহিব কবিযা, তাহাব আলাপ সৃষ্টি কবিযাছেন, সেই আলাপে সকল বাগই সা হইতে উত্থাপন কবা ও সা এ শেষ হয, 'ব্রহ্মমযী পবাৎপবা' নামক দাওযান মহাশয (বঘুনাথ বায) কৃত ইমনকল্যাণেব খেযালটি বি হইতে আবম্ভ হইযা সা এ সমাপ্ত হয, ইত্যাদি। ঐ সকল উত্থাপন ও সমাপ্তি স্থানান্তবিত হইলে ব্যাভিচাব ঘটে।

বাগ বাগিণ্যাদিব গঠন ও অবযব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীযমান হয যে, তাহাদেব উত্থাপন ও সমাপ্তি কোন এক নির্দিষ্ট সুবে আবদ্ধ থাকিতে পাবে না। যে গাটে উহা গীত হয, তাহাব প্রত্যেক সুব হইতেই বাগাদি উত্থাপিত হইতে পাবে। সকল বাগ বাগিণী সম্বন্ধেই ঐ নিযম। কেবল যে যে সুব বর্জ্জিত, অর্থাৎ ব্যবহাব হয না, সেই সুব হইতে সেই বাগ উত্থাপিত হইতে পাবে না....।

পুবাকালেব গাযকগণ গান হইতে বাগ বাহিব কবিযা, তাহাব আলাপ সৃষ্টি কবিযাছেন, সেই আলাপে সকল বাগই সা হইতে উত্থাপন কবা ও সা এ শেষ কবাব প্রথা হইযা গিযাছে। কেবল এই স্থানে এই একটি মাত্র নিযম অধুনা নির্দিষ্ট আছে।"

এবাব কবি নজরুলেব নিযমিত গান বাধাব অভ্যাসটি লক্ষ্য কবা যাক। তিনি বাগভিত্তিক গান অনেক বেঁধেছেন, এক একটি বাগে বেশ কযেকটি কবে গানও বেঁধেছেন। ধবা যাক তাঁব ভৈববী সুবেব অবলম্বনে বাধা কযেকটি গান, যেগুলি বিভিন্ন চালেব ভিন্ন ভিন্ন ভাববসেব খুব জনপ্রিয গান। সেগুলি কোন্ স্বব থেকে শুরু হযেছে দেখা যাক :

সা থেকে শুরু	মোব ঘুম ঘোবে এলে মনোহব
ধা থেকে শুরু --	এস প্রাণে গিবিধাবী
[illegible]	আজি বাদল ঝবে

পা থেকে শুরু -	নিশি ভোর হল জাগিয়া
দা থেকে শুরু —	সখি আর অভিমান
ণা থেকে শুরু —	আমারে চোখ ইশারায়
র্সা থেকে শুরু	মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি

এরকম উদাহরণ অজস্র দেওয়া যায়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এইযে কৃষ্ণধনবাবুর এতামত নজরুলের সৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে এসেছে। এইসব গানের ক্ষেত্রে গ্রহ, ন্যাস, বাদী বিবাদী স্বর নিয়ে একটুও মাথা না ঘামিয়ে অত্যন্ত সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবি এইসব সার্থক গান বেঁধে চলেছিলেন। হঠাৎ নবরাগ সৃষ্টির পর্যায়ে গ্রহ ন্যাস প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দিলেন কেন? তাঁর বহুকথিত বিদ্রোহী সত্তা প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে অবদমিত রইল কেন?

কৃষ্ণধনবাবু গীতসূত্রসারে আরো লিখছেন·

"সংগীতে আরও এক সংস্কার এই যে, রাগের বাদী সম্বাদী অনুবাদী ও বিবাদী প্রভৃতি চতুর্বিধ স্বর ব্যবহার, যদ্বারা রাগের মূর্তি প্রকাশিত হয়। এই সংস্কারেও স্থানে স্থানে ভ্রম লক্ষিত হয়, এবং ইহারও মূল সংস্কৃত গ্রন্থ।.....আধুনিককালে উক্ত বাদী সম্বাদী প্রথা কেহ এখন বড় লক্ষ্য করে নাই ইহা নিশ্চয়। বরং বাদী সম্বাদীর উল্লেখ করিলে রাগ শিক্ষার সাহায্য হওয়া দূরে থাক, যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়, কেননা রাগের মধ্যে বাদী সম্বাদী সুরের নিশ্চয় হয় না। সংস্কৃত শাস্ত্রেও বাদী সম্বাদী সম্বন্ধে নানা মত।"

কবির পূর্বোক্ত বক্তব্যের এই কথাটি অবশ্য স্বীকার্য যে গান নিয়মের সাথে ঠিক খেয়াল বাঁধা সম্ভব। এও মানি, উচ্চাঙ্গ সংগীত আমাদের যে সৌন্দর্যসৃষ্টির আদর্শ দেয় তা আধুনিক গানে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাব্যসংগীত এবং রাগসংগীতের উপস্থাপন প্রণালীর পার্থক্যটি মনে না রাখলে চলবে না। খুব সংক্ষেপে সে পার্থক্য এইভাবে দেখানো যেতে পারে:

কাব্যসংগীত (যে কোন ধরনের) ফিক্সড কম্পোজিশন (Fixed Composition)

কথা, সুর, ছন্দ ও লয়ের এই সুনির্দিষ্ট সাংগীতিক নিদর্শন একইভাবে হয় সম্পূর্ণ রূপে কিছু যোগ বিয়োগ না করে পরিবেশিত হয়।

সুরে রাগের অবলম্বন থাকুক বা না থাকুক।

ক্লাসিক্যাল সংগীত = ফিক্সড কম্পোজিশন (বন্দিশ) + ক্রিয়েটিভ কম্পোজিশন।

অর্থাৎ বন্দিশের উপস্থাপন ছাড়াও যুক্ত হবে বন্দিশের রাগের রূপে গায়কের সৃজনশীল ও প্রথাগত সাংগীতিক কলা কৌশল। ধ্রুপদের প্রথা একরকম, খেয়ালের আরেক রকম এই প্রথাগত কৌশল বাদ দিয়ে শুধু বন্দিশ গাইলে রাগসংগীতের Norm বা আদর্শ পালিত হয় না। বন্দিশটি চমৎকার হলেও নয়।

এখন দেখা যাক, কবি তার সৃষ্ট নতুন রাগের গানগুলি কিভাবে শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন।

বেতার কেন্দ্র থেকে কবির ছয়টি নবরাগ প্রথম প্রচারিত হয়েছিল জগৎ ঘটক রচিত 'উদাসী ভৈরব' গীতিনাট্যের মাধ্যমে। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কবির সৃষ্ট অরুণ ভৈরব, আশা ভৈরবী, শিবানী ভৈরবী, রুদ্র ভৈরব, যোগিনী ও উদাসী ভৈরব রাগের গানগুলি। অনুষ্ঠানটি পরিকল্পিত হয়েছিল বেতারের সবরকম শ্রোতার জন্য। সকলের ভাল লাগলেই সৃষ্টি সার্থক বিবেচিত হবে। অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে রাগসংগীতের শ্রোতাদের জন্য করা হয়নি, সেজন্য নবরাগের গানগুলি যথার্থ রাগসংগীতের প্রথায় উপস্থাপিত হয়নি বা রাগপ্রধানও করা হয়নি। কবি বহু যত্নে ভাব ভাষা ও সুরের সংগঠনে যে নিটোল সাংগীতিক নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন, তাকে বিশৃংখল করে রাগের জৌলুশ দেখানো কবির অভিপ্রেত ছিল না বলেই মনে হয়, তাই সম্ভবত তিনি গীতিনাটিকার আশ্রয় নিয়েছিলেন যাতে নবরাগের গান

কাব্যগীতির আদর্শেই প্রচার করা যায় ও সাধারণ শ্রোতাকে আকর্ষণ করা যায়। রাগসঙ্গীতের শ্রোতা নবরাগ শুনবেন ওই গান শোনার মধ্যেই, বুঝবেন এই কথাও যে এগুলির সুর কোন প্রচলিত রাগের অনুরূপ নয়। কবির অভিপ্রায় এইভাবে অনুমান করা হল এই জন্য যে উদাসী ভৈরবের পর তাঁর আরও ছয়টি নবরাগের গান পুনরায় প্রচারিত হল বেতারে, 'নবরাগ মালিকা' শীর্ষক গীতিনাটিকার পরিকল্পনায়। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কবির সৃষ্ট নির্ঝরিণী, বেণুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা ও দোলন চম্পা রাগের গানগুলি, সংযোজিত হয়েছিল উপযুক্ত কবিতার মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে কবি এক একটি নবরাগে মাত্র একটি করেই গান বাঁধলেন। নবরাগকে রাগসঙ্গীতের আদর্শে প্রতিষ্ঠা করতে হলে একই রাগে ভিন্ন তালে ধীর লয়ে আরো গান বাঁধা জরুরী ছিল। তাতে রাগটির আলাপ করার পদ্ধতি বুঝে নেওয়া যেত, কিছু তান বিস্তার ও ব্যবহার করা যেত। রাগ তো শুধু কণ্ঠেই গাওয়া হয় না, যন্ত্রেও বাজানো হয়। যন্ত্রী শুধু গৎ বাজান না, একটু আলাপ করেন, যন্ত্রের প্রথাগত নানা প্রক্রিয়াও পরিবেশন করেন। কিন্তু রাগ স্রষ্টা তার জন্য কি পথনির্দেশ করলেন? রাগস্রষ্টা স্বরবিস্তার দেননি, পকড় দেননি। শুধু একটি আরোহন অবরোহন পরম্পরা ও বাদী সম্বাদী স্বরের উল্লেখ করলেই কি রাগের ধ্যানরূপ বোধগম্য হয়? একই রাগে অনেকগুলি গান শুনলে রাগের প্রকৃতি বোঝা যায় এবং তখনই রাগটি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যায়। কবি ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্ট নবরাগ পুরোপুরি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদর্শে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে বিচক্ষণ শ্রোতাদের জন্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু সেরকম কোন ঘটনার কথাও জানা যায়নি। কবি বনকুন্তলা রাগে দুটি গান বেঁধেছেন কিন্তু দুটি গানের কোনটিতেই কোন ক্রিয়েটিভ কম্পোজিশন গায়কের জন্য রাখেননি, যা করবার তিনি নিজেই গানের সুরের মধ্যে করে দিয়েছেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হয়ত করা চলে যে নবরাগে কবি ধ্রুপদ বা খেয়াল গায়কের প্রথাগত অভিলাষ পূর্ণ করতে চাননি। বাংলা গানের সুরে নতুনত্ব সৃষ্টিই কবির মূল প্রয়াস। আর এই নতুনত্ব প্রচলিত রাগের চলন এড়িয়ে সুরবিন্যাসে মৌলিক ছাঁদ নির্মাণ করা। লক্ষণীয় যে নবরাগের প্রত্যেকটি গানই চার কলিতে বিস্তৃত। খেয়াল গায়ক-গায়িকার ছড়িয়ে গাইবার সুবিধার জন্য কবি প্রচলিত রাগে কয়েকটি দু কলির গানও বেঁধেছিলেন (মেঘ মেদুর বরষায় ইত্যাদি) কিন্তু নবরাগের ক্ষেত্রে তিনি গীতিকবিতার আয়তন হ্রাস করেননি কারণ তাতে নবরাগের সমগ্র ছাঁদটি পরিস্ফুট হত কিনা সন্দেহ।

এবার একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যাক। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে কবিকে আমরা গ্রহন্যাস সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হতে দেখেছি। কিন্তু নবরাগগুলির স্বর নির্ধারণে গ্রহ ও ন্যাস স্বর যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেনি, উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

সা থেকে ধরা হয়েছে এইসব রাগ বা গানগুলি—

দোলন চাঁপা, বেণুকা, অরুণ রঞ্জনী, নির্ঝরিণী, বনকুন্তলা, শিবানী ভৈরবী, রুদ্র ভৈরব, আশা ভৈরবী ও উদাসী ভৈরব।

পা থেকে ধরা হয়েছে এইসব রাগ বা গানগুলি---

দেবযানী, রূপমঞ্জরী ও যোগিনী।

গা থেকে ধরা হয়েছে—

শিব-সরস্বতী ও শঙ্করী।

আবার ন্যাস বা সমাপ্তি স্বর ধরলে সা ন্যাস স্বর হচ্ছে দোলন চাঁপা, মীনাক্ষী, রূপমঞ্জরী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা, শঙ্করী, অরুণ ভৈরব, আশা ভৈরবী, উদাসী ভৈরব রাগগুলির বেলায়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে কবির ক্ষুরধার সাঙ্গীতিক বোধ দিয়েই নবরাগগুলি সৃষ্টি হতে পেরেছে ভিন্ন ভিন্ন রকম বৈচিত্র্যে। শুধু ব্যাকরণের শুষ্কপথে চলতে হলে সৃষ্টিশীলতা যে ধাক্কা খেত তা বলাই বাহুল্য।

দিন ও রাত্রির এবং সন্ধিপ্রকাশের সময় অনুযায়ী স্বর নির্বাচন সম্পর্কে কিছু সাধারণ নিয়ম পালিত

হতে দেখা যায়। কবির নবরাগ নির্মাণের ক্ষেত্রে সে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কোন্‌টি সকালবেলার, কোন্‌টি বেলা শেষের, কোন্‌টির সময় চাঁদ উঠেছে, কোন্‌টির সময় ভোর হয়ে এল- সেসবের ইঙ্গিত দেওয়া আছে গীতিকবিতার ভাব ও ভাষার মধ্যে। সকালবেলার নবরাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কবি আমাদের সমস্যা-পীড়িত সমাজ পরিত্যাগ করে চলে গেছেন শিব ঠাকুরের আপন দেশে, সতীহারা উদাসী ভৈরবের কল্পলোকে! দোলন চাঁপার ভাবনা ঘনীভূত করেছেন 'পূর্ণিমা রাতে'- তার চিত্রকল্পে রয়েছে 'রাধার দোলনা', 'দেবকুমারীর শুভ্র হাসি', 'গোপিনীর গোপন আনন্দ', 'চুরি করা শ্যামের নূপুর' প্রভৃতি। প্রথমে প্রেমানুভূতির রোমান্টিক চিত্রকল্পে চাঙ্গ দিয়েছেন চিরন্তন নায়িকা দেবযানীকে, যিনি আমাদের কল্পলোকেরই বাসিন্দা। 'শঙ্করী'তে কবি 'তিমির বিভাবরী', শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগমায়া বালিকা-সম লীলাময়ী। 'নির্ঝরিণী'তে 'ঘুমন্ত বনভূমি' চমকিয়া জাগে। শ্রীরাধার সঙ্গিনী 'রূপমঞ্জরী'র ভাব বিলাস 'চাঁদের পাশে'। প্রাক্‌-রক্তিম আকাশে 'অরুণরঞ্জনী' শুকতারার হাসি। 'শোন্‌ ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতি- বেলা শেষের বাঁশী বাজে'। 'আড়ি পাতে নিঝ্‌ঝুম বন'— কখন 'মীনাক্ষী' আঁখি তুলে চাইবে, আঁখির করুণাদৃষ্টিতে পুষ্পিত হবে বনাঞ্চল। 'বনকুন্তলা'র বিষাদিত ছায়া চৈতালী সন্ধ্যার চাঁদের মুকুরে।

কবির নবরাগ সৃষ্টির পর্বে 'বাংলার ভাতখণ্ডে' সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী কবিকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন এবং বেতার অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু নতুন রাগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুরেশবাবুর স্বকীয় চিন্তা একটি উদ্ভাসিত নতুন রাগকে রাগসঙ্গীতের প্রথায় ক্রিয়েটিভ কম্পোজিশন সহযোগে উপভোগ্য করার রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিও নতুন রাগ সৃষ্টি করেছিলেন, যার নাম নন্দকোষ। এই রাগের কথা জানা যায় পরিমল চৌধুরী রচিত 'আকাশবাণীর দিনগুলি' গ্রন্থে। যেখানে এই তথ্য পাওয়া যায়—

"গান গেয়ে শ্রোতাকে মুগ্ধ করার শক্তি ছিল না সুরেশদার, বাজাতেন এস্‌রাজ। কিন্তু শেখাতে পারতেন চমৎকার। নন্দকোষ রাগ আমি সুরেশদার কাছেই প্রথম শুনি। আমাকে শিখিয়েও দিয়েছিলেন। এই রাগ চিন্ময় লাহিড়ী একবার ন্যাশানাল প্রোগ্রামেও গেয়েছেন। রাগটি সুরেশদারই সৃষ্টি।"

উদ্ভাবিত এক একটি রাগে এক একটি গান বাঁধার নজির পাওয়া যায় কবি নজরুলের সমকালীন প্রতিভাদীপ্ত সুরকার হিমাংশুকুমার দত্তর সুরসৃষ্টিতে। স্মরণীয় তাঁর সৃষ্ট পুষ্পচন্দ্রিকা রাগের গান 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে' এবং মেঘচন্দ্রিকা রাগে 'বিরহিনী চিরবিরহিনী' গান দুটি। এই গান যেমন বাঁধা হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে, কিছুমাত্র যোগ বিয়োগ না করেই, কাব্যসঙ্গীতের আদর্শে আজও গাওয়া হয়ে থাকে। তারজন্য অসংখ্য শ্রোতার কোন অভাববোধ হয় না। নজরুল ও হিমাংশুকুমার তাঁদের মৌলিক সুর সৃষ্টির অবদানগুলি মাতৃভাষায় অঞ্জলি দিয়ে গেছেন। এই সব সৃষ্টি স্বস্থানে সংরক্ষিত করাই বাঙালীর কর্তব্য।

বাংলা গানের সুরে যে মৌলিক স্বরসংগঠন উদ্ভাবিত হতে পারে তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারে। ভাবের আলোড়নে, অনুভূতির যথার্থতায় ও কাব্যভাষার সাংগীতিক রূপনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু এমন স্বরসংগঠন উদ্ভাবন করে নিয়েছেন যা শাস্ত্রীয় রাগসঙ্গীতে অনাবিষ্কৃত ছিল। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মধুচক্র সাহিত্য সংসদের এক অনুষ্ঠানে কুড়িটির মত রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদাহরণ দিয়ে সেগুলির সুরের মধ্যে সম্ভাব্য নতুন নতুন রাগের মত মৌলিকত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটির অভিনব সুর সংগঠন থেকে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের 'হেমন্ত বিলাবল' রাগসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। তাই বলে ওই রবীন্দ্রসঙ্গীতটিকে সেই পথে টেনে নিয়ে যাবার কোন যুক্তি নেই, কারণ সেই স্রষ্টার অভিপ্রায় মত স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংগীতিক নিদর্শনরূপে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হয়ে গেছে।

নজরুল সৃষ্ট নবরাগের গানগুলিও সেইরকম স্রষ্টার ইঙ্গিত সুনির্দিষ্ট পরিমিতির স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংগীতিক নিদর্শন। এই দিক থেকে ভাবলে মানা যায় যে রাগসঙ্গীতের প্রথাগত শৈলীর প্রতি কোন গীতিকবির দায়বদ্ধতা নেই। কিন্তু নতুন রাগ সৃষ্টির দাবী থাকলে প্রশ্নটি উড়িয়ে দেওয়া চলে না। রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ প্রথা নস্যাৎ করার প্রস্তাব আমাদের নেই।

নজরুলের কারাদণ্ড : দেশজুড়ে প্রতিবাদ

শি শি র ক র

নজরুলের কারাদণ্ড হয়েছিল তাঁর নিজেরই প্রতিষ্ঠিত, 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে একটি কবিতা লেখার জন্য। নজরুলই বাংলার প্রথম দণ্ডিত লেখক নন। তাঁর আগে বেশ কিছু কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক সরকারী রোষে পড়েছেন ও দণ্ডিতও হয়েছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ কবে উল্লেখ্য, মুকুন্দদাস, সখারাম গণেশ দেউস্কর। কিন্তু নজরুলকে নিয়ে যেমন দেশজুড়ে আন্দোলন, বিক্ষোভ হযেছে, তেমন অন্য কারো ক্ষেত্রে হযনি। নজরুলকে কারারুদ্ধ কবা হলে সারা দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এমন ব্যাপক প্রতিবাদের নানা কারণ আছে। যেসব বাঙালী সাহিত্যিক বা কবিব বই ইংরেজ আমলে বাজেযাপ্ত হযেছিল নিঃসন্দেহে নজরুল তাঁদের মধ্যে সবচেযে শক্তিশালী কবি। আর জনপ্রিয়তায় তিনি তো সমসাময়িক সকলের উপরে ছিলেন। সেযুগে তরুণদের মুখে মুখে ফিরত তাঁর অগ্নিবীণার, ভাঙার গানের কবিতাগুলি। তদুপবি জেলের অবিচাবেব প্রতিবাদে কবি যখন দীর্ঘদিন অনশনে ছিলেন তখন স্বতঃই সারা দেশ বিচলিত হয়ে পডেছিল। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পডেন।

কারাদণ্ড হবার আগেই রাজরোষে পড়ে কবির বই বাজেযাপ্ত হযেছিল। কবিকে কারাগারে যেতে হয়েছিল 'ধূমকেতু'তে লেখা 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য। নজরুলের নিবন্ধেব বই 'যুগবাণী' আগেই বাজেযাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু কারাদণ্ড এই প্রথম। পরে আর একবার 'প্রলয় শিখা' কবিতা লেখার জন্য কবি দণ্ডিত হন, তবে সে কারাদণ্ড কার্যকর হযনি গান্ধী-আরউইন চুক্তির জন্য।

'ধূমকেতু'র ১৯২২, ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি বের হয়। কবিতাটি লেখার জন্য কবি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসাবে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সংখ্যায় 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নামে একটি ছোট্ট নিবন্ধ বের হয়। সেটি ১১ বছরের একটি মেয়ের লেখা। এই লেখাটিও রাজরোষে পডে। সরকার নজরুলের ওই কবিতাটির সঙ্গে এই নিবন্ধটিও বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত কমবয়সী কারো লেখা রাজরোষে পড়েছে কিনা জানি না। এ সম্পর্কে মুজফ্ফর আহমেদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন; "সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নেতারা 'ধূমকেতু'র প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের বাড়ীতেই বেশী এসেছেন। এই বাড়ীতে গিয়েই অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্রের সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় হয়। ....তাঁর একটি ছোট বোন ছিল। এগারো বছর বযস হবে। এ বয়সেই সে লিখতে পারতো। তার ছোট ছোট লেখা ধূমকেতুতে ছাপা হয়েছে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' ধূমকেতুর যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, সেই সংখ্যায এই মেয়েটিরও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নাম দিয়ে একটি লেখা বার হয়েছিল। 'আনন্দময়ীর আগমনে'র সঙ্গে বাংলা সরকার এই লেখাটিও বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এই মেয়েটির নাম আমি ভুলে গেছি। মমতা মিত্র কি ?"

নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হওযার পরে কী হল, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী মুজফ্ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, "এর মধ্যে 'ধূমকেতু'র অফিস তল্লাসী ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারা অনুসারে 'ধূমকেতু' সম্পাদক কাজী নজরুল ও তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজালুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে গিরেফতারি পরওয়ানা বার হয়ে গিয়েছিল। তারিখটা ১৯২২ সালের ৮ই নভেম্বর ছিল। কমরেড আবদুল হালীম আর আমি সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক দোকানে চা খেযে বেডাতে বেড়াতে 'ধূমকেতু' অফিসে গেলাম। আমরা তখন চাঁদনীর ৩ নম্বর গুমঘর লেনে আমার ছাত্রদের বাড়ীতে রাতে ঘুমাতাম। ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনস্থিত 'ধূমকেতু' অফিসে গিয়ে দেখলাম অত সকালেও শ্রীবীবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসে 'ধূমকেতু'র জন্য লিখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতলায ওঠার সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা গেল। পুলিশ এসেছে 'ধূমকেতু'র অফিসে তল্লাসীর পরওযানা ও কাজী নজরুলের নামে গিবেফতারী পরওয়ানা নিযে। নজরুল তখন সমস্তিপুরে গিয়েছিল বলে গিরফেতার হযনি। পুলিশ আসায মুহূর্তেব ভিতরে বীরেনবাবু যে কোথায উধাও হয়ে গেলেন আমরা তার কিছুই টের পেলাম না। পুলিশ প্রথমে নজরুলকে খুঁজলো। আমরা জানালাম তিনি কলকাতার বাইরে কোথায় গেছেন, তখন পুলিশ আমাদেব গভর্নমেন্ট অর্ডার দেখালো যে, ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতা ও 'বিদ্রোহীর কৈফিযৎ' (অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মিত্রের ছোট্ট বোনটির লেখা) শীর্ষক একটি ছোট্ট লেখা বাজেযাফৎ হয়ে গেছে। পুলিশ ওই সংখ্যার কপিগুলি নিযে যাবেন বললেন। তারপবে বাড়ীতে তল্লাসী হলো, ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'ধূমকেতু' যে কযখানা পাওযা গেল তাই নিযে পুলিশ চলে গেলেন, আমাকে সার্চলিস্ট দিয়ে গেলেন।" (পঃ ২৯০, ১ম সংস্করণ)

তখন নজরুল সমস্তিপুর থেকে কুমিল্লা চলে গেছেন। পুলিশ তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার কবে কলকাতায় নিয়ে আসে। কলকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে কবির বিচার হয। [বিচারক সুইনহোও কবি ছিলেন। তাঁর নামে কলকাতায় একটি রাস্তাও আছে!] ১৯২৩, ১৭ জানুযারি সুইনহো মামলার রায় দেন। প্রখ্যাত আইনজীবী মলিন মুখোপাধ্যায বিনা পারিশ্রমিকে নজরুলের পক্ষ সমর্থন করেন। বিচারক সুইনহো রাজদ্রোহের অভিযোগে কবিকে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ক্ষোভের কথা একজন কবি হয়েও সুইনহো আব একজন কবিকে সাধারণ কয়েদীর পর্যাযেই ফেলেন। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করেননি। 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে যে কবিতার জন্য কবির কারাদণ্ড হল, সেটি এই—

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী ?

মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।

ঢাল তরবার, আন না সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্ত দে মা রক্ত দেখা!

তুই একা আয় পাগলী বেটী তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে,
রক্ত-তৃষার 'ময়-ভুখা-হু'র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে।

অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত সুধা।
দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি পূজা
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভূজা।

'ময় ভুখা হুঁ মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি রাণীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী। (সংক্ষেপিত)

নজরুল আদালতে যে সাক্ষ্য দেন, সেটিও এক অনন্য সৃষ্টি। ১৩২৯, ১৩ মাঘ (১৯২৩) সংখ্যার 'ধূমকেতু'তে সেটি ছাপা হয়।

"আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি রাজ কারাগারে বন্দী ও রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একধারে— রাজার মুকুট, আর ধারে ধূমকেতুর শিখা, একজন---রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর একজন--সত্য হাতে ন্যায়দণ্ড।...

"রাজার পক্ষে--- রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজ-কর্মচারী। আমার পক্ষে-- সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি-অনন্তকাল ধরে সত্য--- জাগ্রত ভগবান।...রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র! রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ; আমার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

"রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন, আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারী সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিরঙ্কুশ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।

"আমি ভগবানের হাতে বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু আমাকে ভাঙবে কে?...

"শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি, শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত উষার নবশঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাঁকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত তারা আর উদয়-তারার আলোয় মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।...

"আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই, কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতে অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন স্বয়ং রুদ্র ভগবান। তারপর মাভৈঃ। ভয় নাই।"*

বিচারাধীন থাকার সময় নজরুলকে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রাখা হয়। কারাদণ্ডের পর তাঁকে প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে সেটি জেলে নজরুলের কাছে পাঠিয়ে দেন। এখান থেকে কবিকে হুগলি জেলে পাঠানো হয়। জেলের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে নজরুল অনশন করেন। জেল কর্তৃপক্ষ কাজীর দাবি মানতে গররাজি। আর নজরুলও দাবি না মানলে অনশন তুলবেন না। এদিকে কবি দিন দিন কাবু হয়ে পড়ছেন! নজরুলের দাবি মেনে নেওয়ার দাবিতে দেশবন্ধু

* নজরুল পরিচালিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র শেষ সংখ্যায়— ১৯২৩ সালের ২৭শে জানুয়ারি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে [illegible] লিপি দেওয়া হল।

জনসভা ডাকলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৯২৩ সালের ১১শে কলেজ স্কোয়ারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমরা মুজফ্ফর আহ্‌মেদের লেখা থেকে জানতে পারি ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু। "গোলদীঘিতে জনসভা। সভাপতি দেশবন্ধু: হেমন্ত সরকার, অতুল সেন, মৃণালকান্তি বসু, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি সকলে দাবি জানালেন— নজরুলকে বাঁচানো বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করে।" (—নজরুল স্মৃতি। পৃঃ ১৫)

এদিকে রবীন্দ্রনাথও সেন্ট্রাল জেলে কাজীকে তার পাঠান; "গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচার ক্লেমস্ ইউ।" তবে সে তার শিলঙে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফেরত যায়। কারণ নজরুল তখন হুগলি জেলে। নজরুলের এই অনশনে দেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। নানা সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় এই উদ্বেগ প্রকাশ পায়। এ নিয়ে ১৯২৩ সালের ১৬ মে তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় লেখেন:

"হুগলি জেলে প্রায়োপবেশন"

"কাজী নজরুল ইসলাম, মৌলবী সিরাজুদ্দিন ও বাবু গোপালচন্দ্র সেন প্রায় একমাস পূর্বে হুগলি জেলের মধ্যে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি সেই অবস্থায় আছেন। খানসামা ইউনিয়নের সভাপতি মৌলবী সিরাজুদ্দিন নমাজ করিতেছিলেন, এমন সময় জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সেখানে উপস্থিত হন। মৌলবী সাহেব তাঁহাকে সেলাম করেন না; ইহাতে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নাকি তাঁহাকে অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি করেন। ইহার পূর্বেও জেলের মধ্যে অসহযোগী বন্দীদের উপর নানারকম দুর্ব্যবহার করা হইত; তাঁহাদিগকে মানুষের অব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হইত। এই সব দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্যই ইঁহারা তিনজন প্রায়োপবেশন করেন। অনেকদিন পরে গোপালবাবুকে জোর করিয়া নাকের ভিতর দিয়া দুধ খাওয়ানো হইয়াছিল। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন নাই। ৫ই মে পর্যন্ত তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়ানো হয় নাই। ২৪শে এপ্রিল হইতে কাজী সাহেবের জ্বর হইতে আরম্ভ করে। এই জ্বর অবস্থায় এতদিন অনাহারে থাকিয়া তাঁহার শরীরের ওজন ১৩ সের কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে তাঁহার অবস্থা এতদূর খারাপ যে, যে কোন মুহূর্তে যে-কোন দুঃসংবাদ আসিতে পারে।...."

অনাহারে ও জ্বরে কাজী কাহিল হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং শরীর দ্রুত খারাপ হতে থাকে। এই অবস্থাতেও কবি অবিচল থাকেন। কারো অনুরোধে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। শেষ পর্যন্ত মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবী ছুটে এলেন কুমিল্লা থেকে। তিনি দীর্ঘপথ জলস্পর্শ করেননি। তাঁরও শপথ, 'পাগলকে না খাইয়ে কিছু মুখে দেব না।' ২২শে মে (১৯২৩) তিনি হুগলি জেলে এসে নজরুলের সঙ্গে দেখা করলেন। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন;

"কাজীর ধর্মমাতার সাক্ষাৎ"

"কাজী নজরুল ইসলামের ধর্ম-মা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী কাল প্রাতে হুগলি জেলে কাজীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অনেক করে তাঁহাকে বুঝাইয়া খাওয়াইতে সম্মত করেন। বৈকালে ডাঃ সহরাওয়ার্দী কাজীর সঙ্গে দেখা করেন। কাজী খাবেন বলিয়া তাঁহার কাছেও সম্মতি জানাইয়াছেন। 'যুগান্তরে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার সেন, পবিত্র গাঙ্গুলী, মৌলবী আমেদ আলী আফজল হক্ ও ওয়াজেদ আলি এবং সুলতান মহম্মদ সাহেব প্রভৃতি দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয় না।"
[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩শে মে, ১৯২৩]

শেষ পর্যন্ত ৩৯ দিন পর ২২শে মে (১৯২৩) নজরুল অনশন ভাঙলেন মাতৃসমা বিরজাসুন্দরীর অনুরোধে। এরপর কবিকে বদলি করা হয় বহরমপুর জেলে।

নজরুলের হিন্দি গান

করুণাময় গোস্বামী

কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দিতে কিছু গান রচনা করেছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত আবদুল আজীজ আল আমান সংকলিত নজরুলগীতি অখণ্ড এর দ্বিতীয় সংস্করণে ২৭টি হিন্দি গান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউটেও কয়েকটি গান সংগৃহীত আছে। ইন্সটিটিউট পত্রিকায কবির কয়েকটি হিন্দি গান প্রকাশিত হয়েছে। চেষ্টা চালালে নজরুলের ৫০টির মতো হিন্দি গান সংগৃহীত হতে পারে। এসব গানের অধিকাংশই মূল বাংলা গানের তরজমা। অনেক ক্ষেত্রেই তরজমা অবিকল নয়। তবু তরজমাই। চল্ চল্ চল্ ও টলমল টলমল পদভরেও গান দুটিও হিন্দিতে রূপান্তরিত করেছিলেন নজরুল। তবে সে রূপান্তরও অবিকল নয়। হিন্দিতে নজরুল যেসব গান রচনা করেন বা নিজের বাংলা গান থেকে ভাষান্তরিত করেন তার মধ্যে ভজন অঙ্গের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানই বেশি। এ জাতীয় কয়েকটি বাংলা ও হিন্দিতে রূপান্তরিত গান পাশাপাশি উদ্ধৃত করা হলো :

বাংলা : তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম
আমারি মতন দিবস-নিশি জপিতে শ্যাম নাম।।
কৃষ্ণ কলঙ্কেরই জ্বালা
মনে হত মালতীর মালা
চাহিয়া কৃষ্ণ প্রেম জনমে জনমে
আসিতে ব্রজধাম।
কত অকরুণ তব বাঁশরীর সুর
তুমি হইলে শ্রীমতী ব্রজকুলবতী
বুঝিতে নিঠুর।।
তুমি যে কাঁদনে কাঁদায়েছ মোরে
আমি কাঁদিতাম তেমনি করে
বুঝিতে কেমন লাগে এই গুরু গঞ্জনা
এ প্রাণ পোড়ানি অবিরাম।।

হিন্দি : অ্যাগ্যর তুম রাধা হোতে শ্যাম।
মেরি তরহা ব্যস আঁঠো প্যহ্যর তুম, রটতে শ্যামকো নাম।।
বন ফুলকি মালা নিরালি বন্ যাতি নাগন কালি
কৃষ্ণ প্রেমকী ভীক মাঙ্গনে আতে লাখ জনম

তুম আতে ইস ব্রজধাম॥
চুপকে চুপকে তুমরে হিরদয় মে বসতা বনসীওযালা
অওর ধীরে ধীরে উসকী ধূন সে ব্যঢ়তী মন্‌কি জ্বালা।
পন-ঘটমে ন্যয়্যন বিছাযে তুম, র‍্যহ্‌তে আস লাগায়ে
অওর কালেকে সঙ্গ্ প্রীত ল্যকা কর হো জাতে বদনাম॥

বাংলা : চঞ্চল সুন্দর নন্দকুমার
গোপী-চিতচোর প্রেম মনোহর নওল কিশোর
অন্তব মাঝে বাজে বেণু তার
নন্দকুমার, নন্দকুমার, নন্দকুমার॥
শ্রবণ আনন্দ নূপুর ছন্দ রুমুঝুমু বাজে
নন্দের আঙিনায নন্দনচন্দ নাচিছে হেলে দুলে গোপাল সাজে।
টলমল টলে বাঙা পদতলে
লঘু হযে বিপুল ধরণীর ভাব
নন্দকুমার, নন্দকুমার, নন্দকুমার॥
রূপ নেহারিতে এল লুকাযে দেবতা
কেহ গোপগোপী হল কেহ তরুলতা।
আনন্দ-অশ্রু নদী হযে বযে যায উতল যমুনায।
প্রণতা প্রকৃতি নিরালা সাজায
বন ডালায় পূজা ফুলসম্ভার
নন্দকুমাব, নন্দকুমার, নন্দকুমার॥
চঞ্চল সুন্দর নন্দকুমার গোপী চিতচোব

হিন্দী : প্রেম মনোহর নওল কিশোর
বাজতহি মনমে বাঁশুরি কি ঝনকার
নন্দকুমার, নন্দকুমার, নন্দকুমার॥
শ্রবণ আনন্দ বিছুয়া কি ছন্দ রুনুঝুনু বোলে
নন্দ্‌কে আঙ্গনামে নন্দন চন্দ্রমা
গোপাল বন্ ঝুমত ঝুমত ডোলে
ডগমগ ডোলে রাঙ্গা পাউ বোলে
লঘু হোকে বিরাট ধরতী কা ভার।
নন্দকুমার, নন্দকুমার, নন্দকুমার॥
রূপ নেহারণে আয়ে লুক ছিপ দেওতা
কোই গোপগোপী বনা বৃকশ লতা।
নদী হো বহে লাগে আনন্দকে আঁসু যমুনা জল সুঁ
প্রণতা প্রকৃতি নিরালা সাজায়
পূজা করনেকো ফুল লিয়ে আয়ে বনডার।
নন্দকুমার, নন্দকুমার, নন্দকুমার॥

বাংলা : নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না।
দীপ নিভিতে দাও
নিবু নিবু প্রদীপ নিবুক হে পথিক
ক্ষণিক থাকিয়া যাও।।
আজো শুকায় নি মালার গোলাপ
আশা ময়ূরী মেলেনি কলাপ
বাতাসে এখনো জড়ানো প্রলাপ বারেক ফিরিয়া চাও।।
ঢুলিয়া পড়িতে দাও ঘুমে অলস আঁখি
ক্লান্ত করণ কায়
সুদূর নহবতে বাঁশরী বাজিতে দাও
উদাস যোগিযায়।
হে প্রিয় প্রভাতে তব রাঙা পায়
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায
তব হাসির আভায় তরুণ অরুণ প্রায
দিক রাঙিয়ে যাও।।

হিন্দি : অভি নিশি রহিন যাও ন যাও
দিয়া বুঝনে দো।
বুঝতি হুয়ি দিয়া পিয়া বুঝনে দো
মুসাফির ঠাহ্‌রো
দিয়া বুঝ্‌নে দো।।
নিঁদ আলসী আঁখ রুদ্ধ হোনে দো
ক্লান্ত করুণ দেহ্‌
দূর নৌবৎসে বাজ্‌নে দো বাঁশরী
উদাস যোগিযামেঁ।
ন প্যারে তেরে চরণো পর
গুল মৌত চাহে গীর কর
তেরী হঁসীকো নবারুণিমাসে
দিশা রংগায়ে দো
দিয়া বুঝনে দো।।

বাংলা : আমার খোকার মাসী শ্রী অমুকবালা দাসী
মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক করে সে হাসি।।
তার চোখ প্রায় পুঁটী মৎস্যই
চেহারাও নয় জুৎসই
তাতে আছে তিনটি বৎসই
কিন্তু স্বাস্থ্যে খোদার খাসি।।
সে খায় বটে পান জর্দা
আর চেহারাও মন্দা মন্দা

তবু বুঝলে কিনা বড়দা
আমি তারেই ভালবাসি ॥
শালী অর্থাৎ কিনা বৌ সে পরের আনাই
তারে দিয়ে একটা আনি দাদা ঘরে যদি আনি
সে হয় বৌ ষোল আনাই দাদা কি বলো ?
আমি তারই লাগি জেলে
দাদা মরব ঘানি ঠেলে
তারে নিয়ে ভাগব বেলে
না হয় পরব গলায় ফাঁসি ॥

হিন্দি : মেরে বেটে কি খানা বিবি ঝাপ ঝপকে ঝালা
খুব উস্‌কো দেখা ভালা ঢং উস্‌কো হেয় নিবালা ।
উস্‌কি আখ বড়ি বসিলি উস্‌কি সুরৎ হেয় আলবেলি
ভাইয়্যা হ্যয় বড়ি নবেলি বাকী বদন হ্যয় এক মোটালা ॥
বাতি পান মে হ্যা উয়ো ফর্দা উস্‌কো চেহ্‌রা মরদা মর্দা
কলহ্‌ কা জেয়সা বরধা মেয় উস্‌কা হি মাত্‌ওয়ালা ।
শালি কো মোলকে জানা বিবি পন্দ্র আনা
উস্‌কো দিয়া জব এক আনা লায়ে কব্‌কে পুরিয়া তানা ।
বিবি হুয়ি উ ষোলো আনা
বোলো ভাইয়্যা ক্যা বলো ?
সাতি বাত মে জাগা আজ্‌ জিট্‌ জকাট জে ঠাগা
উস্‌কো বেল মে লেকে ভাগা গোয়া গলে মে ফাঁসি ডালা ॥

বাংলা : চল্‌ চল্‌ চল্‌!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী‑তল
অরুণ প্রাতের তরুণদল, চল্‌রে চল্‌রে চল।
চল্‌‑চল্‌ চল্‌।
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল।
চল্‌রে নৌজোয়ান, শোনরে পাতিয়া কান —
মৃত্যু‑তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ আগল, চল্‌রে চল্‌রে চল
চল্‌‑চল্‌‑চল্‌ ॥
ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ
শহীদী ঈদের সেনারা সাজ
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ

খোল রে নিঁদ্-মহল।

কবে সে খোয়ালি বাদশাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি
যাস মুসাফির গান গাহি
ফেলিস অশ্রুজল।

যাক্ রে তখত্-তাউস
জাগ্ রে জাগ্ বেঁহুস।
ডুবিল রে দেখ্ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুশ,

জাগিল তারা সকল
জেগে ওঠ হীনবল।
আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলায় তাজমহল
চল্-চল্-চল্।।

হিন্দি : মার্চ : চল্ চল্
নওজোয়ান চল্
আদমিয়ত কি ফৌজ তুম্
দরয়্যা কি হো মৌজ তুম্
কুওত্ কে হো হৌজ তুম্
তুম যে বল্।
চল্ চল্ চল্।
খোলকে রাতকা নকীব
লাও দিনকা আফতাব
জমানে কে তুম হো খাব
তুম্ হো ধ্যান আমল্।
তুম আলীকে জুলফেকার, তুম হো নূর তুম হো নার
জল্‌জলাকে তুম পোকার জুলুমকে আজ্‌ল।
চল মচাকে শোর ভোর ভয়িরে ভোর
উঠ্ খড়ে হো শুন আজান গাফলিয়াতে কো ছোড়্।
আরাম কা শিশ্‌মহল
তোড় জওয়ান্ চল্
চল্ চল্ চল্।

বাংলা : টলমল টলমল পদভরে, বীরে দল চলে সমরে।।
খরধার তরবার, কটিতে দোলে
রনন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে
ঘনতূর্য-রোলে শোকমৃত্যু ভোলে
দেয় আশিস সূর্য সহস্র করে।।

চলে শ্রান্ত দূর পথে, মরু দুর্গম পর্বতে
চলে বন্ধু-বিহীন একা
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক লেখা।
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান।
দোলে ঈশান-মেঘে কাল প্রলয় নিশান
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে॥

হিন্দি : জল্ থল্ টল্‌মল্ হিলে আসমান
বীরদল চলে ময়দান।
হাথপর হাতিয়ার লে কে চলে
ওতন্ কে লিয়ে জান দেকে চলে
আগর এক টলে
লাখ লাখ নিকলে
লিয়ে মওত্ কে দাওত চলে শহীদান॥
চলে তকল্লুফ কে রাহপর
কোহ্ সাহারা পার হো কর
চলে বগায়ব দোস্ত সাথী।
চলে জঙ্গকে সিপাহিয়াঁ বেখওফ বে-ডর
ছোড়ি ঘরকে কবর সব বারে চলে
রণ-ঝনন রনন রণ-ডঙ্কা বোলে।
সব আরাম কি বাগ পে আগ জ্বলে।
সাথ নিশান্-বর্দার ঝড় ও তুফান॥

প্রসঙ্গ : শতবর্ষে বিদ্রোহীর মর্যাদা

কল্যাণী কাজী

জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা কখনও ভোলা যায় না, ভুলতে পারি না। আজ ৬৩ বছরে পা দিয়ে একটু একান্তে বসলেই সেইসব দিনের কথাগুলো মনের মধ্যে ভিড় করে। তখন আমার কতই বা বয়স হবে, ১৫ কিংবা ১৬ বছর। সেবার শখ করে এক দাদার সঙ্গে রাঁচি বেড়াতে গেলুম। স্বাস্থ্যকর জায়গা। ওই বয়েসটায় সকলেরই ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। আমারও লেগেছিল। রাঁচিতে গিয়ে সেবার হঠাৎই জানতে পারলাম আমাদের পাশের হোটেলে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম উঠেছেন। শিহরণে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। বিপ্লবীদের কাছে যাঁর গান লড়াইয়ের মন্ত্র তাঁকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাব ভাবতেও পারিনি। সেদিন বিকেলেই পাশের হোটেলে তাঁকে দেখতে গেলাম।

কবির তখন চিকিৎসা চলছিল। তাঁকে দেখছিলেন ডাক্তার ডেভিস। হোটেলে গিয়ে সেদিন অনেকক্ষণ ধরে কবিকে এক দৃষ্টিতে দেখলাম। তখনও জানতাম না তাঁরই পুত্রবধূ হব আমি। তবে সেদিন কবিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দেখা হল আরেক জনের সঙ্গে। সে হল কাজী অনিরুদ্ধ, যিনি পরে হয়েছিলেন আমার স্বামী।

রাঁচিতে সেদিন বিকেলে দেখা হওয়ার পর হোটেলে আমাদের যাতায়াত বাড়ল। আমি গান-বাজনা বরাবর ভালবাসতাম। কাজী অনিরুদ্ধ তখন রীতিমতো স্টার গিটারিস্ট। ওর গিটার আমার আগে থেকেই ভাল লাগত। ওই সফরে একদিন কবির সামনেই গানের আসর বসল। অনেক গান হল। শোনা গেল অনিরুদ্ধর গিটারের জাদু। কিন্তু এত হৈ হুল্লোড়ের মাঝে আমাকে অবাক করল কবির নিস্পৃহতা। যাঁর গানে, যাঁর কবিতায় বিপ্লবীদের রক্ত গরম হয়ে উঠত সেই মানুষটাকে নিস্তেজ, নিরুত্তাপ এবং চুপচাপ বসে থাকতে দেখে খুব কষ্ট পেলাম।

১৯৫৫ সালে বিয়ে হয়ে আসার পর কবিকে আমি আগের মতো স্বাভাবিকভাবে পাইনি। বিয়ের পর প্রায় একবছর বাদে বাবা আমাকে দেখে একদিন হাসলেন। অনিরুদ্ধ আমাকে কবির কাছে এগিয়ে নিয়ে বলল, বাবা এ আমার বউ। বাবা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, আমাকে দেখে হাসলেন। সেই নির্মল হাসিতেই জবাব ছিল, আমি জানি, আমি জানি। মানিকতলার সেই বাড়িতে বাবাকে সবসময় চুপ করে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখতাম। বারবার মনে হত কীসের ক্ষোভে, কীসের দুঃখে তিনি এত উদাস, এত নিস্পৃহ।

আড়ালে-আবডালে অনেকে তাঁকে বলতে, পাগল, উন্মাদ। আমার অথবা অনিরুদ্ধ কিংবা সব্যসাচীরও কখনও এরকম মনে হয়নি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি পাগল ছিলেন না, ছিলেন না উন্মাদ। আসলে মনে বড্ড আঘাত পেয়ে পেয়ে তিনি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই আঘাত সারানোর উপায়

আমরা খুঁজে পাইনি। অনেক সময় দেখতাম কবি চোখের ভাষায় কিছু বলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই বাক্‌শক্তির সঙ্গে সেগুলির সংযোগ ঘটাতে পারছেন না। এই না-পারা কষ্টই কবির জীবনের সব অঙ্ক পালটে দিয়েছে।

শব্দের ফুলকিতে যার লেখায় এরকম বিদ্রোহের আগুন ঝরত, তাঁর জীবনের মোড় এভাবে বদলে গেল কেন ? এ প্রশ্নে আমার মতো অনেকেই বিস্মিত। তবুও আমি যেহেতু কবির পরিবারেরই একজন ছিলাম তাই কথা প্রসঙ্গেই জেনেছি, কবির জীবনে একবার নয় বারবার দারুণ আঘাত এসেছে। সেই আঘাত সইতে সইতেই তিনি বদলে গিয়েছিলেন অন্য মানুষে

কবিদের পরিবারে আমার মানিয়ে নিতে বেশি দেরি লাগেনি। সেই পরিবারের সমস্যায় নিজেকে যত নিয়োজিত করেছি, ততই সংসারের নিত্যনতুন বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছি। পঞ্চাশের দশকের শেষে কলকাতায় বাড়ি ঘরদোর পাওয়ার বিশেষ সমস্যা ছিল না। কিন্তু ১৯৫৮ সালে আমরা রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের বাড়ি ছাড়ার পর কম নাজেহাল হইনি। সে সময় ঘর খুজতে খুঁজতে আমরা হয়রান। এখনকার মতো সে সময়েও কবির 'এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান' কবিতার দারুণ জনপ্রিয়তা ছিল। দুই জাতির ভেদাভেদ দূর করতে এর মতো অর্থপূর্ণ কবিতা আর হয়নি। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন পঞ্চাশের দশকের শেষে 'মুসলমান' বলে আমরা বহু হিন্দু বাড়িতে ঠাঁই পাইনি। অনেকের ঘর ছিল, জায়গা ছিল। কিন্তু দিল না। কেউ বলল বাড়িতে বিগ্রহ আছে, কেউ বলল হিন্দু ভাড়াটে ছাড়া ভাড়া দেব না, কেউ বলল পাগলকে রাখা যাবে না।

১৯৫৮ সালের শেষের দিকে আমরা হাজারিবাগ বেড়াতে গিয়েছিলাম। কবিরা এলেন পরে। কলকাতায় ঘর না পাওয়ায় প্রায় একটা বছর আমাদের হাজারিবাগেই পড়ে থাকতে হল। তবে সে সময় ঘর খোঁজা বন্ধ থাকেনি। ১৯৫৯ সালে আমরা টালার মন্মথ দত্ত রোডের বাড়িটার খোঁজ পেলাম। এই বাড়িটা বেশ খোলামেলা ছিল। চারটে বড় বড় ঘর। জানলাও ছিল বেশ বড়। ১৯৬২ সালে আমাদের পরিবারে বজ্রপাত হল। আমার শাশুড়ি মারা গেলেন। আজ বলার সুযোগ এসেছে যখন তখন বলি, কবির সঙ্গে প্রমীলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে। প্রমীলা দেবী ধর্মান্তরিত হননি। মুসলিম ঘরের বউ হলেও তিনি শাঁখা সিঁদুর সব পরতেন। কিন্তু এক লেখক তাঁর বইতে প্রমীলা দেবীর সৎকার প্রসঙ্গে লিখেছেন, তাকে হিন্দুমতে সৎকার করার জন্য আনিরুদ্ধের শাশুড়ি অর্থাৎ আমার মা দলভারী করার চেষ্টা করছিলেন। আমি বলি, আমার মা কিংবা আমি কেউই হিন্দুমতে তাঁর সৎকার হোক চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম, বাড়ি থেকে তাকে সধবাদের মতো সাজানো হোক, আর আচার অনুষ্ঠান করা হোক মুসলিম প্রথা অনুযায়ী।

ফের পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রমীলা দেবী মারা যাওয়ার পর কাজী সব্যসাচী অর্থাৎ আমার ভাসুর কবিকে নিয়ে গেলেন ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে। সেখানে তিনি বেশ কয়েকবছর কাটিয়েছেন। তবে প্রায়শই আমরা সে বাড়িতে যেতাম। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে গেলেন। ঢাকায় কলকাতা থেকে ভাল জায়গায় তাঁকে রাখার বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সেখানেও তাঁর মৌনব্রত ভাঙেনি।

সত্তরের দশকটা আমাদের জীবনে এসেছিল অভিশাপ নিয়ে। মাত্র ৫ বছরের মধ্যে আমরা বড্ড একলা হয়ে গেলাম। ১৯৭৪ সালে আচমকা মারা গেলেন কাজী অনিরুদ্ধ।

এই বাড়ির বউ হয়ে আসার পর একটা জিনিস আমি দেখতাম কবি থেকে শুরু করে অনিরুদ্ধ, বাড়ির সব ছেলেরই দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির প্রতি এক অদ্ভুত টান ছিল। আমরা যখন টালার মন্মথ দত্ত রোডের বাড়িতে থাকতাম তখন একদিন দেখি কবি বাড়িতে নেই। চারদিকে হুলস্থুল কাণ্ড। বাড়ির সকলে পাগলের মতো খুঁজছে। উদ্বেগ আর চিন্তায় শাশুড়ির মন আনচান। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল হাঁটতে হাঁটতে কবি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি চলে গেছেন। তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হল।

বাড়িতে এসে তিনি যেন অনেক কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু, চিন্তাশক্তি আর বলার মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাচ্ছিলেন না। হঠাৎই চুপ করে গেলেন।

যে মানুষটা হঠাৎ এরকম গম্ভীর এবং নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন সে যে আগে কত হাসি-ঠাট্টা করে দিন কাটাতেন তা না শুনলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি শাশুড়ির কাছে গল্প শুনেছি, আড্ডার আসর থেকে ফিরে কবি প্রায় রোজই ধবধবে পাঞ্জাবি চায়ের দাগে ভরিয়ে আনতেন। আড্ডার আসরে রোজই কাপের পর কাপ চা আসত। যখন বাড়িতে যাওয়ার সময় হত, তখন কাপের তলানিতে পড়ে থাকা চা টুকু কবিরা একে অপরের গায়ে ছেটাতেন। চা ছুঁড়েই বলে উঠতেন 'দে গরুর গা ধুইয়ে'।

বড রসিক মানুষ ছিলেন তিনি। ছেলেরা যদি কখনও কারও নামে কবির কাছে অভিযোগ নিয়ে আসতেন তিনি বিশেষ আমল দিতেন না। বরং ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওযার জন্যই নাটকীযভাবে বলে উঠতেন 'জানে দো কন্ডাক্টর'। কেউ যদি দুপুরের খাওয়া-দাওযার শেষে তাঁকে বলতেন, কেমন খেলেন ? কবি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন, সবই ঠিক ছিল একটা খডকে কাঠি হলে আরও ভাল হত। একটা সময় কথায় কথায় তিনি দারুণ রসিকতা করতেন। কিন্তু বিয়াল্লিশের পর সব যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। এই বিয়াল্লিশ সংখ্যাটাও আমাদের জীবনে একটা বড অভিশাপ। কেন, তা বলছি।

আমার ভাসুর কাজী সব্যসাচী লিখেছিলেন হরি ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ি থেকেই এই পরিবারে সূর্যাস্তের শুরু। এই বাডিতে প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলেন, এই বাড়িতেই বদলে গেলেন কবি। এরপরই সেই দুখু মিঞার জীবনে আরও, আরও কষ্টের শুরু হল। আগে যখন তিনি সুস্থ ছিলেন, তখন ছেলেরা ছিল তাঁর প্রাণ। ফুটবল খেলা তিনি খুব ভালবাসতেন। ফুটবলের আসর জমলেই তিনি ছুটে যেতেন ময়দানে। কখনও সব্যসাচীকে নিয়ে যেতেন, কখনও অনিরুদ্ধকে। খেলোয়াড়দের কাছ থেকে দেখতে ছেলেরা ভিড়ে ঢুকে পড়লে তিনি চিৎকার করে গ্যালারি মাথায় তুলতেন। এসব অনিরুদ্ধদের কাছ থেকেই শোনা।

লেখালেখির পাশাপাশি পরিবারে তিনি অনেক সময় দিতেন। বাড়ির সকলকে তিনি ব্রিজ খেলা শিখিয়েছিলেন। বাড়িতে অবসর সময় কাটানোর এটা ছিল দারুণ রাস্তা। সে সময় তাস খেলতে খেলতে সময় যেন কখন চলে যেত। কবি দাবাও খেলতেন দারুণ। সন্ধ্যে হতে না হতে অনেকদিন তাঁর খেলার সঙ্গী জুটে যেত। কিন্তু বিয়াল্লিশেই তিনি বদলে গেলেন, হয়ে উঠলেন এক অচেনা নজরুল ইসলাম। এই বিয়াল্লিশের কোটাতেই অনিরুদ্ধ চলে গেলেন। আমাদের পরিবারে বিয়াল্লিশ ছিল শুধুই বিপর্যয়ের সংখ্যা।

কবির অনেক দূর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেতে পারেননি। আজ কবির শতবর্ষ নিয়ে কত তোড়জোড়। খুব ভাল লাগছে। দীর্ঘকাল কবির সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। সেবা করেছি। আজ সেই মানুষটাকে নিয়ে এত হইচই হবে, আর আমরা খুশি থাকব না, তা কখনও হয় নাকি ? কবি বেঁচে থাকাকালীন অবস্থায় প্রস্তাব এসেছিল তাঁর নামে রাস্তা হবে। একটা রাস্তার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বারণ করেছিলেন আমার শাশুড়ি। যে রাস্তাটার কথা তোলা হয়েছিল, সেটায় নাকি দারুণ নোংরা-আবর্জনা জমা হয়। শাশুড়ি তাই বললেন, ওঁর নামে রাস্তা হবে, আর সেখানে জঞ্জাল জমবে তা হবে না। স্বামীর প্রতি তিনি গম্ভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই অনেক তলিয়ে ভাবতেন। পরে অবশ্য ভি. আই. পি. রোডের নাম কাজী নজরুল অ্যাভিনিউ করা হয়।

আজ আনন্দের দিনেও অনেক ক্ষোভ-আক্ষেপের কথা মনে পড়ছে। ওপার বাংলায় আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর কবিকে 'জাতীয় কবি'র মর্যাদা দিল। অথচ আমাদের দেশে এরকম ধরনের কোনও উদ্যোগ নেই। ওখানে নজরুল ইন্‌সটিটিউট হয়েছে। রাখা হয়েছে তাঁর গানের স্বরলিপি, লেখা কাগজপত্র সঙ্গে ব্যবহৃত বহু জিনিস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যেখানে বিদ্রোহী কবির সমাধি আছে

জায়গাটা দারুণ সাজানো। আমরা ঢাকা গিয়ে দেখলাম সব ঠিক আছে, কিন্তু রাতে একটু আলোর অভাব। আমরা বললাম দর্শনার্থীদের জন্য রাতে আলো দেওয়া হোক। সেই ব্যবস্থাও হয়েছে। আমাদের এখানে কবির স্ট্যাচু নেই। তবে এবার হবে। উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোথায় বসানো হবে জানি না। তবে শুনেছি লোকালয়ে ভাল জায়গায় বসবে।

বলতে দ্বিধা নেই রাজ্য সরকার তাঁকে নিয়ে যে উৎসবের আয়োজন করছে, কেন্দ্রীয় সরকার তা করেনি। আমাদের রাজ্যের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথায় কথায় নজরুল ইসলামের কথা তোলেন। তাঁর কবিতার উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। তিনি সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে বলেছিলেন, কবির শতবর্ষ উপলক্ষে 'নজরুল সুপার ফাস্ট ট্রেন' চালু করা হোক। কিন্তু তার প্রস্তাবে কাজ কতদূর এগিয়েছে জানি না। আসানসোল এক্সপ্রেসের নামটি বদল করে অবশ্য রেলদপ্তর সম্প্রতি 'অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস' নামে চালু করেছেন।

নজরুল ফাউন্ডেশন কমিটি ঠিক করেছিল কবির শততম জন্মদিনে চুরুলিয়া থেকে একটা মশাল দৌড় হবে। সেটা নিয়ে কথা আর বিশেষ এগোয়নি। তবে জন্মদিনে টালার মন্মথ দত্ত রোডের সেই বাড়িতে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। প্রভাত ফেরী হয়েছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা 'চল, চল' গানে তৈরি করছিল এক স্বপ্নের পরিবেশ।

শেষ করার আগে আরো একটা কথা বলে যেতে চাই। জীবনের প্রতিটি ধাপে চরম আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'উৎখাত' ব্যাপারটাও কবির জীবনে অনেক ঘা দিয়েছে। শ্যামবাজারের যে বাড়িতে কবি দীর্ঘদিন ছিলেন, সেই বাড়ি থেকে তাঁদের প্রায় উৎখাত করা হয়েছিল। অথচ কবির তখন কত নামডাক, কত খ্যাতি। এই মন্মথ দত্ত রোডের বাড়িটাও আমাদের হাতছাড়া হতে যাচ্ছিল। এখানেও আমরা উৎখাত হচ্ছিলাম। কিন্তু কবির অবস্থানধন্য এই বাড়িটাকে বাঁচাতে শেষ কয়েকটা বছর প্রচুর লড়েছি। রাজ্যের দুই মন্ত্রীও এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন।

এখন শুনছি তাঁর জন্মশতবর্ষে মুদ্রা তৈরি হবে, ডাক টিকিট ছাপানো হবে, মূর্তি বসবে, একটি সাম্মানিক চেয়ারও হবে। শুনেছি নবনির্মিত টাউন হলের নামও নাকি তাঁর নামে হবে। এসব ব্যাপারে নিজেকে ফের নতুন করে গর্বিত মনে করছি, তবে এ গর্ব শুধু আমার নয় আমার পরিবারের এবং নজরুলকে যাঁরা মনে-প্রাণে ভালবাসেন তাঁদের সকলের। কিন্তু এত আনন্দ, এত উৎসবের মাঝেও বড্ড ভয় হয়। বারবার মনে হয়, আলোর চমক হারিয়ে গেলেই অন্ধকার দেখা দেয়। তাঁর শতবর্ষ নিয়ে এপার বাংলা-ওপার বাংলায় যত উদ্যোগ তা কী শুধুই হুজুগ? সামনের শতবর্ষে কবিকে সকলে সমানভাবে মনে রাখবে তো? এই অনিশ্চয়তা ভরা প্রশ্নটা মনে জাগলেই বড্ড খারাপ লাগে। সেই খারাপ লাগাটা কাউকে বোঝানো যাবে না, বোঝাতে পারি না।

মেদিনীপুরে নজরুল

আজহারউদ্দীন খান

'বিদ্রোহী' কবিতা নজরুলকে জনপ্রিয়তার সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল, কারাদণ্ড সেই মুকুটে আর একটি পালক গুঁজে দিল। কারামুক্তির পর নানা স্থান থেকে তার ডাক আসতে থাকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে নজরুল মেদিনীপুর শহরে আসেন (১৩৩০, ১১ ফাল্গুন, ১৯২৪, ২৩ ফেব্রুয়ারি, শনিবার)। এখানে তিনি চারদিন ছিলেন। একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভারততত্ত্ববিদ ড. নরেন্দ্রনাথ লাহা (১২৯৩-১৩৭২), অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন নাড়াজোলের ছোটকুমার বিজয়কৃষ্ণ খাঁন। মেদিনীপুর কলেজ এবং কলেজিয়েট স্কুলের মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণে অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আরো অনেকে কলকাতা থেকে এসেছিলেন যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭), অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭-১৯৪০), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪), নরেন্দ্র দেব (১৮৮৫-১৯৭৫), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪), শৈলেন্দ্রনাথ বিশী প্রমুখ। মেদিনীপুর শহরে যে চারদিন নজরুল ছিলেন, সেই ক'দিনের বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথম দিন (১১ ফাল্গুন, ১৩৩০)

অপরাহ্ণ ৪টায় মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও অধিবেশনের সভাপতির ভাষণের পর পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটক অভিনীত হয়। নজরুল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন (১২ ফাল্গুন, ১৩৩০)

সকাল ৭-৩০মিঃ 'কান্ত কবি রজনীকান্ত'-এর লেখক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে (১২৮৯-১৩৪৭) সংবর্ধিত করা হয়। এই সংবর্ধনা সভায় পৌরোহিত্য করেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এই উপলক্ষে 'নলিনী মঙ্গল' নামে ৪২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা বেরোয়। এই পুস্তিকায় নজরুল ইসলামের নলিনীরঞ্জন সম্পর্কে একটি: কবিতা ছিল। কবিতাটি হল—

পুষ্পাঞ্জলি

ত্যাগের নলিনী ফুটেছিল কবে দ্বেষ পঙ্কিল দেশে,
মোহিল চিত্ত সুরভি তাহার পূরবীর বেলা শেষে।
তারি তরে আজ বাণী বেণুবীণে গলেছে সোহাগ সুধা
আপনার ক্ষুধা মিটেছে যাহার মিটায়ে পরের ক্ষুধা।

আপন স্বার্থ বলি দিয়ে তারি রক্ত মাংস ভারে
রচিল যে জন বাণী পাদপীঠ বন্দনা করি তাঁরে।
যে দুখ-দগ্ধপ্রাণ দীপ করি জ্বালায়েছ নিজ ভালে,
সেই প্রাণ শিখা আলো হয়ে আজ জ্বলে এ বরণ থালে।
যে কমল তুলি পূজিযাছ তুমি বীণার ভক্ত সবে
কণ্টক ক্ষত বক্ষে তোমার তাই মালা হয়ে রবে।
যাহাদের তুমি করেছ মহান, করিবে ভবিষ্যতে
তাহাদেরি বাণী করে কানাকানি এ পার ওপার হ'তে।
দুঃখ দারিদ্র সিদ্ধ তাপস। তব তপস্যা ফলে
বাণীর কমল ভাসিয়া এসেছে তোমার চরণ-তলে।
দেখিব না আজকে দিল তোমার ললাটে বিজয়-টীকা,
জ্যোতিষ্কসম আলো দিবে তব ভাগ্যের দহন শিখা।
হে স্বার্থ অসহযোগি! যে চরণে দেবতারা দেন হবি —
নাইবা করিল সালাম সে পাযে, গোলাম জাতের এ কবি।

ভক্তি প্রণত
নজরুল ইসলাম

(পৃ. ৪০ ৪১)

এই সংবর্ধনা সভায তিনি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে স্বরচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন।

অপরাহ্নে পরিষদের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দিত করা হয। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যাযের মতে মেদিনীপুরেই প্রথম কাজীকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয। তারপর বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা মহকুমা পল্লী তাঁকে অভিনন্দিত করে। অভিনন্দন সভায সভাপতিত্ব করেন মণীষীনাথ বসু সরস্বতী। পরিষদের কর্মসচিব ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী পরিষদের পক্ষ থেকে ও কলকাতাবাসীর তরফ থেকে শৈলেন্দ্রনাথ বিশী কবিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-১৯৩৪), কিশোরীপতি রায়, অতুলচন্দ্র বসু মেদিনীপুরের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দিত করে বক্তৃতা দেন। কাজী তাঁর স্বভাব সুন্দর সরল সুমধুর উক্তি সহকারে অভিনন্দনে প্রত্যুত্তর দিযে শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করেন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনির দ্বারা সভা ভঙ্গ হয।

তৃতীয় দিন (১৩ ফাল্গুন, ১৩৩০)

মেদিনীপুর কলেজে বিকেল ৪টায মহিলারা পৃথকভাবে কবির সম্বর্দ্ধনার্থে একটি সভার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সভায কবি স্বরচিত গান ও কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁর গান ও আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় টাউন স্কুলের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ দাসের কন্যা কমলা নিজের গলার হার খুলে কবিকে উপহার দেন। তখনকার সমাজ এই সামান্য জিনিসটাকে সুস্থ চিত্তে ও খোলা চোখে গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁর পিতামাতা আত্মীয়স্বজন ধিক্কারের চোখে দেখেছিলেন। সমাজের গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে মেয়েটি নাইট্রিক অ্যাসিড পান করে আত্মহত্যা করেন। সন্ধ্যায় বাংলা স্কুলে (অধুনা নাম বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ) এক জনসভায় মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কবিকে অভিনন্দনপত্র দেন। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি শুধু কতকগুলি গান গেয়েছিলেন।

বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা, ভদ্রমহোদয়েরা নজরুলকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এরকম হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা অন্য কোন কবি বা সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। পরকে আত্মীয় করে নেওয়া নজরুল চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। তিনি এখানে যে কদিন ছিলেন সে কদিন যেন তিনি মেদিনীপুরের একান্ত আপনজন হয়ে পড়েছিলেন। মেদিনীপুরবাসীর প্রীতির সম্পর্কও সেদিনকার জাতীয়তাবাদী চেতনায় মুগ্ধ হয়ে 'ভাঙার গান' (১৩৩১ শ্রাবণ, আগস্ট ১৯২৪) মেদিনীপুরকে উৎসর্গ করে মেদিনীপুরবাসীর সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য প্রীতি বন্ধনে কবি আবদ্ধ হয়েছিলেন। 'ভাঙার গান'-এর উৎসর্গপত্রের প্রতিলিপি নিম্নরূপ :

মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে

'ভাঙার গান ' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় (১১ই নভেম্বর, ১৯২৪)

নজরুল ইসলাম আর একবার মেদিনীপুর শহরে এসেছিলেন ১৯২৯-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি। সে সময় নাড়াজোল এর রাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁনের উদ্যোগে স্থানীয় শহরের নাডাজোল রাজকাছারীতে শিল্প প্রদর্শনী চলছিল। সন্ধ্যাবেলায় রাজকাছারীর খোলাছাদে গানের জলসায় তিনি কয়েকটি গজল গান করেন। এই জলসায় তাঁর বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারও কয়েকটি হাসির গান পরিবেশন করেন।

নজরুল যখন অসুস্থ ও তাঁর সংসার আর্থিক সংকটে পড়েছে তখন তাঁকে আমরা কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিলাম। মেদিনীপুর কলেজের যখন আমি ছাত্র ছিলাম সেই সময়কার ছাত্র সংসদ কবির সাহায্যে একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করেছিল (১৯৪৮)। প্রদর্শনী খেলা থেকে যা সামান্য টাকা (টাঃ ৩২৮-৬২পঃ) উঠেছিল তা আমরা কবিপত্নীর হাতে দিয়ে এসেছিলাম (২৭ আগস্ট, ১৯৪৮) এবং প্রাপ্তিস্বীকার সূচক তাঁর স্বাক্ষরিত রসিদও সেদিন এনেছিলাম।

চতুর্থ দিন (১৪ ফাল্গুন, ১৩৩০)

বিকেল ৫টায় স্থানীয় নওরংপুর ডাঙায় অর্ধসমাপ্ত ঈদ্‌গা প্রাঙ্গণে একটি সম্বর্ধনা সভা হয়। মৌলবীরা কুরআন শরীফ থেকে আয়েত উদ্ধৃত করে কবিকে আশীর্বাদ জানান এবং তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেন। ঐ সভায় বিভূতিভূষণ দাস বিদ্যাবিনোদ কবিকে একটি অভিনন্দনপত্র দেন। কবিকে বিভিন্ন সভায় যেসব অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল তাঁর হদিশ বহু চেষ্টা করেও পাইনি। এখানে শুধু বিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদের প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রটির অনুলিপি দিলাম—

অভিনন্দন সভায়
দেশপ্রাণ সৈনিক কবি
কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি ভক্তি নিবেদন

কাল্‌কে যখন বন্ধু আমার ছিলে তুমি সভার তলে,
দেবতা দ্বিজ মানুষ পুনঃ 'বিদ্রোহী' কেউ বলে,
পরিয়ে দিল পুষ্প মাল্য শ্রদ্ধা আদর ক'রে,
আমি তখন দাঁড়ায়ে দূরে এক কোণে সেই ঘরে।
তোমার বুকের পরশ পেয়ে উল্লাসে ও ত্রাসে।
ইচ্ছা কেবল হচ্ছিল মোর আকুল আবেশ ভরে,
লুটিয়ে পড়ি, ছুটে গিয়ে তোমার চরণ পরে।
ধন্য কবি জীবন তোমার, বাঁধন যাবে খসে

মুক্তি খুঁজি বন্ধনেতে কারায় যে জন পশে।
হে সন্ন্যাস নিস্পৃহ বীর, তোমার বাঁচাই বাঁচা,
মৃত্যু দহন, নিত্য মোদের, সোহাগ সেধে যাঁচা।
সত্য তোমার আত্মদেহের, কর্ম নিয়ম ভাঙা,
ভয় না করা স্বভাব তোমার জুজুর চক্ষু রাঙা।
নমস্য কেউ নয়ক তোমার, তুমিই তোমার রাজা,
ভুল করে সব মূর্খেরা যায় তোমায় দিতে সাজা।
তোমায় বড় করতে যাওয়া, বাজে কথাই বকা,
বড় ছোটর গণ্ডী তুমি এগিয়ে গেছ সখা।
আসিনি ভাই তোমায় দিতে, নেইক দেবার কিছু,
তোমায় শক্তি দিক আমাদের টেনে তোমার পিছু।
অঙ্গ দ্বিধায় পারি নাক করতে যেসব কাজ,
তোমার পায়ের স্পর্শে, 'পাষাণ' মূর্তি ধরুক আজ।

সোমবার ১৩ই ফাল্গুন ১৩৩০
মেদিনীপুর

কবিবন্ধু
শ্রীবিভূতিভূষণ দাস

পাইওনিয়াব ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর নজরুল

শেখ দরবার আলম

নজরুল জীবনীকাবদের মধ্যে অলস কেউ কেউ ব্যাপক সাক্ষাৎকাব গ্রহণ ও আর্কাইভাল ওযার্ক মারফৎ খুঁটিনাটি অনুসন্ধিৎসায সবকিছু খতিয়ে বা যাচাই ক'রে দেখার কাজে না গিয়ে কোনো না কোনো পক্ষ অবলম্বনকেই ফরজ কাজ বলে ভেবেছেন। ফলে অনেক ফালতু বিষয়ে কলহ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে নজরুল সৃষ্টি ও নজরুল জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই তাঁরা সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেননি। চিন্তাও করেননি। নজরুল কোথায কোথায চাকরী করেছেন, এইসব বড় বকমের খবরগুলোর কোনো কোনোটি নজরুলের তথাকথিত আজীবন সঙ্গীদের স্মৃতিকথায়ও বেমালুম বাদ প'ড়েছে। এ যাবৎ নজরুল জীবনীকাবদের লেখায়ও এসব অনেক কিছুই এভাবে অনুল্লিখিত থেকে গেছে। এসব কিছু এখন উপযুক্ত প্রকল্পের মারফৎ উদ্ধার ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা দরকার।

দৈনিক 'বঙ্গবাণী'র খবর উদ্ধৃত ক'রে ইতোপূর্বে অন্যত্র আমি দেখিয়েছি যে, ৯ ফাল্গুন ১৩৩৭ : ২ শওয়াল ১৩৪৯ : ২১ ফেব্রুযারী ১৯৩১ তারিখ শনিবার 'প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতকার নজরুল ইসলামকে সুর ভাণ্ডারী নিযুক্ত' করেছে 'ম্যাডান থিযেটার্স লিমিটেড'। 'ম্যাডান থিযেটার্স লিমিটেড বাঙ্গলা গানের টকি নির্মাণ' ক'রছিলেন তখন। এটি একটি দুষ্প্রাপ্য তথ্য। অনুরূপ দুষ্প্রাপ্য তথ্য এই যে, কবি কাজী নজরুল ইসলাম পাইওনিযার ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হ'যেছিলেন।

পৌষ ১৩৪০ (ডিসেম্বর ১৯৩৩ — জানুযারী ১৯৩৪ : শাবান রমজান ১৩৫২) : মাসিক 'সওগাত' : ১০ বর্ষ : ৩ সংখ্যায ২২৯ পৃষ্ঠায সেই দুষ্প্রাপ্য খবরটি এইভাবে প্রকাশিত হ'যেছে:

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

'ইনি সম্প্রতি পাইওনিযার ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হইযাছেন। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে ইতোপূর্বে আর কেহ ছাযাচিত্র জগতে এরূপ উচ্চপদের অধিকারী হন নাই। আমরা কবিকে তাঁহার এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।'

অনেকেই জানেন না যে, নজরুল বাঙলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম চিত্র পরিচালক। কবি নিশ্চযই পাইওনিযার ফিল্ম কোম্পানীর অনেক ছবিরই পরিচালনা করেছিলেন। দ্রুত ফিল্মসমূহসহ বিশদ তথ্যাদি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা দরকার।

ইতোপূর্বে ম্যাডান থিযেটার্স লিমিটেড-এর বাঙলা ও অন্যান্য গানের টকির জন্য কবি যে সব সঙ্গীত রচনা ও সুর সংযোজন করেছিলেন, নানান নিদর্শনসহ সে সব তথ্যাদিও অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪০ : ১৪ শাবান ১৩৫২ : ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৩ তারিখ রবিবার শবেবরাতের দিন পার্সী ঝানু ব্যবসায়ী ফ্রামজী ম্যাডান সাহেবের মালিকানাধীন পাইওনিয়ার

ফিল্ম কোম্পানীর আওতায় 'ধ্রুব' ছায়াচিত্রের সঙ্গীত রচনা ও সুর সংযোজনার চুক্তিতে দস্তখত করেছিলেন কবি। এই পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হ'য়েছিলেন কবি সম্ভবত এর পরে। পাইওনিয়র ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম ডিরেক্টর হিসাবে কবির নিয়োগ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৩ কিংবা ১ জানুয়ারী ১৯৩৪ থেকে কার্যকর হ'য়ে থাকবে।

সময় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ১৩৪০ সনের অগ্রহায়ণ পৌষ থেকে নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক সংরক্ষিত তথ্যাদি পেশ করছি।

কবি তখন সপরিবারে কলকাতায় ৩৯ নম্বর সীতারাম রোডে থাকেন। অগ্রহায়ণ ১৩৪০ (নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯৩৩) এ প্রকাশিত হয় মাসিক 'ভারতবর্ষ' : ২১শে বর্ষ : ১ম খণ্ড : ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত : 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়'।

অগ্রহায়ণ ১৩৪০ এর মাসিক 'মোহাম্মদী' : ৭ বর্ষ : ২ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছে 'রুবাইয়াৎ ই-ওমর খৈয়াম' (৩২ ৪৬) এর অনুবাদ।

অগ্রহায়ণ ১৩৪০ এর মাসিক 'মোয়াজ্জিন' : ৬ বর্ষ : ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছে 'ছেলেদের এক পাতা'য় কবিতা 'নবাব নামতা পাঠ'।

অগ্রহায়ণ ১৩৪০ : ১০ বর্ষ : ২ সংখ্যা : 'সওগাত' এ 'গান' (চাঁদনী কেদারা-- ত্রিতালী)—এর কিয়দংশ :

"তরুণ অশান্ত হে বিরহী
নিবিড় তমসায় ঘন ঘোর বরষায়
দ্বারে হানিছ কর রহি' রহি'।।"

অগ্রহায়ণ ১৩৪০ এর 'সওগাত' এই প্রকাশিত 'রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম' এর দু'টি কবিতা। প্রথমটি শুরু থেকে দু'টি পঙ্‌ক্তি :

'আজ আছে তোর হাতের কাছে, আগামী কাল হাতের বা'র,
কালের কথা হিসাব করে বাড়াস্‌নে তুই দুঃখ আর।'

চতুষ্পদী কবিতা 'রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম'-এর দ্বিতীয়টির প্রথম দু'টি পদ :

'এক সোরাহী সুরা দিও, একটি রুটি ছিল্কে আর,
নগ্ন মূর্তি তাহার সাথে একখানি বই কবিতার।'

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০ : ২রা শাবান ১৩৫২ : ২১শে নভেম্বর ১৯৩৩ তারিখ মঙ্গলবার দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল পরলোকগমন করেন।

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০ : ৫ই শাবান ১৩৫২ ; ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩ তারিখ শুক্রবার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সাপ্তাহিক 'দেশ' আত্মপ্রকাশ করে।

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০ : ৮ই শাবান ১৩৫২ : ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩ তারিখ সোমবার কাজী নজরুল ইসলামের পরিশ্রমী তর্জমা 'কাব্য আমপারা প্রকাশিত হয়।

এর মাত্র ছ'দিন পর ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০ : ১৪ই শাবান ১৩৫২ : ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৩ তারিখ রবিবার পার্সী ঝানু ব্যবসায়ী ফ্রামজী ম্যাডান সাহেবের মালিকানাধীন পাইওনিয়ার ফিল্মস্‌ কোম্পানীর আওতায় 'ধ্রুব' ছায়াচিত্রের সঙ্গীত রচনা ও সুর সংযোজনার চুক্তিপত্রে দস্তখত করলেন কবি সঙ্গীতকার কাজী নজরুল ইসলাম। বিশেষ পরিস্থিতিতে 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন কবি।

পৌষ ১৩৪০ (ডিসেম্বর ১৯৩৩-জানুয়ারী ১৯৩৪) এর 'সওগাত' : ১০ বর্ষ। ৩ সংখ্যায় খবর বের হয়েছে যে, সম্প্রতি পাইওনিয়ার ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ছায়াচিত্র জগতে একজন বাঙলাভাষী মুসলমান এই প্রথম উচ্চপদের অধিকারী হওয়ার সাফল্য অর্জন

করায় 'সওগাত' সংশ্লিষ্ট সুধীবৃন্দ অকুণ্ঠ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। পৌষ ১৩৪০-এর 'সওগাত'-এই প্রকাশিত হয়েছে নজরুল ইসলামের গান:

'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী-বর্ণা
এস মালবিকা।
অর্জুন মঞ্জরীকর্ণে
গলে নীপ মালিকা।
এস মালবিকা'

'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা', এই গানটি পৌষ ১৩৪০-এর বুলবুল: ১ বর্ষ: ৩ সংখ্যায়ও ১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। 'বুলবুল' এর এ সংখ্যায় ১৮৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'য়েছে নজরুল ইসলামের ভাটিয়ালী: 'আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো/চল আমার বাড়ী', ১৯০ পৃষ্ঠায় গান: 'আমি অলস উদাস আনমনা', ২১৮-২২২ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ; 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য', ২২২ পৃষ্ঠায় গান: 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর, আয় ফিরে আয় ফিরে আয়' ২২৬ পৃষ্ঠায় গান: 'এল ঐ পূর্ণিমা চাঁদ কুঞ্জ জাগানো'। ২১৮ থেকে ২২২ পৃষ্ঠায় 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য' সম্পর্কে তিনি যা লেখেন, সেটির কিয়দংশ:

'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্যের দিকে একটু ভালো করে দেখ্‌লে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে যা তার দু'টি রূপ। একরূপে সে শেলীর Skylark এর মত, মিলটনের Birds of Paradise এর মত এই ধূলিমলিন পৃথিবীর ঊর্দ্ধে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না; কেবলি ঊর্দ্ধে - আরো ঊর্দ্ধে স্বপ্নলোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী। (প্রাতিকা)।"

পৌষ ১৩৪০ এর 'মোয়াজ্জিন'-এ প্রকাশিত হয়েছে মোহাম্মদ কাসেম প্রণীত উপন্যাসের কবি নজরুল ইসলামকৃত প্রশংসাপত্র 'আগামীবারে সমাপ্য'।

পৌষ ১৩৪০-এর এর ৭ম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ 'রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম' (৪৭-৫৯)।

সম্ভবতঃ ১৯৩৪-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস্ কোম্পানীতে নজরুল-কণ্ঠে রেকর্ড হয় গান: 'এত কথা কি গো কহিতে জানে চঞ্চল তব আঁখি।' কবি-কণ্ঠের এই গানটি এ যাবৎ প্রকাশিত হয়নি।

জানুয়ারী ১৯৩৪ এ কমল দাশগুপ্তের কণ্ঠে 'দি টুইন'-এ (এফ.টি.২৯৬৭) রেকর্ড হয় কাজী নজরুল ইসলামের জাগরণমূলক সঙ্গীত: 'চলরে চপল তরুণ দল' এবং 'শঙ্কা শূন্য লক্ষ-কণ্ঠে'।

জানুয়ারী ১৯৩৪-এ-ই কমল দাশগুপ্তের কণ্ঠে 'দি টুইন' (এফ.টি.৩০০২)-এ নজরুল সঙ্গীতের আর একটি রেকর্ডে গাওয়া হয়েছে আরো দু'টি গান: তুমি নন্দন পথ ভোলা' এবং 'ঝুমকো লতার চিকণ পাতায়'।

২০শে পৌষ ১৩৪০: ১৭ই রমজান ১৩৫২: ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩৪ তারিখ বৃহস্পতিবার পালিত হয়েছে মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী।

মুর্শিদাবাদে কবি নজরুল

আবুল হাসনাত

কোনো বড় কবি, শিল্পী বা ভাবুক যখন কোনো স্থানের সঙ্গে পরিচিত হন, বা সম্পর্ক স্থাপন করেন, তখন স্বভাবতঃই কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ঃ সেই সম্পর্ক স্থাপনের হেতু কী? সম্পর্কের প্রকৃতি কী কি? তাঁর ভাবনাব জগতে বা তাঁব শিল্প বিকাশেব ইতিহাসে সেই স্থানেব কোনো গুরুত্ব আছে কি? থাকলে তাব প্রকৃতি কিরূপ? অন্যান্য কবি শিল্পীব মত কাজী নজরুল ইসলামও অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও বসবাস করেছিলেন। সে সব স্থানেব স্মৃতি এবং তাদের উপলক্ষ্য নজরুলের কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে অক্ষয় হয়ে আছে। কত তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কত না এখনো আবিষ্কারের প্রতীক্ষায়। আমরা এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলাব সঙ্গে নজরুল ইসলামের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

'পলাশীর প্রান্তর' এর পাশ্ববর্তী গঙ্গাবিধৌত মুর্শিদাবাদ জেলা। সেখানে একদিন "ভাবতেব দিবাকব" অস্তমিত হয়েছিল। সেই জেলার সঙ্গে আধুনিক বাংলাব অন্যতম সৎ, সচেতন ও বিবেকবান কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠাব ঘটনা একদিকে যেমন নজরুলেব বিচিত্র জীবনেব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত করে, অপব দিকে সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন মুর্শিদাবাদেব সাংস্কৃতিক ইতিহাস বচনার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে চিহ্নিত হতে পাবে। তাই মুর্শিদাবাদেব সঙ্গে কাজী নজরুলের সম্পর্কেব স্থায়িত্ব এবং তাব প্রকৃতি বিষযে আলোচনা কবা নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মুর্শিদাবাদ তথা বহবমপুরে কাজী নজরুল ইসলাম মুক্তপক্ষ হয়ে আসেন নি, প্রথম এসেছিলেন বন্দী হিসাবে। সুতবাং তিনি যখন বহবমপুবেই প্রথম মুক্তিব স্বাদ লাভ কবলেন, তখন তাব সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবেই একটি গভীব অনুবাগেব সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বীবভূমেব সঙ্গে তাব যেমন একটি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল (এম.আব্দুব বহমান, 'বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বীবভূমেব সঙ্গে তাব সম্পর্ক' "ঝংকাব", নজরুল সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৫), এখানে হয়ত তেমনটি ছিল না। কিন্তু হৃদয়েব আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হতে আদৌ সময লাগে নি। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামেব মতে প্রেসিডেন্সি ও হুগলি জেলা থেকে নজরুল ১৯২৩ সালেব ১৮ই জুন বহরমপুব জেলে স্থানান্তবিত হন এবং ১৫ই ডিসেম্বব মুক্তিলাভ কবেন (রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, ১৩৮৯, পৃ. ১১৪)।

বহবমপুব জেলে অবস্থানকালেই জেল আইন ভাঙাব অপবাধে তাব বিরুদ্ধে আব একটি মামলা আনা হয়। সেকালেব বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ব্রজভূষণ গুপ্ত এবং জ্ঞান সবকাব নজরুলেব পক্ষ অবলম্বন কবেন এবং নজরুল মুক্তিলাভ কবেন। কিন্তু অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা তাঁব একটি বহু তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধে জানান যে তিনি নিজে বহবমপুব জেলেব বন্দীদেব একটি "অযত্নবক্ষিত" তালিকা দেখেছেন, কিন্তু

বহু পাতা লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বন্দী নামের তালিকায় তিনি নজরুলের নাম খুঁজে পাননি (শক্তিনাথ ঝা, 'মুর্শিদাবাদ জেলায় নজরুল চরিতের উপাদান', ১ম বর্ষ স্মরণিকা, বহরমপুর নজরুল কমিটি, ১৯৮২, পৃষ্ঠা দেওয়া নেই)। তাঁর তথ্য-বিশ্লেষণ থেকে আমাদের আরো মনে হয়, নজরুল অনুরাগী জেল-সুপার তাঁর সঙ্গে ভাল আচরণ করেছিলেন বলে যে একটি ধারণা গুরুত্বের সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্মৃতি-চারণায় স্থান পেয়েছে, এটি সম্ভবত যথার্থ সত্যের বিপরীত চিত্র (প্রাগুক্ত)।

১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মুক্তিলাভের পর কৃষ্ণনাথ কলেজের একদল ছাত্র মিছিল ক'রে নজরুলকে তাদের মেসে নিয়ে আসে, মেসটি "সায়েন্স কটেজ" নামে পরিচিত ছিল। নজরুল সেখানে গান শুনিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণনাথ কলেজের বি.এ. ক্লাসের ছাত্র (ভর্তিঃ ১৯২৩) এবং প্রথম ছাত্র-সংসদের সম্পাদক বিপ্লবী নিরঞ্জন সেনের স্মৃতিচারণা উদ্ধার করা যেতে পারেঃ "বহরমপুর জেলে কাজী নজরুল কিছুদিন বন্দী ছিলেন রাজদ্রোহিতার অপরাধে। তিনি জেল ভোগের পর যখন মুক্তি পেলেন তখন তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। আমি যে হোস্টেলে ছিলাম (সায়েন্স হোস্টেল) সেখানে তাঁকে এনে তুললাম। নজরুলের খাওয়া, আদর যত্ন করার কাজে লাগতে পেরে আমাদের গর্বের সীমা ছিল না। আমাদের চোখেই এবং আজ হয়ত সারা দেশের চোখেই, তিনি ছিলেন সেদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনমনীয় যোদ্ধা, বিপ্লবী কবি।" (নিরঞ্জন সেন, "স্মৃতির দিনগুলি", Krishnath College Centenary Commemoration Volume 1853-1953, পৃ-২৫৩)।

তারপরই নজরুল গোরাবাজার নিবাসী নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে ওঠেন। নজরুল গীতির বিশিষ্ট স্বরলিপিকার এবং পরম নজরুল অনুরাগী নিতাই ঘটক ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নজরুলকে ডঃ নলিনাক্ষ সান্যালের বাড়িতে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন ("মুক্ত আকাশ, স্বর্ণপক্ষ ঈগল", কাফেলা, নজরুল সংখ্যা কলকাতা, ১৩৮৮, পৃঃ ৫৭)। অবশেষে নজরুল এসে ওঠেন কাদাই ভট্টাচার্য পাড়ার উমাপদ ভট্টাচার্য মশাই-এর বাড়িতে। তিনি সুরকার, সু-গায়ক এবং নজরুলের গানের অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজে নজরুলকে পরম আদরে তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন। সেখানে সে-সময় নজরুলের জীবনের কিছু ঝঞ্ঝামুক্ত, বর্ষণসিক্ত দিবস-রজনী কেটেছিল।

সেইসব সুখকর দিনগুলিতে কংগ্রেসের ডাকে জনসভায় নজরুল ভাষণ দিয়েছিলেন। নজরুলের একান্ত ঘনিষ্ঠ জন বিশিষ্ট আইনজীবী শশাঙ্কশেখর সান্যাল এক বিশাল জনসভায় নজরুলের গান গাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্যঃ শক্তিনাথ ঝা-এর প্রবন্ধ)। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেস নেতা ব্রজভূষণ গুপ্ত। তবে আমাদের মনে হয়েছে, এরপর বহরমপুর সঙ্গীত উপলক্ষেই নজরুল সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন করেছেন। কৃষ্ণনগরের মত বহরমপুরে অত গভীরভাবে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকতে বা নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় নি বলেই মনে হয়।

আর একটি বিষয় সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা উচিত বলে মনে হয়। সে সময় সম্ভবত বহরমপুরে কোনো মুসলিম পরিবারের সঙ্গে নজরুলের আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা হয়নি। নজরুলের সেই বয়সে এবং তার আগে পরেও মুসলিম পরিচিতির সংখ্যা কম ছিল না। এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। নজরুল যখন বহরমপুর জেলে আসেন তাঁর পূর্বেই তিনি নানা কারণে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। কলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে এক দুর্নিবার নবত্বের সূচনা করেছেন। করাচীর সেনা নিবাস থেকে ফিরে এসে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উদার, জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির আরো অনেকে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করেছেন। সেই সময় কলকাতা বাসকালে অনেকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে সব ইতিহাস রচয়িতাগণ একজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নৈকট্যকে খুব গুরুত্ব সহকারে বিচার করেন নি। তিনি "নূর লাইব্রেরী"র (তালতলায় প্রথমে ১০ নং এবং পরে ১২/১ সারেঙ্গ

লেনে অবস্থিত) প্রতিষ্ঠাতা মঈনুদ্দীন হোসায়ন। অবশ্য মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম, স্মৃতি কথা'য় তাঁদের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন (পৃ ১৯ ২০)। যে সময় নজরুলের সঙ্গে মঈনুদ্দীন হোসায়নের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত, তখন মঈনুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সু সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রেজাউল করীমও কলকাতায় থাকতেন। নজরুল ও রেজাউল করীমের মধ্যে তখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা না হলেও পরিচয় ছিল। নজরুল যখন বহরমপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন, তার পরেও তিনি মাঝে মাঝে বহরমপুরে আসতেন, তখন রেজাউল করীম বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র। তিনি সে সময় "সৌরভ" নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতেন (প্রথম প্রকাশ ১৯২১)। বহরমপুর থেকে আব্দুল বারি, আব্দুল গনি এবং সৈয়দ সাখাওয়াত হোসায়নের পরিচালনায় প্রতিক্রিয়াশীল অর্থাৎ লীগ পন্থী চরিত্রের পত্রিকা "ইসলাম জ্যোতি" আত্মপ্রকাশ করেছে। নজরুল ইসলামের উদার জাতীয়তাবাদী এবং সংস্কারমুক্ত রচনাকে আক্রমণ ক'রে যে সব পত্রিকা লেখনী চালনা করেছিল, তার মধ্যে ইসলাম জ্যোতিরও বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু সেই বহরমপুর থেকেই প্রকাশিত রেজাউল করীমের "সৌরভ" ছিল একান্তই জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। কিন্তু সে পত্রিকার এক বৎসরের সময় সীমায় নজরুলের কোনো রচনা বা তাকে নিয়ে কোনো লেখা প্রকাশিত হয় নি।

অথচ রেজাউল করীম এক স্মৃতি চারণায় বলেছেন, নজরুল তার অপরিচিত ছিলেন না (দ্রষ্টব্য: "আমার স্মৃতিতে নজরুল", ১ম বর্ষ নজরুল স্মরণিকা, ১৩৮২, পৃষ্ঠা দেওয়া নেই)। কিন্তু সৌরভ পত্রিকায় নজরুল প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি অবশ্যই কিছুটা বিস্ময়কর ছিল। সে সময় সম্ভবত কোনো মুসলিম পরিবারের সঙ্গেই নজরুলের আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিছু শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম ছাড়া বহরমপুরে তখন শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে লীগের আধিপত্য ছিল। ব্যতিক্রমের মধ্যে অবশ্যই যার নাম করতে হয় তিনি মঈনুদ্দীন ও রেজাউল করীমের মামা আব্দুস সামাদ সাহেব। তিনি লীগ বিদ্বেষী এবং একান্ত, একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবক ছিলেন। মঈনুদ্দীনের কাছে নজরুল আব্দুস সামাদের নাম বা প্রসঙ্গ শুনে থাকতেও পারেন। কিন্তু নজরুল তার মুক্তিলাভের পর বা অনির্মিত বহরমপুর বাসকালে এঁদের কারো সঙ্গেই পরিচিত হন নি, অন্ততঃ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে তার আদর্শের সাদৃশ্য সত্ত্বেও। আর একটি কথা। রেজাউল করীমের "সৌরভ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৯২) নলিনাক্ষ সান্যালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল: "হিন্দু মুসলমান"। তার পূর্বেই নলিনাক্ষ সান্যালের বিবাহ উপলক্ষে (১৯২৪) নজরুলের বহরমপুর আগমন। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় পরে আসছি)। কিন্তু নলিনাক্ষ সান্যালের মধ্যস্থতাতে "সৌরভ" পত্রিকা বা তার সম্পাদকের সঙ্গে নজরুলের সংযোগ ঘটেনি। বহরমপুরের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের এক খণ্ডিত অংশের সঙ্গেই নজরুলের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বরং বহরমপুরে যাদের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন: নলিনাক্ষ সান্যাল, উমাপদ ভট্টাচার্য, শশাঙ্কশেখর সান্যাল, নিতাই ঘটক, জগৎ ঘটক, জগদানন্দ বাজপেয়ী, ব্রজভূষণ গুপ্ত, খাগড়ার বরাট পরিবার ইত্যাদি। আমরা এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করতে পারি।

প্রথমেই বলা যায় উমাপদ ভট্টাচার্যের কথা। একথা অবশ্যস্বীকার্য, নজরুলের সঙ্গে উমাপদের প্রথম সংযোগ সঙ্গীতের সূত্রে। নজরুল বহরমপুরে জেলে থাকতেই তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গানের দ্বারা অনেকের মত উমাপদও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কারা মুক্তির কয়েকদিন পর নজরুল যখন উমাপদের বাড়িতে এসে উঠলেন, সে-সময়ের বিস্তৃত পরিচয় অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝায়ের প্রবন্ধে আলোকিত হয়েছে। নজরুল উমাপদের বাড়িতে একটানা প্রায় ৭/৮ দিন ছিলেন। উমাপদের বাড়িতে তার আচারনিষ্ঠ পিতৃদেব নজরুলের মত একজন আবাঞ্ছিত মুসলমান অতিথির সমালোচক হয়েও কিভাবে তাঁর নজরুলের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল,— এবং তা মূলতঃ নজরুলের উদার সংস্কারমুক্ত সঙ্গীত-প্রতিভা ও সঙ্গীত-চর্চার কল্যাণে,— তার পূর্ণ বিবরণ অধ্যাপক ঝা-এর প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। উমাপদের বাড়ির সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ, পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। উমাপদের বড় মেয়ে,

কমলার বিয়েতে নজরুল একটি গান লিখে ছাপিয়ে বিতরণ করেনঃ "মাধবীলতার আজ মিলন, সখী/শ্যামসহকার তরুর সাথে।"

আবার অপরদিকে বহরমপুরের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এখানে সে-বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যায়। নজরুলের "দোলনচাঁপা" কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা বহরমপুর জেলে রচিত হয়েছিল বলে উমাপদ ভট্টাচার্যের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। কবিতাগুলি হোলোঃ পউষ, পথহারা, দোদুল, দুল, অবেলার ডাক, সমর্পণ, ব্যথা-গরব প্রভৃতি। কিন্তু আব্দুল কাদিব "নজরুল রচনাবলী"র ১ম খন্ডে "দোলনচাঁপা"র গ্রন্থ পরিচয় অংশে কিছু কিছু কবিতার প্রথম প্রকাশের যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে ঐগুলি নজরুলের বহরমপুর কারাবাসের পূর্বেই রচিত বলে মনে হয়। নজরুল বহরমপুর জেলে আসেন ১৯২৩ সালের ১৮ই জুন অর্থাৎ আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। আর "দোলনচাঁপাব ১ম সংস্করণ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন আশ্বিন মাসে। কবি তখন রাজবন্দী। তাহলে পরে নেওয়া যায় উপরিউক্ত কবিতাগুলি ১৩৩০ (ইংরাজী ১৯২৩) সালের আষাঢ় থেকে আশ্বিনের মধ্যে বচিত হয়েছিল। কিন্তু নজরুল বচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নির্দেশিত হয়েছেঃ "পউষ" এর বচনাকাল ডিসেম্বব, ১৯২২ এবং তা "প্রবাসী"র ১৩২৯ সালের মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত, "পথহারা" ঐ সালের ফাল্গুন সংখ্যা "প্রবাসী" তে প্রকাশিত। "দোদুল দুল" ১৩২৮ সালের চৈত্র-সংখ্যায় "প্রবাসী"তে প্রকাশিত এবং "প্রবাসী" থেকে ১৩২৯ সালের "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র মাঘ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। "ব্যথাগবব" ১৩২৯ সালের "মাসিক বসুমতী"র চৈত্র সংখ্যায়, "সমর্পণ" ১৩২৯ সালের "ভাবতী"র চৈত্র সংখ্যায় এবং "অবেলার ডাক" ১৩৩০ সালেব প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "অভিশাপ" এবং "আশান্বিতা" যথাক্রমে ১৩৩০ সালের শ্রাবণ ও আশ্বিনে অর্থাৎ বহবমপুরে কারাবাসকালে প্রকাশিত বলে একথা বলে করা যেতে পারে যে সেগুলি নজরুল জেলে বসে রচনা করেছিলেন। (তথ্যসূত্র : আব্দুল কাদির; "নজরুল রচনাবলী", ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৫০)।

আরো কিছু কথা এ-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। নজরুল মুক্তিলাভ করেন ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর। তারপর তিনি যখন উমাপদ ভট্টাচার্যেব বাড়িতে ওঠেন এবং কিছুকাল অতিবাহিত করেন, তখন এই বইটি ("দোলনচাঁপা") "ফেলুদা (উমাপদ) ও বৌদিকে" উপহাব দেন। এই বইটি পবে নজরুল অবসর সময়ে সংশোধন ও পবিমার্জনা কবেছিলেন। এই সংশোধিত পাঠগুলি বিশুদ্ধ পাঠ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। সম্ভবত পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই বিশুদ্ধ পাঠগুলিব অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়েছে। আব্দুল কাদিব সম্পাদিত "নজরুল বচনাবলী"র ১ম খন্ডে এই সংশোধনেব অনেকগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে শক্তিনাথ ঝা উমাপদ ভট্টাচার্যেব পুত্র কঙ্কন ভট্টাচার্যের কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মূল পাঠ ও সংশোধিত পাঠের একটি তালিকা দিয়েছেন। আমি তাঁব পুনবাবৃত্তি কবছি না, শুধু আব্দুল কাদিরের নজরুল-রচনাবলী থেকে সেই কবিতাব নাম এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা তুলে দিচ্ছিঃ

"বেলা শেষে"	পৃ.	১২৪;
"পথহারা",	পৃ.	১২৫, ১২৬;
"ব্যথা গরব",	পৃ.	১২৬;
"পূবেব চাতক",	পৃ.	১২৬;
"পূজারিণী",	পৃ.	১৩৬
	পৃ.	১৪২;

এখানে পূর্ব সংশোধন সত্ত্বেও আব্দুল কাদিরের সংস্করণে (জুন, ১৯৮৩) তার উল্লেখ নেই। সংশোধিত পাঠ ছিলঃ "গুমরিয়া ওঠে বুক কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে", আর আব্দুল কাদিরের সংস্করণে আছে; "গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে।" বহরমপুরের জেলে বসে অন্ততঃ কিছু

কবিতাও যে নজরুল রচনা করেছেন এবং তাঁর কারাবাসকালেই এ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সে জন্য "দোলনচাঁপা"কে বহরমপুরের শ্রেষ্ঠ উপহার বলা যেতে পারে। আরো একদিক দিয়ে "দোলনচাঁপা"র গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়ঃ এই প্রথম আমরা তাঁকে অরাজনৈতিক কবিতা রচনা করতে দেখি। "দোলনচাঁপা"র পূর্বে প্রকাশিত "অগ্নি বীণা" এবং "বিষের বাঁশী"র কবিতাগুলি বিদ্রোহাত্মক। কিন্তু সামাজিক এবং ব্যক্তিগত মন্ময় কবিতা রচনার সূত্রপাত এখান থেকেই বলা যায়। এর মধ্যে "মুখরা"র মত বহুমাত্রিক কবিতা যদিও কোথাও কোথাও এর চরণ শিথিলতা স্থান পেয়েছে। এই সব কারণে "দোলনচাঁপা"র একটি ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ("দুটি কথা") পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কিছু চমৎকার কথা বলেছেন। কবির বহরমপুর জীবনে যে প্রতিশ্রুতির কোরক-গুলি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় দু'চোখ ভ'রে দেখেছেন, তা সত্যই একদিন নয়নলোভন পুষ্পরূপে বাংলা কাব্যের উদ্যানকে বর্ণ পাগল করে তুলেছিল। এখানেই বহরমপুরের বাতাস আর দোলন চাঁপার গন্ধ একাকার হয়ে গেছে।

এবার প্রসঙ্গান্তরে যাই। উমাপদ নজরুলের অনেক গান স্বকণ্ঠে গেয়েছেন এবং তার গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। নজরুল গীতির একটি রেকর্ডের ২ খানি গান উমাপদের গাওয়াঃ "কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে" এবং "সখি, বোলো বঁধুয়ারে নিরজনে"। অনেক অনুষ্ঠানেও উমাপদ নজরুলের গান গেয়েছেন। কলকাতা আলবার্ট হলে ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে নজরুলকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তাতে উমাপদ ভট্টাচার্য উদ্বোধন সঙ্গীত নজরুলের "চল্ চল্ চল" গানটি পরিবেশন করেন। অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর উমাপদ, নলিনীকান্ত সরকার বাণী স্বরচিত গীত পরিবেশন করেন। গানটির প্রথম কয়েকটি চরণঃ

ঝটিকা ক্ষুব্ধ সরণীতে ম্লান
সুন্দর সিক্ত শতদল
সঞ্চরে শ্যাম সুষমাতে তব
অন্তরে সুধা পরিমল।

(রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা, পৃ. ২১৪, ২১৬)।

নজরুল ও উমাপদকে নিয়ে মনোরঞ্জন সেন উত্তর কলকাতায় সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ের দোতলায় বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও সঙ্গীত শিক্ষক উমাপদবাবু সপরিবারে বসবাস করতেন। নজরুল এখানে গান শেখাতেন। এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েই নজরুল কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন এবং অনুষ্ঠান করেন। এই বিদ্যাপীঠের দোতলায় উমাপদের বাড়িতে নজরুল প্রায় বারবার সকালে আসতেন। নিতাই ঘটক, "কাফেলা" নজরুল সংখ্যায় এর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন (পৃ. ১৮)। নজরুলের গানের প্রথম স্বরলিপির বই "সুরমুকুর" এ স্বরলিপিকার ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত তার দ্বিতীয় স্বরলিপির বইটি নজরুল উমাপদকে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গ পত্রে একটি কবিতা লিখে উমাপদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেনঃ

ধরার ঊর্ধ্বে সুরলোকে তব সনে
পরিচয় মোর, বন্ধু, সঙ্গোপনে,
কেহ ত' জানে না, মম গান, মম বাণী,
বন্ধু, তোমার কাছে ঋণী কতখানি।
কত সে হীরক ধন মাণিক দানে
সাজায়েছ নিরাভরণা আমার গানে।
অশ্রুমতী সে আমার গানের ভাষা
তোমার প্রসাদে পেল কত ভালবাসা।
তুমি ভগীরথ, আমার সুরধুনিরে
শঙ্খ বাজায়ে এনেছ সিন্ধুতীরে।

শশাঙ্কশেখর সান্যাল এবং নলিনাক্ষ সান্যালের সঙ্গে নজরুলের অতি নিবিড় হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন সভায় শশাঙ্কশেখরকে দিয়ে নজরুল গান করাতেন। শশাঙ্কবাবুর গলায় "কারার ঐ লৌহ-কপাট" এবং "আজি রক্ত নিশি ভোরে" এই গান দুটি শুনতে কবি খুব পছন্দ করতেন। তাঁর ৮৫ বৎসর বয়সে গাওয়া এই গান দুটির দু'চার কলি আমিও শুনেছি। প্রসঙ্গত বলা যায় শশাঙ্কবাবু গান করার সময় নজরুলের ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ "লৌহ-কবাট" উচ্চারণ করতেন, "কপাট" নয়। আর একটি চরণেও নজরুল "কবাট" ব্যবহার করেছিলেনঃ "আজ হৃদয়ের জাম ধরা যত কবাট খুলিয়া দাও।" ("সাম্যবাদী" কবিতাগুচ্ছের "কুলিমজুর" কবিতা, নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.২১)। বহরমপুরে নজরুল-বিষয়ক স্মৃতিচারণায় মাঝে মাঝে কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নলিখিত গানটি নিয়ে এই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শশাঙ্কবাবুর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তাঁর ছোট বোন অল্প বয়সে মারা যান। নজরুল তাঁর বাবা-মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বহরমপুরে সান্যাল বাড়িতে আসেন এবং একটি গান রচনা করে সুর দিয়ে গেয়ে শোনানঃ "কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক দিয়েছে ওরে চখা, ওরে আমার পলাতকা।" এটি পরে "পলাতকা" নামে "ছায়ানট" কাব্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আব্দুল কাদির "ছায়ানট"-এর গ্রন্থ পরিচয়ে লিখছেন :

" 'পলাতকা' ১৩২৮ বৈশাখের "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিলঃ 'মা-মরা খোকার মৃত্যু শয্যায় পিতা গাচ্ছেন' এবং সুর— বৈকালী মেঠো বাউল। গানটি "ভারতী" হইতে ১৩২৮ আশ্বিনের "মোসলেম ভারতে" উদ্ধৃত হইয়াছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪)

এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়ঃ নজরুল গানটি বহরমপুরে রচনা করেন নি, তবে শশাঙ্কশেখর সান্যালের বোনের মৃত্যুর পর তাঁর মা-বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য গানটি গেয়েছিলেন।

নলিনাক্ষ সান্যালের বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নজরুলকে নিয়ে যে-অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সূত্রপাত সে-সম্পর্কে শশাঙ্কশেখর উল্লেখ করেছেন যে নজরুল তাঁর বিখ্যাত "জাতের নামে বজ্জাতি" কবিতাটি নলিনাক্ষ সান্যালের বিবাহ উপলক্ষে জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ঐ দিনই রচনা করেন ও সুর সংযোগ ক'রে গান হিসাবে পরিবেশন করেন। বহরমপুরের সুপরিচিত সাংবাদিক (বর্তমানে জীবিত নেই) কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর "বহরমপুরে নজরুল" প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন (১ম বর্ষ নজরুল স্মরণিকা)। কিন্তু মনে হয় রচনাকাল নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি জমে উঠেছে। নলিনাক্ষ সান্যালের বিবাহ হয়েছিল ১৯২৪ সালের ১৮ই এপ্রিল। আর নজরুলের এই গানটি কবিতা-হিসাবে "বিজলী" পত্রিকায় ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩০ (অর্থাৎ ১৯২৩ সালের মধ্য-জুলাই-এর পরে) এবং "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। "বিজলী" পত্রিকায় কবিতাটির নীচে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল এইভাবেঃ "মাদারীপুর শান্তিসেনা চারণদলের জন্য লিখিত অপ্রকাশিত নাটক হতে" (রফিকুল ইসলাম, "কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা", পৃ. ১১৫)। এ তথ্য থেকে বোঝা যায় কবিতাটি নলিনাক্ষ সান্যালের বিবাহ উপলক্ষে রচিত নয়। তবে সম্ভবত তিনি ঐ দিন তাতে সুরারোপ করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় নিমতিতার নলিনীকান্ত সরকার নজরুল-গীতির সুরকার এবং গায়ক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডে তিনি নজরুলের গান গেয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। নজরুল ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তাঁর গান রেকর্ডিং করতে আগ্রহী হন প্রধানতঃ নলিনীকান্তেরই অনুরোধে এবং উৎসাহে। উমাপদবাবু এবং নলিনীকান্তবাবু নজরুলের সঙ্গে মিলিতভাবে নজরুলগীতির সুরারোপ করেছেন। রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডে এই গান পরিবেশন ক'রে তাঁরা নজরুলগীতির জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত করাতে সহায়তা করেছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ নজরুল তাঁর "বাঁধনহারা" পত্রোপন্যাসখানি নলিনীকান্তকে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গপত্রে লেখেনঃ

"সুরসুন্দর শ্রী নলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু"
"বন্ধু আমারঃ পরমাত্মীয়ঃ দুঃখ সুখের সাথী।
তোমার মাঝারে প্রভাত লভিল আমার তিমির রাত্রি
....তোমার হাসির কাশ কুসুমের পার্শ্বে বহে যে ধারা
সেই অশ্রুর অঞ্জলি দিনু, লহ এ-বাঁধন হারা"।

(আব্দুল কাদির, নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯৪)

জঙ্গীপুরের শরৎ পন্ডিত, যিনি "দাদা ঠাকুর" হিসাবে কিংবদন্তী পুরুষ-রূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও নজরুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নজরুল দাদাঠাকুরের পৌরুষপূর্ণ ঋজু চরিত্রকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর "চন্দ্রবিন্দু" কাব্য গ্রন্থটি নজরুল দাদাঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেনঃ

"পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মদ্দা ঠাকুর
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পন্ডিত মহাশয়ের শ্রী চরণকমলে
হে হাসির অবতার,
লও গো চরণে ভক্তি প্রণত কবির নমস্কার।"

(নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০)

প্রসঙ্গত বলা যায়ঃ "মদ্দাঠাকুর" দ্ব্যর্থক,— মৎ দাঠাকুর অর্থে আমার দাঠাকুর, আবার "মদ্দা অর্থে পুরুষ অর্থাৎ পৌরুষপূর্ণ।

কিন্তু এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং কিছুটা বিতর্কিত— সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শ্রী বরদাচরণ মজুমদারের সঙ্গে। নির্মতিতার এক বিবাহ-বাসরে লালগোলা মহেশনারায়ণ একাডেমীর প্রধানশিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। সেই পরিচয় পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণতি লাভ করে। নজরুল বরদাচরণের কাছে যোগশিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন এবং নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন। এ নিয়ে অনেক কিংবদন্তী অনির্যন্ত্রিত আবেগ-উচ্ছ্বাসে বহুশ্রমসাধ্য ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে চলেছে। যোগী বরদাচরণ ও নজরুলের সম্পর্কের বিশ্লেষণ যে মাত্রা লাভ করেছে তাকে নতুন আলোকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্র রয়ে গেছে। সম্প্রতি একজন নিষ্ঠাবান গবেষক এ-বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে নজরুল ও বরদাচরণের গভীর পারিবারিক সম্পর্কের তত্ত্বটাও বিঘ্নিত হবে বলে মনে হয়। তাছাড়া সাধনার বলে পুত্র বুলবুলের দেহকে প্ল্যানচেটের মধ্যে দেখতে পাওয়া এবং আরো সব কর্মকান্ড একটি মানসিক বিকার বলে মনে হয়। আর এই কারণেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল একথা তিনি তাঁর বইএ উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ২৫৫-৫৬)। স্ত্রীর অসুখের সময় উদ্‌ভ্রান্ত নজরুল বরদাচরণকে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলি নজরুল রচনাবলীতে (৫ম খন্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, পৃ. ৩৩০-৩৩) পত্র সংখ্যা ৫৬, ৫৭ এবং ৫৮। এই পত্রগুলি পাঠ করলে নজরুলের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। যে-নজরুল পরম আত্মবিশ্বাসে একদা লিখেছিলেন, "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ" এবং করেনও নি। সেই নজরুলকে দেখি, স্ত্রীর ব্যাধি-উপশমের জন্য এইসব চিঠিপত্রে বরদাচরণের শক্তিভিক্ষা করছেন। এই পত্রগুলি ১৯৩৮ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে লিখিত। এর মধ্যে একজন মানুষের কাছে যে-আত্মনিবেদনের সুর ফুটে উঠেছে সেটি নজরুলের আজন্ম-লালিত ভাবনার বিপরীত। এর বছর দুই পর ১৯৪০ সালে কলকাতা মুসলিম ছাত্র-সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ক'রে তিনি যে-বাণী পাঠিয়েছিলেন, তাতে এক জায়গায় লিখছেনঃ "আমার মন্ত্র— 'ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাসতাইন'। কেবল এক আল্লাহর আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব স্বীকার করি না, একমাত্র তাঁরই কাছে শক্তিভিক্ষা করি।" (নজরুল রচনাবলী, পৃ. ৩৩৪)। এই পত্রে যে-নজরুল ভাবে-ভাষায় ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত, পূর্ব-কথিত তিনটি পত্র থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা আব্দুল কাদিরের পত্র-পরিচয় থেকে জানতে পারি এগুলি তিনি "শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' নামক গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। মূল পত্রের পাণ্ডুলিপিগুলি কোথায় আছে? সেগুলি সকলের দৃষ্টিগোচর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পত্রগুলির লেখক যে নজরুল ইসলাম তা ভাবতে আমাদের সত্যই কষ্ট হয়। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নিঃসন্দেহে খ্যাতিমান লেখক ও সাহিত্যিক; কিন্তু কখনো কখনো তার অথরিটি যে-অভ্রান্ত নয় তা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ উল্লেখ করেছেন। অচিন্ত্যকুমার তার "কল্লোল যুগ" এ লিখেছেন, "নজরুলের গুরু ছিলেন মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে।" একথা যে ভ্রান্ত তা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণেও সে ভুল সংশোধিত হয়নি। সুতরাং নজরুলের এই পত্রগুলি নতুন ক'রে বিচার করার প্রয়োজন আছে। অন্যের লেখা পত্র নজরুলের লিখিত বলে প্রকাশ করার ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে। নার্গিস বেগমের মামা (যিনি নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিবাহের জন্য সচেষ্ট ছিলেন) আলী আকবর খানকে "বাবা শ্বশুর" সম্বোধনে নজরুল যে পত্রটি লিখেছিলেন বলে আলী আকবর ঘোষণা করেছেন, তাকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ "বাবা শ্বশুর মার্কা পত্র" বলে ঠাট্টা করেছেন (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃ. ৭৯ ৮১)। আমার মনে হয়, নজরুলের চরিত্র ও মানসিক গঠন, তাঁর বিশ্বাস ও ভাবনার বিকাশ পত্রে লিখিত ভাষা ও বিভিন্ন ইমেজের ব্যবহার, বিশেষ বিশেষ লিখিত ভাষা ও বিভিন্ন ইমেজের ব্যবহার, বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি দুর্বলতা এসব বিচার করে বরদাচরণকে লিখিত নজরুলের পত্রগুলি মূল পাণ্ডুলিপি সহ অনুধাবন করা উচিত।

কিন্তু একথা সত্য যে বরদাচরণ মজুমদার নজরুলের ভাষায় তার "যোগসাধনার গুরু"। বরদাচরণ রচিত যোগবিষয়ক গ্রন্থ "পথহারার পথ" (১৩৪৭) নজরুল একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। তিনি যে অতি নিবেদিতচিত্ত শিষ্যের মত বরদাচরণের কাছে সমর্পিত, তা ঐ ভূমিকার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। যেন মনে হচ্ছে একজন সুফি সাধকের কাছে একজন ভক্ত নিজেকে সংশোধিত করছেন যাকে সুফিরা বলেন "ফানা ফিশ শেখ", অর্থাৎ গুরুর মাঝে বিলীন হওয়া। এই ভূমিকা রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন:

"এই দুর্দিনে এই বাংলাদেশেই যে সাম্যবাদী নির্লোভ, নিরহঙ্কার, নিরভিমান, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ যোগী আত্মগোপন করিয়া আছেন যাহার শক্তিতে আজ জাতিধর্ম নির্বিশেষে শত শত বিখ্যাত বাঙালী উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য।"

(নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৮৯)।

এখানে যে নজরুলকে আমরা পাই, তিনি "কামাল পাশা" বা "ভাঙার গান" এর কবি নন, এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়, অতল জলের আহ্বানে এক উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত মুসাফির।

কিন্তু লালগোলায় নজরুলের আরো একটি মূর্তি পাই, তিনি এক রসময়, রসিক ভোজী। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নজরুল লালগোলার রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানে নজরুলের আসা উপলক্ষে এক সংকার সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ অঞ্চল ইলিশ মাছের জন্য প্রসিদ্ধ। নজরুলকে আতিথেয়তার নিদর্শন হিসাবে ইলিশ মাছ খেতে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ কাঁটায় ভরা ইলিশ মাছ খেতে তার কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয়েছে। খাওয়ার শেষে নিজের বিখ্যাত গান "কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে" এরই প্যারডি করে ইলিশ মাছকে নিয়ে বলে উঠলেন, "কেন দিলে হে কাঁটা যদি ইলিশও দিলে।" (মহম্মদ এমদাদুল হক নূর, 'নজরুল জীবনের অলিখিত অধ্যায়', "নজরুলমেলা", পৃ. ৮৯)।

এবার আমরা গজল গানের নজরুলের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের সংযোগ বিষয়ে দু'চার কথা বলব। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ কাদের বখশ এবং মঞ্জু সাহেবের কাছে তিনি বিশেষভাবে ঋণী। নজরুলের অনেক গজল গানে মঞ্জু সাহেবের গজলের সুরের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,

নজরুলের বিখ্যাত গজল "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আ জ দোল"- এর উপর যে উর্দু গজলের সুরের ছাপ স্পষ্ট, সেটি হোলো :

মহব্বত্ রং দে যাতি হ্যায় দিল যব দিলসে মিলতা হ্যায়, মগর মুশকিল তো ইয়ে হ্যায় দিল বড়ে মুশকিল সে মিলতা হ্যায়।

নজরুলের কতকগুলি বাংলা গজলে মঞ্জু সাহেব সুর দিয়েছিলেন। নজরুলের বিখ্যাত "কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে" এই গজল গানের সুর মঞ্জু সাহেবের কাছে পাওয়া। অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন যে, মঞ্জু সাহেবের গাওয়া নজরুলের এই রকম একটি বাংলা গানের কয়েকটি কলি, মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আলি মির্জা সাহেবের বৃদ্ধা ভগিনী জাদলা বেগম তার কাছে উদ্ধৃত করেছিলেন, যদিও জাদলা বেগম এবং অর্থ বোঝেন নি। এই গানের প্রথম কয়েকটি চরণ এই রকম :

স্বপনে তাহার কুড়ায়ে পেয়েছি
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া
স্বপনে তাহারি মু'খানি নিরখি
স্বপনে কুহেলি মাখিয়া।

(অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "চেনা গোলাপ", ভূমিকা, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, পৃ. ৩৬)।

এছাড়াও মুর্শিদাবাদের আরো কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায় যেগুলি নজরুলের উপস্থিতিতে বা নজরুল কর্তৃক তাদের উল্লেখে গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৯৩১ সালের ৪ এপ্রিল পাচথুপীর বাণী মন্দির পাঠাগার ভবনে এক অনুষ্ঠানে অসংখ্য গুণমুগ্ধের সম্মুখে নজরুল গান করেছিলেন এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। পরে পাঠাগারের পরিদর্শক বইতে তিনি একটি সুন্দর মন্তব্য লিখেছিলেন। জনাব এমদাদুল হকের রচনা থেকে আমি এই মন্তব্যটি অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"ময়ূরাক্ষীর কোলে এই 'বাণী মন্দির।' আমি এখানে এসে ধন্য হলাম। প্রাণের পরশমণি দিয়ে গাথা এই মন্দিরের বেদী। সকল জাতির সকল মানুষের শ্রদ্ধা দিয়ে রচিত এর দেবতা। এঁরা সৃষ্ট দেবতার পূজা করেন নি। দেবতাকে সৃষ্টি করেছেন।.......একই নদীর বিচিত্র তরঙ্গ মালার মত এঁরা জাতিধর্মনির্বিশেষে একই গ্রামের বুকে খেলে বেড়াচ্ছেন। পল্লী গ্রামেও এ দৃশ্য বিরল।......"

পরে ময়ূরাক্ষী তীরের সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে আনন্দিত কবি একটি কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু কবিতাটি আর পাওয়া যায় না। (এমদাদুল হক নূর, নজরুল জীবনের অলিখিত অধ্যায়, "কাফেলা", ৮৯)।

কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে নজরুল রচনা করেন "মণীন্দ্র প্রয়াণ"। তারই প্রথম কয়েকটি চরণ,

দান বীর, এতদিনে নিঃশেষে করিলে নিজের দান।
মৃত্যুরে দিলে অঞ্জলি ভরি' তোমার অমৃত প্রাণ।
অমৃত লোকের যাত্রী তোমরা পথ ভুলে' আস, তাই
তোমাদের ছুঁয়ে অমর মৃত্যু আজিও সে মরে নাই।

কবিতার শেষে পাদটীকায় নজরুল লেখেন : "কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে.সি.আই.ই. মহোদয়ের তিরোধান উপলক্ষে লিখিত" (নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯)।

তাঁর কয়েকটি রচনায় বিভিন্ন অধ্যায়ের সূচনায় মুর্শিদাবাদের কয়েকটি গ্রামের নাম বার বার উল্লিখিত দেখা যায় ; "রিক্তের বেদন"-এ একবার সালার গ্রামের নাম (নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২১) এবং "বাঁধনহারা" পত্রোপন্যাসে ৫ বার সালার এবং ২ বার শাহপুর গ্রামের নাম উল্লিখিত হয়েছে (নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫০৩, ৫১৫, ৫২৪, ৫৩৫, ৫৭৬, ৫৮১, ৫৮৪)। এই গ্রামগুলির

কোনো ঘটনা ঐসব রচনায় নেই। তবে গল্পগুলির মুসলিম পরিবেশ এবং সংস্কৃতি লেখককে ঐসব ইসলামী সংস্কৃতি প্রধান গ্রামগুলির কথা মনে পড়িয়ে দিতে পারে।

এতক্ষণ আমরা যে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করলাম, তা থেকে এই ভাবনায় পৌঁছানো যায় যে, নজরুলের জীবনে মুর্শিদাবাদের ভূমিকা মূলতঃ সাংস্কৃতিক এবং সাঙ্গীতিক। কিছু রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেও তিনি কৃষ্ণনগরের মত রাজনৈতিক ভূমিকা এখানে পালন কবেন নি। তবে গানের জগতে তিনি মুর্শিদাবাদের কাছে অনেক কিছু পেয়েছিলেন। বিশেষ করে উমাপদ ভট্টাচার্য, কাদের বখ্‌শ এবং মঞ্জু সাহেবের কাছে তাঁর অশেষ ঋণ। পরবর্তী কালে নজরুল অনেক উচ্চাঙ্গের ভাব জগতেব সন্ধান পেয়েছিলেন এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে ভারতীয সঙ্গীত জগতে নিজের স্থান চিরনির্দিষ্ট করে গেছেন। তবে ঋণকে আত্মসাৎ কবা বড শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নজরুল চর্চা : দেশে বিদেশে

আবুল আজাদ

নজরুল ইসলাম বাঙালি জাতির জাতীয় কবি। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই তিনি এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু ওখানকারই একটি মৌলবাদী পাকিস্তানপন্থী গোষ্ঠী দীর্ঘকাল খণ্ডিত নজরুল চর্চার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। যে ... অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণা সঞ্চারের জন্য আত্মোৎসর্গ করলেন, বিরোধিতা করলেন পাকিস্তান সৃষ্টির সেই কবিকে নিয়েই তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে মৌলবাদী তথাকথিত 'নজরুল গবেষকরা' জাতিভেদ, ধর্ম ও, বিভেদের ঊর্ধে আসীন মানুষের কবি নজরুলকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী শুধুমাত্র মুসলমানদের কবি বানাতে চাইলেন। তারা তাঁর কবিতা গান থেকে কেবল মুসলমানী শব্দ রেখে আর সব বাদ দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলেন। এরাই একসময় রবীন্দ্র বয়কট আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।

দেশভাগোত্তর এই ঘটনার সঙ্গে ১৯২৯ সালে কলকাতায় কবিকে প্রদত্ত জাতীয় সংবর্ধনা উৎসবের প্রাক্কালে 'মোহাম্মদী'র আকরম খাঁর বাহিনী (মাদ্রাসার ছাত্র) কর্তৃক উৎসব সভাস্থল এলবার্ট হল দখল করে রাখার ঘটনার আচরণগত সাদৃশ্য রয়েছে। আকরম খাঁর দল সেদিন কবিকে মুসলমানদের শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন। অথচ তাদেরই অনুসারীরা পরে কবিকে সাচ্চা মুসলমান বানানোর জন্য তাঁর রচনা বিকৃত করার উদ্যোগ নিলেন। নতুন প্রজন্মকে, তরুণ যুবকদের, যাদের কবি হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলেন, সমাজ প্রগতির সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান করেছিলেন, তাদের এই সব ইতিহাস পর্যালোচনা করে — কবির আদর্শ বাস্তবায়নে নিবেদিত হতে হবে।

বাংলাদেশকে কবি হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মক্ষেত্র হিসাবেও সেদিন তিনি বেছে নিয়েছিলেন বাংলাদেশকেই। জীবনে যতবার তিনি সফরে গিয়েছেন ওখানে আত্মীয়তা করেছেন, তার অর্ধেকবারও তিনি কলকাতা, হুগলি, কৃষ্ণনগর ছেড়ে ভারতের অন্য কোথাও গিয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায় না।

এখানে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, নজরুল ইসলাম একদিকে যেমন ছিলেন চূড়ান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন স্বজাতি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে দায়িত্বশীলও। তাই বাংলাদেশের তিন কোটি নিরক্ষর মুসলমানের আত্মজাগরণের জন্য কবি ইসলামী ধর্মসঙ্গীত গুলি রচনা করলেন। কারণ এই মুসলমানরা লিখতে পড়তে না পারলেও গান বুঝতে পারে। তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান চাননি। বরঞ্চ এই মুসলমান মুসলিম লীগ নেতাদের বিরূপ সমালোচনাও অনাচারের জবাবে 'নবযুগে'র (১৯৪১) 'আমার লীগ কংগ্রেস' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"আমি লীগের মেম্বার নই বলে কি কোনো লীগ কর্মী বা নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি? আজও 'নবযুগে' এসেছি শুধু মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে তাদের প্রবল করে তুলতে... 'নবযুগে' আসার

অগে বাঙলার মুসলমান নেতায় নেতায় যে ন্যাতা টানাটানির ব্যাপার চলেছিল সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ কলঙ্ককে দূর করতেই আমি লেখনী ও তলোয়ার নিয়ে আমার অনুগত নির্ভীক, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী 'নৌ-জোয়ান'দের নিয়ে ভাই-এ ভাই এ পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে এসেছি। আমি কোন ব্যক্তিকে সাহায্য কবতে আসিনি।'

মুসলমান সমাজের আত্মবিকাশে কবির এই স্বীকারোক্তির পরও পাকিস্তানের মুসলমান নামধারী মৌলবাদী গোষ্ঠীটি দুরভিসন্ধিমূলক ভাবে নজরুলকে খন্ডনের অপচেষ্টা করেছে। এই স্বজাতি নিষ্ঠার পাশাপাশি ইসলাম ধর্মে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে জড়িযে পড়া কুসংস্কাব ও ভণ্ডামিগুলির কবি যেমন কঠোর সমালোচনা করেন. প্রায একই সময় প্রতিবেশী হিন্দুধর্মের বর্ণচোরা ভন্ড সন্ন্যাসীদেরও শোধরাতে বলেন।

উল্লেখ্য যে, এই সব ভন্ড বর্ণচোরা রাজনীতিকদের মুখোশ উন্মোচন করতে নজরুল সর্বাধিক ঝড় তোলেন পাকিস্তানকে "ফাঁকিস্তান" মন্তব্য করে। এবং তা 'নবযুগে'রই পাতায়।

'নবযুগ' ছিলো তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক-এর পত্রিকা। ঘটনার সময় কায়েদে আজম জিন্নার সঙ্গে হক সাহেবের রাজনৈতিক বোঝাপড়া চলছিলো, 'নবযুগে' এই মন্তব্য প্রচারিত হবার পর ভেঙ্গে যায সেই শলাপরামর্শের আনুষ্ঠানিকতা। প্রতিক্রিযাশীলেরা এসময উঠে পড়ে লাগলে কবিও 'নবযুগ' ত্যাগ করেন।

আশার কথা যে, বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী এই কবিকে তাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিপ্লবী প্রবক্তা মনে করে এবং সবকারী পর্যাযে প্রজাতন্ত্রের এই বেসরকারী ধারণার চূড়ান্ত প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী নজরুলকে এক সময কাফের বলে গাল দিয়েছে, 'লোকটা মুসলমান না শয়তান।' বলে ইসলাম রক্ষকের তথাকথিত ভূমিকায হা পিত্যেশ করেছে, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস; সেই নজরুলের গজল, হামদ, নাত ও ইসলামী গানগুলি আজ ইসলামেরই অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

সেই সঙ্গে বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় নজরুল অন্তর্ভুক্ত। তদুপবি ঐদেশে নজরুলের নামে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অগুণিত। এর পরিসংখ্যান তৈরী কবা একটি দুরূহ কর্ম।

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে ক'টি উৎসব রয়েছে, তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে জাতীয় পর্যাযে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৭/১৮টি স্বাযত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছর এই জাতীয় কার্যক্রমটি বাস্তবাযিত হয়। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী প্রথম নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করে। রচনাবলীর সর্বশেষ পরিমার্জিত নতুন সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে।

এছাড়াও কবির জীবন ও কর্মের উপর গবেষণা পরিচালনা, অনুবাদ এবং তা দেশে বিদেশে প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নজরুল ইন্সটিটিউট।

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হযে দীর্ঘ এক যুগ ব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও কর্মক্ষেত্র নিরূপণের কাজটি সম্পন্ন করে ইন্সটিটিউট এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে কবির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি শতাধিক গ্রন্থ, পত্রিকা, জার্নাল, স্বরলিপি গ্রন্থ ও কবির নির্বাচিত গ্রন্থাবলী প্রকাশ সহ নজরুল রচনার কিছু ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অনুবাদ হচ্ছে Selected Songs of Kazi Nazrul Islam: Abu Rushd. Nazrul Islam: Poet and More, Serajul Islam Chowdhury, The morning Shanai: Kazi Nazrul Islam-Kabir Chowdhury. Kuhelika: কুহেলিকা উপন্যাসের অনুবাদ: Kabir Chowdhury এবং Aspects of Nazrul Songs: Karunamoy Goswami.

নজরুল ইসলাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবন ও কর্মকালের অধিকাংশই সময়ই কলকাতা, কৃষ্ণনগর ও হুগলিতে কাটান। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সাহিত্য ও অন্যান্য রাজনৈতিক সামাজিক কর্মের ততটা আলোচনা বা গবেষণা হয়নি, যতটা হয়েছে সঙ্গীত নিয়ে। তবে নজরুল স্মৃতিকে চিরঞ্জীব করে রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কিছু তৎপরতা উল্লেখের দাবী রাখে। কলকাতার নজরুল মঞ্চ এই কীর্তির এক অনন্য উদাহরণ। রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে প্রতি বছর নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে নজরুল মঞ্চে ও রবীন্দ্রসদনে। সদন মঞ্চের অনুষ্ঠানে এ যাবৎ সঙ্গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমেই কবিবন্দনা হয়ে আসছে। তবে ১৯৯৫ সাল থেকে নজরুল সাহিত্যের নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রবর্তন করা হয়।

নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়াতেও আড়ম্বরের সঙ্গে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে — গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ। সপ্তাহব্যাপী এখানকার উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে নজরুল মেলা।

নজরুল বাংলাভাষী কবি হিসাবে ভারতের একমাত্র বাংলাভাষী প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গেই নয়— সমগ্র ভারতেই সমাদৃত। দিল্লী ইউনিভার্সিটির মডার্ন ল্যাংগুয়েজ ডিপার্টমেন্ট সহ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই ভারতীয় সাহিত্য সঙ্গীত বিষয়ে সীমিতভাবে হলেও নজরুল পঠিত হন। ভারতের জাতীয় ভাষা হিন্দীতে যেমন তাঁর বহু গান ও অন্যান্য রচনা অনূদিত হয়েছে, তেমনি অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও নজরুল সম্পর্কে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তামিল ভাষায় নজরুল সম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থ 'এনড্রন মানিড্রন নজরুল' (মানবতাবাদী নজরুল) এর প্রণেতা S Krishnamoorthy প্রখ্যাত তামিল সাহিত্যিক সুব্রহ্মনিয়ম ভারতীয় সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যকর্মের সর্বশেষ যে তুলনামূলক কাজটি করেন তার শিরোনাম হচ্ছে "Subramaniam Bharathi And Kazi Nazrul Islam, A comparative Study কৃষ্ণমূর্তির "এনড্রন মানিড্রন নজরুল' বইটি ১৯৮৬ সালে ভারতে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে।

পূর্ব ভারতের অসমিয়া ভাষায়ও নজরুলের কবিতার বেশ কিছু অনুবাদ হয়েছে। এ সম্পর্কে সমৃদ্ধ একটি গবেষণাধর্মী কাজ করেন ডঃ সুবীর কর। ১৯৯২ সালে তিনি ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউটে 'আসামে নজরুল' শিরোনামে বক্তৃতা প্রদান করেন।

এছাড়াও নজরুল সঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, সম্প্রতি প্রয়াত শান্তিনিকেতনের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রউফ, নজরুলের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডঃ অশোক বাগচি এবং চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর জনসংযোগ সচিব কাজী মজাহার হোসেন, একাডেমীর উপদেষ্টা শ্রী রবীন সেন, প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সফরকালে ঢাকার বাংলা একাডেমী ও নজরুল ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন এবং নজরুল বিষয়ক কার্যক্রম অবলোকন করে গভীর সন্তোষ ব্যক্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নজরুল বিষয়ে ডক্টরেট, বিশিষ্ট নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্তও সম্প্রতি ইন্সটিটিউটে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা উর্দুতেও নজরুল সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও নজরুল ইসলাম কংগ্রেস লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বে চর্চার ফসল পাকিস্তানবাদের বিরোধী ছিলেন (এ সম্পর্কে আগে আলোচিত হয়েছে), কিন্তু সেই পাকিস্তানেও (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান) তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আজ সমাদৃত হচ্ছে। করাচীর নজরুল একাডেমী বহুকাল যাবৎ পাকিস্তানে নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যাচ্ছে।

এশিয়ার অন্যত্র, বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ায় নজরুল সম্পর্কে আগ্রহ সূচিত হয় সেই চল্লিশের

দশক থেকে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি এবং অন্যান্য বিপ্লবাত্মক কবিতা— গানের অনুবাদও রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

চীনের বেইজিংসহ CIBTC-র তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চীনা ভাষায় নজরুল সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯৯২ সালের ২৩ জানুয়ারী ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউটে আসেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন Mr. Yao Ymsheng. Mr Mevg Mei এবং Mr. Warg Vcag Chay। অনুবাদে সহায়তার জন্য তাঁরা ইন্সটিটিউটের ইংরেজী প্রকাশনা সমূহ সংগ্রহ করেন।

বিশিষ্ট তুর্কী লেখক ডক্টর ফেথি টেবোটাগলুর নজরুল সম্পর্কে তুর্কী ভাষায় কাজ শুরু করেন ১৯৮৬ সালে। মধ্যপ্রাচ্যের ভাবধারা ও নবজাগরণের নায়কদের জীবন ও কর্মের বন্দনা করে রচিত নজরুলের প্রবন্ধ ও কবিতাগুলিই ডক্টর ফেথির গবেষণার বিষয়।

ইরানেও নজরুলের ইসলামী ভাবধারার কিছু কবিতা-গানেব অনুবাদ হয়েছে। ঢাকার ইরান কালচাবাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রচারিত এই অনুবাদ কার্যটি পাক্ষ ভাষায় প্রথম পরিকল্পিত নজরুল বিষয়ক প্রকাশনা।

সাম্প্রতিককালে বহির্বিশ্বে নজরুল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ দেখা যাচ্ছে জাপানে। প্রফেসার কাজুউ আজমা জাপানী ভাষায় 'বিদ্রোহী' সহ নজরুলের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যেকর্মের অনুবাদ করেন। আরেক জাপানী নজরুলপ্রেমী— টোকিও বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রভাষক ডঃ কিওকো নিওয়া নজরুলের ১২টি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত ৩০টি কবিতার বাংলা থেকে সরাসরি জাপানী ভাষায় অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। জাপানী ভাষায় এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নজরুল শিশু'। জাপানী বর্ণমালায় 'ল' নেই, তদস্থলে 'র' ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে নজরুলেব কবিতাগুচ্ছ। জাপানের স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ করে 'বিশ্বের ইতিহাসের মধ্যে ছেলেমেয়েরা' গ্রন্থে নজরুলের কথা রয়েছে। জাপানের ছেলেমেয়েরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই ইতিহাস অধ্যয়ন করে বলে নিওয়া উল্লেখ করেন। আরবী ভাষায়ও নজরুলের 'বিদ্রোহী' সহ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্মের অনুবাদ প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও নজরুল কমবেশী অনূদিত হয়েছেন। ফরাসি অধ্যাপক লুই রনু 'ভারতীয় সাহিত্য সমূহের ইতিহাস' (১৯৫১) গ্রন্থে নজরুল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। প্রখ্যাত ফরাসি মাসিক 'ইউরোপ' এর মে ১৯৫৪ সংখ্যায় ল্যুস্ ক্লোদ্ মেৎর তাঁর 'পয়েৎ রবেল দ্যু বঁগলে' (বাংলার বিদ্রোহী কবিরা, পৃঃ ৯৪-১০৪) প্রবন্ধে নজরুল সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং 'বিদ্রোহী', 'শিকল পরার গান' ও 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র নির্বাচিত অংশের অনুবাদ করেন। ল্যুস্ ক্লোদ্ মেৎর ফরাসি ভাষায নজরুলের উপর একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা।

জার্মানীতে নজরুল সম্পর্কে আগ্রহের সূচনা তিরিশের দশকেই। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কাছে পরাজয়ের পর মিত্রবাহিনীর অধিভুক্ত কলোনী সমূহের বিপ্লবী কর্মকান্ডে জার্মানী পরোক্ষভাবে সহায়তা করে আসছিল। তিরিশের দশকে ভারতে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়, তাতে জার্মানীর পরোক্ষভাবে সহায়তার তথ্যগুলিই এর উদাহরণ হয়ে আছে। এ সময় বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হেল্‌মুথ ফন গ্লাসেনপ্ 'অগ্নিবীণা'র কবিতাগুলি সম্পর্কে বলেন, "The poems deserve with full right the name the author has given, they are full of emotion like fire and sweet like the tune of vina"

যুক্তরাজ্যেও নজরুল আলোচিত হয়ে আসছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। তবে এই আলোচনার বিষয় ছিলো নজরুলের বিপ্লবী ভূমিকা। ১৯২০ সালে নজরুল সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করার পর ভারতীয় গোয়েন্দা দফতর নিয়মিত এই কবি সম্পর্কে লন্ডনে তথ্যাদি প্রেরণ করেছে। ১৯২২ সালে নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকাকে গোয়েন্দারা কম্যুনিস্টদের কাগজ হিসাবে চিহ্নিত করে লণ্ডনস্থ ভারত সচিব বরাবরে তথ্য পাঠায়। একের পর এক কবির গ্রন্থ বাজেয়াপ্তির তথ্যগুলিও তুলে ধরা

হয়। তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ কবি ডঃ উইলিয়াম র‍্যাদিচি ১৯৮৭ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ সফরকালে নজরুল ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে তিনি Sampling the poetry of Nazrul Islam শীর্ষক এক মূল্যবান প্রবন্ধে নজরুল সাহিত্যের বিষয় চেতনাকে মূল্যায়ন করেন। লন্ডন প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে লন্ডনে গড়ে উঠেছে নজরুল সেন্টার। প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রতি বছর সেখানে নজরুল জন্মোৎসব পালন করেন। ১৯৮৭ সালে লন্ডনের প্রবাসী ঐ বাঙালীদের উদ্যোগে নজরুল জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঐ উৎসবে ১৩ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। উৎসবের প্রদর্শনীতে নজরুল বিষয়ক প্রকাশনা, সঙ্গীতের ডিস্ক ও ক্যাসেট, আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে নজরুলের সকণ্ঠে গীত গান ও আবৃত্তির ক্যাসেট, কবির গ্রন্থসমূহের আদি সংস্করণের ফটোকপি ও দুর্লভ আলোকচিত্র দর্শকদের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার করে।

চেক ভাষাতেও নজরুলের 'বিদ্রোহী' অনূদিত হবার তথ্য পাওয়া যায়। আমেরিকার কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যের পঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র নজরুল গুরুত্বলাভ করে আসছেন বহুকাল যাবৎ। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকেই এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও প্রতি বছর সেখানে সীমিত আকারে হলেও নজরুল জন্মোৎসব পালন করেন। তবে এ ধরনের উৎসবের প্রথম সংগঠিত উদ্যোগটি আয়োজিত হয়েছে ১৯৯০ সালের মে মাসে নিউজার্সিতে (উত্তর আমেরিকা)। ঐ সম্মেলনে নিউজার্সির গভর্নর ২৭শে মে-কে 'নজরুল ডে' ঘোষণা করেন। ১৯৯১ সালেও নিউজার্সিতে নজরুল জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৯২ সালের ২৩-২৪মে উত্তর আমেরিকার বোস্টনে বসবাসরত বাংলাদেশীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'তরঙ্গ' নজরুল কনফারেন্সের আয়োজন করে। মেসাচ্যুসেটস-এর মেডফোর্ড অডিটোরিয়ামে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ডঃ গুলশান আরার সম্পাদনায় ১২টি ভাষায় নজরুলের 'গাহি সাম্যের গান' কবিতার অংশ বিশেষের অনুবাদ সহ চমৎকার একটি স্যুভেনীর প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এতে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মোট ২০টি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়। দেশী বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রধান সহ বোস্টন, মেডফোর্ড এবং মেসাচ্যুসেস্ট-এর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নগরপালদের শুভেচ্ছা বার্তা এবং নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালকের অভিনন্দন সহ ১২টি বার্তা প্রকাশিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকেও বার্তা প্রেরণ করা হয়।

কানাডাতেও নজরুল সম্পর্কে কাজ হয়েছে। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদেশীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অধ্যাপক জোসেফ টি ও' কনেল নজরুলের 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ করেন 'দি টেম্পল এন্ড দি মস্ক' শিরোনামে। কানাডাতে এটিই নজরুল বিষয়ক প্রথম কাজ। অনুবাদটি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট মাইকেল কলেজের জার্নাল Fall 1971-এ নজরুল ইসলামের একটি পরিচিতি সহ প্রকাশিত হয়। ও' কনেল ১৯৯২ সালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার লোকতথ্য সংগ্রহকালে বাংলাদেশ সফরে এলে নজরুল ইন্সটিটিউটে আসেন এবং নিবন্ধকারের সঙ্গে আলোচনায় এ সব তথ্য অবহিত করেন।

কানাডা প্রবাসী বাঙালিরাও নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ১৯৯১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বাংলাদেশ-কানাডা এ্যাসোসিয়েশন অব অটোয়া ভ্যালির উদ্যোগে অটোয়াস্থ গ্লীব কলেজিয়েট স্কুল অডিটোরিয়ামে নজরুল সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব টরন্টোর উদ্যোগে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সায়েন্স বিল্ডিং অডিটোরিয়ামে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Vanier Hall এ অনুরূপ আরেকটি অনুষ্ঠান হয়। প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে সোহরাব হোসেন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

প্রখ্যাত অষ্ট্রেলীয় অভিনেতা, কবি ও সমালোচক মিঃ রবিন রামসে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সফরকালে

ঢাকায় নজরুল ইন্সটিটিউটের নজরুল বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও নজরুলের কবিতার অনুবাদ পাঠ করে অভিভূত হন এবং নজরুলের জীবন ভিত্তিক নাট্যরচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৯৯ সালে নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিশ্ববাসীকে এই মানবতাবাদী কবি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একটি ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি বাংলাদেশস্থ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মাধ্যমে ইউনেস্কো সদর দফতরে পাঠানো হয়েছে। ইউনেস্কোর দুই হাজার সালের কর্মসূচিতে এটি অন্তর্ভুক্ত হবার কথা রয়েছে এবং বিশ্বের শতাধিক দেশে একসঙ্গে তা প্রচারিত হবে। ব্যাংককস্থ ইউনেস্কো প্রিন্সিপাল রিজিওন্যাল অফিস ফর এশিয়া প্যাসিফিকের উপপরিচালক Mr Shozo LLzawa ১৯৯২ সালে নজরুল ইন্সটিটিউট পরিদর্শনে এলে এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কবির জন্মশতবর্ষে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) কর্তৃক বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে বিবিসি কর্মকর্তা সিরাজুর রহমান বাংলাদেশ সফরকালে নজরুল ইন্সটিটিউট পরিদর্শনে এলে এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ ছাড়াও বিবিসির নিয়মিত কার্যক্রম সহ ভয়েস অব আমেরিকা ও রেডিও চায়নার বাংলা অনুষ্ঠানের সঙ্গীতের আসরে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে আসছে। অন্যান্য যে সব দেশের বেতারে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাতেও সীমিত আকারে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশিত হতে শোনা যায়।

উত্তর আমেরিকার বে এরিয়া প্রবাসী বেঙ্গলী এসোসিয়েশন আয়োজিত সানফ্রান্সিকোর সান্তাক্লারা কনভেনশন সেন্টারে ১৯ তম বঙ্গ সম্মেলনে (২-৪ জুলাই ১৯৯৯) শতবর্ষে নজরুল স্মারক বক্তৃতার জন্যে বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ড. রাঁধন সেনগুপ্ত একমাত্র ভারত থেকে আমন্ত্রিত হন। ৩রা জুলাই তিনি সেখানে নজরুল বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এছাড়া ১৭ই জুলাই লসএঞ্জেলেসের মিশন ভিয়েগো সিভিক হল সেন্টারেও ড. সেনগুপ্ত আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে প্রবাসী বাঙালীদের আলোচনা সভায় নজরুল বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেন।

উপরের বর্ণনা বিশ্বব্যাপী নজরুল বিষয়ক কার্যক্রমের একটি ক্ষীণ চিত্র মাত্র। এর কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব নজরুল বিষয়ক কাজ হয়েছে তার অধিকাংশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে হওয়ায় এবং প্রচারহীন থাকায় তার তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। সেই সঙ্গে এও উল্লেখ করা অপরিহার্য যে, বাংলা ভাষায় কবি বলে আমরা নজরুলকে নিয়ে গর্ব করলেও দীর্ঘকাল আমরা বিশ্বব্যাপী নজরুল চর্চার তথ্যাবলী সংগ্রহের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করিনি।

জাপানে নজরুল চর্চা

কিওকো নিওয়া

জাপানে নজরুল চর্চা এখন শুরু হয়েছে বা এখনও শুরু হয় নি বললেও চলে। নজরুল চর্চা সম্পর্কে কিছু কথা বলার আগে জাপানে বাংলা সাহিত্য চর্চা নিয়ে কিছু বলা যাক।

জাপানে এখনও সাধারণ লোকের মধ্যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই জানা আছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেই জাপানে তাঁর পরিচয় শুরু হয়। গত ১০০ বছর ধরে জাপান সবসময় পশ্চিমমুখী ছিল বলতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় উনিশশো দশক থেকে শুরু হয়েছে তার কারণ তিনি পশ্চিম দেশে শ্রেষ্ঠ কবি রূপে সমাদৃত। তখন জাপানে এমন কেউ ছিল না বাংলা ভাষা বুঝতে পারে আর অনুবাদ করতে পারে। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের সব রচনার অনুবাদ করা হয়েছিল ইংরেজী থেকে। এখন সেই প্রথম পরিচয়ের আশী বছরের পরে জাপানে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বেরিয়েছে আর তার বেশির ভাগ বাংলা ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু জাপানে রবীন্দ্র চর্চা বা গবেষণা চলছে কিনা বলা মুশকিল। আমাদের দেশে বাংলা সাহিত্যের গবেষক খুব কম, আর শুধুমাত্র ভাষার দিক থেকেও আরও অনেক কিছু করার আছে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জাপানে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় শুধুমাত্র চার-পাঁচ বছরের আগে থেকে শুরু হয়েছে। সব চেয়ে প্রথমে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালীর অনুবাদ করা হয়। তারপর মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুচ্ছ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুচ্ছ আর জীবনানন্দ দাশের "রূপসী বাংলা"-র অনুবাদ বেরিয়েছে। এগুলো সব বাংলা ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে আর অনুবাদের ভাষা বা মান মোটামুটি ভাল বলা যায়।

অবশেষে নজরুল। নজরুলের অনুবাদ আমি নিজেই করেছি আর দু'এক মাসের মধ্যেই বইটা প্রকাশিত হবে। অনুবাদ করতে করতে আমি নানা জায়গায় নজরুলের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। কারণ জাপানে সাধারণ পাঠক বা সম্পাদকেরা নজরুলের নামও আগে শোনেনি আর গবেষকদের মধ্যেই মাত্র নজরুলের নাম জানা ছিল।

আমি আগে বলেছি যে অনেক দিন ধরে জাপানে বাংলা সাহিত্যের মান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ছিল। জাপানের পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যরূপে অভ্যস্ত। তাদের ধারণায় রবীন্দ্রনাথের বা বাংলা কাব্য নিবেদিতচিত্ত এবং পেলব। তাই তারা নজরুলের রচনায় একদম আলাদা সুর দেখে আশ্চর্য হয়েছেন।

অন্যদিকে ভারতের নানা বিষয়ের গবেষকেরাও নজরুলের জীবন-কাহিনী অথবা নজরুল রচনার ঐতিহাসিক ভূমিকায় বেশ কৌতূহল দেখিয়েছেন। যেমন ধরুন, "আমার কৈফিয়ৎ" পড়লে তখনকার নজরুলের সাহিত্যিক জীবন বা তিনি সাহিত্যিক সমাজে কি ধরনের সমস্যায় পড়েছিলেন, তা বোঝা যায়। অথবা "সাম্যবাদী" কাব্য সংগ্রহ বা "লাঙল" পত্রিকা দিয়ে নজরুলের রাজনীতিক ধারণাও জানতে

পাবে। 'বিদ্রোহী'ও বেশির ভাগই রাজনীতির দিক দিয়ে পড়া হয়। তার ফলে "বিদ্রোহী" কবিতাকে ইংরেজ শাসনের বিরোধী কবিতা হিসেবে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে।

কিন্তু আপনারা সবাই ভালভাবে জানেন যে বিদ্রোহী কবিতার মূল্য শুধুমাত্র সেই কারণে আছে, তা নয়। "বিদ্রোহীর ঐতিহাসিক মূল্য আছে বটেই, কিন্তু বিদ্রোহী কবিতার আবেগ এখনও জীবিত। "বিদ্রোহী"তে নজরুল শুধু সেই সময়ের এক ব্যক্তির চিন্তা ধারণা প্রকাশ করেননি, "বিদ্রোহী"তে তিনি সব যুগের— অতীতের বা ভবিষ্যতের সব মানুষের গৌরব বা মহিমার কথা ঘোষণা করেন। তাই এই বিখ্যাত কবিতা এখনও শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা বা ভূমিকা না জানলেও আমাদের পাঠকেরা নজরুলের এই আবেগ বুঝতে পারবে। নানা জায়গায় বার বার "বিদ্রোহী"র জাপানী অনুবাদ আবৃত্তি করতে করতে আমি বিশ্বাস করে ফেলেছি যে নজরুলের সৃষ্টির দেশের সীমা ভাষার সীমা অথবা সময়ের সীমাও পার হওয়ার শক্তি রয়েছে। আর সেই শক্তি একজন কবি একজন ব্যক্তি নজরুলেরই।

আরও দৃষ্টান্ত দিই। "বিদ্রোহী", "সাম্যবাদী", "বারাঙ্গনা" র মতন কবিতাকে নানা দেব দেবী, পৌরাণিক কাহিনী থেকে উদ্ধৃত করা, চরিত্র পাওয়া যায়। অবশ্যই এমন হিন্দু দেবদেবীর নাম নজরুল ব্যক্ত করায় তখন অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু নজরুলের পক্ষে সেগুলো শুধু নিজের কাব্য প্রকাশের প্রতীক মাত্র ছিল। তাই একটু ব্যাখ্যা দিলে সে সব পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্র বা জানলেও জাপানী পাঠকেরাও সহজেই বুঝতে পারে যে নজরুল কি বলতে চাইছিলেন।

নজরুল নিজের রচনায় মানুষের কথা বলছেন। তিনি শুধু বাঙালীর সুখ, দুঃখ, জীবনের বেদনা ও সমস্যা অথবা বাংলা সমাজের অসাম্য ব্যক্ত করতে চাইছিলেন, তা নয়। নজরুল ব্যক্ত করেছেন সাধারণ মানুষের সুখ এবং দুঃখ যে সারা বিশ্বের সারা মানুষের মাঝে দেখা যায়। তার মানে নজরুল সত্যিকারের আন্তর্জাতিক কবি ছিলেন আর সেই জন্যে আমি বিশেষ করে নজরুলের জাপানী সাহিত্য প্রেমীর সামনে পেশ করতে চাই।

নজরুল বিশ্বের সব মানুষের উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন, কিন্তু নজরুলের কবিতায় আমি তীক্ষ্ণ "আমি"-র চেতনায়ও অভিভূত হই। "বিদ্রোহী" ঠিক এই কারণেও তখনকার সাহিত্য সমাজে আদৃত হয়েছে মনে হয়। বিশ্ব-সাহিত্যের দিক থেকেও নজরুলের এই চেতনা খুব আধুনিক বলা যায় আর সেই জন্যে এই কবিতা পড়তে পড়তে আমাদের মধ্যেও আগ্রহ জাগে। নজরুলের এই বৈশিষ্ট্য আর ব্যক্তিত্ব তখনকার অন্য কোনো কবির রচনাতে আমি লক্ষ্য করি না।

আমি এ পর্যন্ত নজরুলের আন্তর্জাতিকতা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে নজরুলের অন্তরে যা রয়েছে সেই ঐতিহ্য মানে বাংলা সাহিত্যের ভাবনা ধারা যা গত ১০০০ বছর ধরে চলে এসেছে। আমার মনে হয় যে এই বাংলা সাহিত্যের কাব্য ধারা নজরুলের প্রেম-কবিতায় বেশী দেখা যায়। এইবার আমি কলকাতায় বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু কিছু অংশ পড়েছি আর সেই সময় নজরুলের প্রেমকবিতা বার বার মনে পড়েছে। "চৈতী হাওয়া" বা "তুমি আমায় ভুলিয়াছ" ইত্যাদি প্রেম কবিতাতে নজরুল যে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য চেতনার অনেক মিল দেখা যায়। শুধু সৌন্দর্যের বর্ণনা কেন, আমার ধারণায় বৈষ্ণব কবিদের কবিতার আবেগ ঠিক নজরুলের হৃদয়ের ভিতরেও ছিল।

আমি নিজে ফারসী পড়ি না, কিন্তু অনুবাদে নানা বিখ্যাত ফারসী কবিদের রচনা যতদূর পড়ি, নজরুলের কবিতায় সেই ফারসী কাব্যের চিন্তা-ধারাও পাওয়া যায় মনে হয়। যদিও নজরুল আন্তর্জাতিক কবি, তাহলেও তিনি বাঙালী কবিও ছিলেন। তাই এই দেশে এত বেশী লোক নজরুলকে ভালবাসে। সত্যি বলতে কি শুধু নজরুল গবেষণার মধ্যেই বিদেশী সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের বেশী কিছু বুঝতে পারবেন। আর নজরুল চর্চার এই দুই দিক— নজরুলের ব্যক্তিত্ব এবং বাঙালীত্ব— দু'দিক দিয়েই

করা উচিত হবে। প্রথমে আমি বলেছি নজরুল চর্চা জাপানে এখনও তেমন করে শুরু হয়নি। আমরা অনেক দেরি করেই নজরুলের সাহিত্য জগতে প্রবেশ কবেছি। কিন্তু সেই নজরুলের ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা সাহিত্যের কাব্যধাবা যে নজরুলের বচনাব মধ্যে বহন কবা হয়েছে, তা এখনও জীবিত এবং মূল্যবান। তাই আমবা এই কাজে হাত দিযেছি এবং ভবিষ্যতে আবও চর্চা করবো আশা করি।

দুখু মিয়ার লেটো গান / একটি সমীক্ষা

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন

মশহুব নামা কবি কাজী নজরুল ইসলামেব বাল্যনাম "দুখুমিয়া"। তিনি তাব কিশোব ও প্রাক্ যুদ্ধ যাত্রা জীবনে মাঝে মাঝে লেটোব দলে যোগ দিয়ে নাচ গান অভিনয যেমন কবেছেন, তেমনি বচনা কবে গিয়েছেন নানা ঢঙেব লেটো গান, ছক ও ছোট বড লেটোব পালা। ছককে সঙও বলা হতো, অর্থাৎ গানবহুল হাস্যবসাত্মক নাটিকা। তাঁব লেটো গানেব ওস্তাদ তাঁবই চাচা কাজী বজলে কবিম। পবে তাঁব এই চাচাব অনুবোধেই নিমশা লেটোদলে ওস্তাদ রূপে যোগ দিয়ে তিনি ঐ দলকে একটা আদর্শ লেটো দলে উন্নীত কবেছিলেন। তাঁব বচিত গান, ছক ও পালা চলতো মুখে মুখে। উৎসাহী তথা স্বল্প লেখাপডা জানা কোন কোন শিল্পী সেইসব গান খাতায লিখে বাখতেন। তবে তাঁব অধিকাংশ গান, ছক এবং পালা চলে আসছে মুখে মুখে, প্রবীন শিল্পী এবং নতুন শিল্পীদেব মধ্য দিয়ে। ভাবতীয তথা বাংলাব লোকসংস্কৃতিব প্রতি আমি অনুবক্ত। লোকসংস্কৃতিব বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে আমি আগ্রহী। লোক সংস্কৃতিব উপাদান সংগ্রহকালে বিভিন্ন প্রবীণ লেটো শিল্পীদেব নিকট আমি দুখু মিযাব লেটো গানেব সন্ধান পাই এবং তা কিছু কিছু সংগ্রহ কবি। পবে বিশেষ ভাবে বাংলাদেশেব এক সাহিত্য সংস্থাব অনুবোধে দুখুমিয়াব লেটো গান সংগ্রহে আত্মনিয়োগ কবি। শুরু কবি অনুসন্ধান ও সমীক্ষা। কাজে নেমে বুঝতে পাবি এ কাজ শ্রমসাধ্য ও দুরূহ। তবুও এই প্রৌঢ বযসে শ্রম ও ধৈর্যেব সাথে শুরু কবি সমীক্ষাব কাজ। উদ্ধাব কবি তাব বিভিন্ন ঢঙেব লেটো গান, ছক ও পালা। এই প্রবন্ধে সমীক্ষাব বিববণী এবং দুখুমিযাব কিছু লেটো গান নজরুল ভক্তদেব আস্বাদন করাবো।

সমীক্ষার ক্ষেত্র: দুখুমিয়াব লেটো গানেব উপব সমীক্ষা ও সংগ্রহ কবতে গিয়ে আমাকে পবিক্রমা কবতে হয় পশ্চিমবঙ্গেব বর্ধমান-বীবভূম-হুগলী-মুর্শিদাবাদ-নদীযা জেলাব সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল। বর্ধমান জেলাব বায়না, খণ্ডঘোষ, ভাতাব, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বব, জামুডিযা, বাণীগঞ্জ, অন্ডাল, কেতুগ্রাম, হুগলী জেলাব আবামবাগ, বীবভূম জেলাব বোলপুব, নানুব, সাঁইথিযা, মুর্শিদাবাদ জেলাব ভবতপুব, ববোয়া, ভগবান গোলা, নদীয়া জেলাব কালীগঞ্জ ও তেহট্ট ইত্যাদি। এই অঞ্চলটিকে লেটোগানেব আকরভূমি বলা যেতে পাবে। এই সব এলাকায় দুখুমিযাব সমকালে যে সব লেটো শিল্পী ছিলেন তাঁবা হলেন চুরুলিযাব কাজী বজলে কবিম, মসুমোল্লা, বাহালুদ্দিন, আইনুদ্দিন, জৈনুদ্দিন, কেলেজোডাব শেখ ফকীব মন্ডল, বায়না থানাব বামবাটী-সন্তোষপুব-বাজিতপুব-উদালনেব যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বামাচবণ সাঁতবা, শেখ কাজেম আলী, সাঁওতাল দুহিতা শ্রীমতী লক্ষ্মীমাণ্ডী, শেখ আব্দুল লতিফ, বর্ধমান থানার কৃষ্ণপুবের সৈযদ মোবসেদআলী ও সৈয়দ মোহাম্মদআলী (পবে এঁবা মেমাবীর তক্তিপুবে যান), ভাতাব থানাব রাজীপুবেব মহঃ সেলেমান, তুলসীডাঙাব আনোয়াব হোসেন, মঙ্গলকোট থানাব দেউলিযাব মোহাম্মদ জোহাদাব বহিম, কাটোয়া থানার রাজুয়া গ্রামের জোবেদ মির্জ্জা, আব্দুব রহমান, শেখ সামসুদ্দিন,

আবুল হাশেম, কেতুগ্রাম থানার কাটাড়ী গ্রামের আব্দুল মান্নান মিঞা, উজ্জলপুরের আখতার হোসেন মিঞা, বীরভূম জেলার নানুর থানার ফকির বৈদ্যপুরের আব্দুল হালিম, আতকুলের শেখ ওয়াজেদ আলী, সিরাজপুরের শেখ কেরামতুল্লা এবং এই নানুর থানার আব্দুস শুকুর, রওশন আলী প্রমুখ। এঁদের পরবর্তী যাঁরা বেঁচে আছেন, বর্ধমান রায়না থানার আব্দুল লতিফ, নীহারবালা দত্ত, আব্দুস সাত্তার, কেতুগ্রাম থানার জিল্লার রহমান, আব্দুস শুকুর, শেখ আলী দফাদার, বীরভূমের নানুর খানার শেখ ওয়াজেদ, মানিক খান, মুর্শিদাবাদের করুণাকেতন হাজরা, নদীযার কালো রজক সহ আরো অনেকে। শেখ ওযাজেদ মাষ্টার ছিলেন লেটোগানের অন্যতম ওস্তাদ। ইনি কিশোর বযসে দুখু মিঞার কাছ থেকে কিছু গান লিখে এনেছিলেন। ইনি ছিলেন লেটোগানেব ওস্তাদ সৈয়দ খোরসেদ আলীর শিষ্য। আবার এই খোরসেদ আলী ছিলেন কাজী বজলে কবিমেব শিষ্য। খোরসেদ আলীর ছোট ভাই সৈযদ মোহাম্মদ আলীর বিবাহ হযেছিল চুরুলিযার কাজী পবিবাবে নজরুল ইসলামেব চাচাতো বোনের সঙ্গে। "মা" ও "বাদশা আলমগীর" প্রভৃতি লেটো পালার ইনিই লেখক। এই পালাদ্বয়ে নজরুল ইসলামেব বেশ কযেকটি গান ছিল। এঁরা উভযে আত্মীযতাব সূত্রে দুখুমিযার কাছ থেকে বহু গান, ছক, পালা লিখে এনেছিলেন। শেখ ওযাজেদ আলী এঁদের কাছে নজরুল ইসলামের লেটো গান শিখেছিলেন।

ফকিব বৈদ্যপুরের আব্দুল হালিম ছিলেন ধনী চাষী। লেটোগানের উপব তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি ওস্তাদ রেখে ভাল একটি লেটোর দল তৈবী কবে ছিলেন। সব খরচ তিনি দিতেন। লেটোগানের প্রবীন নট মানিক খান জানিযেছেন, যে এই আব্দুল হালিম নজরুল ইসলামেব কিছু বড। ইনি ঘোড়ায় চেপে চুরুলিযা, নিমশা এবং রানীগঞ্জ গিযে নজরুল ইসলামেব কাছ থেকে গান লিখে আনতেন (ছক পালাসহ) তাঁর দলের আব্দুস শুকুর, রওশন আলী ইত্যাদিরা সেই গান অনুশীলন কবে লেটোর আসরে গাইতেন। সিদিই গ্রামের ইদুশেখ'ও (সঙদার) এই দলে থাকতেন।

বর্ধমান জেলাব তুলসী ডাঙা গ্রামের আনোযার হোসেন ছিলেন লেটোগানের বিখ্যাত নট। ইনি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের লেটো জীবনের বন্ধু ও কেলে জোড়ার শেখ ফকিব মন্ডলের শিষ্য। নজরুল ইসলাম লিখিত "রাধা বিনোদ" পালা ইনি ফকির সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এঁর কাছে কাজী নজরুল ইসলামের প্রচুর লেটো গান ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গানের খাতাগুলি নষ্ট হযে গেছে। তবে "রাধা বিনোদ" পালাটি উদ্ধার হবে।

এই ক্ষেত্র পরিক্রমা পূর্ব্বক লেটো শিল্পীদের নিকট সমীক্ষা করেছি লেটোগান তথা দুখুমিয়ার লেটোগানের।

দুখুমিয়ার লেটো গানের বিস্তৃতি : দুখুমিয়া লেটো দলে যোগদান থেকে শুরু করে প্রাক্ যুদ্ধ যাত্রা পর্যন্ত প্রচুর লেটোগান, ছক ও পালা তাঁর পরিচালিত দলে, এবং পরে বিভিন্ন দলের কর্মকর্তা ও শিল্পীদের লিখে দিযেছিলেন। তিনি যখন শিয়ারসোল বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন গোপনে লেটো লিখে দিতেন গান প্রার্থীদের এবং গোপনে রানীগঞ্জের এক নির্জনে আমবাগানে চলতো গান শিক্ষার মহড়া। তাঁর এইসব গান, ছক, পালা লেটো শিল্পীদের মধ্যদিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এক বৃহৎ পরিমন্ডলে। তাঁর গানগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল নানাভাবে। লেটোগান সেকালে হতো পাল্লা দিযে। দু'দলে চলতো পাল্লা। একদলের গান অন্যদল শুনতো, তার পর ভাল ভাল গান ছক ও পালাগুলি আয়ত্ব করে নিয়ে নিজ দলে গাইতো, এই ভাবে চলে যেতো গানগুলি একদল হতে অন্যদলে। আবার এক দলের বিভিন্ন শিল্পীদের দুখুমিয়ার গান তালিম দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। তারপর কোন কোন শিল্পী একদল ছেড়ে চলে যেতেন অন্য দলে। এইভাবে সে সময় শ্রোতাদের অনেকে এইসব জনপ্রিয় গানগুলি শিখে নিয়ে নিজেরা সুর করে গাইতেন। চাষীরা কৃষি ক্ষেত্রে, রাখালেরা গো চারণ ক্ষেত্রে গান গাইতো ও জনপ্রিয় ছকের অভিনয় করতো। গ্রামে লেটো গানের আসর বসলে সে গান হিন্দু মুসলিম মেয়েরাও

শুনতো। হিন্দু সমাজের জেলে ও অন্যান্য তপশীলী ভুক্ত মেয়েরা কাঁদবে, মেঠোপুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে কিংবা কৃষি ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে নিজস্ব মেয়েলী সুরে তারা গানগুলি গাইতো। একশ্রেণীর মুসলিম মেয়েরাও এইসব গান শুনে ও ছকের অভিনয় দেখে, স্বসমাজে বিয়ে শাদী উপলক্ষে ঢোলক বাজিয়ে নিজস্ব মেয়েলী সুরে গানগুলি গাইতো এবং গভীর "কাপ" অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ছকের অংশবিশেষ অভিনয় করতো। এইভাবে দুখুমিয়ার জনপ্রিয় লেটোগানগুলি, চাষী, রাখাল জেলেনী এবং একশ্রেণী হিন্দু মুসলিম মেয়েদের কণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই জনপ্রিয় গানগুলির অন্যতম একটি গানের প্রথম ছত্র হলো : "তুমি গিয়াছ বকুল বিছান পথে।"

লেটো গানে শ্লীলতা আনয়ন: একদা তরজা-পাঁচালী-কবি গানে যেমন আদিরসের আধিক্য ছিল, তেমনি লেটো গানেও এর আধিক্য ছিল। পাঁচালীকার দাশরথী রায় তরজা-পাঁচালী-কবি গানে হাস্যরস সহ নির্মল গানের প্রবর্তন করেছিলেন। দুখুমিয়া তেমনি লেটোগান হতে আদিরসের পরিবর্তে প্রেম ও হাসির গানে এক নূতন ধারা এনে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে উৎকট আদিরস পরিহার করেছিলেন। বিংশ শতকের শেষ দিকে অবশ্য লেটোগানে পঞ্চ রসের মধ্যদিয়ে আবার আদিরসের সংক্রমণ ঘটেছিল।

দুখুমিয়ার লেটো গানের নমুনা: বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামের কাজী বংশীয় মরহুম কাজী বজলে করিম ছিলেন লেটোগানের এক সফল ওস্তাদ। তিনি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের চাচা এবং তাঁর কবিতা রচনার ও লেটোগানের গুরু। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম প্রথম তাই তাঁব লেটোগানের আদলেই গান রচনা করতেন। নীচে তার নমুনা দেওয়া হলো :

কাজী বজলে করিমের গান

গেল নিশি কালা কৈ এলো সই ?
ঝঙ্কারে কোকিল দেখ্, দেখ্লো ঐ।।
ভ্রমরা ভ্রমরী যত
গুঞ্জরে যে অবিরত
ধাইছে শত শত দেখ্লো সই।।
নিশা, সখী কমলিনী,
হতেছে অতি মলিনী,
উঠল দিনমণি দেখলো ঐ।।
পুষ্প সজ্জা বিফল হলো,
প্রাণ নাথ নাহি এলো,
বজলে করিম বলে, হলো প্রভাত লো ঐ।।

কাজী নজরুল ইসলামের লেটো গান

সখী নিকুঞ্জ সাজানো বৃথা হলো।
কালাচাঁদ মোর কুঞ্জে নাহি এলো।।
কুঞ্জের ফুল সুবাস,
কালা কি পেল না সে ফুলবাস,
কার দেহ বাস দেখে কোথা গেল।।
চুল বেঁধে সাজলাম,
আলতায় পা রাঙালাম,

ফুল তুলে গাঁথা মালা শুখাইল॥
সখী কুঞ্জ আর সাজাবনা,
তার লাগি মালা গাথিবনা,
সাজিবনা, সাজিবনা বড়ায়ীলো॥

ীচে মৎ সংগৃহীত কিছু কাজী নজরুল ইসলামের লেটোগান নমুনা স্বরূপ দেওয়া হলো।

(এক) সখী একেলে যাব না যমুনা।
কালো ছোঁড়া বাঁশী হাতে পিছু ছাড়ে না॥
যমুনাতে জল আনিতে,
তাই চলিলো সখী সাথে,
বড়ায়ীলো কথাটা শোন্ না॥
যখন ভরি গাগরী,
কালো ছোঁড়া ধরে বাঁশরী,
বাঁশরী সুরে হ'ইলো আনমনা॥
সুরের তালে তালে চলি,
গাগরী পড়ে উছলি,
ভিজে যায় মোর নীল ওড়না॥

(দুই) আমি সেযানা বিটি,
মাথায় বেঁধেছি ঝুটি,
মেঘ বরণ কালো চুল॥
চুলেতে কিলিপ আঁটা
সুগন্ধী সুন্দা বাটা,
তাহে গুঁজেছি বকুল ফুল॥
নয়নে কাজল আঁকা,
এ ভুরু ধনুক বাঁকা,
বিন্ধিবে প্রেমিকের মনে।
মিষ্টি এক খিলি পান
তার ভাই পাঁচ সিকে দাম
দেখ হে ঠোঁট রাঙা পানে।
কপালে টিপ আছে ভাই,
নাকেতে নোলক দোলাই,
দেখে কি পাবে মনের কুল॥
গলাতে হাঁসুলী হার,
দেখ্ কি রূপের বাহার,
বুকেতে প্রেমেব হিম গিরি,
বাহুতে রূপোর বাজু,
চেয়ে কি দেখছো যাদু,
দু'হাতে লাল কাচের চুড়ি।
কাঁকালে রূপোর বিছে,

কামড়াবে নয়কো মিছে,
কানেতে দুলছে সোনার দুল॥
আলতায় পা মোর রাঙা,
নুপূরের শব্দ মাখা,
পরেছি পাছাপাড় শাড়ী,
উড়নিতে ঢেকেছি বুক,
দেখ্‌লে লাফাবে বুক,
করো না মোর সনে আড়ি।
চলেছি হংস চালে,
যাব যমুনা কুলে,
তুলবো বাঙা ফোটা ফুল॥
অমন করে তাকিও না,
ও নয়ন বাঁকিও না
ওহে ও প্রেমেব বঁধুযা,
গেঁথেছি ফুল মালা,
পড়াব তোমাব গলা,
এইতো তোমাবি পাওনা।
ভ্রমর কবির গানে,
বাঁশীর মধুব তানে,
আসর হয়েছে মশগুল॥

(তিন) মরুর তরু তলে ছখিনা ঘুমায়,
মুছে নাও মেহেন্দীব হাতে, মুছে নাও॥
পিপাসায় ভুলিতে নারে,
কবরের হাহাকারে
সে ফুল ফুটিল মোর বেদনায়॥
(ছখিনার বেদনার গান)

(চার) সখী রাঙাওনা, রাঙাওনা, রাঙাওনা।
খুনের মেহেন্দী দিয়ে এ হাত মোর রাঙাওনা॥
আজ মেরা শাদী হবে,
কাল প্রিয় জঙ্গে যাবে,
শহীদ হইতে প্রিয়র মনোবাসনা॥
(কোথা) মদিনা খেজুরের বাগ,
এ যে কারবালা খুনেরি ফাগ,
খুনে খুনে রাঙা চারিদিক, খুনেরি ঝরণা॥
মদিনা বাগে খেলিতাম খেলা,
কত মধু কল্পনা গোধূলিবেলা,
এ প্রান্তর কারবালা, মুছেদিল মোর কল্পনা॥
(ছখিনার বেদনার গান)

(পাঁচ) মরুর বালু ভিজালো আজ নবীর চোখের জল।
মদিনা বাগের বুলবুলি আজ শহীদ মরুর তল॥
খোদা প্রেমের এক দিওয়ানা,
নামটি যে তাঁর শাহ হোসেনা,
ফোরাতের জল সে পেলোনা, কি তকদিরের ফল॥
বেহেস্তে কাদেন মা ফতেমা,
আলী শাহ মাথে বাঁধে আমামা,
বলে, জুলফিকর হাতে নামির কারবালাতল॥
কাঁদে হাজেরা জননী, ইব্রাহিম,
চোখ ফেটে যায় রহমানুর রহিম,
সে অশ্রুশিশির হয়ে ঝরে যে ধরণীতল॥

(ছয়) নয়না গাঁয়ের নয়নমণি, সে যে রূপের রাণী গো।
তাকে দেখেছিলাম হাটের পথে, তার নামটি নাহি জানিগো॥
নীলাম্বরী ছিল তাহার অঙ্গ ঘিরিয়া,
যৌবন উচ্ছ্বলে পড়ে বসন ছিঁড়িয়া,
তাকে দেখ্‌বো বলে পাড়ি দিলাম ভরা গাঙে পানি গো॥

বন্ধে পরিবেশিত গানগুলি বর্ধমান ও বীরভূমের বিভিন্ন লেটো শিল্পী এবং লেটো রসিক ব্যক্তিদের ছ থেকে সংগৃহীত। "লেটো গান ও দুখুমিয়া" নামে লেটো গানের তথ্য বহুল ইতিহাস এবং দুখুমিয়ার ভন্ন ঢঙের লেটো গান পালা সহ বাংলা দেশের 'ইস্পাত প্রকাশনী' হতে প্রকাশিত হচ্ছে। — লেখক)

নজরুল ছোটগল্পে শিল্পচেতনা

তৌহিদ আহ্‌মদ

কাজী নজরুল ইসলামের প্রবল কবি-খ্যাতির অন্তরালে ছোটগল্পকার কিংবা ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি প্রায় অজ্ঞাত। অথচ নজরুল প্রতিভার সামগ্রিক মূল্য নির্ধারণে কথাশিল্পের সীমানা থেকে তাঁকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ছোটগল্পের রচনাকাল মোটামুটিভাবে প্রথম মহাসমরোত্তর কাল থেকে অর্থাৎ ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। গল্পগুলো তিনটি গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯৯২), পরবর্তী গ্রন্থ 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) এবং তৃতীয় গ্রন্থ 'শিউলিমালা' (১৯৩১)।

কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত আঠারটি রচনার মধ্যে 'রাজবন্দীর চিঠি' পত্রসাহিত্য এবং 'দুরন্ত পথিক' কথিকা, অবশিষ্ট ষোলটি ছোটগল্প।

নজরুল ছোটগল্পের শিল্পচেতনা প্রসংগে একটি অপ্রিয় সত্যকে মেনে নিতে হয়। তিনি মূলতঃ গদ্যলেখক ছিলেন না। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে কিছু গদ্য লিখতে হযেছে। বিশেষ করে 'নবযুগ', 'ধুমকেতু', প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখার মধ্য দিযে তাঁর গদ্য সাহিত্যে পদক্ষেপ সূচিত হয়েছে। তবু 'তাঁর গদ্য রচনায় তাঁর নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। সে স্টাইলের গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।'

নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়েছিল গল্প রচনার মাধ্যমে। অথচ তাঁর সমগ্র খ্যাতি ঘোষণায় কবিতা ও গানের ভূমিকাই প্রবলতর। তাই তাঁর গল্প উপন্যাস যে শিল্পের সূক্ষ্ম মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়—এ মন্তব্য সংগত। অবশ্য, তাঁর সবগুলো কবিতাই যে শিল্পসম্মত, সে বক্তব্যও আমাদের নয়। আমরা মনে করি, ছোটগল্পে যে আবেগ-উচ্ছ্বাস বর্জিত সংযত, পরিমিত অথচ রসঘন এবং সংহত শিল্প-মানসের প্রয়োজন তার সাধনা নজরুলের গল্পে সামগ্রিকভাবে নেই।

তাহ'লে নজরুল ছোটগল্পে শিল্পচেতনার বিকাশ কোথায় ? এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। যে আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রবলতা তাঁর ছোটগল্পের ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সেটাই কিন্তু একজন নিরাসক্ত পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায, তাঁর গল্পে যে ব্যথার কাহিনীগুলো মর্মস্পর্শী বেদনার নির্যাসে জারিত হয়ে অত্যন্ত আবেগবিহ্বল সুরে প্রকাশিত হয়েছে তা সহজেই পাঠকের মনকে গীতিরসের সকরুণ অনুভূতিতে মৃদু কম্পিত করে।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে সেনবাহিনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চিত্তে যে শুধু রণ-হুঙ্কারেই আচ্ছন্ন ছিল তা নয়, বরং সেখানে ফারসী সাহিত্যের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। এই সময় হাফেজের প্রেম-রোমাঞ্চ ভরা কাব্যকলার মধ্যে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছিলেন। সৈনিক জীবনের পটভূমিকায় 'ব্যথার দান' (১৯২২) ও 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪)-এর গল্পগুলোর কাঠামো রচিত হলেও তাঁর মৌলিক কবি-প্রতিভা গল্পের অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত। একই

পটভূমিকায় লিখিত গল্পগুলোর ভাবগত ঐক্য রয়েছে। উভয় সংকলনের অধিকাংশ গল্প রোমান্টিকতায় ভরা ; নজরুল ছোটগল্পে বিধৃত বর্ষা-প্রকৃতি কিংবা পদাবলী সাহিত্যের অনুরূপ ভাবধারা তাঁর শিল্পীসত্তায় বাঙালী জীবন বোধের পরিচয় বহন করে। মধ্যপ্রাচ্যের পটভূমিকায় গল্পরচনা করলেও তিনি স্থানীয় প্রভাব থেকে বিমুক্ত হননি।

নজরুল ইসলামের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯২২) একদিন 'গদ্যকাব্য' নামে প্রশংসামুখর স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর ছোটগল্পের উপজীব্য বিষয় ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে ১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'ভারতী' সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। 'গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য আছে, সবগুলিই রোমান্স ; তাহাতে ব্যথার সুরই আগাগোড়া বাজিযাছে। কাবুল, বেলুচিস্তান সাহারার ক্যাম্প, এমনি নানা বিচিত্র জায়গায় বিচিত্র দৃশ্যমাধুরীতে ও সেখানকার আবহাওয়ায় গল্পগুলি ভারি মিঠা মশগুল হইযা উঠিযাছে। তবে গল্পগুলির কবিত্বের অত্যুগ্র উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে এমনি ফ্যানাইয়া উঠিযাছে যে তাহা একঘেযে হইযা রসভঙ্গ করিয়াছে। ভাষায় মুদ্রাদোষও মাঝে মাঝে আছে। নহিলে গল্পগুলি মন্দ নয।'

নজরুল ছোটগল্পে বিধৃত এই অভিজ্ঞতা এবং 'ভারতী'র উল্লিখিত মন্তব্য থেকে মনে হয, কবি যেন ব্যক্তিগতভাবে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সৈনিক জীবনের বন্ধুদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তিনি উপমহাদেশের বাইরে কোথাও যাননি।' অতএব, তাঁর গল্পে বর্ণিত এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমি ছিল ফারসী কবির কাব্য-পাঠের মাধ্যমে অর্জিত একটি কল্পনাপ্রবণ স্বপ্নদৃষ্টি। যদি তাঁর গল্পগুলোকে এই স্বপ্নদৃষ্টির ফসল হিসেবে স্বীকার করা হয়, তবে তাঁর গল্পে শিল্পী-সত্তার পরিচয়ও অক্লেশে অনুমান করা যায।

নজরুলের ছোটগল্প থেকে এমন অনেক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যেখানে আছে বল্গাহীন আবেগ উচ্ছ্বাস, কাব্যগন্ধি শব্দ এবং ভাবসাম্যহীন বাক্য প্রয়োগ। প্রথমে 'ব্যথার দান' গল্প থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

'বেদৌরা অশ্রু-ভরা হাসি হেসে বললে—'ফিরতেই হবে প্রিয়তম, ফিরতেই যে হবে তোমার। এ সংশয় দু'দিনেই কেটে যাবে। তখন দেখবে, আমাদের সেই ভালবাসা কেমন ধৌত শুভ্র বেশে আরও গাঢ় পূত হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি তোমারই প্রতীক্ষায় গোলেস্তানের এই ক্ষীণ ঝরণাটার ধারে বসে গান আর মালা গাঁথব। আর তা যে তোমায় পরতেই হবে। ব্যথার পূজা ব্যর্থ হবার নয় প্রিয়।'

ছোটগল্পের বাহন হিসেবে সংযমীর কাব্যধর্মী আবেগপ্রবণ এই ভাষা ব্যর্থ ; সংলাপের মধ্যে স্বাভাবিক বাক্-ভঙ্গী অনুপস্থিত, বরং তা' অতিনাটকীয় আবহ সৃষ্টি করেছে। ছোটগল্পের বাস্তবানুগ পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি এখানে। পাঠক যেন এক অচেনা পৃথিবী কিংবা অজানা রহস্যলোকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। মালা গাঁথা যায়, গানও গাঁথা যায়, কিন্তু বেদৌরা শুধু গান গেঁথেই ক্ষান্ত কেন ? গান তো সুর দিয়ে গাওয়ার প্রয়োজন। সুর দিয়ে না গাইলে সে গানের মর্ম রইল কোথায় ? শব্দ নির্বাচনের ত্রুটির জন্য এখানে অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে। তবে গল্পটিতে প্রেম-চেতনা সম্পর্কে আমরা লেখকের ব্যতিক্রম দৃষ্টির পরিচয় পাই। বেদৌরা বিপথগামিনী ও সতীত্বহারা হবার পরও তার প্রেমাস্পদ দারার কাছে যে ক্ষমাসুন্দর আচরণ ও মানসিক মিলনের অঙ্গীকার লাভ করেছে তা' উদার শিল্পচেতনার নিদর্শন ; এ চেতনা সংস্কারমুক্ত এবং আধুনিক।

যথেচ্ছ অনুপ্রাসযুক্ত নিছক কাব্যিক বর্ণনা 'ঘুমের ঘোরে' গল্প থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> 'সে ছিল এমনি এক চাঁদনী-চর্চিত যামিনী, যাতে আপনি দয়িতের কথা মনে হ'য়ে মর্মতলে দরদের সৃষ্টি করে। মদির খোশ্‌বুর মাদকতায় মল্লিকা-মালতীর মঞ্জুল মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল। উগ্র রজনীগন্ধার উদাস সুবাস অব্যক্ত অজানা একটা শোক-শঙ্কায় বক্ষ ভ'রে তুলেছিল।'

'হেনা' গল্পের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

> 'ওঃ কি আগুন বৃষ্টি! আর কি ভয়ানক শব্দ। গুডুম-গুডুম-দ্রুম। আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে। গোলা আর বোমা ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অত ঘন যদি জল ঝরত, আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে, তাহলে একদিনেই দুনিযা পানিতে সযলাব হযে যেত।'

উদ্ধৃত অংশে কতিপয় অলংকার ও একটি চিত্রকল্পের বিকাশ ঘটেছে। বর্ণনার কৌশলে চক্ষু ও কর্ণ উভয় ইন্দ্রিযানুভূতির সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু পাশাপাশি 'আকাশ' ও 'আসমান' কিংবা 'পানি' ও 'জল' ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহারের কোন যৌক্তিকতা নেই। শব্দচযনে কোন সংকীর্ণতা অবশ্যই কাম্য নয়; তাই বলে ভারসাম্যহীনতা নিশ্চয কৃতিত্বের বিষয নয। শব্দ নির্বাচনের এই স্বেচ্ছাচারিতা বর্জন ক'রে উল্লিখিত শব্দযুগলের যে কোন একটিকে গ্রহণ করলেই শোভনীয হ'ত।

নজরুল ছোটগল্পের ভাষায অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটেছে। 'ব্যথাব দান' থেকে দুটো অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পাবে এই মন্তব্যের পবিপ্রেক্ষিতে।

ক. শিরাজ-বুলবুল এর দিওযান পাশে থুযে আমি তোমার অবাধ্য দুষ্টু এলো চুলগুলি সংযত ক'রে দিচ্ছিলাম, আর আমাদের দুজনারই চোখ ছেপে অশ্রু বযেই চলেছিল।

খ. ওগো, এ মরণের তটে এ দুর্দিনে কি দিয়ে বাসর সাজাব?

'চোখ' অথবা 'মরণ' প্রভৃতি তদ্ভব শব্দের পরেই যথাক্রমে 'অশ্রু' অথবা 'তট' জাতীয তৎসম শব্দের প্রযোগ নিতান্ত বিষম বলে মনে হয।

নজরুল ছোটগল্পের অনেক অংশে প্রবল কল্পনা প্রসূত বর্ণনা সাব্লিমিটির পর্যাযে পৌচেছে। যেমন,

> 'বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিযে দিলে। ঠিক সেই সময কোথা থেকে ধূমকেতুর মত সরফুল মুলুক এসে আমার কান ভাঙানি দিলে—ভালবাসায় কি বিরাট শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য, ঠিক ভৈরবী রাগিনীর কড়ি-মধ্যমের মত।' (ব্যথার দান)

এখানেও একাধিক অলংকারের সমাবেশ লক্ষণীয়। যেমন, 'কামনার তীব্র আগুন'—রূপকাভাস। 'ভালবাসায় কি বিরাট শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য'— বিরোধাভাস। 'ঠিক ভৈরব রাগিনীর কড়ি-মধ্যমের মত'—নিশ্চয। 'হেনা' গল্পের মৃত্যুদশা বর্ণনায সাব্লিমিটির পরিচয পাওযা যায়: 'কি চীৎকার করে মরছে শত্রুগুলো দলে দলে। কি ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী।'

কুশলী ভাষাশৈলীর সৌজন্যে এখানে অনুভূতির বিপর্যয ঘটেছে। মৃত্যুর বিভীষিকা মাধুর্যরসে পরিণত হয়েছে। গল্পের নায়ক চরিত্রে কর্তব্যবোধ ও প্রেমলিপ্সার সমন্বয ঘটেছে।

'বাদল-বরিষণে' গল্পের শুরুতে ধ্বন্যুক্তি অলংকারের মাধ্যমে পরিবেশিত হযেছে বৃষ্টিপতনের শব্দ। এখানে বর্ষাকে বেদনার প্রতীক হিসেবে প্রকাশ করার যে কবি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা' বাঙলার কবি সাহিত্যিকের এক ঐতিহ্যগত সম্পদ। এ প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা :

> 'সামনে আমার গভীর বন। সেই বনে ময়ূর পেখম ধরেছে, মাথার উপর বলাকা উড়ে যাচ্ছে, ফোটা কদম ফুলে কার শিহরণ কাঁটা দিযে উঠছে, আর কিসের ঘন-মাতাল-করা সুরভিতে নেশা হ'য়ে সারা বনে গা টলছে....এটা শ্রাবণ মাস, না?—আহা তাই অন্তরে আমার বরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে আসছে।'

বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অনবদ্য চিত্রকল্পের মর্যাদা লাভ করেছে। এখান হৃদযাবেগ আছে, কিন্তু তা' শিশুসুলভ চপলতায় পর্যবসিত হয়নি। কবিকল্পনা ভাষার সুমিষ্ট বিন্যাসে অত্যন্ত মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। বর্ণনাটি সামগ্রিকভাবে যেন বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্গত বর্ষার পটভূমিকায় অঙ্কিত বিরহ-পর্বের পদের ললিত-মধুর সুর বহন করে। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদ স্মরণ করা যেতে পারে।

গল্পের নায়িকা চরিত্রটি দৃষ্টির গভীরতায় ঋদ্ধ। কালো বর্ণের এই নায়িকা নায়কের কাছে প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি পেয়েছে। সে নায়কের জীবনে একনিষ্ঠ অন্বেষণের ফলশ্রুতি হিসেবে সমাগত এক দুর্লভ সত্তা বলে বিঘোষিত হয়েছে। কিন্তু আত্মদৈন্যে পীড়িত এই তরুণী জীবন সম্ভোগের আহ্বানে সমর্থন দিতে পারল না। নায়কের এত উদারতার মধ্যেও সে প্রত্যয় পেল না, কারণ তার মন সন্দেহপ্রবণ, সিদ্ধান্তে তার দৃঢ়তার অভাব। নায়কনায়িকার প্রথম পরিচয়, অনুভূতি বিনিময় এবং বিচ্ছেদ ঘটনা সব কিছুই আকস্মিক ও নাটকীয়। অপর পক্ষে নায়িকা চরিত্রেব বিকাশ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী। আত্মাভিমানিনী নায়িকা তার পরিচিতজন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত উপহাসের কথা নিজেই স্বীকাব করেছে। তার বক্তব্য থেকে মনে হয়, সে যেন কারো ভালবাসা পাবার অধিকার নিয়ে জন্মেনি। নৈরাশ্য আর চিত্তবৈকল্যে আহত 'কাজরী' নামে অভিহিতা এই নারী স্বভাবতই সংবেদশীল পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করবে।

অপ্রত্যাশিত প্রেম লাভের আনন্দ হয়তো কাজরীর সহ্য হয়নি, এবং তাই তার অপমৃত্যু হ'ল। গল্পের শেষে প্রেম সম্পর্কে লেখকের একটি আদর্শবোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নায়ক যেন ঘন তমসাচ্ছন্ন বর্ষা প্রকৃতির মধ্যে তার প্রিয়াকে খুঁজে পেয়েছে—তার মানস সরোবরে প্রিয়া যেন এক প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম। প্রকৃতির মাঝে হারানো প্রেমিকার অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য কল্পনা বিহারীলাল চক্রবর্তীর বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যানুভূতি সদৃশ। আবার রবীন্দ্রনাথের দেহনিরপেক্ষ প্রেমচেতনার সাথেও বর্তমান গল্পের প্রেম চিন্তার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। নিগূঢ় তত্ত্ব ছোটগল্পের ঈপ্সিত রসবোধকে ক্ষীণ করলেও একটি বিশেষ ভাবের প্রতীকী উপস্থাপনায় গল্পটির সমাপ্তি গীতিমধুর ও ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে।

'অতৃপ্ত কামনা' গল্পের নায়ক-চরিত্র সৃষ্টিতে মনঃসমীক্ষার চিহ্ন বিদ্যমান। অতি আধুনিক গল্পে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গল্পের নায়ক অকারণে তার নায়িকাকে প্রহার ক'রে এক অদ্ভুত আনন্দ লাভ করত। তর এই স্যাডিস্ট আচরণ তার স্বগতোক্তিতেই 'ক্ষেপা-খেয়াল' বলে অভিহিত হয়েছে। অপর পক্ষে তার নায়িকা কিন্তু পীড়নের মধ্যেই দয়িতের প্রেম স্পর্শ কল্পনা ক'রে আনন্দ লাভ করে।

নায়ক কল্পনা করছে, তার জন্য প্রতীক্ষারত নায়িকা সহসা গাচের পাতা ঝড়ে পডলেই চমকে উঠছে। এ কল্পনা পদাবলীর উচ্চকিতা রাধিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নায়িকার বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে চরম দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ অথচ নির্লিপ্ত নায়ক যখন বলে :

'....তুমি যার কাছে যাবে, সে তোমায় আমার চেয়েও বেশী ভালবাসবে; আর তুমি সেখানে গিয়ে আমাদের সব কথা ভুলে যাবে।'

তখন কিন্তু নায়কের সমগ্র ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে যায়, সে যেন এক পুতুল। সেই দুরন্ত বালক, যে নায়িকাকে যথেচ্ছ প্রহার ক'রে তৃপ্তি লাভ করত, হঠাৎ সে কেন এত নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল তার কোন সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কার্যকারণহীন এই চারিত্রিক বিবর্তন সচেতন পাঠককে নিরাশ করে বইকি।

গল্পের মূল কাহিনী নায়কের স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। এবং তার বিরহসংগীতের সুর-মূর্ছনার মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। এ সমাপ্তি অবশ্য পাঠকের হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়িত করে, কিন্তু কোন অনুসন্ধিৎসা নিশ্চয় জাগায় না।

'ঘুমের ঘোরে' গল্পের প্রারম্ভ চমৎকার এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। অবশ্য তৃতীয় প্যারাতেই তৎসম শব্দাবলীর উৎকট ঝংকার শোনা যায় :

> 'নিশি-ভোরটা নাকি বিশ্ববাসী সবার কাছেই মধুর, তাই এ-সময়কার টৌরী রাগিনীর কল-উচ্ছ্বাসে জাগ্রত নিখিল অখিলের পবিত্র আনন্দসরসী-সলিলে ক্রীড়ারত মরাল-যূথের মত যেন সঞ্চরণ ক'রে বেড়ায়, কিন্তু আমার নিশি ভোর না হ'লেই ছিল ভাল।'[১৩]

এরপর সঙ্গীতজ্ঞ নজরুল বিচিত্র রাগ-রাগিনীর উপমায় পাখিদের কলকাকলির বর্ণনা দিয়েছেন।

এ বর্ণনায় আন্তরিকতা আছে, কিন্তু অপরিমিত কাব্যিক বর্ণনার মধ্যে ছোট গল্পের কোন ইঙ্গিতময়তা আছে বলে মনে হয় না।

গল্পের সৈনিক নায়ক চরিত্রে এক অর্ন্তদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়েছে। সে সৈনিক এবং প্রেমিক। অন্তরে তার বেদনা, মনে আশঙ্কা —হয়ত মানুষ তার এই প্রেমবোধকে উপহাস করবে। তার ব্যথা, তার গ্লানি আর দুর্বলতাকে সংগীতকলার অন্তরালে সে লুকিয়ে রাখতে চায়, অর্থাৎ একটি বিকল্প জগত সৃষ্টি করে সে আত্মগোপন করতে চায। নায়কের মনের গভীর প্রদেশ থেকে সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বকে লেখক উদ্‌ঘাটিত করে তার চরিত্রে যুগপৎ মাধুর্য ও উৎকর্ষ দান করেছেন। আবার তার চরিত্রে শিল্পীসুলভ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সে আপনার বেদনাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে চায়, অন্যের সহানুভূতিকে তার অনুকূলে আকৃষ্ট করতে চায। নায়িকা 'পরী' কতকগুলো নীতিবোধকে বিশেষভাবে লালন করে। তার আকর্ষণ প্রেমিকের নির্বাসনে পাঠাতে চায। সে সর্বস্বের বিনিময়ে তার প্রেমিককে সুখী ক'রে সান্ত্বনা লাভের আশা পোষণ করে। কর্মময় বহির্জগৎ আর প্রবৃত্তি সম্পন্ন অর্ন্তজগতের দ্বন্দ্বে তার অনুভূতি আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত। স্বগতসংলাপে সে কঠিন আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর নিজেই নির্ণয় করে :

> 'আমি মিথ্যাকে মানব কেন? যা অন্তরে সত্য, সেইটাই আসল, সেইটাকে এড়িয়ে চললেই পাপ। গভীর সমাজ তত্ত্বের সাথে গভীর সত্যের কথাটাও একবার ভেবে দেখ।'

এর পর পরীর সংলাপের মাধ্যমে আরো কিছু তত্ত্বকথা বিবৃত হযেছে। ধর্মের নামে ধর্মের খোলসকে আঁকড়ে ধরার মতো বিড়াল তপস্যার বিরুদ্ধে তার বক্তব্য সোচ্চার হযেছে। একটি প্রগতিশীল উদার মনোবৃত্তির এই বিকাশ অভিনন্দিত। কিন্তু বক্তব্য প্রকাশে, বিশেষতঃ তত্ত্বকথার অবতারণায় এত প্রত্যক্ষ হওয়া ছোট গল্পকারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয। শিল্প সৃষ্টির এই সূক্ষ্ম প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে বলা যায়, লেখক এখানে ভাবের গহনলোকে পাঠককে বন্দী করার একটা চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার আয়ু অতি ক্ষীণ। কারণ পরক্ষণে যখন আমরা 'হাজার ফ্যাচাং-এর দলিল নজির পেশ'[১৮] করার প্রসঙ্গে আসি তখন সেই জীবনবোধের রসস্নাত মার্জিত মন আকস্মিকভাবে আহত হয়। শব্দ চয়নের এ দীনতার জন্য লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠা অসঙ্গত নয়।

গল্পের নায়ক আজহার তার বন্ধুর হাতে তার প্রেমিকা পরীকে তুলে দিযে যায়। বাসর ঘরে পরীর স্বামী তার কাছে আজহারের এই আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ ব্যক্ত করে। সে স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ নির্ভরতার অঙ্গীকার পেল। ঘটনাটি নাটকীয উপস্থাপনায় চিত্তাকর্ষক হয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যয়বার্তা জানার পরও প্রাক্‌-বৈবাহিক প্রণয়পাত্রের জন্য পরীর দুর্বার আকর্ষণ-বোধ জীবনরসে সমৃদ্ধ হয়েছে। অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি অত্যন্ত ইংগিতময় হয়েছে। অবশ্য এখানে ভাষার বিন্যাস আরো বলিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল।

'রিক্তের বেদন' গল্পের প্রারম্ভে ভাষা-শৈলীর নৈপুণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথার্থ বর্ণনার গুণে একটি গতিময় যুদ্ধ-যাত্রীদলের চিত্ররূপ পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হযেছে। সৈনিকের কণ্ঠে দোদুল্যমান মোলার ফুলগুলো সজীব 'আর্দ্র-সমুজ্জ্বল'। নিশ্চয় অলংকারের প্রয়োগে সেগুলোকে জনতার হৃদয় থেকে উৎসারিত অশ্রুবিন্দু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিধা অতিক্রম করে বর্ণিত ফুলগুলো ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। আশাভরা সঙ্গীত সুরে প্রকৃতি যেন অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠল, সে স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল। সমাসোক্তির সার্থক প্রয়োগে প্রকৃতির চিন্ময় সত্তার অভিজ্ঞতা দান করেছেন লেখক। এ প্রকৃতিচেতনা সৃষ্টিধর্মী, এ সৃষ্টি আবেগপ্রবণ কবি-কল্পনার, এ কল্পনা শিল্পমাধুর্য মণ্ডিত। কিন্তু সুরের রেশ বেশীক্ষণ রক্ষিত হয় নি। এর পরই লক্ষ্য করি, নায়ক দেশের তরুণ সমাজকে দেশ সেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এ আহ্বানের মেজাজ কিন্তু মঞ্চভাষণের মতো। তাতে শ্লোগানের উত্তেজনা থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের সম্মোহন নেই।

নায়কের আত্মতৃপ্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে আরব্য রজনীর 'আবুহোসেন' চরিত্রটি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত

হয়েছে। লোকপ্রিয় কাহিনী থেকে উপমা সংকলন লেখকের ঐতিহ্য প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ। রাত্রির অন্ধকারের বুক ভেদ করে চলমান বিশাল শক্তিশালী রেলগাড়ির উপমা হিসেবে লেখক পুরাণ থেকে মহিষাসুরের উপমা সংগ্রহ করেছেন। ঘনঘন, অন্ধকার রাত্রি, গাড়ির গতিবেগ ইত্যাকার মনোজ্ঞ পরিবেশের পটভূমিতে নায়কের প্রেমিক মনের বিক্রিয়াটি যথার্থ মনোবিশ্লেষণে স্বাক্ষর বহন করে। নায়কের বঞ্চিত, রিক্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে সাহারা মরুভূমির মতো অতি প্রসিদ্ধ একটি স্থানকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অমূর্ত চেতনাকে এমন সার্থকভাবে মূর্ত করার পদ্ধতি অতি আধুনিক শিল্পদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। আলোচ্য গল্পে মুসলমান সমাজে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী কারবালার কাহিনীর পটভূমিকায় বক্তব্য প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ্য করি। পবিত্র বিশ্বাসের সৌরভ স্নাত এই কাহিনীর উল্লেখ পাঠক-চিত্তকে আকৃষ্ট করার জন্য সহায়ক হয়েছে।

বেদুইন যুবতী গুলকে কেন্দ্র ক'রে যে দ্বন্দ্ব ও গল্পের প্রাণসঞ্চার করেছিল তার নিরসন কিন্তু বড় মর্মান্তিক ও সকরুণ। নায়ক কিন্তু তার প্রবাসী জীবনের প্রেমপ্রার্থিনীকে স্বীকৃতি তো দেয়নি, বরং কর্তব্যের খাতিরে তাকে হত্যা করেছে। কুন্দনন্দিনী অথবা রোহিনীর অপমৃত্যুর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়, এক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ আনা যেতে পারে। অবশ্য লেখক তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন শেষে। গুলের জীবিত অবস্থায় তার যে প্রেম প্রার্থনা লাঞ্ছিত হয়েছে, তার মৃত্যুর পর প্রেমাস্পদের সুতীব্র অনুশোচনার মাধ্যমে সে প্রার্থনা বন্দিত হয়েছে। আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুক্তির পথ সন্ধান করতে গিয়ে নায়ক ভ্রষ্ট হয়েছে, নবলব্ধ জীবনদর্শনের আলোকে সে সম্ভোগের মধ্য দিয়ে এবং নারী হৃদযের বন্ধনের মধ্য থেকে মুক্তির সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছে। এ চেতনা অত্যন্ত জীবনধর্মী। ঘটনার সংঘাতময়তা, সমাপ্তির সকরুণ আকস্মিকতা এবং নায়কনায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব সবকিছু মিলে গল্পটিতে ট্র্যাজিক সুর সঞ্চারিত করেছে। এর আঙ্গিক কিছুটা ডায়েরী ধর্মী এবং বিশেষত্বের দাবী রাখে।

নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত জীবনে বোহিমিয়ানিজমের ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার প্রভাব তাঁর গল্পগুলোতে স্পষ্ট। 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'তে সে অভিজ্ঞতার স্পর্শ আরো বেশী। লেখক এই রচনার শিরোনামাতেই উল্লেখ করেছেন যে বর্ণনাটি একটি 'বওয়াটে' যুবক কর্তৃক নেশার ঝোঁকে বিবৃত। বওয়াটে যুবক নেশার ঝোঁকে তার আত্মকাহিনী বললেও নজরুল ইসলাম যে হুবহু তাকেই উদ্ধৃত করেছেন, এ কথা বলা যায় না। কারণ গল্পে যে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে তা কখনো অসংলগ্ন বা পারম্পর্যবিহীন হয়নি। তাছাড়া গল্পে বিধৃত সালঙ্কার বর্ণনা, মন্ময় গীতিপ্রবণতা, নায়কের নিদারুণ অনুশোচনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখকের শিল্প সচেতনতার পক্ষেই রায় দেয়। অবশ্য, যে মুহূর্তে আমরা লেখকের শিল্পচেতনার কথা উল্লেখ করছি, সে মুহূর্তে এ কথা বিস্মৃত হতে পার না যে, তাঁর শিল্পচেতনা সীমাহীন কবিকল্পনা থেকে বিমুক্ত নয়। অতএব, গল্পটির শিল্পমূল্যের পূর্ণ দাবীও আমরা করব না। দীর্ঘ স্মৃতিচারণের মাধ্যমে যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তার গ্রন্থনা গাঢ়বদ্ধ হয় নি। অন্যপক্ষে অনেকগুলো ঘটনাপ্রবাহ মিলে একটি উপন্যাসের পটভূমিই সৃষ্টি করেছে। জীবনের কোন একটি মাত্র তুচ্ছ ঘটনা ছোটগল্পকারের সৃষ্টিকৌশলে এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে তা এক ব্যাপক জীবনবোধের মহিমা লাভ করে। বর্তমান গল্পে তেমন অনেকগুলো ঘটনার সংস্পর্শে আমরা আসি, কিন্তু কোনটিই বাঞ্ছিত তাৎপর্য লাভ করেনি। নায়কের স্কুল জীবনের দুরন্তপনা, অসৎসংসর্গ, অভিভাবক কর্তৃক কঠোর শাস্তিবিধান, যৌবনে দু'বার বিয়ে ও উভয় স্ত্রীর অপমৃত্যু, নির্বাচনী পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য পিতার পক্ষ থেকে তিরস্কার ভরা চিঠি লাভ, মায়ের আকস্মিক মৃত্যু, গুণ্ডাদলে একাত্ম হওয়া এবং পিতা কর্তৃক ত্যাজ্যপুত্র ঘোষিত হওয়া ইত্যাদি কোন একটি ঘটনাই কিন্তু এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। নায়কের পর পর দুই স্ত্রীর মৃত্যু

ঘটনা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তার জীবনকে যেন দুরন্ত ঝড়ের মতে প্রবাহিত হিসাবে দেখানোর জন্য এ দুটো মৃত্যু ঘটনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। গল্প বিকাশের স্বাভাবিকতার পথে এ স্বেচ্ছাকল্পনা অনিবার্যভাবে অন্তরায়। বারবার ভাষার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে, তদ্ভব-তৎসম শব্দের যথেচ্ছ মিশ্রণে ভাষা হয়েছে অমার্জিত। ছোটগল্পের ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে সংযমবোধের গুরুত্ব এত বেশী যে, সেখানে হাস্যরস পরিবেশন করতে গিয়ে যেন নিছক ভাঁড়ামিতে পরিণত না হয়, সে বিষয়েও সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য গল্পের ভাষা কোথাও রম্যরচনারীতির মতো হয়েছে, কোথাও স্থূল রসিকতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে কিছু প্রাসংগিক অংশ এই গল্প থেকে উদ্ধৃত করা যাক।

ক. 'তোমার 'বিরাশী দশআনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বস, ভাই তোমার সকল কথা খুলে বল্তে হবে, তখন আমার অন্তরাত্মা ধুক্ ধুক্ করে ওঠে—পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষ পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'তে পারে বা জোনাকী পোকা জ্বলে উঠতে পারেল তা আমার মতো এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।'

এই ভাষা তদ্ভব-তৎসম শব্দের মিশ্রণ-দোষে দুষ্ট।

খ. 'হ্যাঁ, আমার ছোটকালের কোন কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোন রস বা রোমান্স (বৈচিত্র্য) নেই।—সেই সরকারী রাম-শ্যামের মত পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা, ঝুলঝাপ্পুর ডাণ্ডাগুলি খেলায় 'দ্বিতীয় নাস্তি', দুষ্টামি-নষ্টামিতে নন্দদুলাল কৃষ্ণের তৎকালীন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ।'

এখানে ভাষা হয়েছে রম্যরচনা রীতির। অবশ্য সে কারণেই এর সরসতা ও প্রাণোচ্ছলতা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

গ. 'কি ভাষা! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মত লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ। তুমি যে দেখ্‌ছি চিটে গুড়ের চেয়েও চাম্‌চিটকেল! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বল্‌তে কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ হয়।'

এখানে শব্দচয়নের ব্যর্থতায় ভাষারীতি অত্যন্ত স্থূল হয়ে পড়েছে।

অপরপক্ষে গল্পটির শিল্পমূল্য নির্ণয়ের জন্য অনুকূল তথ্যেরও অভাব নেই। ভাষায় সরসতা ও বক্তব্যে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির জন্য অনেক বহুশ্রুত প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'উৎখাত করলেই চিৎপাত হতে হয়' 'পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া', 'পুরুষের রাগ আনাগোনা করে', 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা', 'মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না', 'যেন তেন প্রকারেণ' ইত্যাদি। নববধূর দ্বিধা-সংকোচ এবং গোপন সলজ্জ দৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিচিত্র মানসিক অভিব্যক্তির চিত্র অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও উপভোগ্য হয়েছে। তার কাছ থেকে নায়কের বিদায় দৃশ্যটিও করুণাঘন হয়ে উঠেছে। নিরুত্তর বধূর চোখের পানি নিবিড় দাম্পত্য প্রণয়ের স্বাক্ষর বহন করে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর নায়ক জীবনের সংঘাত ও অন্তর্বেদনা সার্থক দৃশ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে:

> 'কবর ধরে সমস্ত রাত্তিরে কাঁদলুম। রাবেয়া এল না। আমার চারিদিকের একটা ঘূর্ণিবায়ু হুহু করে কেঁদে ফিরতে লাগল, ছোট্ট শিউলি গাছ থেকে শিশিরসিক্ত ফুলগুলো আমার মাথায় ঝ'রে পড়তে লাগল। ও আমার রাবেয়ার অশ্রু বিন্দু, না কারুর সান্ত্বনা?'

বর্ণনাটি মনোজ্ঞ ও গীতিধর্মী হয়ে উঠেছে। রবার্ট ফ্রস্টের Dust of Snow কবিতা ভাবনার সাথে বর্তমান প্রসঙ্গের তুলনা করা যায়। পড়ন্ত শিশির-সিক্ত ফুলের স্পর্শে নায়কের বিষণ্ণ মনে প্রশান্তির আমেজ এসেছে। ফুলের স্পর্শকে প্রিয়ার অশ্রু-স্পর্শ বলে ভ্রম হয়েছে। দ্বিধান্বিত হয়েছে মন কারো সান্ত্বনার আভাস কল্পনা করে। ফ্রস্টের কবিতায় লক্ষ্য করি পাখির ডানা ঝাপটায় যখন তুষারকণা কবির মাথায় পড়েছিল, তখন তাঁর সারাদিনের বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে ভাবনার রূপান্তর হ'ল।

'মেহের নেগার' গল্পের নায়িকা জীবনবাদের বলিষ্ঠ ঘোষণায় সমুজ্জ্বল। সে বাইজীর মেয়ে। কিন্তু কবি কল্পনার সৌজন্যে তার অন্তর প্রেমের আলোয় মহিমান্বিতল তার কণ্ঠস্বর আত্মবিশ্বাসের ঘোষক:

'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও, ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো না। এক বিন্দু অশ্রু ফেলো, আমার কল্যাণ কামনা করে——আমি অপবিত্র কিনা জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল।'[২৩]

ঘটনা বিন্যাস ও সুষম সংলাপ রচনার গুণে গল্পের কোথাও কোথাও নাট্যরসের সঞ্চার হয়েছে:

'আমি দৌড়ুতে দৌড়ুতে ডাকলুম, 'মেহের নেগার!' সে উত্তর দিল না। কলসিটাকে কাঁখে জড়িয়ে ধরে ডান হাতটাকে তেমন ঘন ঘন দুলিয়ে সে যাচ্ছিল। তারপর তাদের বাড়ীর সিঁড়িতে একটা পা থুয়ে আমার দিকে তিরস্কার ভরা মলিন চাওয়া চেয়ে চলে গেল। আর বলে গেল ছি! পথে-ঘাটে এমন ক'রে নাম ডেকো না! —কি মনে করবে লোকে!'

প্রেম সম্পর্কে একটি তত্ত্বগত আদর্শবোধ এই গল্পে দেখা দিয়েছে। নায়িকা তার অন্তরে প্রেমবোধক নিষ্ঠার সাথে লালন করে, কিন্তু সে অপবিত্র জন্ম নিয়েছে, তাই প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত সে হতে চায় না। বরং তার পবিত্রতা রক্ষার্থে সে ত্যাগের মাধ্যমেই প্রেমের সার্থকতাকে উপলব্ধি করতে চায়:

'....আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে য়ুসোফ, তবে তোমাকে পাবার আশা আমাকে জোর করে ত্যাগ করতেই হবে। যাকে ভালোবাসি তারই অপমান ত করতে পারিনে আমি। এইটুকু ত্যাগ, এ আমি খুব সইতে পারব।'

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি পারস্যের সুফী কবিদের রচনাবলী কাজী নজরুল ইসলামকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। এই গল্পে বর্ণিত স্বপ্নের মাঝে নায়ক-নায়িকার মিলন দৃশ্যটি অমর কবি হাফিজের স্বপ্নলোকে তার কাব্যলক্ষ্মীর সাথে সাক্ষাৎ লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গল্পের সংলাপ অনেক ক্ষেত্রে অতি নাটকীয় হয়ে গেছে। গল্প বিস্তারের গতি সুনিয়ন্ত্রিত হয়নি, ক্ষিপ্রতার সাহায্যে চমক সৃষ্টির কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। পক্ষান্তরে সারা গল্পে কাব্যিপনার সাধনাই বেশী, ক্ষেত্রবিশেষে গীতিরসেরও আস্বাদ এসেছে।

নজরুল খ্যাতির ঘোষণায় তার 'বিদ্রোহী' সত্তাই প্রবলতর। অথচ তাঁর যে কবিতার জন্য অর্থাৎ 'বিদ্রোহী'র জন্য তিনি জনপ্রিয় উপাধিটি লাভ করেছেন, তাতেও কিন্তু অবিমিশ্র বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় নেই—সেখানেও সমন্বয় ঘটেছে প্রেমিক-বিদ্রোহী সত্তার। নজরুল ইসলামের গল্পে কিন্তু তাঁর প্রেমিক সত্তার কর্তৃত্ব একচ্ছত্র। 'সাঁঝের তারা' গল্পটি এ মন্তব্যের সপক্ষে জ্বলন্ত সাক্ষী। এর ভাষারীতিতে ভারসাম্য আছে, আবেগ-উদ্দীপনা সংযত। রূপকাভাসে বর্ণিত একটা তত্ত্ব ইঙ্গিতময়তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সীমাহীন কল্পনাবিলাসী মানুষের প্রতিভূ হিসেবে আলোচ্য গল্পের নায়ক চরিত্রটি কল্পিত। প্রেমের ব্যাপারে বোধ হয় মানুষ কল্পনার আর বাস্তবের পার্থক্যই প্রার্থনা আর প্রাপ্তির মাঝে সৃষ্টি করে ব্যবধান, জীবনে আনে দুঃসহ বঞ্চনা। বর্তমান গল্পের নায়কের আকাঙ্খিত প্রেয়সী আকাশের তারার মতোই দূরে থেকে গেছে, তার 'সৃষ্টি ছাড়া' পথের সহযাত্রী হতে চায়নি। আকাশের তারা প্রতিদিনই দেখা যায়, কিন্তু 'সন্ধ্যাতারার' রূপকে আভাসিত নায়িকাকে আর উদয়ের দেশে দেখা যায় না, তার অবস্থান অস্তাচলের দেশে। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবজীবনে সে এখন পরের ঘরের বধূ। পুরুষ প্রকৃতি কল্পনা বিলাসের মধ্য দিয়ে অপ্রাপ্তির বেদনাকে জয় করার চেষ্টা করে কল্পিত ভুবনে হারানো

প্রেমিকার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু নারী প্রকৃতি সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। সংসারের কর্মসূচীতে তাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতে হয়, অতএব এ কল্পনাবিলাস তার পক্ষে অস্বাভাবিক, অসম্ভব। প্রেম তার বিলাস নয়—সমাজ-সংসারের বিধিলিপির শর্তসাপেক্ষ :

'বুঝলাম সে যতদিন অস্ত-পারের দেশে বধূ হয়ে থাকবে ততদিন তার দিকে তাকাবারও অধিকার নেই। আজও সে তার জগতের চিরন্তন সহজ ধারাটুকুকে বজায় রেখে চলেছে। সে তো বিদ্রোহী হতে পারে না। সে যে নারী——কল্যাণী।'

রূপকাশ্রয়ী এই গল্পটি শিল্পপ্রকরণে আকর্ষণীয় ও প্রেম-চেতনার এক বিশেষ আদর্শবাদে সমৃদ্ধ।

বীরভূমের বাগ্দীদের ভাষায় লেখা 'রাক্ষুসী' গল্প আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্যকে বহন করে। একটি স্বামীহন্তা মর্মাহত নারীর আত্মকথায় লেখা এ গল্পে প্রকরণগত কোন উৎকর্ষ নেই। প্রলাপোক্তিতে বিবৃত কাহিনী বিন্যাসে কোন বৈচিত্র্য, সংঘাত বা নাটকীয়তার আভাস নেই। চরিত্রগুলোও দীপ্ত হয়নি। তবু এর যা কিছু আকর্ষণ তার আঞ্চলিক ভাষারীতির জন্য।

উত্তেজিতা রমণীর কণ্ঠে অসংস্কৃত ভাষায় কেমনভাবে তার মনোভাব ব্যক্ত তা নীচের উদ্ধৃতি থেকে লক্ষ্য করা যাবে :

'আমি কোন্ উনোনমুখো সুটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন্ খালভরা ড্যাক্‌রার মুকে আগুন দিয়েছি? কোন্ চোখ্‌খাগী আবাগীর বেটির বুকে বসে তপ্ত খোলা ভেঙেছি? কা'র গতর আমকাঠ না কুল কাঠের আখায় চড়িয়েছি? কোন্ ছেলেমেয়েদের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছি।'

বিকৃতভাবে উচ্চারিত কিছু আঞ্চলিক শব্দ এ গল্প থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এগুলো ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। যেমন, সোয়ামী (স্বামী), কিরপিণ (কৃপণ), ভদ্দরনুক (ভদ্রলোক), উচ্ছুগু (উৎসর্গ), পেতিজ্ঞা (প্রতিজ্ঞা), ইস্ত্রি (স্ত্রী), পেথম (প্রথম), পেরকাণ্ড (প্রকাণ্ড) ইত্যাদি।

গল্পের নায়িকা পরনারীতে আসক্ত স্বামীকে হত্যা করেছে। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় সে পুণ্যবতী। কারণ, স্বামীকে সে নরকযাত্রা থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সামাজিক আইনে সে অপরাধিনী, তার কারাদণ্ড হয়েছে। সে পুরুষপ্রধান সমাজের একটি ক্ষতস্থানে অংগুলি নির্দেশ করেছে--- অনুরূপ অপরাধের জন্য স্বামী যদি তাকে হত্যা করত তাহলে এই ঘটনাকে সমাজ স্বাভাবিক বলেই মেনে নিত। আলোচ্য গল্পে অস্তিবাদী চেতনার দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। শাসনকর্তার পরিবর্তনের ফলে নায়িকা নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বেই কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও সে তার এই ভাগ্যপরিবর্তনকে ভগবানের ইচ্ছাশক্তির ফল হিসেবেই বিবেচনা করছে।

'সালেক' গল্পটি রূপকধর্মী এবং ইংগিতময়। এখানে স্বল্প পরিসরের মধ্যে গভীর জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম 'দারিদ্র্য' কবিতায় যে সুরে দুঃখকে বরণ করেছেন তা' বর্তমান গল্পেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

'এই সব লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই ত চন্দন। আর ওতে কিছু দগ্ধ হয় না ভাই, স্নিগ্ধই হয।'

সুফী সাধনার উদ্দেশ্যে একজন মাধ্যম বা গুরুর প্রয়োজন। আলোচ্য গল্পের 'দরবেশ' চরিত্র সে মাধ্যমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। গুরুর নির্দেশ মেনে চলে মুক্তিপ্রত্যাশা মানুষ। তাঁর নির্দেশিত পথ ধ'রে স্রষ্টার সাথে বিলীন হবার জন্য পার্থিব মোহ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি সব বিসর্জন দিয়ে বরণ করে দুঃসহ যন্ত্রণা। এই সাধন প্রণালীর অনুসৃতি লক্ষ্য করি কাজী চরিত্রের মাঝে। দরবেশের আদেশে তিনি যা করেছেন তাতে তাঁর সমস্ত খ্যাতি বিনষ্ট হয়েছে। মসজিদে মদের বোতল নিয়ে যাওয়া কিংবা আত্মগৌরবের সমাধি রচনা করা—এ সবই রূপক। এর অন্তরালে সাধনার দুর্গম পথই উদ্ভাসিত । গল্পটি প্রত্যয়বোধ ও আশাবাদের দ্যোতক। সাধক অনেক যন্ত্রণা ভোগের পর অজ্ঞাতজনের শান্ত-শীতল ক্রোড়ের সান্নিধ্য পেয়েছে। তার অবারিত অশ্রুধারায় বস্ত্রের কিংবা আত্মার সব অহংকার সব মালিন্য বিধৌত হয়ে গেছে। অজ্ঞাতজনের পরিচয় জানতে চাইতে কাজী শুনতে পেলেন একটি কম্পিত কণ্ঠস্বর

'মাতাল হাফিজ'। মনে হয় কবি হাফিজের কাব্য নজরুল ইসলামকে এই গল্প রচনায় বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

'স্বামীহারা' গল্পের বর্ণনা কৌশল 'সালেক' গল্পের অনুরূপ। এক হতাশাগ্রস্ত বিধবার করুণ দীর্ঘশ্বাসে গল্পটি আতপ্ত।

গোরস্থান বর্ণনা সুস্মিত ভাষাবিন্যাসে অনবদ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নজরুল ইসলামের মৃত্যু-চেতনা সম্পর্কে একটি আভাস পাওয়া যায়:

'....এই মাটির রাজ্যে ত দুঃখ-ক্লেশ বা কারুর অত্যাচার আসতে পারে না; এখানে শুধু একটা বিরাট অনন্ত সুপ্ত শান্তি- -কর্মক্লান্ত মানবের নিঃসাড় নিস্পন্দ সুষুপ্তি।'

মৃত্যুর চেয়ে অধিক যন্ত্রণাদায়ক যে বেঁচে থাকা, সেটাই জীবনের ট্রাজেডী। বর্তমান গল্পের নায়িকা সেই ট্রাজেডীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তার অনুধ্যানে মৃত্যুর স্বরূপ দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় বহন করে:

'জাবেহ করা জানোয়ারের মত আর কতদিন নিদারুণ জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে মরব? কেন মৃত্যুর মাধুরী মায়ের আশিস ধারার মত আমার উপর নেমে আসে না?'

মৃত্যুর এই মাধুর্যরূপ দর্শন প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু-চেতনা বিষয়ক একটি কবিতার কথা মনে পড়ে। খণ্ড জীবনের অপূর্ণতা, ব্যর্থতা, অক্ষমতা যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু মৃত্যু খণ্ড জীবনের অবসান ঘটিয়ে অনন্ত জীবনের পূর্ণতা দেয়। টেনিসন চিন্তা করেছেন, মৃত্যু বিভাজিকা রেখা অতিক্রম করলেই অনন্ত জীবন সমুদ্রে তিনি পৌঁছতে পারবেন। সেখানে তিনি পরম স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে পারবেন—এই আশায় তিনি উদ্দীপ্ত, অর্থাৎ মৃত্যু তাঁর কাছে মোহনীয়। জীবনানন্দ দাশ মৃত্যুকে কল্পনা করেছেন শান্ত, মন্থর স্বপ্নাচ্ছন্ন সন্ধ্যা রূপে। দিনের শেষে রাত, আর জীবনের শেষে মৃত্যু। রাত শূণ্যতায় ভরা নয়। পাখির কাকলি আর উড়ন্ত কাকের গতি রাতকে স্পন্দিত করে। এই অভিজ্ঞতার সৌজন্যে তিনি মৃত্যুর বিভীষিকায় ভয়ার্ত নন, বরং মৃত্যু তাঁর কাছে এক অনন্ত ঋদ্ধ জীবনের সূচক।

গল্পের নায়িকা চরিত্র সৃষ্টিতে কিছুটা মনোসমীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তার শিক্ষা ও বংশ মর্যাদার তুলনায় তার স্বামী ছিলেন অনেক যোগ্যতর। তার উপর শাশুড়ীর কাছে সে পেয়েছে গভীর স্নেহ-মমতা। প্রতিবেশীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে বক্রোক্তি করত যে এ সুখ তার সইবে না. এর ফলে শুরু হ'ল তার অমঙ্গলের আশংকা। আর আত্মদৈন্যের মানসিক যন্ত্রণা। অবশেষে কলেরায় তার স্বামীর জীবনাবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাগ্যের বিপর্যয় হ'ল। অমার্জিত ভাষায় জনৈক আত্মীয় তাকে গালমন্দ করল। তাকে অন্যত্র বিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু নায়িকা মেনে নিতে পারল না এ বিকল্প ব্যবস্থা। সে মনে করে—এটা কামনার বশবর্তী হয়ে পবিত্র ভালোবাসাকে কলঙ্কিত করা ছাড়া কিছুই নয়। সংকীর্ণতা কিংবা প্রথাগত বিশ্বাসবর্জিত বাস্তব জীবনে বন্দনায় কাতরা কণ্ঠ সোচ্চার:

'মৌলবী সাহেবরা হয়ত খুব চটে আমার 'জানাজার' নামাজই পড়বেন না, কিন্তু মানুষ আর মৌলবীতে অনেক তফাৎ—শাস্ত্র আর হৃদয়, অনেকটা তফাৎ।'

প্রকরণগত দুর্বলতা এ গল্পে যেটুকু আছে তার সবটুকুকে আচ্ছন্ন ক'রে এই উদার প্রগতিশীল জীবনবোধ আমাদের এক সুষমামণ্ডিত রসলোকে উত্তীর্ণ করে।

'শিউলিমালা' গ্রন্থের গল্পগুলোর পটভূমি সম্পূর্ণরূপে বাংলার প্রকৃতি ও সমাজ। জিন প্রসঙ্গ কিংবা মৃত্যু-দূতকে ফাঁকি দেবার জন্য সন্তানের 'আল্লারাখা' নামকরণ ইত্যাদি লোকবিশ্বাসের পরিচয়ে এই সংকলনের গল্পগুলোকে প্রাকৃতগন্ধী করে তুলেছে। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে, আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সংলাপ রচনা। নজরুল ইসলাম 'শিউলিমালা' সংকলনের গল্পগুলোতে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে সেই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। 'পদ্ম গোখরো' গল্পের উপজীব্য

বিষয় সমাজচেতনা ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। অন্যান্য গল্পগুলো প্রেমচেতনার এবং ট্র্যাজিকধর্মী। বর্তমান সংকলনের গল্পগুলো তুলনামূলকভাবে ভাবালুতাবর্জিত ও সফল প্রয়াস।

দুটো যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অব্যবহিত পরেই মা মারা যায়। তাদের হারিয়ে স্নেহবুভুক্ষু জননী দুটো সর্পশিশুর মধ্যে আবিষ্কার করল হারানো সন্তান যুগলের মমতাময় স্পর্শ। এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী জোহরার পরিচয় পাই 'পদ্মগোখরো' গল্পে। তার অবচেতন মন ব্যেপে সাপ দুটোর অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল। তারা যেন জোহরার মৃত সন্তান যুগলের রূপ ধরে ক্ষুধায় কাতর কণ্ঠে তার কাছে দুধ পান করতে চাচ্ছে।

মৃত্যুর হাত থেকে অবিশ্বাস্যভাবে মুক্তি পেয়ে আরিফ আপন গৃহে ফিরে আসল। জোহরা তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হ'ল। বিবেকের দংশনে ও আত্মগ্লানিতে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গটির উপস্থাপনা অত্যন্ত জীবনধর্মী ও নাটকীয় :

'জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, "না, না, তুমি শাস্তি দাও। তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার।"

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, "এই নাও শাস্তি।"

জোহরার পিতা ও সাপের সংঘর্ষ দৃশ্যটি ক্লাইমেক্সের সৃষ্টি করেছে। অন্যায়কারীর পতন অনিবার্য—এই নীতিবাদের প্রচার প্রয়াস গল্পটিতে প্রকটিত হয়েছে। যে সর্পশিশু যুগল সন্তানহারা নারীর হৃদয়ে সন্তানের প্রতীক হিসেবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাদের দ্বারাই আবার অন্যায়কারীর ধ্বংস সাধন করে তাদের উপর দৈবীমাহাত্ম্যের আবরণ সৃষ্টির ফলে সেই অন্তরঙ্গতা বিনষ্ট হয়েছে। একই বস্তুকে একবার মানবশিশুর প্রতীক হিসেবে, আবার আর একবার দৈবী সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। কল্পনার এ বৈপরীত্য রসাস্বাদনের ক্ষেত্রকে বন্ধুর করে বৈকি। এছাড়া সর্পশিশুর প্রতি জোহরার বাৎসল্য রস এত প্রগাঢ় যে সে কল্পনায় নাগমাতা আর তার স্বামীকে নাগলোকের অধীশ্বর হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল। এ ধরনের কল্পনা লেখকের অতিশয়োক্তি মাত্র। এখানে বাস্তবজীবনবোধের চেয়ে রূপকথার আবহ প্রবল।

সর্পশিশুর মৃত্যু সংবাদে জোহরার মৃত্যুবরণ ও গ্রামময় তার সর্পশিশু প্রসবের গুজব ছড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখক গল্পের উপসংহার টেনেছেন; এই সমাপ্তি পাঠকদের মনের মাঝে একটি অতৃপ্ত অনুভূতির সঞ্চার করে।

লোকবিশ্বাস, রূপকথা কিংবা পুরাণ থেকে উপমা সংকলন এবং সার্থক সমাজচিত্র অঙ্কন গল্পের শিল্পমূল্যকে বৃদ্ধি করেছে।

'জিনের বাদশা' গল্পের নায়কের নাম-পরিচয় এমনকি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক স্বয়ং তথ্য সরবরাহ করেছেন :

'.........আল্লারাখা আমাদের গল্পের নায়ক, গল্পের নায়কের মতই দুঃশীল, দুঃসাহসী, দুঁদে ছেলে সে।'

বক্তব্য প্রকাশে লেখকের এমন প্রত্যক্ষ ভূমিকা অবলম্বন যথার্থ নয়। ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকাশ ঘটানোই বিধিসম্মত।

.আল্লারাখার পিতার সংলাপে পুরোপুরি আঞ্চলিক ভাষা রীতি লক্ষ্য করা যায় :

'হুনছনি হালার পোর কতা! হালার পো কয়, বাপ্‌কা বেডা। তোর বাপের মুহে মুতি।'

এ সংলাপ স্থূল রস এবং রুচিবিকৃতির পরিচয় বহন করে। তবে অপ্রকৃতিস্থ এবং অ-সংস্কৃত মানুষের চরিত্র বিকাশের জন্য এ ধরনের অমার্জিত বাচনভঙ্গী উপযোগী হয়েছে।

চানভানু কর্তৃক আল্লারাখাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন নাটকীয়। চ্যালাকাঠ দিয়ে আল্লারাখার পিঠ ভাঙবার অভিপ্রায় জানালো সে ছড়া কেটে। 'দুঁদে' ছেলে আল্লারাখা এই অপমানের প্রতিশোধ নিল আরো

আশ্চর্য কৌশলে। সে চানভানু ছাড়া আর সবার বাড়ির দরজায় অস্পৃশ্য বস্তু নিক্ষেপ করল। বলা যায়, নায়ক তার নায়িকার জন্য মানসিক শাস্তি প্রয়োগ করছে।

নায়ক নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎদৃশ্য মনোজ্ঞ এবং রোমান্টিক। তাদের অন্তর্গত অনুভূতি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

চানভানুর মনে আল্লারাখার মূর্তিটি 'কালবৈশাখীর মেঘের' রূপ ধ'রে অংকিত হয়েছে। সে চিত্র তাকে ভীত করে আবার আকর্ষিতও করে। অন্যপক্ষে আল্লারাখা তার নায়িকার সামনে উপস্থিত হয় পথে কিংবা স্নান ঘাটে, তাকে উত্ত্যক্ত করে বারবার। প্রসঙ্গগুলো রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলার সংগে তুলনীয়।

চানভানুকে পাবার পরিকল্পনা নায়কচরিত্রের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে যে ঘটনার সৃষ্টি করেছে তা' নাটকীয় এবং কৌতুকপূর্ণ। চানভানু নদীর ঘাটে জল আনতে গেলে আল্লারাখা অভিনয় ক'রে তাকে ভূতের ভয় দেখাল এবং সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। আল্লারাখা তাকে কোলে ক'রে ডাঙায় তুলল। তার পরিকল্পনা সফল হ'ল। সে চানভানুর আনুগত্য অনুভব করল। আকাশের চতুর্দশী চাদ তার কাছে চানভানুর মুখসদৃশ বলে মনে হ'ল। অবশ্য চানভানুকে পাবার জন্য আল্লারাখার বিচিত্র বেশ ধারণ ও ভূতের ভয় দেখানো নিতান্ত লঘু ব্যক্তিত্বের পরিচয়। এসব ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ অথবা বক্তব্যের কোন গভীরতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু গল্পের সমাপ্তিতে লেখক চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লারাখার এত চেষ্টা সত্ত্বেও তার শেষ রক্ষা হ'ল না। চানভানুর বিয়ে হ'ল অন্যত্র। তখন আল্লারাখার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন পাঠক মনকে বিস্মিত করে। চানভানুর ব্যাকুল প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। সে প্রশ্নের সপ্রতিভ উত্তর দেয় আল্লারাখা। গল্পের সমাপ্তি অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ।

'অগ্নিগিরি' গল্পের নায়ক সবুর আখন্দ কবি কল্পনার উচ্ছ্বাসে নিশ্চয়ই পুতুলের মতো হয়ে পড়েছে। সমবয়সী ছেলেদের শত অত্যাচার উৎপীড়নে সে নিরুত্তর, নিস্পৃহ। বরং আত্মরক্ষার জন্য বার বার সে ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েছে। তিন বছর নূরজাহানের সান্নিধ্যে থেকেও সে কখনো তার মুখের দিকে তাকায়নি। এই অতিসাধু চরিত্র চিত্রণের মাঝে ধার্মিকতার উপাসনা থাকতে পারে, কিন্তু জীবনের বন্দনা নেই। তাই গল্পের চরিত্র হিসেবে সবুর আখন্দ ব্যর্থ। অন্যদিকে নূরজাহান চরিত্রটি অনবদ্য। সবুরের এই অসহায়তার জন্য সে তার প্রতি সহানুভূতিশীলা। আবার তার চরিত্রের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ববোধ, আপন রূপ-যৌবন সম্পর্কে সচেতনতা তাকে অত্যন্ত মানবিক করে তুলেছে। বার বার লাঞ্ছিত হবার পরও সবুরের যখন চৈতন্য হল না, কিংবা তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হ'ল না কোন প্রতিবাদধ্বনি, তখন নূরজাহানই তার ব্যক্তিত্বকে উদ্বোধিত করবার জন্য তাকে প্রশ্ন করেছে, তার মনে আঘাত দিয়েছে, যাতে এই আঘাতে তার সুপ্ত পৌরুষের জাগরণ হয়। নূরজাহানের এই প্রয়াস ফলপ্রসূ হ'ল। দৃষ্টির বিনিময় হ'ল দুজনার। সবুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল 'নূরজাহান'। এই স্বর শুনে নূরজাহানের মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল। বর্ষারাতের চন্দ্রবেষ্টিত ইন্দ্রধনুর শোভার উপমায় সে মুখশ্রী চিত্রিত হয়েছে: সুপ্ত অগ্নিগিরি যেমন আকস্মিকভাবে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়, তেমনি সবুরের অন্তর্গত সমস্ত উত্তাপ বেরিয়ে পড়ল। তার মানসিক বিপ্লব ঘটল। নূরজাহানের বিশ্বাস, অনুপ্রেরণা তাকে আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ করল। সে দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেদের উপযুক্ত জবাব দিল। সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের একজন তার নিজের হাতের ছুরিতেই মারা গেল। এর পরই কিন্তু সবুর আবার উত্তাপ হারিয়ে ফেলল। প্রকৃতপক্ষে সে হত্যাকারী নয়, শুধু আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। দুর্ঘটনাক্রমে ছেলেটি মারা যায়। কিন্তু সমস্ত অপরাধ সে নিজের কধে তুলে নিল। তার পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিলও নিযুক্ত করতে দিল না সে। বিচারে তার সাত বছরের জেল হ'ল। কুৎসা রটনাকারী, মামলাবাজ লোক, মিথ্যা সাক্ষী ইত্যাদি হীন মানুষের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে এই গল্পে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের রূপটি ফুটে উঠেছে।

গল্পটিতে অনেক অপ্রয়োজনীয় ঘটনার বিস্তার ঘটেছে। প্রারম্ভ ও পরিণতির রসবোধের সামঞ্জস্য নেই। কারণ আলী নসীব মিঞার কৌতুক মূর্তিটির দীর্ঘ বর্ণনার বিশেষ কোন প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে লঘু হাসির ইন্ধন থাকতে পারে, কিন্তু শিল্প নৈপুণ্য নেই। অথচ গল্পের সমাপ্তিতে পরিবেশিত ভাবনা ও রস অত্যন্ত প্রগাঢ়। এই সমাপ্তি ইঙ্গিতময় ও ট্র্যাজিকধর্মী :

'কারাগারের দুয়ার ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল—সেই দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের মনে হ'ল—তার সকল সুখের স্বর্গের দ্বার বুঝিবা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেল।'

'শিউলিমালা' গল্পটির উপজীব্য বিষয় সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতি। বৈঠকী ভঙ্গীতে বিবৃত এই গল্পে কোন আবেগ-উচ্ছ্বাস নেই। এর ভাষারীতি প্রাঞ্জল, সরল, ও সহজ। ঘটনাবিন্যাসে গতিধর্ম রক্ষিত হয়েছে। গল্পের নায়ক আজহার তরুণ ব্যারিস্টার, অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি নির্মোহ এবং দাবা খেলায় অত্যন্ত আসক্ত। বন্ধুদের কাছে স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে তার পরিণতিবিহীন প্রেমিক জীবনের কথা ব্যক্ত করল।

আজহার শিউলির সংযত মন কখনো উদ্বেলিত হয় নি, তাদের প্রেম সম্পর্কে কোন কথাও প্রকাশ পায়নি। তাদের অন্তরে প্রেমের যে অঙ্কুর জন্ম নিয়েছিল তার পরিণতি লাভের অসমর্থতার কোন কারণ গল্পে স্পষ্টভাবে দেখা দেয়নি। মনে হয়, তাদের দ্বিধাহীন ঘনিষ্ঠতার মধ্যে এমন একটি পবিত্র বিশ্বাসের বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল যে হৃদয়ঘটিত কোন দুর্বলতার কথা ব্যক্ত করার মতো প্রবৃত্তি কারো হয় নি। সামাজিক আনুষ্ঠানিকতার সমর্থন নিয়ে তাদের প্রেম সার্থক হয় নি সত্যি, কিন্তু আজহার সে প্রেমকে তার হৃদয়-বেদীতে অধিষ্ঠিত করেছে। সে অকৃতদার রয়ে গেছে। সে শিউলির অনুরোধে প্রতি আশ্বিনে বিনম্র শিউলি ফুলদলকে জলে ভাসায়। এ প্রেম-চেতনা দেহনিরপেক্ষ এবং প্রাক্‌যুদ্ধ প্রেমাদর্শের প্রতিনিধি। গল্পের রসবোধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আঙ্গিক প্রকরণ কৃতিত্বপূর্ণ।

নজরুল ইসলাম বাংলা ছোট গল্পের উন্মেষ পর্বের লেখক। মুসলমান গল্প লেখকদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই অগ্রজ। তাঁর গল্পে আঙ্গিকগত ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বভাবতই রয়েছে। কিন্তু গঠনযুগের সৃষ্টি হিসেবে তার একরোখা নিন্দাবাদ সুবিচারের পরিচয় নয়। নজরুল ইসলামের অধিকাংশ গল্পই উত্তম পুরুষে বিবৃত। এই বৈশিষ্ট্য অতি সাম্প্রতিক কালের ছোট গল্পেও লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর অধিকাংশ গল্পে মাঝে মাঝে কিছু গান সন্নিবেশিত হয়েছে। আবার গল্পগুলো শিরোনামায় কিংবা সংখ্যা দ্বারা কতিপয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই আঙ্গিক বৈশিষ্ট সাম্প্রতিক ছোটগল্পে দেখা যায় না।

নজরুল ইসলামের গল্প রচনার কাল পরিধির মধ্যে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে, এদেশে তার বাতাস বইতে শুরু করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়েছে। এদিকে দেশবাসী স্বাধীনতা লাভের আশা নিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সংগে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর নির্মমভাবে সে আশা ভেঙে গিয়েছিল। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে একটা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধের বিবর্তন হয়েছিল। নজরুল ইসলামের ছোট গল্পে যুদ্ধের যেটুকু প্রভাব আছে, তা হ'ল বোহিমিয়ানভাব, রণাঙ্গণের বর্ণনা এবং কোন বিভ্রান্ত তরুণের যুদ্ধে যোগদানের প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রথম মহাসমরোত্তর বিশিষ্ট চেতনা, অর্থাৎ বিবর্তিত মূল্যবোধ সম্পর্কিত কোন চিহ্ন সেখানে নেই।

শিল্পের মানদণ্ডে নজরুল ছোটগল্পের সামগ্রিক সাফল্য আমরা দাবি করি না ; কিন্তু তাঁর ছোটগল্পে শিল্প চেতনার অন্বেষণ সম্ভব : এবং সে অন্বেষণ ধনাত্মক ফলপ্রসু।

নজরুল ও বিভূতিভূষণ : স্মৃতির আয়নায়

চ ণ্ডী দা স চ ট্টো পা ধ্যা য়

নজরুলের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কখন যে প্রথম বিভূতিভূষণেব আলাপ ও পবিচয হযেছিল বলা কঠিন। মনে হয, ত্রিশেব দশকের গোড়াব দিকে আলাপেব সূত্রপাত এবং ক্রমশ তা ঘনিষ্ঠতায পরিণত হয।

এখন নবাঙ্কত তথ্যাবলীর মাধ্যমে জানা যায়— বিভূতিভূষণ 'বিচিত্রা'য 'পথের পাঁচালী' বের হবার প্রাক্কালে ১৯২৮ খ্রীঃ অথবা তাব কাছাকাছি সমযে কলকাতায ফিরে এসেছিলেন। কারণ ১৯২৮ খ্রীঃ বিভূতিভূষণ তাব প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লাব'-এর অন্তর্ভুক্ত 'নব বৃন্দাবন' গল্পটি নব গঠিত বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠ কবেছিলেন। 'বিচিত্রা'ব কর্তৃপক্ষ— ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮) 'বিচিত্রা'ব ভাদ্র সংখ্যায গল্পটির উচ্চ প্রশংসা কবেছিলেন।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে সেকালের 'ইণ্ডিযান ব্রডকাস্টিং করপোবেশন'-এর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তিনি সেখানে নিযমিত গল্প পাঠ কবতেন। নলিনীকান্ত সরকাব (পণ্ডিচেরী) ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রই 'বেতাব'-এব সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। মনে হয নজরুলের সঙ্গেও এসব আসরেই বিভূতিভূষণের প্রথম পরিচয হযেছিল এবং যথারীতি পরিচয শেষে তা ঘনিষ্ঠ সখ্যতা ও বন্ধুত্বে পবিণত হযেছিল।

বিভূতিভূষণেব পিতা মহানন্দ শাস্ত্রী কথক ও সুকণ্ঠেব অধিকারী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বেনাবস ঘরানার শিল্পী ছিলেন। উচ্চাঙ্গ বা মার্গ সঙ্গীত খুব ভালোভাবে শিখেছিলেন। গোযালিযর ও লক্ষ্ণৌতে তিনি ধ্রুপদ ও ঠুংবী এবং টপ্পা শিখেছিলেন। যে সব গান বিভূতিভূষণের মুখেও কিছু কিছু শুনেছি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও বিভূতিভূষণ খুব ভালোই বুঝতেন। বিভূতিভূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নুটুবিহারী কলকাতার 'কাম্বেল মেডিকেল-স্কুল'-এ পড়তেন এবং তাঁর সঙ্গেই মির্জাপুরের মেস-এ আলাদা ঘরে থাকতেন। তিনি ছিলেন জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের ছাত্র।

নজরুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পরে তিনি নজরুলকে অনুরোধ করেন— তিনি ইন্দুবালার গান শুনবেন। এইচ.এম.ভি. ও টুইন-এর স্টুডিওতে ইন্দুবালা ও আঙ্গুরবালার গান সামনাসামনি শোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। ইন্দুবালার সঙ্গীত প্রতিভার প্রতি বিভূতিভূষণের পক্ষপাতিত্ব ছিল। নজরুল তাঁকে ১৯৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দে (পরবর্তীকালে অবিভক্ত বঙ্গের (১৯৪৬-৪৭) প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবের বাড়ীতে এক ঘরোয়া সান্ধ্য জলসায় ইন্দুবালা ও অন্যান্য গায়কগায়িকার গান শুনিয়েছিলেন।

বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়বার বিবাহের অনতিকাল পূর্বে রবিবারের এক সকালে নজরুল বিভূতিভূষণের মেস-বাড়ীতে এসে হাজির। চারদিকে ছাত্রদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। নজরুল বিভূতিভূষণের তেতালার ঘরটিতে জাঁকিয়ে বসলেন। নুটুবিহারীকে তিনি হারমোনিয়াম ও তবলা আনতে বললেন। সঙ্গে বোধহয় নলিনীদা ও আরো ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ ছিলেন। নজরুলের গান আরম্ভ হয়ে গেল। নুটুদা তবলাতে

ঠেকা দিতে লাগলেন। নবীন যশঃপ্রার্থী সেদিন বোধহয় ২/১টি গানও শুনিয়ে দিয়েছিলেন। ডবল-ডিমের ওমলেট ও জর্দ্দা পান এলো। আর এল বারে বারে চা। কিন্তু আনন্দ মুখর আসরটিকে শেষের দিকে নজরুল নিরানন্দময় করে তুললেন। নজরুল হাত দেখতে জানতেন। বিভূতিভূষণের তখন বয়স চল্লিশ। দুই-তিনটি মেয়ের সঙ্গে তখন তাঁর বিয়ের কথা চলছে। বিভূতিভূষণ কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। নজরুলকে বিভূতিভূষণ তাই তাঁর হাত দেখালেন। নজরুল বিভূতিভূষণের হাত দেখেই বললেন—বিভূতিভূষণের দ্বিতীযবার বিবাহ অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি কয়েকটি পুত্র ও কন্যার জনক হবেন। তবে তাঁর সন্তানভাগ্য মন্দই। মাত্র একটি সন্তানই বাঁচবে। বিভূতিভূষণ নিজেও দীর্ঘায়ু হবেন না। ৬০ বৎসরের বেশী বাঁচবেন না। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীও তাঁর আগেই পরলোকগমন করবেন। বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপির মধ্যেই আমি একথা' পেয়েছি। শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকারের মুখেও একথা শুনেছি বহুবার। নজরুলের হাত দেখার অনেকটাই কিন্তু বিভূতিভূষণের জীবনে ফলে গিয়েছিল। তিনি মাত্র ৫৭ বৎসর বেঁচে ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী অবশ্য তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে মারা যান। তবে পুত্র তারাদাসের আগে দুটি শিশুকন্যা হয়ে মারা যায়।

বিভূতিভূষণ যখন নজরুলকে হাত দেখান তখন তাঁর চিত্ত বিবাহের ব্যাপারে অস্থিরতা ও দোলাচলের মধ্যে দুলছিল। তাঁর সঙ্গে একটি শিক্ষিতা অসবর্ণ মেয়ের বিবাহ প্রায় স্থির হতে চলেছিল। কিন্তু ভাটপাড়ার মাতুলালয় থেকে সে ব্যাপারে আপত্তি তোলায় সে বিবাহ হয়নি। স্ব-গ্রামবাসী আরো একটি ব্রাহ্মণ মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে তখন প্রায় স্থির। কিন্তু স্বগ্রামবাসী গুরুকন্যা ও স্বগোত্র হলেও সে বিয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। বিভূতিভূষণের বিখ্যাত গল্প 'কিন্নর দল' ও 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' - গল্প দুটির পশ্চাৎপট হল এই।

এসব আমার মেজদির সঙ্গে বিভূতিভূষণের বিবাহের পূর্বের ঘটনা।

১৯৩৯ খ্রীঃ ঢাকা শহরে All India Radio এর Radio Station খোলা হয়। কলকাতা থেকে সম্ভবত Station Director হয়ে যান অশোক সেন। ঢাকায় রেডিও স্টেশন খোলার সময়ে সারা বাংলা থেকেই বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন রেডিও স্টেশনের সেদিনের কর্তৃপক্ষ। বিভূতিভূষণও রেডিও স্টেশন উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নজরুল ও বুদ্ধদেব বসু। ঢাকা মেলে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বেশ বড় স্টীমারে যেতে হত। ঢাকাগামী স্টীমারে বিভূতিভূষণের সঙ্গে নজরুলের তন্ত্র সাধনা, কালীপূজা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ কিভাবে মানুষের মধ্যে হতে পারে সে সম্পর্কে গভীর আলোচনা হয়। নজরুলকে জিজ্ঞেস করে আরো অনেক কথাই বিভূতিভূষণ সেদিন জানতে পারেন। নজরুলের তন্ত্র ও কালী সাধনা সম্পর্কেও বিভূতিভূষণের মনে কৌতূহল ছিল। এ বিষয়ে কলকাতায় বিভূতিভূষণ বন্ধুবান্ধবদের মুখেও কিন্তু কিছু কিছু কথা শুনেছিলেন। বিভূতিভূষণের বিখ্যাত গ্রন্থ 'দেবযান' তখনো বের হয়নি। তিনি নানারকম আলোচনা ও দেশি বিদেশি বই পড়ে এ বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করছিলেন। কালী সাধনা ও তন্ত্র সাধনা সম্পর্কে অনেক গুহ্য তত্ত্ব নজরুলই তাঁকে বলেন। তিনি বলেন "আজকাল তিনি মন শান্ত করে ধ্যানে বসলেই জ্যোতি দেখতে পান। তাঁর জ্যোতিদর্শন হয়। তাছাড়া চোখ বুজলেই তিনি মা কালীকে দেখতে পান। এই স্টীমারেই তিনি কতবার কালী মূর্তির দর্শন পেলেন। মা কালী যেন তাঁকে হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর আর আনুষ্ঠানিক ফুল-বেলপাতা নিয়ে ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে ঠাকুরের সামনে আসন পেতে বসতে হয় না। তিনি আজকাল মানস পূজা করতে পারেন। মানস ক্ষেত্রেই তিনি মা কালীকে দেখতে পান। মাঝে মাঝেই তাঁর জ্যোতিদর্শন ঘটে। আজকাল তাঁর গান ও কবিতা তাই আর লিখতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, হিমালয়ের কোনো গিরি কন্দরে অথবা মধ্যপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের কোনো বিজন জঙ্গলে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা করে তাঁর জীবনটা কাটিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থ স্ত্রী ও দুটি শিশুপুত্রের জন্যে তাঁর আর বাড়ী ছেড়ে যাবার অবসর হবে না। সম্মুখে ভয়ঙ্কর খাদ।"

বিভূতিভূষণ নজরুলের একথা শুনে খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে ফিরে এসে অনেকের কাছেই অনেক বন্ধুবান্ধবের কাছেই এসব কথা বলেছিলেন। আমাদের বাড়ীতেও আলোচনা হয়েছিল। আমার বাবা ষোড়শীকান্ত সঠিক অর্থে কালীসাধক না হলেও Spiritualism-এ বিশ্বাসী ছিলেন। নজরুলের লেখা ও সুর দেওয়া অনেক গানই তাঁর সংগ্রহে ছিল। তিনিও নজরুলের কথা বিভূতিভূষণের মুখে শুনে বলেছিলেন : 'নজরুল সাধনার অত্যন্ত উচ্চমার্গে অবস্থান করছেন।'

এই প্রসঙ্গে অনেক দিন পরে আমি বিভূতিভূষণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার মানসে বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুকে একটি পত্র দিয়েছিলাম। পত্রটির নানা কারণে একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে মনে করে এই স্মৃতিকথায় তুলে দিচ্ছি। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন 'ঢাকা মেল'এ ঢাকা রেডিও স্টেশনের উদ্বোধনে তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন। সঙ্গে নজরুলও গিয়েছিলেন। আর কে গিয়েছিলেন তাঁর মনে পড়ছে না। যাই হোক সে চিঠিটি তুলে দিলাম।

সবিনয় নিবেদন,

আপনি বিভূতিভূষণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন শুনে সুখী হয়েছি।

বিভূতিভূষণকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ১৫ কলেজ স্কোয়ারে এম. সি. সবকারের দোকানে, খুবসম্ভব ১৯৩০ সালে। সেখানেই প্রথম পরিচয়। ঢাকা যাওয়া বিষয়ে আপনি খবরটি ভুল শুনেছেন। ঢাকার বেতার কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে কলকাতা থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন— তাদের মধ্যে নজরুল ও আমি ছিলাম। আর কে ছিলেন বা ছিলেন কিনা আমার মনে নেই। নজরুলের সঙ্গে আমার নারায়ণগঞ্জগামী স্টীমারে দেখা হয়েছিল, সেই বৃত্তান্তও কালের পুতুল-এ লিখেছি।...

আপনি আমার আন্তরিক শুভ কামনা জানবেন। *বুদ্ধদেব বসু।*

২০.৬.১৯৭২

ঢাকাগামী স্টীমারে বিভূতিভূষণের নজরুলকে দেখে এক নতুন মানুষ ও অধ্যাত্মপথের পথিক বলে মনে হয়েছিল। এই ঘটনা তাঁর মনে দৃঢ় ছাপও রেখে গিয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রীঃ আমতায় 'মেলাই চণ্ডী' মন্দিরেব চবুতরায বাঘ সন্ধ্যার আলোকে কাঁসর ঘণ্টা আরতির বাদ্যেব মধ্যে পুনরায ঢাকাগামী নজরুলের কথা তুলেছিলেন।

ঢাকা গমনের কিছু আগে বা পরে বিভূতিভূষণ তাবাশঙ্করের আহ্বানে লাভপুর গ্রামে গিয়েছিলেন। তখনো আমার মেজদির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়নি। প্রত্যেক বৎসরই বীরভূমের লাভপুর গ্রামে সাহিত্য সম্মেলন হোত। তারাশঙ্করই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। সেখানে কলকাতার ধাঁচে বিরাট নাট্যমঞ্চ ছিল। সেখানে সাহিত্যসভার সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও অভিনয় হোত। বিখ্যাত নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

ইতোমধ্যে নজরুল নলিনীকান্ত সরকারকে নিয়ে লাভপুরে এসে পডলেন। তারাশঙ্করই তাঁদের আহ্বান করেছিলেন। তখন নজরুল উদ্‌ভ্রান্তের মত। নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা ইসলাম বাতের ব্যাধিতে ও পক্ষাঘাতে পঙ্গু। তারাশঙ্করের মুখে শুনেছিলাম— লাভপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ফুল্লরা দেবী খুব জাগ্রতা। একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম পীঠস্থানের সেটি একটি পীঠস্থান। সেখানে পূজো দিয়ে, মানত করে নির্মাল্য নিয়ে গেলে অনেকের পঙ্গুত্ব ও পক্ষাঘাত নাকি সেরে যায়। নজরুল নলিনীকান্তকে সঙ্গী করে পূজো দিয়ে এলেন। তারাশঙ্করদের বাড়ীর গরুর গাড়ীটি ঠিক করাই ছিল। তাতে আরোহী হয়ে নজরুল ও নলিনীকান্ত ৮/১০ মাইল দূরে এক পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত হিন্দুরাজার দীঘিতে স্নান এবং কালী মন্দিরে ও শিবমন্দিরে পূজো দিতে গেলেন। স্থানটির নাম সম্ভবত রাজজীবনপুর। বহুদিনের ব্যবধানে স্থানের নামটি ভুলে গিয়েছি। কথিত আছে ওই দীঘিতে স্নান করে এবং কালী মন্দির ও শিব মন্দিরে পূজো দিলে অনেক

দুরারোগ্য ও কঠিন ব্যাধিও সেরে যায়। পূজোর পরে মন্দিরের কাছে পুরোনো কালের দীঘির শেওলা ও উদ্ভিদ এনে পক্ষাঘাতগ্রস্থ জায়গায় লাগালে রোগ সেরে যায়। নজরুল ও নলিনীদা অনেক রাতে ফিরে এলেন। দুজনেই অভুক্ত ও পথশ্রমে কাতর। লাভপুরে অনুষ্ঠান ছিল বলে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ এদের সঙ্গে যেতে পারেননি। অনেক রাতে সকলে খেতে বসলেন। বিভূতিভূষণ ও নজরুল তারাশঙ্করদের উঠানে খাটিয়াতে ঘুমোতে গেলেন তারাশঙ্কর ও তারাশঙ্করের মায়ের শত নিষেধ সত্ত্বেও। নজরুল নিচু কণ্ঠে অনেক রাত পর্যন্ত গানও গেয়েছিলেন। একথা বিভূতিভূষণ প্রায়ই বলতেন।

বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও এই গল্প অনেক বার শুনেছি। নলিনীকান্ত কলকাতায় এলেও শুনেছি তাঁর মুখেও।

আগেই বলেছি বাবার প্রিয় সঙ্গীতকার ও সুরকার ছিলেন নজরুল ইসলাম। ছেলেবেলা থেকে তাঁর (নজরুলের) লেখা গান রেকর্ডে বহুবার শুনেছি। হরিমতি, আঙ্গুরবালা ও ইন্দুবালা, অনুপকুমারের বাবা ধীরেন দাস তাঁর গান রেকর্ডে গেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গেযেছেন জগন্ময় মিত্র ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমল। তখন রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। অথবা কিছুদিন পরেই আরম্ভ হবে। সে সময়ে শুনলাম 'বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলন'-এ নজরুল ইসলাম আসছেন। বনগাঁর এস. ডি. ও. মীজানুর রহমান প্রধান উদ্যোক্তা। বিভূতিভূষণও ছিলেন বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি।

নজরুল আসছেন শুনেই মনটা আনন্দে পুনরায নেচে উঠলো বলা যায। মাত্র কিছুদিন আগে ১৯৪০ খ্রীঃ ৩ ডিসেম্বর আমার মেজদির সঙ্গে বিভূতিভূষণের বিযে হযেছে। সেই সাহিত্য সম্মেলন যাতে সাফল্য মণ্ডিত হয় তার জন্যে বিভূতিভূষণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এখন যেখানে বনগ্রাম মহকুমা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— রাতারাতি সেখানে 'মীজান পার্ক' গড়ে উঠলো। রাস্তা ঘাটের সংস্কার করালেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মহকুমার শাসক মীজানুর রহমান। তখনও যুদ্ধ চলছে। দেশের অবস্থাও এমন কিছু ভালোও নয়। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণ চাঞ্চল্য ও উন্মাদনা হঠাৎ দেখা দিল, বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদাযের আবালবৃদ্ধ বনিতার মধ্যে। গ্রীষ্মকালেই এই বনগ্রাম সাহিত্যে সম্মেলন হয়েছিল। বেশ গরম পড়েছিল সেদিন। সারা মহকুমার জনসাধারণ ভেঙ্গে পড়েছিল এই সাহিত্য সম্মেলনে। এর ৮০ ভাগ জনসংখ্যাই ছিল মুসলিম। মুসলিমদের মধ্যে এমন প্রাণের আবেগ ও প্রাণের উচ্ছ্বাস পূর্বে কখনো দেখিনি। মাত্র কিছুদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব এসেছিলেন বনগাঁয়। তখন এত চাঞ্চল্য ও আবেগ দেখিনি। দলে দলে হিন্দু-মুসলমান আসতে থাকলেন সভার নবনির্মিত স্থলে। নজরুলকে ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে সভাস্থলে নিযে আসা হোলো। মীজানুর রহমান লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। বিভূতিভূষণও লিখিত ও মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন। এখনো যদি কেউ খোঁজ করেন, স্থানীয় 'পল্লীবার্তা' কাগজ-এর প্রতিবেদন পেতে পারেন। সভায় অনেকগুলি নজরুল গীতি পরিবেশিত হল। স্থানীয় গায়ক-গায়িকারা গাইলেন। নজরুল আগাগোড়া চুপ করেই ছিলেন। শুধুমাত্র বিভূতিভূষণের সঙ্গেই ২/৪টা কথা হচ্ছিল দেখতে পাচ্ছিলাম। আমরা ছিলাম স্বেচ্ছাসেবকের দল। দরকারে অ-দরকারে মঞ্চে উঠছিলাম। ঈশাক মাস্টার মশাই মঞ্চে উপস্থিত সকলকে ডাবের জল পান করার জন্য ডাব দিয়ে আসতে বললেন। আমরা গিয়ে ডাব নিয়ে গিয়ে কবিকে মঞ্চে ডাব দিয়ে এলাম। ডাবের জল পান করে তারপর নজরুল বক্তৃতা দিতে উঠলেন। সেকি কম্বুকণ্ঠে স্বাদেশিকতার নিঙড়ানো বাণী। নজরুল তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন: 'আপনারা কেউ হিন্দু বা মুসলমান নন। আপনারা বাঙালী। হিন্দু ও মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করে আপনাদের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে বিদেশী রাজশক্তি। এক হাজার বছর ধরে আমরা এক সঙ্গে মিলে মিশে থেকেছি। আজ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ও সন্দেহ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মানছি অত্যাচারী হিন্দু অনেক জমিদার আছেন। মুসলমান

জমিদারও কম অত্যাচারী নয়। আপনারা নিজেরা এক হোন। আপনারা ঈশ্বরের সন্তান। একই অন্ন ও জলে পুষ্ট হচ্ছেন। একই নদীতে বা দীঘিতে স্নান করছেন। অত্যাচারী বা লুণ্ঠনকারীরা হিন্দু-মুসলমান দেখে লুঠ করে না। আমি দৈনিক 'নবযুগ'-এ এসব কথা লিখে যাচ্ছি। আপনারা পড়বেন। আমি আমার সামনে আজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। আজকের সমাবেশটা আমার কাছে মধুরতম মনে হচ্ছে। মধুরতম্, মধুরতম্ মধুরতম্।" এই বলে তিনি 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' কবিতাটি মুখে মুখে বলে গেলেন। কবিতার সব লাইন বোধহয মন পডছিল না। সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। গ্রীষ্মের শেষবেলায সূর্যাস্তের আগে সূর্যের শেষ রক্তিম তাঁব মুখে এসে পড়েছে। সেই করুণ ছবিটি এখনো মনের মধ্যে আঁকা আছে।

সভা ভঙ্গ হবার পরে কাছেই S. D. O.-এব বাংলোতে সামান্য জলযোগের পরে তিনি মোটরে যশোর রোড দিয়ে কলকাতায় রওনা হলেন। সঙ্গে গেলেন অন্যান্যরা। আমবা কবিকে প্রণাম করলাম। পিঠে হাত দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করলেন : "মানুষ হও-, দেশকে ভালোবাসতে শেখো।"

আমার চিরদিনের সুর 'নজরুল'

মা ন বে ন্দ্র   মু খো পা ধ্যা য়

সঙ্গীতকে আমি ভালবেসেছি। প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবেসেছি।

এক সঙ্গীতময় পরিবেশে আমার জন্ম। ফলে শৈশব থেকেই সঙ্গীতের সাথে এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই। পাখির কাকলীতে, নদীর কলতানে, বাতাসের মর্মরধ্বনিতে, ফুলের গন্ধে আমি অনুভব করেছি সুরের পরশ। শব্দ গন্ধ ও বর্ণে বৈচিত্র্যময় পৃথিবী আমার সামনে তুলে ধরেছে সুরের ডালি। সুরের জাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন হ'ল আমার হৃদয়, আমার জীবন। একদিন বুঝলাম সঙ্গীত আর জীবন এক হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গীত যে একদিন আমার জীবিকা হয়ে দাঁড়াবে একথা ভাবি নি কোন দিন। ভাবতে পারি নি সেদিনও যেদিন সিটি কলেজে পড়ার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদ থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত পর্যন্ত প্রতিটি বিভাগেই প্রথম হলাম। যাহোক, একদিন স্পষ্টতই উপলব্ধি করলাম ইচ্ছায় হোক আব অনিচ্ছায় হোক জীবনের প্রয়োজনে সঙ্গীত আমার জীবনের উৎস হ'যে উঠেছে। তারপর বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হল। আধুনিক গান গেয়ে যশ পেলাম, অর্থ পেলাম, পেলাম প্রতিষ্ঠা। ফাংশনে গাইতে বসে দর্শকদের অজস্র করতালিতে অভিনন্দন কুড়োলাম। একদিন যৌবনে ভাটা পড়ল। অবশেষে বুঝলাম "চাঁদ ফুল ভালবাসা" চেয়েছি পেয়েছি। শব্দ বহুল আধুনিক গান শ্রোতারা আর আমার মুখ থেকে শুনতে রাজী নন। বুঝলাম আমার জীবননাট্যের আধুনিক পর্ব শেষ। অথচ কি আশ্চর্য সেদিনও দেখেছি আজও দেখছি আমার চেয়েও বেশি বয়সে এমনকি মস্ত টাক মাথা নিয়েও কেউ কেউ বহাল তবিযতে আধুনিক প্রেমের গান গেয়ে দর্শকদের কাত করে দিচ্ছেন। এটাও ষ্টারের ব্যাপার। হয়ত বা আরও কিছু দিন আমিও চালিয়ে যেতে পারতাম আধুনিক গান। কিন্তু মন সায় দিল না। আমি মুক্তির পথ খুঁজলাম। মুক্তি পেলাম নজরুল-গীতিতে এসে। আজ আবার আমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছি নজরুল-গীতিতে। অনেকে বলেন আমি নজরুল-গীতিকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছি। কিন্তু আমি মনে করি নজরুল-গীতিই আমাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। আমাকে বাঁচিয়েছে, আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নজরুল ইসলাম— বিপ্লবী নজরুল, কবি-শিল্পী নজরুল। আজ তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে শৈশবের কথা। আমার কাকা শ্রী রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সাথে নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিল। এই সূত্রে তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন এবং গানের আসরে যোগ দিতেন। কাকার সাথে বসে তার ছেলে দিলীপ আমি এবং আরও অনেকে রূপানুরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কীর্তন গাইতাম। নজরুলের গানও প্রায়ই গাইতাম আমরা। আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে 'অঞ্জলি লহ মোর' গানখানি আমাদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। নজরুল ছিলেন গানের মস্ত সমঝদার। গান শুনে ভাল লাগলেই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে চীৎকার করে উঠতেন। আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। তাঁর সেই আনন্দ

উচ্ছ্বাস ছিল বর্ষার বাঁধ-ভাঙা নদীর মত। কোন জড়তা, কোন সঙ্কোচই মানতেন না তিনি। প্রচণ্ড আনন্দোল্লাসে সবাইকে মাতিয়ে তুলতেন। পরবর্তী জীবনে বহু গানের আসরে বহুভাবে সম্বর্ধনা পেয়েছি। কিন্তু নজরুলের কাছে যেমনটি পেয়েছি তা আর পাই নি কোথাও। তিনি ছিলেন এক আত্মভোলা সঙ্গীত প্রেমিক, দুরন্ত দুর্মদ এক রসিক পুরুষ। তাঁর আর একটা খেয়াল ছিল। এক এক জনের জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত এক একটা নামকরণ করতেন। রত্নেশ্বর কাকার ছেলে দিলীপকে ডাকতেন 'কাই বিচি' বলে। আমার তখন বয়স বছর দশেক। আমি এর ওর কোলে বসতে ভালবাসতাম। আমাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'খিয়ে কড়ি'। এমনিভাবে অনেককেই অনেক নামে ডাকতেন তিনি।

নজরুল ইসলাম একাধারে গায়ক, সঙ্গীত রচয়িতা এবং সুর সংযোজনকারী। এই তিন গুণের সমন্বয়ে ১৯৩০-এর দশকে এ-দেশকে তিনি দিয়ে গেছেন অভূতপূর্ব অবদান। সুরের সৃষ্টিতে এক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তিনি। সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা নেই। নজরুল রচিত গানের সংখ্যা তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে। শাক্ত এবং বৈষ্ণব এই দুইভাবের সমন্বয় ঘটেছে নজরুলের মধ্যে। তাঁর রচিত গানগুলোকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়। আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতি— এঁরা তাঁর রসাশ্রয়ী গানগুলি গেয়ে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। রাগাশ্রয়ী খেয়াল সঙ্গীত গেয়েছেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ অনেকেই গেয়েছেন তাঁর শ্যামাসঙ্গীত এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আধুনিক গান গেয়েছেন কমলা দাশগুপ্ত, জগন্ময় মিত্র আরও অনেকে। এছাড়া আছে দেশাত্মবোধক বিপ্লবাত্মক সঙ্গীত। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে নজরুলের গানের জনপ্রিয়তা খুবই বেড়ে যায়। ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানি বরাবরই নজরুলকে বর্জন করে এসেছে। তাঁর দেশাত্মবোধ ও বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য, কিন্তু নজরুলের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা দেখে বেনিয়া কোম্পানিকে এবার মাথা নোয়াতে হ'ল তাঁর কাছে। নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা নজরুলকে নিলেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে ট্রেনার ও হেড কম্পোজার হিসাবে। স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র নজরুল-সংগীতের ভক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে নজরুলের গানগুলি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে। রত্নেশ্বর কাকা, হর্ষ বাবু, অম্বিকাবাবু এঁরা নজরুলের দেশাত্মবোধক গানগুলি গেয়ে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। কোন সভার পূর্বে এঁরা 'দুর্গম গিরি---' গানটি গাইলে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নজরুলকে আরও বেশি করে জানার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫০ সালে এইচ, এম, ভির অধিকর্তা শ্রী পি, কে, সেন সতীনাথ মুখোপাধ্যাযকে দিয়ে নজরুলের গানের রেকর্ড করান। তখনও নজরুল-গীতি প্রবর্তিত হয় নি। বলা হ'ত কথা ও সুর — নজরুল। অতঃপর পি, কে, সেনের জায়গায় এলেন শ্রী সন্তোষ সেনগুপ্ত। তিনি এসেই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে লং প্লেয়িং রেকর্ডে বার করলেন, 'নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গান'। তাতে অনেকের সাথে আমিও ছিলাম। নজরুল গীতি কেমন যেন ভীষণভাবে আমাকে নাড়া দিল। ঠিক তখনই আমি ভাবছিলাম আধুনিক গানের জগৎ থেকে বিদায় নেব কিনা। ভেবে ঠিক করলাম— না, আর দোটানায নয়। তাই আধুনিক ছেড়ে পুরোপুরি চলে এলাম নজরুল-গীতিতে। ঠিক এ-সময় সুবল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বিমান মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সুবল মুখোপাধ্যায়ের সাথে নজরুলের যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকায় নজরুলের বহু অপ্রকাশিত গান জমে ছিল তাঁর কাছে। সেগুলো সব পেয়ে গেলাম বিমান মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। সেগুলো গেয়ে প্রচুর যশ পেলাম। আর সেই সংগে নজরুল-গীতির প্রতি শ্রোতাদের আকর্ষণও বেড়ে গেল বহুলাংশে।

নজরুলের বহু গানে সুর দিয়েছেন সুবল দাশগুপ্ত (যেমন পর পর চৈতালী সাঁঝে, পায়ে যে বিঁধেছে কাঁটা), তুলসী লাহিড়ী (যেমন সহসা কি গোল বাধাল) জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব প্রভৃতি।

১৯৭৩ সালে নজরুল-গীতির একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড বের হয়। তাতে আমি একাই গেয়েছি। কবির অল্প বয়সের লেখা একটা কাঁচা কবিতা আছে তাতে। "আলগা করগো খোঁপার বাঁধন'। গানটির সুর আমি নিজেই দিয়েছিলাম। কারণ কেমন যেন লোভ সামলাতে পারি নি। নজরুল-গীতি হিসেবে

গানটি এখন যথেষ্ট সমাদৃত। তাই আজ সে কথাটা খুলেই বললাম।

সঙ্গীত জগতে আজ নজরুল-গীতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। যতই দিন যাচ্ছে তার জনপ্রিয়তা আরও বাড়ছে। বিভিন্ন আসরে নজরুল-গীতি গাইতে বসে তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি! এই তো সেদিন এপ্রিলের গরম দুপুরে নৈহাটি সিনেমাহলে নজরুল-গীতি গাইবার পর বয়স্ক বয়স্কাদের, এমনকি তরুণদের কাছ থেকে প্রচণ্ড সম্বর্ধনা পেয়েছি। শ্যামল মিত্রের মা পর্যন্ত আমায় আশীর্বাদ করলেন। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে নজরুল দিবসে শ্রদ্ধেয়া আঙ্গুরবালা ও ইন্দুবালা আমায় বারবার আশীর্বাদ করেছেন।

একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। কিছুদিন আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তিনি নজরুলের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়ি গেলেন। সে উপলক্ষে একটি ছোট্ট ঘরোযা অনুষ্ঠানে নজরুলের বাড়িতে তাঁরই সামনে বসে আমি পরপর অনেকগুলো গান গাইলাম। নজরুল স্তব্ধ, স্থবির। তবু বারবার তাঁকে দেখেছি রাধাকান্ত নন্দীর তবলা সঙ্গতের সাথে সাথে তিনিও তাল দিচ্ছিলেন। গান তাঁর ভাল লাগছিল। তাই একটা গান শেষ হতেই হযত খাতা নয়ত এ্যাসট্রে কিছু একটা আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। জানি না— ঠিক বুঝতে পারি নি কবির মনে তখন কি ভাবের উদ্রেক হচ্ছিল।

সকলের কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ চাই আমরা যেন নজরুলকে তাঁর গানের মধ্য দিযে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। উচ্চাঙ্গ সংগীতে যাঁদের দখল আছে এ ব্যাপারে তাঁদেব এগিযে আসার প্রযোজন। এত অন্যায়, অনাচার, শোষণ আর অনাদর্শের বিরুদ্ধে কবি স্বয়ং ছিলেন মূর্ত প্রতিবাদ। তাই মনে হত নজরুল সেদিন সঙ্গীতের স্তব্ধতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্তব্ধতার সঙ্গীত।

আমার দেখা নজরুল

মজহারুল ইসলাম

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অনুরোধে ভারত সরকার কবিকে ঢাকায় পাঠান। সঙ্গে কবি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও যান। কথা ছিল কয়েকমাস পরেই কবি আবার কলকাতায় ফিরে আসবেন।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ ঢাকায় তাঁর মেয়ের কাছে যান। কথা ছিল কাকাবাবুর সঙ্গে আমিও ঢাকায় যাব। কিন্তু হঠাৎ আমি কাজে আটকে যাওয়ায় কাকাবাবুর সঙ্গে ঢাকা পৌঁছতে পারিনি। দমদম বিমান বন্দরে কাকাবাবুকে বিদায় জানাই। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বন্ধুবর জিয়াদ আলিকে নিয়ে সড়ক পথে ঢাকা পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে উঠি গুলশান আবাসিক এলাকায় বন্ধুবর নবী সাহেবের বাড়িতে। কাদির সাহেবের বাড়িও গুলশান আবাসিক এলাকায়, নবী সাহেবের বাড়ির খুব নিকটে। পরদিন আমি কাকাবাবুর সঙ্গে কাদির সাহেবের বাড়িতে দেখা করতে চাই। কাকাবাবু আমাকে দেখে খুব খুশী হন। নানান কথার ফাঁকে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, 'নজরুলকে দেখতে গিয়েছিলেন ? নজরুল ধানমণ্ডির একটি বাড়িতে আছে।" আমি বলি, "আপনার এখান থেকেই আমি নজরুলের বাড়িতে যাব।" তার কিছুক্ষণ পরেই আমি নজরুলকে দেখার উদ্দেশ্যে ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার দিকে যাত্রা করি। দেখি বাড়িটি সুন্দর। একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়িটির সামনে ছোট্ট লন। লন পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাই। সামনের ঘরটিতে নজরুলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার নজরলের পরিচর্যার জন্য একাধিক সেবিকা নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা পর্যায়ক্রমে দিবারাত্র নজরুলের পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত আছেন। কবি ও কবি পরিবারের জন্য রান্না করার লোক সরকারী খরচে রাখা হয়েছে। এমনকি নজরুলকে নিয়ে প্রত্যহ বেড়াবার জন্য একটি বিদেশী গাড়ি সরকারী খরচে কবিকে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় বাংলাদেশ সরকার কবির স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব ব্যবস্থাই করেছেন। কবির ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকতেন কবির বহুদিনের সঙ্গী প্রখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্ত ও তার সহধর্মিনী প্রখ্যাত গায়িকা ফিরোজা বেগম। কবির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি কমলদা ও ফিরোজা বেগমের সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি ফিরোজা বেগম প্রায়ই কবিকে গান শুনিয়ে আসেন। আমি ফিরোজা বেগমকে বলি পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসাবে আপনি আজও আপনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন জেনে খুবই ভাল লাগছে। তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শয়ে শয়ে লোক প্রতিদিন কবিকে দেখতে আসেন। সেই কারণে সরকার থেকে কবিকে দেখার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজেও একদিন সে দৃশ্য অবলোকন করি। কবিকে বাংলাদেশ সরকার যে মর্যাদায় রেখেছিলেন তা দেখে আমাদের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথা ভারত সরকারের কবির প্রতি ঔদাসীন্যের কথা ভেবে লজ্জা পেয়েছিলাম। যে কয়দিন ঢাকায় ছিলাম প্রায় প্রত্যহ কবিকে দেখতে যেতাম। একদিন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী মজাহার হোসেনের অনুরোধে তাঁদের বাড়িতে রাতের আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি মুর্গীর বিরিয়ানি সহ আরও অনেক কিছু রান্না হয়েছে। আমি মঙ্গু ভাইকে প্রশ্ন করি, "কি ব্যাপার ? এত রান্না-বান্না কেন ?" মঙ্গু ভাই জানায় সরকার থেকে সব কিছুই দেওয়া হয়। আমাদের কিছুই কিনতে হয় না।"

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার নজরুলের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তা স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিরিশ বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকার কবির জন্য বিশেষ কিছুই করেন নি। যদিও কবি বিদেশী শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জেল খেটেছেন, অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে মসি ধরেছেন, তাঁর লেখা গান গাইতে গাইতে শত শত মানুষ কারাগারে গিয়েছেন। তাঁর কবিতা পাঠ করতে করতে স্বাধীনতার জন্য অনেকেই ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। যে কবি দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন সেই কবির রচনাবলী পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রকাশ করা যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁর রচনাবলী সুলভমূল্যে মানুষের হাতে তুলে দেওয়ায় বাধা কোথায় ? কপি রাইটের অজুহাতে সরকার ও সরকারী আমলারা নজরুল রচনাবলী প্রকাশের অনীহা দেখিয়ে এসেছেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট হওয়ার পর কাকাবাবুর চেষ্টায় ও পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাদেমির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাদপ্তর থেকে রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তার জন্য প্রথম তিন খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়। পরে জানা যায় সেই পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছে। কিভাবে সেই পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেল ? কে বা কারা সুকৌশলে শিক্ষাদপ্তর থেকে পাণ্ডুলিপি সরিয়ে ফেলল তা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন পর্যন্ত সরকার বা সরকারীদপ্তর অনুভব করেননি। এ থেকেই বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নজরুলের বক্তব্যকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরে একশ্রেণীর মানুষ চালিয়ে যাচ্ছে। কবির জন্মদিনে তথাকথিত জনপ্রিয় কাগজগুলি এবং সেই সঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহী ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধার ভাণ যাঁরা করেন তাদের কাগজেও তাঁরা কবির একটা ছবি পর্যন্ত ছাপেন না। তথাকথিত জনপ্রিয় কাগজগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু আমার বলার নেই। কারণ তাঁরা হয়তো তাঁদের স্বার্থেই নজরুলকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র অতীতেও করেছেন আজও করবেন তাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু প্রগতিপন্থী চিন্তাধারার কাগজগুলির কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন : কবির জন্মদিনে প্রতিবছর কবির একটি ছবি, কবি সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ করাও কি কপিরাইটের আওতায় পড়ে ?

ঢাকা থেকে ফেরার আগে কমলদা ও ফিরোজা বেগমের আতিথেয়তা গ্রহণ করে একরাত্রি তাঁদের বাড়িতে ছিলাম। কমলদা বলেন, "ইসলাম, তুমি থাকতে আমরা কি কলকাতায় একটা অনুষ্ঠান করতে পারব না ?" আমি কমলদাকে বলি, "কমলদা, পেশাদারী কোন অনুষ্ঠান করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাদেমির অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমাদের কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে অভিজ্ঞতা তো আপনারও আছে। বিত্তশালী বেশিরভাগ মানুষেরা নজরুলের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। নজরুলকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি আলোচনা হলে তাঁদের রাতের ঘুম নষ্ট হয়। তাঁরা ভাবেন মানুষের মধ্যে নজরুলের চিন্তাধারা প্রসারিত হলে তাঁদের সুখের সংসার ভেঙে যেতে পারে তাই পেশাদারী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অর্থলগ্নী করতে কে এগিয়ে আসবে। তবু আমি চেষ্টা করব আপনাদেব দিয়ে কলকাতায় একটা পেশাদারী অনুষ্ঠান করার।" আমি কলকাতায় ফিরে এসে অনেকের কাছে কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগমকে নিয়ে একটি পেশাদারী অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব করি। কিন্তু সেদিন কারও কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাইনি। কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের নৈতিক সমর্থন থাকলেও সেদিন অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি ছিলেন না। অবশেষে আমি স্থির করি অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে আমি নিজেই পেশাদারী অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করব। সেই

বাসনা নিয়ে একদিন রবীন্দ্রসদন হল বুক করার জন্য উপস্থিত হই। গিয়ে দেখি রবীন্দ্রসদনের দায়িত্বে কবি মণীন্দ্র রায়ের প্রাক্তন স্ত্রী শ্রীমতী তপতী রায় আছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে রবীন্দ্রসদনে একটি পেশাদারি নজরুল গীতি অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব রাখি। তপতীদির সঙ্গে আমার আগে থেকেই অল্প অল্প আলাপ ছিল। তিনি বলেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে হল ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনি যদি কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ে হল ভাড়া নেন, ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।"

বাধ্য হয়ে সেদিন পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাদেমির নামেই আমাকে হল ভাড়া নিতে হয়েছিল। যদিও তখন একাদেমির কোন কর্মতৎপরতা ছিল না। তয়ে ভযে সমস্ত আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে সেদিন ফিরোজা বেগমের একক নজরুল গীতির অনুষ্ঠান করার আযোজন চালাতে থাকি। এ ব্যাপারে কল্পতরু সেনগুপ্ত, প্রদীপ ঘোষ, দিলীপ চক্রবর্তী, দুর্গাদাস সরকার, যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক বহ্নি রায়, বসুমতী পত্রিকার সাংবাদিক রমেন্দু মুৎসুদ্দী ও আমার ব্যক্তিগত কিছু বন্ধু বান্ধব নৈতিক সমর্থন জানান ও সহযোগিতা করেন। টিকিটের দাম বেশি করবার সাহস আমার হয়নি। তারপর কলকাতায বিভিন্ন কাগজের সঙ্গে যুক্ত সঙ্গীত সমালোচকদের নিয়ে এসে গান শোনানোর জন্য সৌজন্যমূলক প্রবেশপত্র অনেকেই দিতে হয। ফলে হলেব মোট টিকিট বিক্রয়মূল্য গিযে দাঁড়ায খুবই অল্প। ২৫শে অক্টোবর ১৯৭২ সালে সেই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির একটি অভিজ্ঞতার কথা আমার আজও মনে আছে। হলের টিকিট কাউন্টারে আমি এক সন্ধ্যায় বসে আছি। ময়লা জরাজীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "দু টাকার টিকিট আছে?" আমি বললাম, "শেষ হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক তখন হতাশ হয়ে বললেন, 'অনুষ্ঠানটি আমার আর শোনা হবে না। আমি নজরুলগীতি খুব ভালবাসি। আর কারোর গান আমার ভাল লাগে না। কিন্তু দু টাকার বেশি টিকিট কাটার ক্ষমতা নেই। আর দু এক টাকা যা আছে তা দিয়ে আমায় বাড়ি ফিরতে হবে। আমি এসেছি বেলঘরিয়া থেকে। আমাদের মত সাধারণ মানুষ যাদের নিয়ে কবি লিখেছেন, গান রচনা করেছেন তারা কি কবির লেখা পড়তে পারবে না? গান শুনতে পারবে না?" আমি তাঁকে বললাম, 'সরকার উদ্যোগ না নিলে সেটা করা সম্ভব নয়।" আমি তাঁকে ৫ টাকার একটি টিকিট দিলাম, বাকি ৩ টাকা দেব কোথা থেকে। আমি তাঁকে বললাম, 'বাকি ৩ টাকা আপনাকে দিতে হবে না। তাঁর আত্মসম্মান লাগল, বললেন, আমি টাকা না দিয়ে টিকিট নেব কেন?" আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, আপনি আমার দাদার মত। আমি নিজেই উদ্যোক্তা। আপনাকে ছোট ভাই হিসেবে আমি একটা টিকিট দিচ্ছি। ৫ টাকার টিকিটের সঙ্গে তাঁর দেওয়া ২ টাকা ফেরৎ দিলাম। বয়স্ক ভদ্রলোক খুশি হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করে টিকিট নিয়ে চলে গেলেন।

অনুষ্ঠানের নির্দ্ধারিত দিনের দুদিন আগে কমলদা ফিরোজা বেগমকে নিয়ে কলকাতা পৌঁছালেন। আমি প্রদীপ ঘোষকে নিয়ে ব্রডওয়ে হোটেলে বসে কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগমের সঙ্গে অনুষ্ঠানের সমস্ত পরিকল্পনা ছকে ফেললাম। অনুষ্ঠানের দুদিন আগেই সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে মানসিক চাপ অনেকটা কমে গিয়েছিল। তবুও অনুষ্ঠান কেমন হবে, মানুষ কি ভাবে নেবে, সে ব্যাপারে প্রচণ্ড সংশয় ছিল। আমি প্রদীপবাবুকে অনুরোধ করলাম অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আপনার সুললিত কণ্ঠে গানের মাঝে মাঝে গানের বিষয়বস্তু বর্ণনা করে গ্রন্থনা করতে হবে। প্রদীপবাবু রাজী হয়ে গেলেন। নিপুণ হাতে গ্রন্থনার বিষয়বস্তু তৈরি করলেন। আমি অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য কমলদাকে অনুরোধ করলাম, "উদ্বোধনী সঙ্গীত আপনি ও ফিরোজা বেগম একত্রে গাইবেন।" কমলদা বললেন. "ইসলাম, সেটা কি সম্ভব?" দীর্ঘদিন অনভ্যাসের ফলে আমার গলা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার পক্ষে কোন মতেই গাওয়া সম্ভব নয়।" আমি বললাম, "অনুষ্ঠানে ফিরোজা বেগমের সঙ্গে অতীতের এক দিকপাল শিল্পী সুরকার কমল দাশগুপ্তকেও জনগণের সামনে হাজির করতে চাই। আমি গানও ঠিক করে রেখেছি।" কমলদা প্রশ্ন করলেন, "কোন গান? আমি

বললাম, নজরুল সারাজীবন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, আপনারাও আপনাদের জীবনে যে আদর্শ বহন করে চলেছেন সেই আদর্শের গান — "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।" প্রদীপবাবু আমার এই প্রস্তাবকে জোরালো ভাষায় সমর্থন জানালেন। কমলদা শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমার একটি ছোট লেখা ও কল্পতরুবাবুর 'কমল দাশগুপ্ত' নামে একটি লেখা দিয়ে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। আমার লেখাটি ছিল এইরূপ :

আমাদের আশা

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও বহু দেশপ্রেমিকের আত্মদানে নতুন বাঙলাদেশের আবির্ভাব হয়েছে। এই আবির্ভাবে ভারত বাংলাদেশের মৈত্রীর দ্বার খুলে গেছে। এই মৈত্রীকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দুই দেশের জনগণের মধ্যে যত আদান প্রদান বাড়বে, দুই দেশের মধ্যে যত বেশি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে মৈত্রীর সম্পর্ক তত দৃঢ় হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে শারৎ উৎসবকালে আজকের এই নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠান। ওপার বাংলার শিল্পীর জন্য সীমান্ত মুক্ত থাকুক এপার বাঙ্‌লার শিল্পীর জন্য ওপার বাঙ্‌লা অবাধ হোক। দুই বাঙ্‌লার শিল্পীদের সাংস্কৃতিক বিনিময়ে বঙ্গ সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটুক, জনগণের সংস্কৃতি গডে উঠুক। আজকের অনুষ্ঠানে এই আমাদের আশা। রবীন্দ্রসদন, ২৫শে অক্টোবর ১৯৭২

মজহারুল ইসলাম

মঞ্চের পিছনে এক বৃন্তের দুটি কুসুম সজ্জিত আলোকসজ্জায় মঞ্চটিকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে কাকাবাবু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আমার আজও মনে আছে মঞ্চের পর্দা ওঠার আগে আমার লেখাটি প্রদীপ ঘোষ দরদ দিয়ে পাঠ করেছিলেন। লেখা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পর্দা উঠে যায়। প্রেক্ষাগৃহ তখন কানায় কানায় ভরে গেছে। অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। কমলদা ও ফিরোজা বেগম অনুষ্ঠান শুরু করলেন — "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" গান দিয়ে। আলোকচিত্রীরা সেই মুহূর্তটিকে তাঁদের ক্যামেরায় ধরে রাখলেন। তারপর একের পর এক গান গেযে চললেন ফিরোজা বেগম। প্রদীপ ঘোষ তাঁর লেখার বাঁধুনী দিয়ে বিভিন্ন গানের বিষযবস্তু গ্রন্থনার মাধ্যমে শ্রোতাদের সামনে দরদ দিয়ে পরিবেশন করলেন। তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল, "আমার যাবার সময় হল দাও বিদায় / মোছ আঁখি, দুয়ার খোল দাও বিদায়" গানের মাধ্যমে। পরদিন থেকে কাগজে অনুষ্ঠান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক এন. কে. জি. আনন্দবাজার পত্রিকার সন্তোষকুমার ঘোষ শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠান শুনেছিলেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কে কলকাতার বহুল প্রচারিত একটি পত্রিকায় সেদিন লেখা হয়েছিল, ফিরোজা বেগমের একক নজরুল গীতির এই অনুষ্ঠান শ্রোতারা দীর্ঘদিন মনে রাখবে। কাগজে ফিরোজা বেগমের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রকাশিত মন্তব্যের কাটিং ও অনুষ্ঠানের ছবি দিয়ে সাজিয়ে একখানা এলবাম আমি ফিরোজা বেগমকে উপহার দিয়েছিলাম। পরে কলামন্দিরে ফিরোজা বেগমকে দিয়ে আরও একখানি পেশাদারী নজরুল গীতির অনুষ্ঠান করিয়েছিলাম। এইভাবে নজরুলের গানকে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির সময় থেকে আজও সুযোগ পেলে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে ফিরোজা বেগমের নজরুল গীতির অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ব্যবস্থা করেছি। চুরুলিয়া নজরুল একাদেমির জন্য ফিরোজা বেগমকে দিয়ে আসানসোল, বার্নপুর ও চুরুলিয়ায় চ্যারিটি'শো করিয়েছি।

শরীর তথা বয়সের দরুণ ও অন্যান্য কারণে আগের মত উদ্যোগ নিতে আমি আর পারি না। তবু আজও যদি কেউ নজরুল প্রসঙ্গে কোন অনুষ্ঠান করতে চান আমি ব্যক্তিগতভাবে যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করি। বছর সাতেক আগে ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে নতুন করে নজরুলচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের আবেদনে আমি সাড়া দিয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে সমিতির সহ-সভাপতি করে ধন্য করেছিলেন। নজরুল চর্চা কেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠান সল্টলেকের বি.ডি. হলে নজরুল গবেষক ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত ও ধীরেন বসু সহ অন্যান্য শিল্পীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর নজরুলের গানের প্রকৃত সুর শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।

চুরুলিয়া নজরুল একাদেমির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আমি তাঁদের সঙ্গেও সাধ্যমত সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। চুরুলিয়া নজরুল একাদেমির আমি আজীবন সদস্য। একাদেমির সদস্যরা বহু পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে কাজী মহাজার হোসেনের (মঙ্গুভাই) অবদান অনস্বীকার্য।

চুরুলিয়া নজরুল একাদেমি শান্তিনিকেতনের মত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে নজরুল চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হোক এটাই আমার প্রত্যাশা। চুরুলিয়া নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় পরিকল্পনার শুরু থেকে কলেজ তৈরি পর্যন্ত মঙ্গুভাই ও অন্যান্যদের সঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি কৃতজ্ঞবোধ করছি। কেবলমাত্র বছরে একদিন নজরুলের জন্মদিন পালন করলেই চলবে না। সারাবছর ধরে নজরুল চর্চার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আযোজন করতে হবে। নজরুলের গানের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য নজরুল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের নিযে নজরুল গীতিব বোর্ড তৈরি করতে হবে। তাঁদের দিযে স্বরলিপি করিযে সরকারকে তা প্রকাশের ব্যবস্থা কবতে হবে। সবশেষে কপিরাইট সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে বিশেষ আইনের মাধ্যমে নজরুলের রচনাবলী সুলভমূল্যে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আশার বিষয়, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় এ ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। রবীন্দ্রসরোবরের কাছে নজরুলের নামে একটি মঞ্চের নামকরণ ও নজরুল পুরস্কার প্রবর্তিত হযেছে। যেভাবে সরকার বিশ্বভারতীকে রয়্যালটি দিযে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করেছেন, নজরুলের গান ও লেখা প্রকাশে কপিরাইটের মালিকদের প্রাপ্য রয়্যালটি দিযে তেমনি রচনাবলী প্রকাশ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওযার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অনুরোধে ভারত সরকার কবিকে বাংলাদেশ পাঠান। কথা ছিল কয়েক মাস থাকার পর কবি আবার ভাবতে ফিরে আসবেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী অফিসারদের হাতে নিহত হন মুজিবর রহমান সহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্য। মুজিব দুহিতা শেখ হাসিনা বর্তমানে যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেই সময় বাংলাদেশে না থাকায তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান। নানা পট পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নাযক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তিনি প্রেসিডেন্ট থাকার সময কবি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবির চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়। তাঁকে ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয। কিন্তু সব চিকিৎসার অবসান ঘটিয়ে মূক কবি চিরতরে ২৯শে আগস্ট, ১৯৭৬ বিদায নেন।

নজরুল, নার্গিস, আজিজুল হক

ডি এফ আহ্‌মদ

এই নিবন্ধের শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল নার্গিস ও আজিজুল হাকিম। কেননা ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার হাসনাবাদ (পোস্ট অফিস বাজার হাসনাবাদ) গ্রামের কবি ব্যবসায়ী অনুবাদক আজিজুল হাকিম এবং কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার দৌলতপুর গ্রামের মরহুম মুনশী আব্দুল খালেকের একমাত্র কন্যা সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের দাম্পত্য জীবন ছিল প্রায় বাইশ বছর এবং নার্গিস ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিদেশে মৃত্যুবরণ করার আগে পর্যন্ত তিনি কবি আজিজুল হাকিমের বিধবা স্ত্রী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কতিপয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খামখেয়ালী, স্বার্থপরতা ও অপরিণামদর্শিতা এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কতিপয় লেখকের দায়িত্বহীনতায় বিষয়টি এমনভাবে গড়ে ওঠে যে, এটা নজরুল-নার্গিস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে আজিজুল হাকিম নার্গিস দম্পতির একমাত্র অধ্যাপিকা কন্যা ও একমাত্র ডাক্তার পুত্রকে বেশ কিছুদিন হাতে লগুড় নিয়ে তথাকথিত গবেষকদের হটাবার জন্য কাটাতে হয়েছে। সাঁতারু ছাড়ে তো ভাসমান কম্বল ছাড়ে না— এই রকম পরিস্থিতির জন্য আজিজুল হাকিম পরিবারকে বিনা দোষে বেয়াদব অভদ্র আখ্যা পেতে হয়েছে। কোনো সাহিত্যিক বা সাংবাদিক কোন তথাকথিত বিশেষজ্ঞ লেখকের রচনার উপর, লেখনীর উপর নির্ভর করে নার্গিসের সাক্ষাৎকার নেবার জন্য ঢাকা শহরে তাদের রোকনপুরস্থ বাসভবনে দিনের পর দিন ভীড় জমিয়েছেন।

নজরুল নার্গিসের ব্যাপারটা ছিল — দুইজনের বিয়ের তারিখ ধার্য হয়। মধ্যরাতে বিয়ে সম্পাদন হওয়ার প্রাক্কালে কন্যা পক্ষের শর্তের কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিয়ের তারিখ ধার্য হবার পূর্বে তার বয়োজ্যেষ্ঠা মামাতো বোন মেজো মামা ওয়াছির আলী খানের বিয়ের যোগ্য কন্যা হেনার সাথে নজরুলের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন হলে তা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু কোনো গবেষক বিশেষজ্ঞ সে কথা কোনদিন জোরশোরে প্রচারে প্রয়াসী নন কেন ? বিয়ে সম্পাদনের কতকগুলো পূর্বশর্ত থাকে, যেমন বিয়ের শর্ত পড়ানোর পূর্বে বর পক্ষের ও কন্যা পক্ষের তিনজন উকিল সাক্ষী থাকবে। তারা কন্যার এজেন (সম্মতি) নেবেন। বরকেও সেই সম্বন্ধ কবুল করার পর কাবিন নামা প্রস্তুত হয়। কিন্তু নজরুল-নার্গিসের বিয়েতে সেভাবে তো কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। নজরুলের পক্ষে বিয়ের মজলিসে কোনো মুসলমান বরযাত্রীই ছিলেন না। কলিকাতাস্থ নজরুলের বন্ধুবর্গের মধ্যে যারা আমন্ত্রণ লিপি পেয়েছিলেন, তাঁরা আসেন নি— আবার যাঁরা আসার মত ছিলেন যথা-ওয়াজেদ আলী, আফজালুল হক, মুজফ্ফর আহ্‌মদ তাঁরা বিয়ের তারিখের পরে পত্র পেয়েছিলেন — যা সন্দেহ করা যায় যে, সেটা ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত। নজরুল দৌলতপুরে দুই মাস ছিলেন আর বিয়ের রাতেই শর্ত আরোপের প্রয়োজন হলো এটা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করবেন না। আসলে কন্যা পক্ষ অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে হেনার প্রস্তাবের মত এটাও বাতিল করতে আগ্রহী ছিলেন

এবং তা হয়েছে। যে বিয়ে আদৌ সম্পাদিত হয়নি, সে বিয়ের ঢেকুর তুললে কি আর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ থাকে! বোখারী শরীফের কিতাবুন নিকাহ্ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে এক মহিলা হুজুর (সাঃ) এর কাছে এসে আরজ করে যে, তার আব্বা তার নাবালিকা থাকা অবস্থায় বিয়ে সম্পাদনা করে দিয়েছেন। তার অর্থে সম্মতি ছিল না। হুজুর ((সাঃ) সে বিয়ে বাতিল করে দেন। সেই দম্পতি কি আর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের ঢেকুর তুলতে পারে! আর নজরুল নার্গিস এর বিয়ে তো সম্পাদনের আগেই ভেঙ্গে গেছে। নজরুল সেই রাতেই কুমিল্লা চলে গেছেন। তবে আর তাদের স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ রইলো কোথায়?

সৈঈদা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানম জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে (১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ১৪ বছরের কিশোরী হিসেবে) নিরক্ষর না থাকলেও তিনি অশিক্ষিতা ছিলেন। তবে তার মামাতো বোন থেকে সুন্দরী ছিলেন। আসলে পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা আর্থিক দুর্গতিতে পতিত হন। আর লেখাপড়া করা তো দূরের কথা, অন্ন সংস্থানই কষ্টকর ছিল। বাধ্য হয়ে তাঁর বড় ভাই পানির জাহাজে খালাসীর চাকরি নেন। নার্গিসের বড় খালাও বিধবা ছিলেন এবং তাঁর মাতাদের সংসার দেখাশোনার নামে তিনি সেখানে পালিতা হচ্ছিলেন। সৈঈদা খাতুন আর তার মা অবহেলিত হয়ে সেই পাড়াতেই বাস করত। সৈঈদা খাতুন ওরফে নার্গিসের তিন মামা। বড় মামা— আলতাফ আলী খান প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মেজো মামা ওয়াসির আলী খান জোতদার ও সংসারী ছিলেন। ছোট মামা আলী আকবর খান বি.এ. পাস করে কলিকাতায় পুস্তকের ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে গ্রন্থ প্রণেতা, প্রকাশক ও বিক্রেতা। নজরুল নার্গিসের বহুল আলোচিত বহুল বিতর্কিত তথাকথিত বিয়ের মূল ব্যক্তি ছিলেন 'নয়কে ছয় করা' নামে আখ্যায়িত নার্গিসের ছোট মামা আলী আকবর খান। তিনিই ছিলেন এই ব্যাপারের মূল নায়ক। তাহলে একটু পিছে থেকে বলতে হয়।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আলী আকবর খান যখন ঢাকা কলেজের বি.এ. ফাইনাল বর্ষের ছাত্র, তখন তার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ নোয়াখালী নিবাসী মুজফ্ফর আহ্মদ (পরে কমরেড) নোয়াখালী জেলা স্কুল থেকে ঢাকা কেন্দ্রে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে আসেন। নোয়াখালী জেলা স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল ঢাকাতে। আর সেখানকার অন্য স্কুলের কেন্দ্র ছিল কুমিল্লায়। পরীক্ষার সময় একদিন আলী আকবর খান ও মুজফ্ফর আহ্মদের পরিচয় হয় ঢাকার রমনা পার্কে। এরপর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আলী আকবর খান বি.এ পাস করে চলে যান কলিকাতায়। আর মুজফ্ফর আহ্মদ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিস ছিল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বিপরীত দিকে, বৌবাজার কলেজ স্ট্রিট মোড় থেকে খাড়া উত্তরে যেতে ডান দিকে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিট বাড়িতে। এই অফিসে আলী আকবর খানেরও যাতায়াত ছিল। তখন তিনি ভাষা ও বেশ বদল করে ফেলেছেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজের ছাত্র থাকাকালে ইংরেজিতে কথা বলতেন এবং ইংলিশ ড্রেস পরতেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ধূতি জামা পরনে মুখে মধুর ভাষা মাতৃভাষা বলতেন আলী আকবর খান।

ক্রমে নজরুল ও আলী আকবর খানের পরিচাতি ঘটে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে সুস্থ করে তোলার উদ্দেশ্যে আফজালুল হক ও আলী আকবর খান নেতৃত্ব দেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, নজরুল বিহারের দেওঘর স্বাস্থ্য নিবাসে যাবেন। তাঁকে মাসে মাসে একশত টাকা দেয়া হবে। বিনিময়ে মোসলেম ভারতে তিনি লেখা পাঠাবেন। নজরুলকে তাই পাঠানো হয়। কিছুদিন পর নজরুল সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। আলী আকবর খান প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকের জন্য তিনি নিজেই গল্প নাটক কবিতা রচনা করতেন। কবিতা হতো না। মুজফ্ফর আহ্মদ একদিন তাকে ঠাট্টা করে বলেন, প্রতি কবিতার জন্য যদি পাঁচ টাকা দেন আমি কবিতা লিখে দেব। যাই হোক, আলী আকবর খানের কবিতার ব্যাপারে আগ্রহ দেখে নজরুল তাঁর পুস্তকের জন্য একটি কবিতা লেখেন—

"বাবুদের তাল পুকুরে হাবুদের ডাল কুকুরে
সে কি বাস্ করলো তাড়া বলি থাম একটু দাঁড়া!
পুকুরের ঐ পাশে না লিচুর এক গাছ আছে না?
হোথা না আস্তে গিয়ে য্যাবড়া কাস্তে নিয়ে
গাছে গো যেই চড়েছি ছোট এক ডাল ধরেছি
ও বাবা মড়াৎ করে পড়েছি সড়াৎ জোরে
পড়বি পড় মালীর ঘাড়ে সে ছিল গাছের আড়ে।
বেটা ভাই বড় নচ্ছার ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুসি একদম জোরসে ঠুসি।
আমিও বাগিয়ে থাপড় দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়।
লাফিয়ে ডিংনু দেয়াল, দেখি এক ভিটরে শেয়াল
আরে ধ্যেৎ শেয়াল কোথা ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা।
দেখে যাই আঁৎকে ওঠা কুকুরও জুড়লে ছোটা
আমি কই কম্ম কাবার কুকুরেই করবে সাবাড়।
বাবাগো মাগো বলে পাঁচিলের ফোকল গলে
ঢুকিগ্যে বোসেদের ঘরে যেন প্রাণ আসলো ধড়ে।
যাব ফের? কান মলি ভাই, চুরিতে আর যদি যাই।
তবে মোর নামই মিছা কুকুরে চামড়া খিচা
সে কি ভাই যায়রে ভুলা মালীর ঐ পিটনী গুলা।
কি বলিস? ফের হপ্তা? তৌবা নাক খপ্তা।"

কবিতার নাম দেয়া হলো 'লিচু চোর'। আলী আকবর খান কবিতাটি পড়ে উচ্ছ্বাসে উথলে পড়লেন। তিনি যা চেয়েছিলেন এটা ঠিক তাই। নজরুলের বন্ধুদের মধ্যে অনেকে মন্তব্য করেছিলেন যে, এই 'লিচু চোর' কবিতা দিয়েই নজরুল নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। আলী আকবর খান মনে মনে হয়তো এক পরিকল্পনাই করে ফেলেছিলেন। সৈনিক প্রাণ, উদার প্রাণ, সরল প্রাণ নজরুল তার কিছুই টের পাননি।

অপ্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পুকুরের মাছ জেলে, বঁড়শি ও পলুই ধারীর হাত থেকে পালিয়ে যায় আর নজরুল আলী আকবর খানের ফাঁদে পড়ে গেলেন। পানির মাগুর মাছ ও পাড়ের ছিপওয়ালার গল্পে রয়েছে যে, চতুর মাগুর কিছুতেই বঁড়শির কাছে আসছে না। আর ছিপওয়ালা তার ফাতনাটি ধীরে ধীরে টানলে সেটি টিপ টিপ করছে। তখন মাগুর মাছ বলছে—

"বারো বঁড়শি তের জাল পলুই এ ছিঁড়েছে ঘাড়ের ছাল
ধরা পড়ে কানকো কাটতে ছোঁ মেরে নিলে চিলে
ভাগ্য ভালো পড়লাম এসে এই বিলে।
যে বুঝে না টিপ টিপের ভাও
তার কাছে গিয়ে টিপ টিপাও।"

অর্থাৎ বারো বার বঁড়শি ছিঁড়ে পালিয়েছি। তেরোবার জাল থেকে বেরিয়ে গিয়েছি। পলুই-এর চাপে ঘাড়ের ছাল ছিঁড়ে ধরা পড়ে গেলাম। গিন্নী বঁটি নিয়ে কানকো কাটার সময় ব্যথা পেয়ে তার হাত ফুঁকলে বেরিয়ে গেলাম কিন্তু চিল আমাকে ছোঁ মেরে নিয়েও রাখতে পারলো না — আমি

বিলে এসে পড়েছি। এই টিপ টিপ করার ভেদ আমার জানা আছে।

কিন্তু নজরুল আলী আকবরের বঁড়শি থেকে ছাড়া পেলেন না। মেসের বন্ধুগণ সহ মুজফ্ফর আহ্মদ নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি আলী আকবর খানের গ্রামের বাড়ি দৌলতপুর সফর করতে শিয়ালদহ স্টেশনে হাজির হলেন। সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না, তবে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের শেষে কিংবা ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের প্রথমদিকে হবে। নজরুলের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার সুযোগ ভেস্তে গেল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নজরুল দেওঘর গেলে নবযুগ পত্রিকার চাকরি ছেড়ে যান। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নবযুগ বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রবন্ধকার বদরুদ্দিন ওমরের দাদা (আব্বার আব্বা) প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবুল কাশেম সাহেবের উদ্যোগে আবার 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। আলী আকবর খানও ধারণা করতে পারেন নি যে, নজরুল এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাবেন। তাই আগে থেকে বাড়িতে খবর দিতে পারেন নি। নজরুলকে নিয়ে তিনি কুমিল্লা শহরে তার সহপাঠি বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে উঠলেন। খবর দিলেন বাড়িতে এবং পাঁচ দিন পর রওনা দিলেন দৌলতপুর।

কলিকাতায় নজরুলের বন্ধুরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। যারা জানতেন যে তিনি দৌলতপুর কুমিল্লা যাবেন তারাও খুঁজছিলেন। কেননা তাঁর যাওয়াটা তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। যখন বুঝলেন যে তিনি সত্যিই কুমিল্লা গেছেন তাঁরা এই মর্মে আফসোস করতে লাগলেন যে, আলী আকবর খান তাঁর স্বার্থের জন্য সব কিছু করতে পারেন তাই তাঁকে বিপদে না ফেলে দেয়।

এদিকে আলী আকবর খান নজরুলকে নিয়ে দৌলতপুরে পৌঁছলে তার বাড়ির লোকজন নজরুলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আলী আকবর খান কুমিল্লায় বসে এই ব্যবস্থাটিই করেছিলেন এবং তিনি সফল হন। তাছাড়া পরিবারে তথা গ্রামে তখনকার একমাত্র গ্র্যাজুয়েট হিসেবে, পুস্তক প্রণেতা হিসেবে আলী আকবর খানের বেশ প্রভাব ছিল।

আলী আকবর তার মেজো ভাই-এর কাছে নজরুলের ভূয়সী প্রশংসা করে তার বিবাহযোগ্যা কন্যা হেনার সাথে নজরুলের বিবাহ সম্পাদনের জন্য প্রস্তাব দেন এবং তাঁর লাভবান হবার যুক্তি দেখান। তার মেজো ভাই ওয়াছেব আলী খান চালচুলোহীন অচেনা যুবকের সংগে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। এত দূর তাঁর পরিকল্পনা মতোই চলেছে। এখন ভাই-এর সিদ্ধান্তে তিনি যেন ধপাস্ করে মাটিতে পড়লেন। এখন কি করা যায়। এদিকে নজরুল এসে বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান, বাঁশি বাজানো ও আবৃত্তি নিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছেন।

আলী আকবর খান নিরুৎসাহ হলেন না। তবে আত্মীয়তার বন্ধন ছাড়া নজরুলকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। তাঁর যা উড়োমন, হুট করে না পালিয়ে যায়। আলী আকবর খানের মেজো বুবুর মরহুম মুনশী আবদুল খালেকের বিধবা স্ত্রী আসমাতুন্নেছার আবদুল জব্বার ও আবদুর রহমি নামে দুই ছেলে এবং সৈঈদা খাতুন নামে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে নিরক্ষর না হলেও প্রায় অশিক্ষিতা। আলী আকবর খান এই বোনের (বয়সে তার বড়) খুব খেয়াল করতেন না। ফলে পূর্বে বলেছি যে, সৈঈদা খাতুনের লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়েছে। এবং তার ভাই আবদুল জব্বারকে পানির জাহাজে খালাসির কাজ নিতে হয়েছে। বাড়িতে মেহমান এবং আবৃত্তি গান বাজনায় সৈঈদা বা তার মা আকর্ষিত হয়নি। তবে তাদের যাওয়া আসা শুরু হলে আলী আকবর ছোট বুবুর পায়ে সালাম করে তাকে রত্ন প্রসবিনী আখ্যায় আখ্যায়িত করেন এবং প্রকারান্তরে সৈঈদার সাথে মেহমান নজরুলের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে লোভ দেখিয়ে সঈদার মাকে রাজি করান। পাড়াগ্রামে মেয়েদের বিয়ে দিতে দেরি হলে কথা হয়। সৈঈদার মা খুশিই হন। এবং ভাইদের বাড়িতে ঘন ঘন তার যাওয়া আসা শুরু হয়। আলী আকবর খান জানেন যে, সৈঈদা অশিক্ষিতা কিন্তু নজরুলের মত বাইশ বছর বয়সের পাত্রের কাছে চৌদ্দ বছরের সৈঈদা মানান সই। কিন্তু গুণের কথা তথা যোগ্যতার কথা উঠলে তখন কি হবে? আলী

আকবর খান ভাগ্নীকে কথা বলা, কাপড় পরা ও জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হতে বললেন। কিন্তু সৈয়দা নজরুলের কাছে ভিড়তে প্রযাসী বা আগ্রহী নয়। তরুণ মনে মোহ সৃষ্টি করতে না পারলে তো গুণ দিয়ে বিচার করা যাবে না। নজরুল আবৃত্তি করেন, গান করেন, বাঁশি বাজান। নজরুল একদিন রাতে বাঁশি বাজালে আলী আকবরের চাপা চাপিতে সৈয়দা নজরুলকে প্রথম যে সংলাপ বলেছিল সেটা হলো, "আপনি রাতে বাঁশি বাজিযেছেন আমি শুনেছি।" প্রায় দু'সপ্তাহের প্রচেষ্টার ফলে এই প্রথম সংলাপ নজরুলের যে বযস সে বয়েসে সুন্দরী সৈয়দাকে পছন্দ না করে অথবা আকর্ষিত না হয়ে পারা যায় না। আলী আকবর খানের আশা এখন পূর্ণ ও শেষ চেষ্টা সফল হলেই হয়।

নজরুল তার কলিকাতার বন্ধুদের পত্র দিলেন। তিনি এক সুন্দরী গ্রাম্য বালিকার প্রেমে ডুবেছেন এবং পাণি প্রার্থী হতে যাচ্ছেন। তার কলিকাতার বন্ধুদের মধ্যে মুজফ্ফর আহ্মদ ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায তাঁকে পুনর্বিবেচনার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভোগান্তি যার কপালে আছে সে তো উপদেশ শুনবে না। দিন এগিযে যায। সৈয়দার মা তার খালাসি পুত্রের অন্নে পালিত হচ্ছেন কাজেই তাকে সংবাদটাতো দিতে হয়। গেল সংবাদ কিন্তু সৈয়দার ভাই আবদুল জব্বার এ বিয়েতে অমত প্রকাশ করলো, কারণ পাত্র অচেনা অনাত্মীয। সৈয়দার মা কাঁদা শুরু করলেন। তার ভাই তো আর তাকে পালবে না। পালবে তার ছেলে। কাজেই তার অমত ফেলে দেযা সম্ভব নয। এই কাঁদাকাটি অবজ্ঞা করে আলী আকবর এগিয়ে যেতে লাগলেন। তার বড় ভাই আলতাফ আলীও আলী আকবরের সমর্থক ছিলেন। কেননা আলী আকবর রচিত পুস্তকগুলো কলিকাতার ডি.পি. আই অফিস পাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদন না করলেও তার ভাই আলতাফ আলী স্কুলের হেড মাস্টারদের কাছে গিয়ে ক্যানভাস করলে শিক্ষকগণ এই সকল পুস্তক তাদের স্কুলের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতেন। ছাত্রছাত্রীগণ সেইসব বই কিনতে বাধ্য হত। ব্যবসা চলতো ভালো। তাতে আলতাফ আলীরও কিছু স্বার্থ ছিল। তাছাড়া আলী আকবর তার সহপাঠী বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে যেতেন। সেখানেও আলতাফ আলীর যাওয়া আসা ছিল। বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ি ছিল কুমিল্লার কান্দির পাড় মহল্লায়। তার বাবা ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কোর্ট অব ওয়ার্ড স্টেটের ইন্সপেক্টর ছিলেন। তার মা বিরজাসুন্দরী দেবীকে আলী আকবর মা ডাকতেন। বীরেনদের সংসার অসচ্ছল ছিল না। তাই তারা অতিথিপরাযণ পরিবার ছিলেন। এই পরিবারের আরো সদস্যদের নাম উল্লেখ করে রাখি। কেননা এর পরবর্তী অধ্যায়ে তাদের কথাও আলোচনায় আসবে। তাঁরা ছিলেন—

১) ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত — বীরেনের বাবা
২) বিরজাসুন্দরী দেবী — বীরেনের মা
৩) বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত — মা বাবার একমাত্র পুত্র
৪) কমলিনী সেনগুপ্তা— বীরেনের স্ত্রী
৫) প্রবীর ওরফে রাখাল — বীরেনের চার বছর বয়স্ক ছেলে
৬) কমলা সেনগুপ্তা — বীরেনের বারো বছর বয়স্কা বোন
৭) অঞ্জলি সেনগুপ্তা ওরফে জটু — বীরেনের ছয় বছর বয়স্কা বোন
৮) গিরিবালা দেবী — বীরেনের বিধবা বড় চাচি
৯) প্রমীলা সেনগুপ্তা — গিরিবালার তেরো বছরের মেয়ে
১০) সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত — বীরেনের ফুফুর পনের বছর বয়স্ক ছেলে

আলী আকবর খানের বাড়িতে পুস্তক ছাপানোর জন্য একটি ছোট প্রেস ছিল। তার দেখভাল করতেন তার বড় ভাই আলতাফ আলী খান। সেই প্রেসে প্রস্তাবিত বিবাহের নেমন্তন্ন পত্র (কার্ড নয়) ছাপানোর ব্যবস্থা হয়। সৈয়দা খাতুনের নামকরণ করা হয় (নজরুল কর্তৃক) নার্গিস আসার খানম। আজো তাকে

সবাই এই নামেই জানেন। তার পুরানো ঢাকার রোকনপুরস্থ বাড়ির দ্বারে এই নামেরই 'নাম ফলক' আজো আঁটা রয়েছে। কিন্তু ৬/৯/৮১ তারিখের দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জনাব বুলবুল ইসলাম দাবি করেছেন যে সৈয়দা খাতুনের নামকরণ করা হয়েছিল নার্গিস আসার বেগম, নার্গিস আসার খানম নয়। এই তথ্য যে অনেক তথ্যের মতো বানোয়াট এবং অসার তার প্রমাণ উপরিউক্ত নামের ফলক।

যাই হোক, বিবাহের তারিখ ধার্য হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুন মোতাবেক ৩রা আষাঢ় ১৩২৮ বঙ্গাব্দ শুক্রবার। আলী আকবর খানের মেজ ভাই ওয়াছির আলী খান দূরে দূরে থাকলেও আলতাফ আলী সব কাজেই ছিলেন। নজরুল বিরজাসুন্দরীকে আসার জন্য পত্র দিলেন। পত্র নিয়ে গেলেন স্বয়ং আলী আকবর খান। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আলী আকবর খান যখন কুমিল্লা জেলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলো তখন থেকে তার সহপাঠী বীরেন্দ্রদের বাড়িতে যাওয়া আসা শুরু হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আলী আকবর খান ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং বীরেন্দ্র কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন। তাই বিরজাসুন্দরীকে নেমন্তন্ন দেয়া আলী আকবর খানের একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল।

আলী আকবর বীরেন্দ্রদের বাড়ির সকলকে নিয়ে নৌকাযোগে দৌলতপুর পৌঁছালেন ১৬ই জুন মোতাবেক ২রা আষাঢ়। কিন্তু নৌকা ঘাটে পৌঁছলে দেখা গেল সেখানে কোনো লোকজন নেই। আলী আকবর আর একটা ধাক্কা খেলেন। তিনি বাড়ি থেকে লোকজন এনে নৌকা টেনে পাড়ে উঠালেন। আলী আকবরদের পাশের বাড়িতে বিরজাসুন্দরীদের থাকার ব্যবস্থা হলো। তেসরা আষাঢের সকাল থেকেই সৈয়দা খাতুনের মা কান্নাকাটি শুরু করলেন। কারণ তার পুত্র আব্দুল জব্বার পানির জাহাজের খালাসির চাকরি করে--- সে এই বিয়েতে অমত প্রকাশ করে পত্র দিয়েছে।

বিয়ের নেমন্তন্ন পত্রে আলী আকবর তার বড় ভাই, মেজ ভাই বা সৈয়দার মায়ের নাম বাদ দিয়ে নিজেই ভাগ্নীর অভিভাবক হয়েছেন। ভাইরা তাই ক্ষুব্ধ। আলী আকবর ফাঁপরে পড়লেন। কিন্তু দমলেন না। তবে আশংকা করলেন যে, একটা গণ্ডগোল হতে পারে। তাই ঘোষণা দিলেন যে, কলিকাতা থেকে মেহমান এসে পৌঁছাননি তাই বিবাহ রাত্রে হবে। নজরুলও বিরক্ত হয়ে পড়লেন। পাড়াগাঁয়ের রাত তো সন্ধ্যা হলেই অনেক রাত। আলী আকবর খান কাবিননামা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। শর্ত এই যে নজরুল চালচুলোহীন তাই তাকে ঘর জামাই থাকতে হবে। সৈয়দা কোনোদিন চুরুলিয়া যাবে না। নজরুল বিবাহ মজলিশ থেকে উঠে গেলেন। পাশের বাড়িতে বিরজাসুন্দরীকে দেখা করে বললেন, মা, আমি এক্ষুনি কুমিল্লা চলে যাচ্ছি।

বিরজা তাঁর সাথে বীরেন্দ্রকে নিয়ে যেতে বললেন। ইন্দ্রকুমার থাকলেন অন্যান্যদের সাথে করে নিয়ে যাবার জন্য। পায়ে হেঁটেই ছিল তাঁদের যাত্রা।

তাঁরা ভোরে কুমিল্লা পৌঁছলেন। বিরজা সুন্দরীর ভাষায় বিয়ে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগলো। মানে সম্পাদনা হলো না।

ত্রিশঙ্কু শব্দটি কোনো কোনো পাঠক পাঠিকাগণের কাছে স্পষ্ট না হতে পারে, তাই তাদের সদয় অবগতির জন্য এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা যায়। ত্রিশঙ্কু ছিলেন সূর্য বংশীয় অযোধ্যার রাজা। তিনি মুনি বিশ্বামিত্রের খুব ভক্ত ছিলেন। হিন্দু মতে বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গচ্যুত করেন। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে পুনরায় নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করলে অগত্যা দেবগণ তাকে স্বর্গমর্ত্যের মধ্যখানে ঝুলন্ত অবস্থায় অবস্থান করান। এখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে, দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপস্যায় ভীত ছিলেন। তাই তিনি অপ্সরা মেনকাকে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য মর্ত্যে প্রেরণ করেন। তাঁর তপোভঙ্গ হয় কিন্তু মেনকার রূপে তিনি আসক্ত হন। মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। মালতী নদীর তীরে মুনি কণ্বের আশ্রম ছিল। শকুন্তলা সেখানেই পালিতা হন।

নজরুলের বিয়ের রাতেই (৩রা আষাঢ় দিবাগত রাতে) কুমিল্লা চলে যাওয়ার সমর্থনে নজরুল

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে ৬ই জুলাই ১৯২১ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শিনী বিরজাসুন্দরীও সেই বর্ণনাই দিয়েছেন। এবং তাঁরা (বিরজা) আশংকিত গোলযোগ এড়াবার জন্য দুই দিন পর অর্থাৎ ৫ই আষাঢ় কুমিল্লা রওনা দেন। ডঃ রফিকুল ইসলাম তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা' গ্রন্থেও সেই ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। শেখ দরবার আলম তার 'অজানা নজরুল' গ্রন্থেও সেই একই কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু জনাব বুলবুল ইসলাম রচিত এক নিবন্ধে ৬/৯/৮১ তারিখের দৈনিক সংগ্রামে দাবি করেছেন যে, নজরুল ৩রা আষাঢ় দিবাগত রাতে দৌলতপুরে অবস্থান করে, পরদিন সকালে কুমিল্লা রওনা হয়ে যান। তাহলে ইন্দ্রকুমাব গং রইলেন কেন? আর রাতেই যদি থাকলেন তবে সকালে গেলেন কেন? জবাব বুলবুলের নিবন্ধে সে প্রশ্নের উত্তর নেই। তাই এই তথ্য মন গডা ছাডা কিছুই নয়। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেযেছ্নে যে, নজরুল নার্গিসকে বিযে করে, ছেড়ে দিযে গিয়েছেন। এতকাল পরে তথাকথিত তথ্য দিয়ে একজন জাতীয কবির বিরুদ্ধে এরূপ বলা বীতিমত অপরাধ।

আসল তথ্য হলো আলী আকবর খান তাৎক্ষণিকভাবে পারিবারিক গোলযোগ এড়াবার জন্য নজরুলকে অপমান করেছেন, তথা তঞ্চকতা করেছেন। কিন্তু যখন গ্রামে ছি ছি শ্লোগান শুনেছেন তখন বিরজা সুন্দরীকে ধরেছিলেন একটা সমঝোতার জন্য। নজরুল আব রাজি হন নি। আলী আকবব খানও আর অগ্রসর হবার প্রয়াস পান নি। কেননা নজরুল কুমিল্লাতে পৌঁছেছিলেন ১৮ই জুন ১৯২১ শনিবাব ভোরে। তিনি সেখানে কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলেন (১৮ই জুন থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত)। ৮ই জুলাই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কলিকাতা রওনা দেন। এই সময়েব মধ্যে আলী আকবব বা তাঁব ভাইদের কেউ কিংবা তাঁদের পক্ষে কেউ নজরুলের কাছে আসেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নজরুলকে অপমান করে বিযে ভেঙে দেযা এবং তাই করা হযেছিল।

আমাদের দেশে একটি কুসংস্কার এখনো রয়েছে মজলিশ থেকে বিযের বর উঠে গেলে অন্যের সাথে তখন সেই মেযের বিযে না দিলে সে মেযে দোষী হযে যায। হিন্দু মতে সেই তিথিতে বিযে না হলে আর তার বিযেই হয় না। গ্রামে এই সব দোষ আলোচনা হলে আলী আকবর খানসহ বাডির সবার টনক নডে ওঠে। কিন্তু নজরুল তখন কলিকাতা পৌঁছে গেছেন।

শতবর্ষের আলোকে কবি নজরুল ইসলাম

অ নু ন য় চ ট্টো পা ধ্যা য়

এক

বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান কলকাতা। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এমনকি সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও যা কিছু আন্দোলন এই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ঘিরে আর এই সব আন্দোলনের শীর্ষে অবশ্যই বিরাজ করেছেন উচ্চবিত্ত পরিবারের অপেক্ষাকৃতভাবে সুযোগপ্রাপ্ত ও আলোকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট জনেরা। দুয়েকটি ব্যতিক্রম নিশ্চযই আছে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অজগাঁয়ের অতিদরিদ্র পরিবারের টুলো পণ্ডিতের ঘরের ছেলের নগ্ন পায়ে শহরমুখে অভিযান এবং অচিরেই বাঙলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষের ভূমিকায় অধিষ্ঠান সে ছিল এক বিরল ঘটনা। সমকাল ও উত্তরকাল আভূমি নতজানু এই মহাপুরুষের সামনে। দ্বিতীয় উল্লেখজনক দৃষ্টান্ত বোধকরি কাজি নজরুল ইসলাম। আসানসোল মহকুমার চুরুলিযা গ্রামের দৈন্যক্লিষ্ট আধুনিক শিক্ষায় বঞ্চিত এক মুসলমান পরিবারের পিতৃহীন অভিভাবকহীন শিশু 'দুখুমিঞা', কৈশোরে লেটোর ভ্রাম্যমান দলের 'ব্যাঙাচি' প্রথম যৌবনে বাঙালী পল্টনের হাবিলদার নজরুল ইসলাম শহর কলকাতায় ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়েই সমগ্র সাহিত্য মহলকেই জয় করে নিলেন। একমাত্র 'বিদ্রোহী' কবিতাই তাঁকে যে জনপ্রিযতা ও সাহিত্য-স্বীকৃতি দিল, বিশেষকরে রবীন্দ্র-সূর্য যখন মধ্যগগনে, তা এককথায় অভূতপূর্ব। 'বিদ্রোহী' কবিতা বিজলী পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এমন চাহিদা সৃষ্টি হয পাঠকমহলে যে পরপর কয়েকটি সংখ্যায় কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এছাড়াও 'মোসলেম ভারত', 'প্রবাসী', 'সাধনা' প্রভৃতি নামীদামী পত্রিকাতেও পুর্নপ্রকাশিত হলে এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি হয।

আধুনিক সাহিত্যচর্চার পরিবেশ ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত, শহর কলকাতার নাড়ির সঙ্গে সম্পর্কহীন একজন লেখক আবির্ভাব মুহূর্তেই সর্বজয়ের গৌরবে ভূষিত হলেন কোন শক্তিবলে তা নিবিড় গবেষণার বিষয়। নজরুলের স্রষ্টা-মানস গঠনের মূলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল প্রভাব না থাকলেও বাঙালি পল্টনে অবস্থানকালীন তিনি বিশ্ব সাহিত্যের বিশেষ করে আরবী-ফার্সি ও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর সাধ্যমত পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু বাঙলার নিজস্ব লোকায়ত সংস্কৃতির সহজ উত্তরাধিকার তাঁর মধ্যে ছিল। যে অঙ্গনে তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে সেখানকার পরিবেশে একদিকে যেমন বীরভূমের আউলসুর, বর্ধমানের লেটো-ভাদুর সুর ভেসে বেড়াত, তেমনি অন্যদিকে অজয়ের ধারে ধারে বসে জঙ্গলে সাঁওতাল পল্লীতে ঝুমুর ও মাদল ধামসার প্রাণ মাতানো সুর মূর্ছনা আবেশ সৃষ্টি করত। শৈশবে পিতৃবিয়োগের ফলে নজরুলের স্বাভাবিক বিকাশের ন্যূনতম সুযোগও বিঘ্নিত হয়। শৈশবের মক্তবে শিক্ষা ও পিতৃব্যের কাছে ফার্সিভাষায় হাতেখড়ির গণ্ডী পেরিয়ে আধুনিক ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করতে এক দুঃখী ভবঘুরে দীন জীবন যাপন করতে হয়। শুধু পেটেভাতে জীবন ধারণের জন্যই বাবুর্চির

কাজ, রুটির দোকানে শিশুশ্রমিকের কাজ, তাঁকে করতে হয়েছে, আবার কারও দয়া দাক্ষিণ্যে কখনও কখনও বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন মেধাবী ছাত্র হিসাবে। অনিশ্চিত জীবনের যন্ত্রণা, বন্ধুরতা, অযত্ন, লাঞ্ছনা তাঁর মধ্যে এক ক্ষ্যাপা বাউন্ডুলে, রুদ্র অথচ আবেগময় মনন গড়ে দিয়েছিল। সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠার সুযোগ তাঁর সামনে একেবারেই ছিল না। নির্মম নিষ্ঠুর শিশুমেধ যজ্ঞের নিদর্শন নজরুল-জীবন, উত্তরকালেও তা কখনও মসৃণ হয়নি। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নজরুল মাতৃস্নেহ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন যা নিদারুণ অভিমানে দূরত্ব রক্ষা করেছিল বাকি জীবন, কেননা তিনি মায়ের বিধবা জীবনে পুনর্বিবাহ মেনে নিতে পারেন নি। মুসলমান সমাজে বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ সমাধা ও ধর্মসম্মত, এমনকি শতবর্ষ আগে হিন্দু বিধবার বিবাহও বিদ্যাসাগর আইনসম্মত করে দিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায়া মহিলা অনেকগুলি সন্তান নিয়ে চরম দারিদ্রের মধ্যে পুনর্বিবাহের পথে কোনোরকম একটা আশ্রয় সন্ধান ছাড়া কীইবা করতে পারতেন। কারণ যাইহোক এঘটনার প্রতিক্রিয়া নজরুলের জীবনে এত দৃঢ়মূল হয়েছিল যে তিনি পরবর্তীকালে মার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেন নি, এমনকী জেলে সাক্ষাৎপ্রার্থী মাকেও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বিচিত্র হলেও এ আচরণ হয়তো ভাবাবেগসম্পন্ন নজরুল চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুই

আবাল্য বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা হলেও অতি অল্প বয়সেই লেটোর দলে গান রচনা ও গাওয়ার মধ্য দিয়ে নজরুলের সৃজনী প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। বাঙালি পল্টনে যোগ দেওয়ার আগে একই শ্রেণীর পড়ুয়া পরবর্তীকালের খ্যাতনামা লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নজরুল তখন লিখতেন গল্প আর শৈলজানন্দ কবিতা। উত্তরজীবনে তাঁদের লেখক ভূমিকার স্থান পরিবর্তন হয়। করাচীতে সেনা নিবাসে থাকাকালীন নজরুল 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' নামে দুটি গল্প-কাহিনী রচনা করেন। কিন্তু পরে কথা সাহিত্য তাঁর গৌণকর্ম হয়ে যায়। মুখ্যস্থান লাভ করে কবিতা ও গান। তাঁর অধিকাংশ গল্পই বাস্তবতাবর্জিত অতি-ভাবালুতায় ভরপুর শিথিল গদ্যের সমাহার। কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর মনোযোগের খুবই অভাব ছিল। এক কথায় কথাসাহিত্য তাঁর নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছিল না। এমনকী তাঁর সাংবাদিকতার ভাষাও যতটা উদ্দীপক, ক্রোধী ততটা গম্ভীর ও স্বাদু নয়। বাংলা গদ্যের ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা উত্তরাধিকার সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন।

করাচী সেনানিবাসে বসেই পত্রযোগে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির দপ্তরে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সূত্রে ভারতবর্ষের সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুলের সংযোগ হয়। তারই আহ্বানে নজরুল কলকাতায় এসে ৩২ কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে ওঠেন এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করতে থাকেন। রাণীগঞ্জ বিদ্যালয়ে পাঠের সময় শিক্ষক বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের স্বল্পকালীন সান্নিধ্য, বিদেশে বাঙালি পল্টনে থাকাকালীন রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক ঘটনায় উত্তাপ-লাভ, দেশে ফিরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আব্দুল হালিম প্রমুখ মার্কসবাদীদের দৈনন্দিন সান্নিধ্য ইত্যাদি ঘটনাপরম্পরা নজরুলের বিদ্রোহী সত্ত্বা গঠনে সহায়ক হয়েছিল। ফলে আজন্ম বঞ্চিত অবহেলিত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পরিবারের সন্তান স্বভাবতই এক আপোসহীন সমাজ বিপ্লবের নান্দীকার রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন। শ্রেণী শত্রুদের তিনি এতই বেশী চিনতেন, তিক্ত কঠোর অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে এতটাই যাচাই করে নিতে পারতেন যে তাঁর কাব্যে শ্রেণীঘৃণা ও উচ্চনাদী জেহাদ চূড়ান্ত শীর্ষ স্পর্শ করেছিল যা বাংলা সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য। ১৯২০ থেকে ১৯২৯ এই দশবছর নজরুলের সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও দেশাত্মবোধক গানগুলো প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের সৃষ্টি। কবিতাগুলিতে কখনও কখনও অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেল শ্রমিকের গান, সৈনিকের গান, কৃষকের গান, ছাত্রদলের গান, নারীজাগরণের গান, কুচকাওয়াজের গান, নওজোয়ানের গান,

অন্তরন্যাশনাল সংগীত ইত্যাদি একেবারেই নতুন এবং পূর্ব-নজিরহীন। এ সময়ে একদিকে কমিউনিস্ট নেতাদের প্রভাব বলয় এবং অপর দিকে কংগ্রেসের 'লেবার স্বরাজ পার্টি' ও পরবর্তী পরিবর্তিত নাম 'ওয়াকার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি অব বেঙ্গল' সংগঠনের ঘনিষ্ঠতা কার্যকর ছিল। হেমন্তকুমার সরকার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কুতুবুদ্দিন আহ্‌মদ, শামসুদ্দিন হোসায়ন প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবীর সংযোগের সূত্র তাঁর মনন গঠনে ও প্রগতিশীল সৃজনকর্মে সহায়ক হয়েছিল। প্রগতিশীল ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরেও নজরুলের কবি পরিচয় স্বীকৃতি লাভ করে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের আগেই। মোসলেম ভারত পত্রিকায় তার 'খেয়াপারের তরণী' ও 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতা দুটি পাঠ করে অগ্রজ কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এক প্রশংসাপত্রে সম্পাদককে লেখেন: "যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী এককথায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।" অচিরেই এই দুই প্রবীন ও নবীন কবির মধ্যে প্রায় গুরু শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যদিও তা অধিককাল স্থায়ী হয়নি।

তিন

কলকাতায় আসার পরই ১৯২০ সালে এ.কে. ফজলুল হক সাহেবের আর্থিক সহায়তায় নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যৌথ সম্পাদনায় 'নবযুগ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতেই রুশবিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত নজরুলের আবির্ভাব বলা চলে। নজরুল রচিত 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে ?', 'ধর্মঘট' ইত্যাদি প্রবন্ধের জন্য পত্রিকাটি ইংরেজ সরকারের আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছুদিন পর বন্ধও হয়ে যায়। নবযুগের প্রবন্ধাবলি গ্রন্থিত হয়ে 'যুগবাণী' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এখান থেকেই শুরু হল নজরুল জীবনে রাজদ্রোহ ও রাজ-আক্রমণের তাল ঠোকাঠুকি। নজরুল সম্পাদিত ও রবীন্দ্র-অভিনন্দিত পরবর্তী পত্রিকা 'ধূমকেতু'। এই সময়ের কবিতা ও পত্র-সেবিত লেখাগুলির মধ্যে পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধতা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য অদম্য কামনা ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পায়। 'ধূমকেতু'ই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপন করে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য কবির একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় (১৯২৩)। হুগলি জেলে বন্দী কবি জেলের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেন। এ দেশে একজন জনপ্রিয় কবির অনশন ও কারাবরণের ঘটনা বোধহয় এই প্রথম। বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ ও নবীন সাধকের জীবন বিপন্ন বিবেচনা করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে অনশন ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠান। আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণের মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে পরশাসন বিরোধী জনজাগরণের কবিতা ও গান রচিত হতে থাকে। সে যুগে এই সব রচনা যুবসমাজের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণোৎসর্গ করার অনাবিল প্রেরণা যুগিয়েছিল। অবিস্মরণীয় সেই সব পংক্তি ;

(১) কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণবেদী,
ওরে ও তরুণ ঈশান,
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ,
ধ্বংস নিশান উঠক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি।

(২) (এই) শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল
(এই) শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।
(তোমার) বন্দীকারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
(ওরে) ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।

(৩) আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দি-শৃংখলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।

এই পর্যায়ে নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' নামক কবিতাটি। বাণীর গাম্ভীর্য ও সুরের নতুনত্বে এ এক দুর্লভ সৃষ্টি। ১৯২৬ সালের ২২ মে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে উদ্বোধনী সংগীত রূপে গানটি গীত হয়। এ কবিতার সবচেয়ে বড় মর্মবাণী সেই দুটি পঙক্তি--

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী। বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।'

সমকালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ব্যথিতচিত্ত কবি দেশবাসীকে সতর্ক করতে চেয়েছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের কোনও স্থান তাঁর মনে ছিল না, বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক এই বিভাজন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথে চালিত করবে এটাই ছিল কবির আশঙ্কা। 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' বা 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া' ইত্যাদি কবিতা শুধু সেকালে নয় বিমূঢ় জাতির সামনে আজও কতটাই না প্রাসঙ্গিক। ইতোপূর্বে একটি প্রবন্ধে শহীদের আত্মোৎসর্গ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কবির আহ্বান : "এস ভাই হিন্দু। এক মুসলমান। এস বৌদ্ধ। এস ক্রিশ্চিয়ান। আজ আমরা সব গন্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিবনা।" শুধু হিন্দু মুসলমান নয়, তিনি বুঝেছিলেন নিম্নবর্গের সমস্ত মানুষকে জাতপাতের উর্ধ্বে মানবিক যোগসূত্রে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা একান্ত জরুরি। তিনি বলছেন :— "আমাদের এই পতিত, চন্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মত দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমরাও প্রাণ সংলগ্ন করিয়া উচ্চশিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে।" সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ নজরুলের স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে, জনশক্তির মূলে রয়েছে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী এবং সামাজিক বৈষম্য ঘুচিয়ে এরাই সক্ষম নতুন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে। তাই তাঁর উদাত্ত আহ্বান : "জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা। তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক-উলটে ফেলুক। আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ— ধূলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত মাখা লালে লাল ঝান্ডা।" উদাত্ত কণ্ঠে, উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কথোপকথনের ভঙ্গিতে উজ্জীবনমূলক এই ভাষা সত্যবাদিতার ভাষা হিসেবে আদর্শ কিনা এ নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু সেকালে নির্জীব বিভ্রান্ত বাঙালি সমাজকে আঘাত দিয়ে সচকিত করতে তা কার্যকর হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে, এ-সবের জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্রোধ থেকেই প্রমাণিত। ভাষার দিক দিয়ে পাঠকের নিশ্চয়ই বিবেকানন্দর গদ্য স্মরণে আসবে।

উদ্দীপক ভাষার সঙ্গে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও প্যারডি ব্যবহার করে নজরুল সংবাদকে আকর্ষণীয় করে

তুলতেন। কয়েকটি নমুনা :

(১) দেশ দেশ গণ্ডিত করি মন্দিত তবে ভেরী
আসিল যত উকীলবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

(২) সে যে মানেনা মানা
লাঠি দেখাইলেও বলে না, না, না।

(৩) তুর্কীর ভবিষ্যৎ রাজধানী
বল কোন্ ঘাটে ভিড়বে তোমার
সোনার তরী

১৯২৫ সালের শেষ দিকে লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্র রূপে 'লাঙল' সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে. সম্পাদক পদে থাকেন নজরুল। এই পত্রিকায় নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ মুদ্রিত হয়। এই সময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বিরুদ্ধে 'লাঙল' এবং পরিবর্তিত নামে 'গণবাণী' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সেই সময় এ কাজ খুবই দুরূহ ছিল, কারণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই উগ্র মৌলবাদ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ খুবই সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল সেকালে। তাঁর বিখ্যাত 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি 'গণবাণীতে' প্রকাশিত এবং পরে 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। গভীর আবেগের সঙ্গে এই প্রবন্ধে নজরুল বলছেন, 'মারো শালা যবনদের। মারো শালা কাফেরদের। আবার হিন্দুমুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম তখন আর তাহারা আল্লা মিঞা বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে— 'বাবাগো, মাগো।' মাতৃ পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।" সাংবাদিক বা সম্পাদকের এমন সামাজিক দায়বদ্ধ ও দরদী ভূমিকা আজকের বাণিজ্যিক হলুদ সাংবাদিকতার যুগে প্রায় অনুপস্থিত।

চার

১৯১৯ সালে মে-জুন মাসের 'সওগাত' মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'কবিতা সমাধি' কবিতা এবং 'স্বামীহারা' গল্প যদি প্রথম মুদ্রিত রচনা ধরা হয় তাহলে কাজি নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন তেইশ বছর বিস্তৃত (অর্থাৎ ১৯১৯ সালে আত্মপ্রকাশ ও ১৯৪২ সালে অসুস্থতাজনিত কারণে অসমর্থ হয়ে পড়া পর্যন্ত)। যদিও পূর্বেই বলা হয়েছে কৈশোরে লেটোর দলে বা ছাত্রাবস্থায় বেশ কিছু গান ও গল্প তিনি রচনা করেছিলেন, তার কিছু নমুনা পরবর্তীকালে উদ্ধার করে ছাপাও হয়েছে। মুদ্রণে আত্মপ্রকাশ ১৯১৯ সালে হলেও কয়েকটি গল্প ও কাহিনী ১৯১৮ সালের করাচীতে বাঙালি পল্টনে থাকাকালে লিখিত এবং কিছু পরে (১৯১৯-২০) পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত। মাত্র দুই দশকের সামান্য কিছু সময়ের সীমার মধ্যে নজরুল যে বিপুল পরিমান সৃষ্টিসম্ভার রেখে গেছেন তা বিস্ময়কর এবং স্বতস্ফূর্ততা ও স্বভাবসৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নজরুলের আজ পর্যন্ত মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা অন্যূন ৬১টি, অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ ৩টি, ছোটদের কবিতা ৫টি, উপন্যাস ৩টি, গল্প সংকলন ৩টি, বিভিন্ন গ্রন্থাবলি ২টি। এছাড়া রয়েছে সম্পাদিত পরিচালিত পত্রিকা ৩টি। বলাবাহুল্য এই তালিকা অসম্পূর্ণ, কেননা উভয়বঙ্গে এখনও নজরুল গবেষণার কাজ সমাপ্ত হয়নি। বাংলাদেশে নজরুল একাডেমি আন্তরিকভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় একাজে অনেকটা অগ্রসর হলেও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের কারণে নানা জটিলতা ও সমস্যা তাদের সামনেও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এ কাজ করার মত কোনও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এখনও গড়ে ওঠেনি। চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমি কবির স্মৃতিরক্ষায় অনেক প্রশংসার্হ কাজ করলেও নজরুলের সৃষ্টি সম্ভার উদ্ধার,

সম্পাদনা, প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় তাদের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেছে। নজরুল পরিবারও এ বিষয়ে অসমর্থ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুলের সমগ্র রচনার একটি মান্য-পাঠ প্রস্তুত করে প্রকাশ করার দায়িত্ব এখনও গ্রহণ করতে পারেনি। কপিরাইট জনিত বাস্তব ও জটিল সমস্যা অন্যতম প্রধান অন্তরায় এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কীভাবে এই বাংলায় যথাসম্ভব নির্ভুল এবং মান্য- পাঠ সম্বলিত সমগ্র নজরুল রচনা সম্ভার কতদিনে বাঙালি পাঠকের হাতে আসবে তা এখনও বিবেচনাধীন। ঢাকার বাংলা আকাদেমি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খন্ডে নজরুল রচনাবলি প্রকাশ করেছে, এই সংকলন আপাতত অনেকখানি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এ বাংলায় প্রকাশিত রচনাবলি ও খন্ড গ্রন্থগুলির সম্পাদনা ও প্রকাশনার মান পাঠকদের খুশি করেনি। সরকারি প্রচেষ্টায় যদি কপিরাইট সংক্রান্ত সমস্যার জট মুক্ত করা যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পক্ষেই একমাত্র সমগ্র নজরুল রচনা সম্ভারের সুসম্পাদিত ও নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করা সম্ভব।

পাঁচ

কবি কাজি নজরুল ইসলামের প্রতি বাঙালির ঋণের শেষ নেই। তিনি নিজেই এক জীবন্ত ইতিহাস। রবীন্দ্রসূর্য পরিক্রমায় স্থিত হয়েও নিজস্ব সৃষ্টির উদ্ভাসে তিনি বাঙালি হৃদয়ে আজও রাজচক্রবর্তী। স্ত্রীর পক্ষাঘাত, সন্তানের মৃত্যু, অর্থের অভাবে চিকিৎসা না করতে পারার যন্ত্রণা, নিত্য দারিদ্রের লাঞ্ছনা, অসূয়াজনিত ও সংকীর্ণতা বশতঃ পারিপার্শ্বিক আক্রমণ ও নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আঘাত এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রত্যক্ষ নিপীড়ন, একের পর এক গ্রন্থের নিষিদ্ধকরণ এবং তার ফলে প্রকাশিত গ্রন্থের বিক্রি খেলোপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একমাত্র আয়ের পথ বন্ধ হওয়া— এরকম অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিদ্রোহী কবি নজরুলের মাথা কখনও অবনত হয়নি। যেসব গ্রন্থ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়— যুগবাণী ১৯২২ সালে (নবযুগ পত্রিকার লেখা কয়েকটি নিবন্ধের সংকলন), কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' ১৯২৪ সালে, কাব্যগ্রন্থ 'প্রলয় শিখা' ১৯৩১ সালে, চন্দ্রবিন্দু (ব্যঙ্গ বিদ্রূপধর্মী কবিতা) ১৯৩১ সালে। প্রায় বিশ বছর পর ১৯৪১ সালেও দেখা যাচ্ছে 'যুগবাণী' গ্রন্থের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে ভয় পেয়েছে ব্রিটিশ সরকার। 'অগ্নিবীণা' নিষিদ্ধ হয়েছিল কি হয়নি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য মেলেনি। তবে 'ফণিমনসা', 'সঞ্চিতা', 'সর্বহারা', 'রুদ্রমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থের জন্যও কবিকে যথেষ্ট হয়রানি করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে। এ দিনের জন্যও রাষ্ট্রীয় শ্যেন দৃষ্টি থেকে তিনি রেহাই পান নি। আগেই বলা হয়েছে ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য কবির একবছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। দ্বিতীয়বার 'প্রলয় শিখা' কাব্যগ্রন্থের জন্যও কবির ৬মাস জেলের আদেশ হয় ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হলে জামিন মঞ্জুর হলেও মামলা চলতে থাকে। ইতোমধ্যে গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হলে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট কবিকে অব্যাহতি দেয়। নজরুলের কবিতার জন্য শুধু তিনি নিজে হয়রান হয়েছেন তাই নয়, প্রকাশক মুদ্রকরাও রাজরোষে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে শেষের দিকে কবিকে প্রকাশক ও মুদ্রকের ভূমিকাও নিতে হয়। নিষিদ্ধ বইগুলি অধিকাংশই স্বাধীনতার পর রাহুমুক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলি কিন্তু গোপন পথে শত শত কপি পাঠক মহলে পৌঁছে যেত।

নজরুল চরিত্রমানসের কয়েকটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যের প্রতি উত্তরকালের পাঠকসমাজ কখনই উদাসীন থাকতে পারে না, কারণ এই অবদানগুলি ইতোমধ্যে একালের মানুষ আত্মসাৎ করে ফেলেছে, তাদের পুষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। প্রথমত, নজরুল তাঁর বিদ্রোহী সত্তার আঘাতে বাঙালি সমাজের গড়ে ওঠা আভিজাত্য কৌলিন্যের দুর্গ ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নতুন এক কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। সমালোচক নারায়ণ চৌধুরীর মতে: 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি' অস্মিতার

লক্ষ্মণ-চিহ্ন-মন্ডিত গর্বোদ্ধত আমি নয়, এই আমি হল এ যাবৎ অনাদৃত, লাঞ্ছিত উৎপীড়িত, অপমানিত গণমানুষের প্রতীক আমি। এস আমির উদার আঙিনায় সমস্ত সাধারণ মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে, যাদের মুখে এতকাল কোনো ভাষা ছিল না, যাদের মনে ছিল না কোনো বল ভরসা বা আত্মবিশ্বাস। সেই অগণিত নির্যাতিত উপদ্রুত অবহেলিত মানুষেরই প্রতিভূ হল নজরুলের 'আমি'। এই আমিকে শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতায় নয় আমার কৈফিয়ৎ, চির বিদ্রোহী প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায়, পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলিতে প্রত্যক্ষ কবা যাবে। তাঁর দ্বিতীয় অবদান— তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শন এবং তার মূল সূত্রগুলিকে সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে প্রচারের আলোকে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রেণীসাহিত্যের প্রথম সচেতন পথিকৃৎ বোধকবি তাঁকেই বলা যায। অন্তত উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত, শোষক ও শোষিত মানুযদের শ্রেণী চিহ্নিত করণে তাঁর ভুল হযনি। তৃতীয অবদান— পরাধীন দেশে মূল সংগ্রামই হল স্বাধীনতার জন্য আপোসহীন লডাই, এখানে নজরুল নেতৃত্বের ভূমিকায়। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আর কোনও লেখককেই এদেশে বারবার এমন করে রাষ্ট্রদ্রোহীতার শিরোপায ভূষিত হতে হয়নি। আগেই উল্লেখ করেছি তিনিই প্রথম এদেশে পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। অজস্র গান ও কবিতার এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি পরাধীন ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, গণজোয়ারে সামিল করতে নেতৃত্ব দিযেছিলেন। অপরদিকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেব সবচেযে বড যে দুর্বলতা, দেশেব জনশক্তি হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মীয গোষ্ঠীতে বিভক্ত— সেদিকে ববীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবেই বারবার রাজনৈতিক নেতাদের এবং সাধারণ মানুষকে সতর্ক কবে দিযেছেন, বারবাব ঐক্যের প্রযোজনীযতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু নজরুল যেভাবে নিজেব জীবন-আচরণ, পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ ও সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা এদেশে তুলনারহিত। 'আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'— এ শুধু রাজনৈতিক বা সমসাময়িক তাগিদে রচিত কাব্য নয, এ তাঁর জীবনবেদ। ভারত ভাগ হয়েছে, বাংলা ভাগ হযেছে। কিন্তু নজরুল অবিভাজ্য, অখন্ড। তারই জযধ্বনি কিংবা অকুণ্ঠ স্বীকৃতি সমকালীন কবিদের রচনায

(১) বিধাতার এক সুর
করেছিল বুঝি পথ ভুল,
তারই নাম জানি নজরুল।
মলিন মাটির দেশে সে সুরেব দেখেছি আগুন,
দিকে দিকে অনির্বাণ শিখা,
তাহারে বরিতে আজ মহাকাল আপনার হাতে
আঁকে জযটিকা। (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

(২) ভুল হযে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল। (অন্নদাশংকর রায়)

স্বাধীনতা আমরা পেযেছি কিন্তু শোষণমুক্ত যে ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা নজরুল করেছিলেন তা এখনও বহুদূরে, বলা চলে ক্রমশ অধরা হয়ে যাচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওযার শোকাবহ অভিজ্ঞতার পর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অঙ্গীকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারত রাষ্ট্র ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটেই চলেছে। সংখ্যাগুরু ধর্মের মৌলবাদ যে কোনো দেশের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক। ভারতে আজ সেই অদ্ভুত অন্ধকার ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে— এসময়ে কবি কাজি নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টিসম্ভারের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের চৈতন্য মালিন্যমুক্ত করুক, প্রতিবাদে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করুক। নতুন শতাব্দীর প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে এই হোক ভারতবাসীর প্রার্থনা।

বিপ্লবী বিপিনবিহারী ও বিদ্রোহী নজরুল

গৌ রী প দ গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ মহেন্দ্র একস্থানে বলেছিলেন, 'এ ত দেশ, এত মা নয়'। সন্ন্যাসী ভবানন্দ তার উত্তরে জানিয়েছিলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না--জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিযসী। জন্মভূমিই জননী'। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভারতমাতার অশ্রুমোচনের জন্য প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতাকামী যুবকের দল। তাঁরা বুঝেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহু সময়ব্যাপী সংগ্রাম চালাতে গেলে প্রযোজন পর্যাপ্ত অর্থ ও অস্ত্রের। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলার বিপ্লবীরা এক সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন), রাসবিহারী বসু অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠলেন। এ ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন স্থান ছাড়াও বিদেশে বিপ্লবীদের পাঠান হল যাতে তাঁরা সংগঠিত হযে বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানতে পারেন।

এদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের আর এক মহানায়ক, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অবিস্মরণীয দলনেতা হালিশহরের কৃতী সন্তান বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় অতি শৈশবে সাধক-কবি রামপ্রসাদের মাতৃসংগীত ও বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হন। কলকাতার খেলাৎচন্দ্র বিদ্যালয়ে পড়াকালীন ব্লুকমান সাহেবের ভূগোল গ্রন্থে 'বাঙালি এক দুর্বলচেতা নিরীহ জাতি' পড়ে বিশেষ বিচলিত বোধ করেন আর সেই থেকে বাঙালি জাতিকে সাহসী ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলবার জন্য উদ্যোগী হন।

আবার রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) পড়ার সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, লোকমান্য তিলক, ব্যারিস্টার পি. মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, 'ডন সোসাইটি'র সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর', 'মুক্তিসংঘে'র পাশাপাশি 'আত্মোন্নতি সমিতি' নামে এক প্রভাবশালী সংস্থা স্থাপিত হয় মধ্য-কলকাতায়। যুবকদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখলেও আসলে এটি একটি বিপ্লবী সংস্থা ছিল। এই সমিতির কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময বিপ্লবী বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) হরিশচন্দ্র শিকদার, অধ্যাপক প্রভাস দে প্রমুখের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। সত্যিকারের সমাজ সেবকের ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে তিনি যুবকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে দিলেন।

অন্যদিকে বাংলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল ইসলাম মাত্র ন'বছর বয়স থেকেই কঠোর জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হন। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করলেও লেখাপড়ার দিতে তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত মাথরুণ গ্রামের নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে ষষ্ঠ শ্রেণীতে

ভর্তি হয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন। এখানেই নজরুল প্রধান শিক্ষক পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হন। এরপর তিনি রাণীগঞ্জের সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টমশ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলে নজরুল তিন বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। এখানেই 'কয়লা কুঠির দেশে'-এর প্রখ্যাত লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী।

সিয়ারশোলে পড়ার সময়েই নজরুলের যুগান্তর দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসবাদী নিবারণচন্দ্র ঘটকের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা জন্মে। নিবারণ ঘটকের দ্বারাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

সিয়ারশোলে রাজবাড়িতে এলেন সে সময়ে একজন নতুন কর্মচারী। নাম তাঁর রণেন গাঙ্গুলি। দীর্ঘকায়, সুগঠিত দেহ, সৌম্যমূর্তি তাঁর। রণেনবাবু মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠি ও ছোরা খেলায় ছিলেন সমান পারদর্শী। যুবক মহলে ছিল তাঁর দারুণ দাপট। নিবারণ ঘটক শুধু তাঁর কাছে দীক্ষাই নেননি, পেয়েছেন তাঁর অপার স্নেহ ও ভালবাসা। নিবারণ সময় সময়ে বীরভূম জেলার ঝাউপাড়া গ্রামের তার মাসিমা দুকড়িবালা দেবীকে নিয়ে আসতেন এখানে। রণেনবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। নজরুল ইসলাম মাঝে মাঝে নিবারণের সঙ্গে উপস্থিত হতেন। প্রথমে পরিচয় পরে রণেন গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। শৌর্যশালী, অটুট মনোবল ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাসী রণেনবাবুর আচার-আচরণে নজরুল ও নিবারণের মাসিমা সহ সকলেই বিমুগ্ধ। কিন্তু রণেনবাবুর এখানে বেশিদিন আর থাকা হল না। ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারকারী বিশ্বাসঘাতক পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জী মধ্য কলকাতায় প্রকাশ্য রাজপথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। কলকাতা থেকে সি আই ডি রা সিয়ারশোলে ছুটে এলেন রণেন গাঙ্গুলির খোঁজে। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা শুনে অবাক হয়ে গেল—যখন তারা জানতে পারল রণেনবাবু রাজস্টেটের শান্ত স্বভাবের কর্মচারী নন, তিনি হলেন আসলে মুরারীপুকুর বোমা মামলার অন্যতম ফেরারী আসামী বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার রডা কোম্পানির ৫০টি মাউজার পিস্তল ও ৪৬ হাজার কার্তুজ লুঠ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও ত্রুটিহীন পরিকল্পনার ফলেই সম্ভব হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে সময় যেসব প্রখ্যাত বিপ্লবীরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন রায) প্রমুখ। মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, 'পঞ্চাশটি মশার পিস্তল গভর্নমেন্টকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল'। নিবারণের মাসিমা দুকড়িবালা সাতটি মাউজার পিস্তল নিজের হেফাজতে রাখার অপরাধে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রথম মহিলা বিপ্লবী দুকড়িবালার দেশ প্রেমের তুলনা মেলা ভার।

আবার দশম শ্রেণীর কৃতী ছাত্র নজরুল দেশের প্রয়োজনে সৈনিক বৃত্তি নিয়ে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে তিন বছর পরে ফিরে এসে কলকাতায় তাঁর সাহিত্য সাধনা পূর্ণোদ্যমে শুরু করলেন। কবি তখন কলকাতায় তালতলা লেনে থাকতেন। সারারাত জেগে তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লেখেন। ভোরে উঠে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মেদকে কবিতাটি শুনিয়ে আসেন। ১৩২৮ সালে পৌষ মাসে (ইং ১৯২১ সালে ডিসেম্বর) 'বিজলী' ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। বাঙালি তরুণ মহল তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিল। কবিতাটি সর্বস্তরের মানুষের কাছে সমাদৃত হল। দেশের বিপ্লবীরা তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন। বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এলেন বিপ্লবী বিপিন গঙ্গোপাধ্যায় ও ভূপতি মজুমদার।

ভাটপাড়া-নৈহাটি-হালিশহর অঞ্চলে বিপিন গঙ্গোপাধ্যায় 'তরুণ সংঘ' নামে যুগান্তর দলের একটি

গোপন সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এরই মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামের মহড়ার ব্যবস্থা করা হত। যুবকদের উৎসাহিত করতে প্রায়শই নজরুল বিপিন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এসব অঞ্চলে আসতেন।

হালিশহর অঞ্চলে সে সময়ে বিপ্লবীদের গোপন দুটি ঘাঁটি ছিল। চৌধুরীপাড়ার অধিবাসী বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দক্ষ সংগঠক যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিপদগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন মল্লিক বাগে। 'তার বাগান' হিসেবে সে সময় এটির বিশেষ খ্যাতি ছিল। কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে সবজির চাষ হলেও কিন্তু রাতের বেলায় এখানে গোপনে বিপ্লবীদের নানা রণ-কৌশলের তালিম দেওয়া হত। বিপিন গঙ্গোপাধ্যায় সহ বহু ছোট-বড় বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকদের এখানে আনা-গোনা ছিল। পরে পুলিশের বিষ নজর পড়ায় এটি বন্ধ হয়ে যায়। যতীন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

আর একটি শিবের গলি—চৌধুরীপাড়ায় অবস্থিত মল্লিকদের বাড়ি। বাড়িটিকে পোড়ো বাড়ি হিসেবে সকলে জানত। আমার স্বর্গত পিতৃদেব উমাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বিপিন গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্য। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে নিগৃহীত হন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ও কংগ্রেসের ডাকে উত্তর ২৪ পরগণার মহিষবাথানে ১৯৩০ সালে যে লবণ সত্যাগ্রহ হয়েছিল তাতে হালিশহরের পক্ষ থেকে তিনি ও অপর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন পুরপ্রধান সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় নেতৃত্ব দেন। স্বর্গত পিতৃদেব যা বলেছিলেন তা হল, হালিশহর স্টেশনে নেমে অনেক রাতে কখনও একা, কখনও আগত কোন সহযোগীকে নিয়ে হাজির হতেন এখানে বিপিনদা। কখনও আবার হালিশহরের আর এক কৃতী সন্তান অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও নেতাজীর ব্যক্তিগত সচিব সুশীলকুমার ঘোষও সঙ্গে আসতেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে খবর চলে যেত। স্থানীয় স্বাধীনতাকামী যুবকরা হাজির হতেন। লাঠি, ছুরি এমনকি বন্দুক ছোঁড়ার অনুশীলন চলত গভীর রাত অবধি। কোনদিন আবার সে যুগের বাগ্মী, রাজনীতিবিদ ও দেশপ্রেমিক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের রচিত ইতালির দুই নব্য যুবক 'ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি'-র দেশপ্রেমের কথা, সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের গৌরব দীপ্ত কাহিনী ছেলেদের সামনে তুলে ধরতেন বিপিন গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগিরা। রামপ্রসাদের লেখা একটি গানের লাইন প্রায়ই তিনি শোনাতেন 'সাগরে যার বিছানা, শিশিরে তার কি করিবে'। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্তভাবনাহীন' আর নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার সেই বিখ্যাত লাইনটি 'আপনারে ছাড়া কাহারে করি না কুর্নিশ' উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন বিপিনদা। যুবকদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে এই দুটি ঘাঁটিতে নজরুলের উপস্থিতি ঘটেছিল বলে পিতৃদেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

অষ্ট আশী বছরের বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে যে কথাগুলি শুনিয়েছিলেন তা তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। হালিশহর তাঁর পিতৃভূমি ছিল তাই বিপিনদা সময় পেলেই এখানে চলে আসতেন। যুগান্তর গোষ্ঠীর যুবকদের বিপ্লবের নানা কথা শোনাতেন এবং অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেমনভাবে লড়াই করতে হয় তার ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে বলতেন :

তিরিশের দশকের কথা। সম্ভবত তরুণ সংঘের উদ্যোগে গঙ্গার তীরে অবস্থিত হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ে সভা বসেছে। যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্যসূচী নির্ধারিত না থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতি ও আশু কী কী করণীয় এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছিল যুবকবৃন্দের সামনে। বিপিনদার সঙ্গে ওইদিন কাজী নজরুল ইসলাম সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন ওই সভার মধ্যমণি। নজরুল তাঁর স্বভাবজাত ভঙ্গিতে কিছু বক্তব্য রেখে উদাত্ত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে দেন। মজার কথা হল, সভা থেকে বেরিয়ে এসে স্কুলের জলঘরের সামনের একটা উঁচু জায়গায় বসে নজরুল আপনমনে

একটা ঠোঙা করে মুড়ি ও তেলেভাজা খাওয়া শুরু করেছেন। আমি বাইরে এসে তাঁর ওই অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যাই। নৃপেন্দ্রনাথ কখন যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা জানি না। হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, হীরেন ওঁকে একটা থালা দিতে পারনি। তাড়াতাড়ি একটা থালার ব্যবস্থা কর। আমি তাকিয়ে আছি আর নজরুল খেয়েই চলেছেন। আমার যখন ঘোব কাটল, তখন উনি উঠে পড়েছেন। এ দৃশ্য কী সহজে ভোলা যায়!

নজরুলের নাটক ও নাটকে নজরুলের গান

ব্রহ্মমোহন ঠাকুর

অনেকান্ত জীবন নজরুলের, কখনও রুটির দোকানে কর্মচারী কখনও লেটো দলের কবি, কখনও সৈনিক, কখনও প্রেমিক, কখনও বিদ্রোহী, কখনও সাধক, কখনও আমির, কখনও ফকির। এ রকম নাটকীয় উপাদানে যাঁর জীবন গঠিত তিনি নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। বাল্যকালে লেটো দলের কবি হিসাবে যে সব পালাধর্মী নাটক রচনা করেছিলেন তার কয়েকটি হল—'রাজপুত্র', 'আকবর বাদশা', 'চাষার সঙ', 'ঠগপুরের সঙ', 'মেঘনাদ বধ', 'শকুনি বধ', 'যুধিষ্ঠির', 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'কবি কালিদাস', 'দাতা কর্ণ' ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে 'রাজপুত্র' এবং 'চাষার সঙ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

করাচির সৈনিক জীবন হতে ১৯২০ সালে কলকাতায় ফিরে এসে তন্নিষ্ঠভাবে তিনি শুরু করলেন তাঁর সাহিত্য জীবন। প্রথম দিকে উপন্যাস, কবিতা এবং গান রচনাতেই তাঁর সাহিত্য জীবন। প্রথম দিকে উপন্যাস, কবিতা এবং গান রচনাতেই তাঁর অভিনিবেশ ছিল বেশি। নাটক রচনা বা নাটকের জন্য গান রচনা তিনি কিছু পরে আরম্ভ করেন।

প্রথম নাটক রচনা তিনি শুরু করেন বহরমপুর জেলে মাদারিপুরের পূর্ণচন্দ্র দাসের শান্তি-সেনা চারণদলের অভিনয়ের জন্য। নজরুল হুগলি জেল হতে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত হন ১৯২৩ সালের ১৮ই জুন তারিখে এবং ঐ জেল থেকেই মুক্তিলাভ করেন ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে। ঐ জেলে তাঁরই সঙ্গে বন্দী অবস্থায় ছিলেন মাদারিপুরের শান্তি-সেনা চারণ দলের অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাস এবং নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ('দেশের ডাক' গ্রন্থের লেখক)। এখানেই পূর্ণচন্দ্র দাস এবং নরেন্দ্রনারায়ণের পরামর্শক্রমে নজরুল চারণদলের অভিনয়ের জন্য নাটক লেখেন। শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্‌মেদ জানিয়েছেন :

> 'বোধ হয় জুলাই মাসের শেষ ভাগে হবে, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত কোন কাজের উপলক্ষে কয়েকদিনের জন্যে বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল হতে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে এলেন। তিনি নজরুলের নিকট হতে আমার জন্যে গোপনে একখানা পত্র নিয়ে এসেছিলেন....লি-খেছে, আমার কথা সে সব শুনেছে। আমি কি বহরমপুরে বদলী হতে পারি না? তার পরে লিখেছে তার সময় ভালই কাটছে। শ্রীপূর্ণ দাস (মাদারীপুরের) একখানা নাটক লিখে দেওয়ার জন্যে তাকে অনুরোধ করেছেন। তাই লিখছে সে তখন। শ্রীপূর্ণ দাস বাইরে গিয়ে একটি চারণ দল গঠন করবেন। সেই চারণ দলের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন নাটকখানার। নজরুলের এই নাটক লিখিত হয়েছিল, তার পাণ্ডুলিপি জেল হতে বাইরে নিরাপদে পৌঁছেও গিয়েছিল, কিন্তু তার পরে নাকি পাণ্ডুলিপিখানা হারিয়ে যায়। নজরুল ইসলামের একটা সৃষ্টি এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

নজরুলের লিখিত প্রথম নাটক সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এই বর্ণনা হতে আমরা পেয়ে যাই কিন্তু রচনাকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাই না। সেটি পাই নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর রোজনামচা হতে। তাঁর লেখা হতে উদ্ধৃত করা যাক:

'আমার রোজনামচা: তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। আজ সব স্থির হইয়া গেল। বাইরে যাইয়া আমরা—পূর্ণবাবু, কাজী ও আমি চারণদল গড়িয়া তুলিব। কাজী পালা গাঁথিবেন, গানের সুর দিবেন, গান গাহিবেন। আমার উপর থাকিবে অভিনয়ের দায়িত্ব। পরিচালনার ভার থাকিবে পূর্ণবাবুর উপর।'

স্মৃতি অপেক্ষা রোজনামচার সাক্ষ্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এর একটি গান রক্ষা পেয়েছে। গানটি হল বিখ্যাত—'জাতের নামে বজ্জাতি সব'। গানটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ সংখ্যায় বিজলীতে এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩৩০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পাদটীকায় লেখা ছিল—মাদারীপুর শান্তি-সেনাচারণদলের জন্য লিখিত অপ্রকাশিত নাটক হতে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে সে সময় শ্রাবণ সংখ্যার পত্রিকা শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হত না, অন্তত তিন-চার মাস পরে প্রকাশিত হত।

দ্বিতীয় নাটকটিও বহরমপুর জেলেই রচনা করেছিলেন নজরুল ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে:

এরপর শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাস অবলম্বনে শান্তিপদ সিংহের নাট্যরূপটিতে একটি গান লিখে দেন। এ সম্বন্ধে শান্তিপদ সিংহ স্বয়ং জানিয়েছেন:

'কবিকে হুগলী জেলে বদলী করবার পর কলকাতা অসহ্য হয়ে ওঠে। তার ওপর এ পুলিশের নজর থেকে একটু শান্তি পেতে আমি এক কোলিয়ারীতে চলে যাই। সেখানে কিছুই করবার ছিল না বলে প্রচুর সময় পাই। সেই সময় শরৎচন্দ্রের অদ্বিতীয় উপন্যাস 'চরিত্রহীনে'র নাট্যরূপ দেবার ইচ্ছা হয়। বইটা নিয়ে আমি দিনরাত খেটে একটা নাটকের কাঠামোয় দাঁড় করাই।....কবিকে (নজরুলকে) আমি মাঝে মাঝে গ্রন্থনা পড়ে শোনাতাম। সিন সেটিং এর মাঝখানে নায়ক অতীশের মেসে ভিখারীর মুখে একটা গান দেবার জায়গা রেখেছিলাম। কবিকে বলতে তিনি সদ্য সদ্য ঐ গানটি লিখে দেন। বাউল সুরের সময়োপযোগী গান।'

গানটির কথা, সঠিক সন, তারিখ উল্লেখ না থাকলেও ধারণা করা যায় যে কবি জেল হতে মুক্তি পাবার গানটি লিখেছিলেন।

গানটি হচ্ছে—'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল'।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে কাজী মোতাহার হোসেনকে একটি চিঠিতে নজরুল লিখছেন—হাঁ, কি নাটক লিখব বল তা! ওদের idea কি তা ত জানা নেই। নাটকটা ওখানে গিয়েই লিখে দেবো দুদিনে।' কোন্ প্রসঙ্গে নাটকটি লেখার কথা হয়েছিল জানা যায় না, তবে নাটক লেখার ব্যাপারে নজরুলের আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিটি লক্ষণীয় (দু দিনে লিখে দেওয়া)। নাটকটি সম্ভবত লেখা হয় নি।

নজরুল নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন দু'ভাবে— ১) নিজে নাটক রচনা করে, ২) অপরের লিখিত নাটকের জন্য গান রচনা করে এবং তাতে সুর সংযোজন করে। দ্বিতীয় কাজটিতে তাঁর ভূমিকা আরও বেশি এবং এ কাজ করতে গিয়েই তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হন। এ কথা সুস্পষ্টভাবেই বলা যায় যে সুরস্রষ্টা নজরুলকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরতে সবচেয়ে বলা যায় যে সুরস্রষ্টা নজরুলকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল রঙ্গমঞ্চগুলি। রঙ্গমঞ্চে তাঁর ভূমিকাই আরম্ভ হয় অপরের লিখিত নাটকের জন্য গান রচনা ও তাতে সুর সংযোজন করে। ১৯২৯ সালের ২রা জুন তারিখে মনোমোহন থিয়েটারে শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের সমস্ত গানগুলি রচনা করেছিলেন এবং সুর দিয়েছিলেন নজরুল। অপরিসীম

পরিশ্রম করেছিলেন নজরুল এই নাটকটির জন্য, তারই স্বীকৃতি স্বরূপ লেখক শচীন সেনগুপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন নজরুলকেই মর্মস্পর্শী ভাষায় :

কবি নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

নজরুল,

বইখানি পড়ে খুশী হয়ে তুমি গান লিখে দিয়েছ। শুধু তাই নয়, স্বরচিত গানে তুমি সুর দিয়েছ এবং অক্লান্ত শ্রম করে সে গান তুমি অভিনেত্রীদের শিখিয়েছ। তোমার গানের দাম আমি জানি। তাই ঋণের কথা না তুলে, বইখানির সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে দিলুম।

তোমার গুণমুগ্ধ

শচীনদা।

নিবেদন অংশে শচীন সেনগুপ্ত জানিয়েছেন—'রক্তকমল প্রথমে প্রকাশিত হয় 'নটরাজে'।...... আমার পরম স্নেহভাজন কবি নজরুল ইসলাম ন'খানি গান রচনা করে দিয়েছেন।

কিন্তু শচীন সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে তাঁর একটি পুস্তকে জানিয়েছেন—

'নজরুল ওই নাটকের জন্য সাতখানা গান লিখে দিলেন; ইন্দুবালার চারখানি গান রক্তকমলের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠল।.... শেফালিকা দুখানি আর সরযূবালা একখানি গান গাইতেন। রক্তকমলের এই সাতখানি নজরুলগীতিই খুবই জনপ্রিয় হয়। এই বক্তব্য হতে মনে হয় রঙ্গমঞ্চে দুটি গান বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং সে দুটি 'মমতা' চরিত্রের গান। প্রকৃতপক্ষে সরযূবালা দেবী দুটি গান গাইতেন এবং সে দুটি হ'ল—'দারুণ পিপাসায় মায়া মরীচিকায়' ও 'মোর ঘুম ঘোরে'।

'রক্তকমল' নাটকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণই ছিল ইন্দুবালার কণ্ঠে নজরুলের গান। এ সম্পর্কে নবশক্তি পত্রিকা লিখেছিল :

'এইবার রক্তকমল অভিনয়ের সব চেয়ে বড় আকর্ষণের উল্লেখ করব। তা হচ্ছে পূরবীর ভূমিকায় সুবিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালার গান। পূরবী, রক্তকমল নাটকের অন্তর্গত কোন চরিত্র নয়। অভিনয়ের পূর্বে প্রতি দৃশ্যের পূর্বাভাস তুলতে এই চরিত্রটিকে সৃষ্ট করা হয়েছে। এই হিসাবে সে নাটকের গল্পকে এগুতে সাহায্য করে। পূরবী এই পূর্বাভাস ফুটিয়ে তোলেন গানের মধ্যে। এবং এ দ্বারা তার পরবর্তী দৃশ্যের উপযোগী এমন একটা পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয় যা শ্রীমতী ইন্দুবালার মুখে কাজী নজরুল ইসলামের এই গানগুলি শোনবার পূর্বে সম্ভব বলে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন হত।....কথার তুলিতে কাজী যে ছবি আঁকেন সুরের আগুনে তা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে শ্রীমতী ইন্দুবালার কণ্ঠে।'

'রক্তকমলে'র পর মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকের জন্য গান রচনা করে এবং সুরে যোজনা করে নজরুল খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করলেন। 'মহুয়া' নাটকও অভিনীত হয়েছিল মনোমোহন থিয়েটারে এবং প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ১০২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে। পুস্তকাকারে 'মহুয়া' নাটকের ভূমিকায় লেখক মন্মথ রায় স্বয়ং লিখেছেন :

'আমার লেখনীর অক্ষমতাকে এমনি করিয়াই সার্থক সুন্দর করিয়াছেন আমার গীত-সুন্দর কবি নজরুল ইসলাম।'

'মহুয়া' নাটকের গানগুলি সুরের দিক হতে ছিল অভিনব। কোনও কোনও গানের সুর ছিল একাধিক রাগের দক্ষ মিশ্রণে। 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান' গানটি বেহাগ ও বসন্ত রাগের মিশ্রণে গঠিত, 'এক ডালি ফুলে ওরে' গানটি তিলোক কামোদ রাগ ও দেশ রাগের মিশ্রণে গঠিত ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে তিনি এই নাটকে প্রথম নানা ধরণের লোকগীতির সুর প্রয়োগ করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। পশ্চিমবঙ্গে 'ঝুমুর' আঙ্গিকে সুর করলেন 'কে দিল খোঁপাতে' ও 'মহুল গাছে ফুল ফুটেছে' গান দুটিতে এবং পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি, সাম্পান সুরে রচনা করলেন—'আমার

গহীন জলের নদী' 'তোমায় কূলে তুলে বন্ধু' এবং 'ও ভাই, আমার এ নাও যাত্রী না লয়' গানগুলি। সে যুগে এও ধরনের প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক ছিল।

'মহুয়া'র গান এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে সব গানগুলি নিয়ে একটি ছোট পুস্তিকা ডি এম লাইব্রেরী প্রকাশ করলে তার রেকর্ড বিক্রি হয়। এ সম্বন্ধে ডি এম লাইব্রেরির প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার স্বয়ং জানিয়েছেন :

> 'পরলোকগত মুজফ্ফর আহ্মেদ সম্পাদিত পত্রিকায প্রকাশিত নজরুলের সাম্যবাদী প্রকাশ করলাম আমি আর নাট্যকার মন্মথ রায় লিখিত 'মহুযা' নাটকের অন্তর্গত নজরুলের ন'খানি গান মাত্র দু আনা দামের সিরিজের বইরূপে। কি অসম্ভব বিক্রি এ ছোট্ট দুখানি পুস্তিকার। বিন্দু থেকে সিন্ধু লাভ হল আমার।'

নাটকে গানগুলি কতখানি জনপ্রিয হয়েছিল তা এই স্বীকৃতি হতে বোঝা যায়। এই ছোট্ট বইটি পরে আর মুদ্রিত হয়নি।

'কোথা চাঁদ আমার' গানটি যে 'মহুয়া' নাটকের গান সে তথ্য এই ছোট্ট বইটি হতেই জানা যায়। মূল নাট্যগ্রন্থে এ গানটি নেই। বোঝা যায় যে রঙ্গমঞ্চে অভিনযকালে গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'জাহাঙ্গীর' নাটক মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ তারিখে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। এই নাটকে নজরুলের একটি গান ছিল। গানটি হল—'রংমহলের রংমশাল মোরা'। নাটকে গানটির বাণী সামান্য ভিন্ন। সেখানে প্রথম পঙ্‌ক্তি—'রঙমহলে গো রঙ্গমশাল মোরা আমরা রূপেব দিপালী।'

মন্মথ রায়ের লেখা 'কারাগার' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয মনমোহন থিয়েটারে ১৯৩০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে এবং ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আঠারোটি অভিনয়ের পর, সরকারের নিষেধাজ্ঞার ফলে বন্ধ হয়। ইংরেজ সরকার নাটকটিতে রাজদ্রোহের গন্ধ পান। পরে জনসাধারণের প্রতিবাদের চাপে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওযা হয় এবং পুনরায় নাট্যনিকেতন থিযেটারে ৮ই আগস্ট, ১৯৩১ হতে অভিনীত হতে থাকে। নাটকটিতে গান রচনা করেছিলেন নজরুল ও হেমেন্দ্রকুমার রায়, কিন্তু একটি গান ছাড়া সকল গানেরই সুরকার ছিলেন নজরুল। 'কারাগার' নাটকে নজরুলের যে গানগুলি ছিল সেগুলি এই :

১ জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী
২ মন্দিরে মন্দিরে জাগো দেবতা
৩ কারা পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ
৪ পূজা দেউলে মুরারী শঙ্খ নাহি বাজে
৫ নাহি ভয় নাহি ভয়
৬ তিমির বিদারি অলক বিহারি
৭ নিরভ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন
৮ আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈ বরাভয়

এবার একটি অজানা নাটকের উল্লেখ করা হবে যার গানগুলির সুরকার ছিলেন নজরুল। নাটকটি ছিল যতীন্দ্রমোহন সিংহ রচিত 'ধ্রুবতারা' উপন্যাস অবলম্বনে নাটক 'ধ্রুবতারা'। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। 'ধ্রুবতারা'র ছয়টি গানের মধ্যে দুটি ছিল রবীন্দ্রনাথের, আর বাকি চারটি ছিল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা। নজরুলের সুরারোপিত গান হল :

১ গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই
২ বাজাও বুকে তোমার বীণ
৩ মাধবী মোর স্বপন ভোর সুরভি
৪ প্রাণ বাগিচার ভোমরা আমি

নাট্যনিকেতন তাঁদের বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেছেন :

আমাদের নূতন নাটক রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর প্রণীত সুবিখ্যাত উপন্যাস ধ্রুবতারা— নাটকাকারে ধ্রুবতারার নূতন রূপ দিয়েছেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়—সঙ্গীতের সুর দিয়াছেন আধুনিক বাঙলার শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী কবি নজরুল ইসলাম।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নাট্যনিকেতনে প্রথম মঞ্চস্থ হয় মন্মথ রায়ের লেখা নাটক 'সাবিত্রী'। এই নাটকের সমস্ত গানের গীতিকার ও সুরকার নজরুল।

এর আগে দু-একটি নাটক লিখেছিলেন নজরুল কিন্তু সেগুলি ছিল মহড়া মাত্র। 'আলেয়া' নাটক তার সত্যকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি সাংকেতিক গীতিনাট্য। এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নাট্য-নিকেতনে ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩১ তারিখে। সে আমলে একটি সাংকেতিক গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করার রীতিমত দুঃসাহসের কাজ ছিল। 'আলেয়া' নাটক-গ্রন্থের ভূমিকায় কবি যা বলেছেন তা হতে নাটকটির মর্ম বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন :

'এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা—আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হতে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই ওর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী— চিরকালের নর-নারীর প্রতীক—এই আগুনে দগ্ধ হল, তাই নিয়ে এই গীতিনাট্য।'

নরনারীর প্রেমের যে রহস্যময় লীলা পৃথিবীকে বিচিত্র সুন্দর করে তোলে তারই সাংকেতিক প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকটিতে। যৌবন-তপ্ত প্রেমের এই গীতিনাট্যে স্বাভাবিকভাবেই গানের সংখ্যা অনেক বেশি। গানগুলির সুরেও রয়েছে বৈচিত্র্য। নাটকটিতে প্রধান ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন: কবি—জ্ঞান দত্ত, মীনকেতু—ধীরাজ ভট্টাচার্য, চন্দ্রকেতু—ভূমেন রায়। এ ছাড়া ছিলেন—নীহারবালা, নিরুপমা, তারা, সন্তোষকুমারী, পারুল প্রভৃতি।

রঙ্গমঞ্চে নাটকটির অভিনয় দেখে একটি সমালোচনা লিখেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু।এই তাৎপর্যপূর্ণ সমালোচনাটির অংশ বিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হল :

বাঙালী গীতিরসিক জাতি। গান না থাকলে বাঙলা নাটক চলে না,.....নাট্যনিকেতন পুরানো প্রথা লঙ্ঘন করে নিজস্ব নূতনরীতি প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী। তাই সেখানে যখন গীতিনাট্য খোলা হল আমরা দেখতে পেলাম নজরুল ইসলামের আলেয়া। গীতিনাট্য লেখবার যোগ্যতা জীবিত বাঙালী লেখকদের মধ্যে নজরুল ইসলামের চেয়ে বেশী আর কারো নেই। প্রথমতঃ তিনি কবি, তা ছাড়া তিনি সুরশিল্পী। বাঙলা সঙ্গীতে তিনি সম্পূর্ণ একটি নূতন ঢঙ প্রবর্তন করেছেন ; সাহিত্যের চাইতে সঙ্গীতে তাঁর দান বেশী ছাড়া কম নয়। হিন্দু রাগ রাগিনী ভেঙে, মিশিয়ে, নানারকম সুর তৈরী করতে তিনি ওস্তাদ। এই নজরুলের আলেয়ার এমন একটি জিনিষ হয়েছে যা অত্যন্ত high brow থেকে আরম্ভ করে সাধারণ দর্শক পর্যন্ত সবাই উপভোগ করবেন আলেয়া রূপক নাট্য ; তার বিষয়বস্তু হচ্ছে নরনারীর প্রেম। গল্পাংশ খুব ক্ষীণ ; বহু গানের মাঝে মাঝে অল্প ডায়ালগ ছড়ানো। টেকনিকের দিক থেকে একেবারে খাঁটি musical comedy. গানগুলির ভাষা আর সুর দুই-ই অনিন্দনীয়। নজরুলের যেটুকু করবার তিনি খুব ভালো করেই করেছেন। ডিরেক্টর সতু সেন ও প্রোডিউসার প্রবোধচন্দ্র গুহর যেটুকু করবার তাও তাঁরা অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করেছেন। ....রঙ্গমঞ্চের three dimensional দৃশ্য পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণ দেখে শুধু মুগ্ধ হতে হয়। ...আলেয়ার নৃত্যগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ; কারণ বাঙলা রঙ্গমঞ্চে ও ধরনের নাচ এই প্রথম। বেশীর ভাগই অত্যন্ত দ্রুত, তাদের staccato rhythm মোটেই স্বদেশীয় নয়, আগাগোড়া বিলিতি ধরনের......আলেয়া দেখতে গিয়ে অনেক নুতন মুখ দেখলাম। এ নাটকে তেমন কোন প্রধান ভূমিকা নেই, ব্যক্তিগত অভিনয়ের চেয়ে mass acting -ই এখানে বড়। তাই এই সুযোগে

নাট্যনিকেতনের কর্তৃপক্ষ অনেক নূতন artist-কে সুযোগ দিয়েছেন.....শ্রীমতী নীহারবালা শুধু ব্যালে গার্লদের একজন, তার বেশি কিছু নন; 'ছোট নীহার' শ্রীমতী নিরুপমাকে তাঁর যথাসাধ্য করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একক গানগুলো গাইবার জন্য একটি নতুন মেয়েকে (শ্রীমতী পারুল) নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি সুকণ্ঠী কিন্তু stage fright কাটতে এখনো দেরি আছে। একক গান সব চেয়ে ভাল গেয়েছেন কবির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত জ্ঞান দত্ত। রঙ্গমঞ্চে ইনিও নতুন। আর একজন নতুন হচ্ছেন মীনকেতুর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য। তাকে দেখাচ্ছিল বেশ, অভিনয়ও মন্দ করেন না;......চন্দ্রকেতুর ভূমিকায় শ্রী ভূমেন রায়ের অভিনয় আরো ভালো হবে আশা করেছিলাম।

এই লেখাটি আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত এবং মূল্যবান লেখা হতে তাঁর মতামতই শুধু নয়, নাটকটি সম্বন্ধে অনেক দরকারি তথ্যও পেয়ে যাই। 'আলেয়া' নাটকে রঙ্গমঞ্চে কোন্ গানগুলি ছিল এ সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে।

তাছাড়া, এর ২৪টি গান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেলেও, আরও কিছু গান ছিল বলেই মনে হয়।

১৩৩৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'কল্লোল' পত্রিকায় সাহিত্য সংবাদ বিভাগে জানানো হয়েছে—'নজরুল ইসলাম একখানি অপেরা লিখেছেন। প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন 'মরুতৃষা'। সম্প্রতি তার নাম বদলে 'আলেয়া' নামকরণ হয়েছে। গীতিনাট্যখানি সম্ভবতঃ মনোমোহন অভিনীত হবে। এতে গান আছে ত্রিশখানি। নাচে গানে অপরূপ হয়েই আশা করি এ অপেরাখানি জনসাধারণের মন হরণ করবে।'

মনে হয় প্রথম দিকে আলেয়া মনোমোহনে অভিনীত হবার কথা ছিল। যাই হোক, এখানে ত্রিশখানি গানের কথা বলা হয়েছে।

আলেয়ার গানগুলির সুরে বৈচিত্র্য ছিল—কখনও মার্চসং, কখনও গজল, কখনও রাগপ্রধান, কখনও নৃত্যসম্বলিত চটুল সুর—সব ধরনের সুরই ছিল। 'আধো ধরণী আলো' গানটিতে তিলককামোদ ও পিলু রাগের মিশ্রণে ছিল দক্ষতা। কোমল নিষাদ যুক্ত বিষ্ণুপুর ঘরাণার তিলক কামোদকে এখানে নজরুল গ্রহণ করেছেন যাতে পিলুর মিশ্রণ ঘটাতে সুবিধা হয়।

নাট্য-নিকেতনের পক্ষ থেকে নাচঘর পত্রিকার ২রা পৌষ, ১৩৩৮ সংখ্যায় 'আলেয়ার' বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এ ভাবে:

নাট্যনিকেতন
নবরূপ পরিকল্পনার দ্বিতীয় অবদান
কবি কাজী নজরুল ইসলামের

—আলেয়া—
শনিবার ৩রা পৌষ রাত্রি ৭ টায়
রবিবার ৪ঠা পৌষ দুবার অভিনয়।

নাচঘর পত্রিকায় সত্যসখা সেন 'আলেয়া' নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের কারণগুলিকে চুম্বকীকৃত করেছেন এ ভাবে:

আলেয়ার কতকগুলি বিশেষত্ব দেখতে পেয়েছি। তা হচ্ছে এই—

ক) সত্যিকারের গান খ) সুরের বৈচিত্র্য গ) নাচের অনিন্দ্য সুন্দর রূপ ঘ) রঙয়ের আশ্চর্য্য খেলা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'আলেয়ার' গানের প্রশংসা (বাণী সুর উভয় দিক হতেই) বুদ্ধদেব বসুর মতো খুঁতখুঁতে সমালোচক হতে শুরু করে সকলেই করেছেন। এই নাটকের অভিনয়কালীন এক রাত্রে

একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল—যা তাকে তাঁর মঞ্চভীতির ব্যাপারটি জানা যায়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভাষাতে তা এই:

'নাট্য নিকেতনে তাঁর একখানি নাটক খোলা হয়, নাম 'আলেয়া'। তার মধ্যে কবির এক ভূমিকা ছিল। কবি সেজে সুপরিচিত গায়ক শ্রীজ্ঞান দত্ত কথা বলতেন, গান গাইতেন। একদিন পটোত্তলনের সময় এল, কিন্তু জ্ঞান দত্ত অনুপস্থিত। কর্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। প্রথম দৃশ্যেই কবিকে দরকার।.....রঙ্গাল-য়ের কর্তা শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ অগত্যা নজরুলকে ধরে পড়লেন। বললেন 'তোমার নাটক, তোমার কথা, তোমার গান। সে গান তুমিই শিখিয়েছ। অতএব তুমিই কবি সেজে স্টেজে নেমে আমাদের মান বাঁচাও।' উপরোধ ঠেলতে না পেরে নজরুল নিমরাজী হয়ে গেলেন। যবনিকা উঠল। দেখা গেল কবি দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে রঙ্গমঞ্চে বসে আছেন—যা তাঁর থাকবার কথা নয়। সেই অবস্থাতেই তিনি গান গাইলেন। যতক্ষণ মঞ্চের উপরে রইলেন, একবারও মুখ দেখালেন না। তারপর দৃশ্য পরিবর্তন হল। বিবর্ণমুখে নজরুল বাইরে বেরিয়ে এলেন পুতুলের মত। খানিকক্ষণ যায়। আবার কবিকে মঞ্চে দেখা দিতে হবে। কিন্তু কোথায় কবি? অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে আবিষ্কার করা গেল না। কবি একেবারে উবে গিয়েছেন। প্রবোধবাবু তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বার অবস্থা। এমন সময়ে জ্ঞান দত্তের আবির্ভাবে সকলকার দুশ্চিন্তা দূর হল, কি এক দুর্ঘটনায় তিনি আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। পাছে আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতে হয়, সেই ভয়ে নজরুল থিয়েটারের পিছনে দরজা দিয়ে পলায়ন করেছিলেন।'

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৮শে কার্তিক তারিখে নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেব 'ঝড়ের রাতে' নাটক। নাট্যগ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—'শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র রায় এই নাটকের গান রচনা করেছেন, কবি নজরুল এবং আর একটি বিশিষ্ট বন্ধু করেছেন সেই গানে সুরযোজনা (প্রকাশক: অখিল নিয়োগী, নিয়োগী নিকেতন; ১৯২/এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা)।' আমাদের অনুমান এই বিশিষ্ট বন্ধু হলেন অখিল নিয়োগী।

১৯৩৬ সালের ৩০শে মে তারিখে রঙমহল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'সর্বহারা'। 'সর্বহারা' নাটকের (গ্রন্থরূপ) 'ঋণ-স্বীকার' অংশে লেখক লিখেছেন:

'মুখে তাদের চপলহাসি' এই গানটি ভিন্ন নাটকের। অন্য গানগুলি সুকবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা। তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।'

'সর্বহারা' নাটকের নজরুল রচিত গানগুলি এই:

১ এই রইল তোর সাধের বসন (দ্বৈত সংগীত)
২ ওগো চৈতী রাতের চাঁদ যেও না (নৃত্য সংগীত)
৩ জাগো রূপের কুমার (নৃত্য সংগীত)
৪ নবীন বসন্ত যে যায়
৫ পাপিয়া আজ কেন ডাকে সখি
৬ মলয় হাওয়া আসবে কবে ফুল ফোটাতে
৭ সখি! দখিনা মলয় ঝিরি ঝিরি বয়

১৯৩৬ সালের আগস্টে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'আলাদীন' নাটকটি নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটি সম্বন্ধে কোনও তথ্য আজ আর কোথাও পাওয়া যায় না। তৎকালীন খেয়ালী পত্রিকা জানিয়েছে:

নাট্য-নিকেতন: এই রঙ্গমঞ্চে 'আলাদীনে'র আশ্চর্য্য প্রদীপ জ্বলে উঠেছে কাল সন্ধ্যে থেকে। 'আলাদীনে'র বিশেষত্ব-এর প্রযোজনা করেচেন সুধীর গুহ, পরিচালনা করেছেন ভূমেন রায়, গীত সংযোজনা করেছেন কাজী নজরুল, আর নৃত্যের রূপ দিয়েছেন নীহারবালা।

'আলাদীন' নাটকের গানগুলির সন্ধান পাওয়া গেলে, নজরুলের কিছু লুপ্ত গানের হদিশ পাওয়া

যেতে পারে।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র তারিখে (২৩শে আগস্ট, ১৩৩৬) রঙমহলে মঞ্চস্থ হয় যোগেশ চৌধুরী রচিত 'নন্দরানীর সংসার'। গানগুলির সুরকার ছিলেন নজরুল।

১৯৩৭ সালের ২৮শে এপ্রিল (১৫ই বৈশাখ ১৩৪৪) তারিখে নাট্যনিকেতনে মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটক মঞ্চস্থ করেন ক্যালকাটা থিয়েটার্স। নাট্যগ্রন্থেব ভূমিকায (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪) মন্মথ রায় লিখেছেন 'বন্ধুবর কাজী নজরুল ইসলাম 'সতীর' জন্য গীত রচনা ও সুরসংযোজনা করিযাছেন। এ নাটকের গানগুলি অদ্যাবধি অগ্রন্থিত অবস্থায ছিল। বর্তমান লেখক কর্তৃক 'অপ্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থে তা প্রকাশিত হযেছে।

১৯৩৮ সালের ২৯শে জুন তারিখে নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয শচীন সেনগুপ্তেব 'সিরাজদ্দৌল্লা'; এই নাটকের জন্য নজরুল গান রচনা ও সুব যোজনা করেছিলেন। নাটকটি এবং গানগুলি সে সময অত্যন্ত জনপ্রিয হয়েছিল—যে কারণে ১৯৩৮ সালেব নভেম্বব মাসে এইচ.এম ভি বেকর্ড কোম্পানি হতে রেকর্ড নাটিকা প্রকাশ করতে হযেছিল।

১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর, তারিখে (শুক্রবার) মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনয অনুষ্ঠিত হয মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'দেবী দুর্গা' নাটক; তারিখটি ছিল দুর্গা পূজার মহাষষ্ঠীর দিন। এই নাটকের সকল গানের রচযিতা ও সুরকাব নজরুল। নাট্যগ্রন্থের ভূমিকায নাট্যকার জানিযেছেন—'এ নাটকের গানগুলি সবই রচনা করেছেন এবং সুর দিয়েছেন--গীত সুন্দর কাজী নজরুল ইসলাম। দেবী দুর্গার রূপকার আমি আর লাবণ্য দিয়েছেন তিনি!'

'দেবী দুর্গা' নাটকের অন্তর্ভুক্ত নজরুলের গানগুলি লুপ্ত হওযায, নজরুল গবেষণার স্বার্থে এগুলিকে পুনরুদ্ধার করা প্রযোজন।

নজরুলের 'মধুমালা' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬৫ সালের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুযারিতে।

'মধুমালা' একটি রূপকধর্মী গীতিনাট্য : যদিও এর মধ্যে অপার্থিব পরিবেশ রয়েছে বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছে (যা রূপকথায় ঘটে থাকে), তবুও কাহিনীতে, মানবীয় চেতনা বহুল পরিমাণে সঞ্চারিত হয়েছে। 'মধুমালা' নাটকের গানগুলি হল :

১ জাগো বনলক্ষ্মী;
২ হে বিজযী! হে না দেখা রূপের কুমার এস এস;
৩ সুন্দর! সুন্দর!
৪ মোদের মর্দানা ঢঙ নাচা;
৫ ঘুম আয় ঘুম, ঘুম ঘুম ঘুম,
৬ এরি লাগি তপস্যা কি করে আঁধার রাতি;
৭ যেন দুধ সাগরের ননী দিয়ে তৈরী লো এর গা;
৮ তুমি কে গো;
৯ ওলো এক চাঁদকে সৃষ্টি করে বিধির পুঁজি শেষ;
১০ এতো একা চন্দ্রমণি;
১১ আয় আয় মোর ময়ূর বিমান আকাশ নদী বেয়ে;
১২ সোনার খাটে ঘুমায় কন্যা রূপোর খাটে কেশ;
১৩ নিঝুমে নিদ্রা যায় রে মধুমালা রাজার ঝিয়ারি
১৪ ভোরের তরুণ অরুণে আর পূর্ণিমার চাঁদে;
১৫ কি অনল জ্বলে লো সই;

১৬ আমি হেরে এবার নেবো লো সই বঁধুর গলার হার ;
১৭ তোমার চন্দন রং উত্তরীয ;
১৮ আহা ! সুনীল নীরদে ঢাকিল অরুণ ;
১৯ পূব সাগরে ডুব দিযে ঐ সোনার রবি ;
২০ তুমি যেযো না ;
২১ কেউ বলতে পার কোথায আমার মধুমালার দেশ ?
২২ এই কাঞ্চন নগরেব বাদশা নাম দন্ডধর ;
২৩ আমারে ভাসালে অসীম আকাশে তোমারে ভাসানু জলে ;
২৪ ওরে ও পদ্মানদী বলতে পারিস কোথায মধুমালা ;
২৫ বোন্ রে বোন্ ও কোন্ রূপ দেখালি ;
২৬ আমরা বনের পাখী বনের দেশে থাকি ;
২৭ মধুর মধুর আজি—সকলি মধুব ;
২৮ ও বন পথ ! ওবে নদী কোথায বে তোব শেষ ;
২৯ ফুলের হাওযা যা বে ছুটে মধুমালাব দেশ ;
৩০ তুমি হেসে চলে গেলে বন্ধু তোমার কাঁটার পথে ;
৩১ তুমি এতদিনে মরণ টানে টানলে বুকের কাছে ;
৩২ সাগব জলে খেলতে এল তোর আকাশের চাঁদ ;
৩৩ বন্ধু বিদায ;
৩৪ আমাব পাযের বেড়ী ;
৩৫ নিশির পাহারা ভেঙে চোর এসেছে ঘরে ;
৩৬ অনেক জ্বালা দিযেছ তার শাস্তি পাবে কালা ;
৩৭ ওগো বন্ধু ! দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ ;

১৯৩৯ সালে 'দেবী দুর্গা' নাটক হতেই নজরুলের মিনার্ভার সাথে যোগাযোগ শুরু হয। এরপর ১৯৪১ পর্যন্ত নজরুল কেবল মাত্র মিনার্ভার সাথেই যুক্ত থাকেন। ১৯৪০ সালে সারা বৎসরই তিনি মিনার্ভা থিযেটারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, আবাব একই সমযে বেতারেও নানা অনুষ্ঠানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এ সব কাবণে সিনেমায ও বেকর্ডে এ বছরে সে রকম সময দিতে পারেননি। নজরুলের কোনো কোনো ছাত্র বলেছেন যে ১৯৪০ সালে বেকর্ড কোম্পানিতে প্রশিক্ষণ দিতে নজরুলকে খুবই কম দেখা যেত (সূত্র : সুশীল চট্টোপাধ্যাযের সাথে সাক্ষাৎকার)।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায রচিত 'অন্নপূর্ণা' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভায় ৩রা মার্চ, ১৯৪০ তারিখে। নাট্যগ্রন্থেব ভূমিকায পরিচয শিরোনামায লেখক জানিযেছেন—'এই নাটকের অধিকাংশ গান (২য অঙ্কের ১ম দৃশ্যে পুরকন্যাগণ, ৩য অঙ্কের ১ম দৃশ্যে গণপতি ও কেশব এবং ৪র্থ অঙ্কের ২য় দৃশ্যের ক্ষুধাতুর বালকগণের ব্যতীত) বন্ধু সাধক কবি কাজি নজরুল রচনা ও সুর সংযোগ করিয়াছেন। প্রত্যেক গানখানি তিনি নাট্যকারের সহযোগিতায নাটকের বিষয়বস্তুর অনুসরণে রচনা করায় স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক হইযাছে।' ('অন্নপূর্ণা', বরেন্দ্র লাইব্রেরি ; ২০৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, চৈত্র, ১৩৪৬)। নাটকটিতে রযেছে মোট ১৭টি গান যার মধ্যে ১৪টি গান নজরুলের রচিত। এই ১৪টি গানের মধ্যে 'যত ভুল তত ফুল' এবং 'শোনো ডাকে রে ঐ ডাকে মোরে ডাকে' গান দুটি ছাড়া বাকি ১২টি গান লুপ্ত ছিল। সকল গানেবই সুরকার ছিলেন নজরুল।

১৯৪০ সালেব ২৫ শে তারিখে রাত্রি সাড়ে সাতটায় মিনার্ভায় আশুতোষ সান্যালের রচিত 'বন্দিনী' নাটক মঞ্চস্থ হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বন্দিনী নাটকের নিবেদন অংশে নাট্যকার লিখেছেন—"সুবিখ্যাত

সুরশিল্পী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'বন্দিনী'র গানগুলিতে অপূর্ব সুর সংযোগ করিয়া এবং কৃষ্ণা চরিত্রে 'কুসুম ফুলের মালা গেঁথে' গানখানি রচনা করিয়া দিয়া 'বন্দিনী'কে শ্রীমন্ডিত করিয়াছেন। জনপ্রিয় গায়িকা সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী হরিমতি 'ওগো ভুলানি ঘুম পাড়ানি এস আমার বুকে' গানখানির সুর সংযোগ করিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছেন।' সুতরাং নাটকটির একটি গান ছাড়া সব গানের সুরকার নজরুল এবং একটি গানের গীতিকার আশুতোষ সান্যাল স্বয়ং।

'দেবী দুর্গা'র মতো আর একটি নাটক 'হরপার্বতী'—যার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ আলোচনা করেননি। অথচ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত এই নাটকের সকল গানের গীতিকার ও সুরকার নজরুল। গানগুলি অদ্যাবধি লুপ্ত ছিল—বর্তমান লেখকই প্রথম এগুলির সন্ধান পান।
হরপার্বতীর সন্তান কার্তিক কর্তৃক তারকাসুর বধ—পৌরাণিক এই কাহিনীটিই 'হরপার্বতী' নাটকের উপজীব্য বিষয়।

হরপার্বতী গানগুলির মধ্যে প্রথম গানটি অর্থাৎ 'এস এস বন-ঝরণা' গানটি প্রথম প্রকাশ করেন আবদুল আজীজ আল আমান। নজরুল 'মদিনা' নামে একটি নাটকের ছক ঠিক করে রেখেছিলেন বা পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সেইমত চরিত্রানুযায়ী কয়েকটি গান লিখেছিলেন। এই রচনার পান্ডুলিপি আজীজ সাহেব উদ্ধার করেন ও বাংলাদেশের নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকার, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পিত নাটকের একাদশ নম্বর গান হল 'এস এস বনঝরণা'।

১৯৪০ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে মিনার্ভায় দেবেন্দ্রনাথ রাহার লেখা 'অর্জুন বিজয়' নাটকটির উদ্বোধন হয়। এই নাটকের সমস্ত গানই নজরুলের রচনা। গ্রন্থাকারে নাটকটির 'একটি কথা' শিরোনামে ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন—'সুকবি কাজী নজরুল ইসলাম নাটকের গানগুলি রচনা করিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিযাছেন।'

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত 'ব্ল্যাক-আউট' নামে রঙ্গ-নাট্য। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকটির টাইটেল পৃষ্ঠায় প্রথম অভিনয়ের সময় হিসাবে লিখিত—'মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ভাদ্র ১৩৪৮'। অর্থাৎ অভিনয়ের তারিখ উল্লেখিত হয় নি।

'ভীষণ ভূমিকা' শিরোনামে ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন—'নৃত্যে রতন সেনগুপ্ত, সুর যোজনায় রঞ্জিৎবাবু যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর একটি কথা—সুহৃদ্বর কাজী নজরুল ইসলাম ভূতেশ্বরের দুখানি গান রচনা করে দিয়ে এবং আমায় তা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।' অর্থাৎ ভূতেশ্বর চরিত্রের দুটি গানের রচয়িতাও নজরুল এবং অন্যান্য সব গানের মতই এ দুটি গানেরও সুরকার রঞ্জিৎ রায়।

ভাগ হয়নিকো নজরুল

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

ক

নজরুলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম। গভীর, বিস্ময়কর ও আনন্দময় সে স্বপ্ন। প্রত্যাশার রঙে রঞ্জিত। বিপুল প্রাণশক্তিতে ভরপুর, 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' খোলার উদাত্ত আহ্বানে চঞ্চল। স্বপ্ন দেখার আনন্দ ও স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ একই দিনে ঘটে গেল, মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধানে। দিনটাও মনে আছে ২৯ শে আগস্ট ১৯৭৬, বাংলা, হিসেবে ১২ ভাদ্র ১৩৮৩। সে দিনই তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি করে ঢাকায় নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ এর ২৪শে মে। সেই তাঁর শেষ যাওয়া। ফিরে এলেন না নিজের মাটিতে, আত্মজনের সমাধিভূমিতে। কিন্তু নজরুল যে মানসিকতার কবি তাঁর মাটির কোন ভূগোল নেই, দেশ তো নেইই। তিনি মানুষের কবি, মানুষের মাঝেই শুয়ে আছেন। সুতরাং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা কেন? অন্নদাশংকর রায় অনেককাল আগে বড়োদের জন্য ছড়া লিখেছিলেন: 'নজরুল'।

'ভুল হয়ে গেছে
        বিলকুল
আর সব কিছু
        ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।
এই ভুলটুকু
        বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে
        একজন আছে
দুর্গতি তার
        ঘুচে যাক।'

স্বপ্ন দেখেছিলাম একজন এবং একজনই মাত্র অবশিষ্ট অখণ্ড বাঙালি এক অখণ্ড মৃত্তিকায় শুয়ে থাকবেন, সে বর্ধমানের চুরুলিয়ায় নয়, ধোপদুরস্ত শহর ঢাকাতেও নয়, দুই বাংলার এমন কোন সীমান্তের শ্যামল প্রান্তরে, বৃক্ষ-লতা-ফুল ও পাখির নিবিড় আত্মীয়তায় যেখানে মানুষ এসে দাঁড়াবে তার মানুষ পরিচয় পাসপোর্ট ও ভিসার হৃদয়হীন অবরোধকে অবজ্ঞা করে। এখানে দাঁড়াবার জন্য বিশেষ কোন দেশের ছাড়পত্র লাগবে না, আমন্ত্রণ বা অনুমতিও নয়। আকাশের আলোর মত মুক্ত ও বাধাবন্ধনহীন এক মানুষকে আলোর ভাষায় সম্বোধন করার শিক্ষা ও স্বাধীনতা পেয়েছি তাঁরই রচনায়, কবিতায়

গানে, নানা লেখালেখিতে। এক উদ্দাম, চিরচঞ্চল বিদ্রোহী মানুষ অখণ্ড মানুষের মুক্তি সাধনার চিরচলিষ্ণু স্রোতে নিজেকে ভাসিয়েছেন। সেই মিলিত মানুষের জীবনের কলরব শুনবো এই সমাধিভূমিতে। সীমানার সংকোচনমুক্ত, ধর্মের পাহারাহীন অনাবৃত ও অবিভক্ত আকাশের আদরে অভিষিক্ত হব। ব্যক্ত, অব্যক্ত, উচ্চারিত অথবা অনুদারিত অনুশোচনা আমাদের কুরে কুরে খায়

'জননী তোমার শিকল করিতে ভঙ্গ
বিকল করেছি অঙ্গ।'

আমরা ভুলতে পারি না, ইতিহাস আমাদের ভুলতে দেয় না :

'পরকে সরাতে ভাইকে করেছি পর
ছেড়েছি আপন ঘর
দুর্বল ওকে করেছি, হয়েছি
নিজে দুর্বলতর।'

ধর্মোম্মাদনা, দাঙ্গা ও দেশভাগের সকরুণ মর্মন্তুদ স্মৃতি, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও বাঁটোয়ারার বিষ-ব্যথা বুকে নিয়েই নজরুল সমাধিভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারতামঃ

'তুমিই মোদের মেলাবে, আমরা
তোমারি তো সন্তান।'

মহাভারতের অবিস্মরণীয় উক্তি আমাদের এই আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক :

'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' লালনও অনুপ্রাণিত হয়ে গান বেঁধেছিলেন :

'মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।'

এই 'মানুষ তত্ত্বই' রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে তথাকথিত ধর্ম ও জাতের ভেদচিহ্নহীন এক অখণ্ড মানবিকতার উত্তরাধিকার এনে দিয়েছিল। তিনি অনায়াসে শক, হূণ পাঠান মোগলের এক দেহে লীন হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন; বলতে পেরেছিলেন 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।' নজরুলেরও তো একই অঙ্গীকার

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্'

সাংবাদিক নজরুল, কবি নজরুল, গীতিকার নজরুল হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদহীন মহীয়ান মানুষের বিশ্বরূপ দেখেছিলেন। দু:সাহসে ভর দিয়ে নিজের প্রথম সন্তানের নাম রাখতে পেরেছিলেন 'কৃষ্ণ মহম্মদ', যদিও সেকালের গোঁড়া সমাজ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির প্রয়াসকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে। 'ছোলতান' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৯ শে চৈত্র সংখ্যায় তাঁর হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করা নিয়ে এ.ভি. কমরুজ্জামানের একটি কুরুচিপূর্ণ লেখা বেরোয় '.... সুতরাং হিন্দু মহিলার পানি গ্রহণ করিয়া কাজী সাহেব হিন্দু-মোছলেম প্রীতির যত বড় প্রচারকই হোন না কেন, মোছলমান সমাজ তাঁকে চায় অন্যভাবে।' ব্যক্তিগত জীবনকেও যিনি সম্প্রীতির পাদপীঠে সমর্পণ করেছিলেন তাঁর সমাধিকে ঘিরেই তো প্রগলভ আবেগ ও স্বপ্নের জাল বোনা যায়।

খ

'ধূমকেতু' পত্রিকা তখন বেশ কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 'ধূমকেতু'র পাতায় অগ্নিবর্ষী রচনার জন্য নজরুলের জেল জরিমানাও হয়েছে। তবু তাঁর বিদ্রোহী কণ্ঠস্বরকে তিনি স্তিমিত করেন নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের মাঝপথে ধর্মের নানা ভড়ং ভণ্ডামী আন্দোলনের বেগকে প্রশমিত করতে চায়। নজরুল ১৯১২ এর ১৭ই নভেম্বর 'আমার ধর্ম' নামে এক জোরালো সম্পাদকীয় লিখলেন :

'দেশে একটি কথা উঠেছে যে মুক্তির জন্য যে আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি আমাদের তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে।...কিসের জন্যে আমাদের ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে?...কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল ঝড়কে আমি বাঁধবো, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে ফেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করবো। সব ছারেখারে দিয়েও আমি বাঁচবো। আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই। দুপুর রাতে দু:স্বপ্নে যার ঘুম ভেঙে যায়, অত্যাচারকে চোখে রাঙাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি! ......ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে— তুমি কি বাঁচার কথা ভাববে না? ...যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে তারা শত্রু এলে বেদ নিযে পড়ে থাকতো? তারা কি দুষমন এলে কোরআন্ পড়তে ব্যস্ত থাকতো? তাদের রণ কোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুষমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত।' 'ধূমকেতু'তে হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রচারের জন্য নজরুলকে কম নির্যাতিত হতে হয় নি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে 'ধূমকেতু' প্রকাশের প্রাক্কালে চিঠি দিয়েছিলেন '...তোমাকে একটি মাত্র আশীর্ব্বাদ করি যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার।' হিন্দু মুসলমানের মিলন ব্যাকুলতাই ছিল তাঁর জীবনের পরম সত্য। এর পুরস্কার জুটল 'ইস্‌লাম-দর্শন' পত্রিকার পক্ষ থেকে। সম্পাদকীয়তে 'ধূমকেতু'র 'ধর্মদ্রোহীতা' এবং উহার স্বেচ্ছাকারিতা'র নির্মম সমালোচনা করা হল ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায়। কার্তিক সংখ্যায় পূর্বোক্ত সমালোচনাকে কেন্দ্র করে কিছু নোংরা চিঠি ছাপা হল, যা যে কোন বিবেচনায় আবর্জনার স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলাম দর্শন লিখেছিল 'দুরাচার ধূমকেতুর ধর্মহীনতার এবং উহার অনাচারী সম্পাদকের স্বেচ্ছাচারিতা'য় 'ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।' আর মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ চিঠি ছাপিয়ে নজরুলের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধীতাকে বললেন 'এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানী শিক্ষায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ।'

এসব আঘাতে নজরুল থেমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। অন্য ধাতুতে গড়া তাঁর মন এবং বিশ্বাস। দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায়ও নজরুল একের পর এক জ্বালাময়ী ও আবেগপূর্ণ সম্পাদকীয় লিখে যেতে লাগলেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে 'যুগবানী'র অবদান আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। সাংবাদিক নজরুল তাঁর চিন্তাকে সংহত করে 'যুগবাণী'র কলমে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রচণ্ড কষাঘাত করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঔপনিবেশিক জল্লাদ ডায়ারের মৃত্যুবর্ষণ বিশ্বের বিবেককে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এক অসাধারণ অগ্নিময় চিঠি লিখে। সেই সময়ে বিভিন্ন দেশনেতাদেরও তিনি চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরই ডায়ারের কুকীর্তি নিয়ে 'যুগবানী'তে শক্তিমান এবং আবেগপূর্ণ লেখা লিখলেন নজরুল এবং সেখানেও হিন্দ-মুসলমানের মিলনের কথা উঠে এল। 'এই মহামানবের সাগরতীরে ভারতবাসী জাগিয়াছে—বড় সুন্দর মোহন মূর্তিতে জাগিয়াছে। সেই তোমার আনন্দের হত্যার দিনে, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হতভাগ্যদের রক্তের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু মুসলমান দুই ভাই গলাগলি করিয়া কাঁদিয়াছে। দু:খের দিনেই প্রাণের মিলন সত্যিকার মিলন হয়। আজ আমাদের এ মিলন যে স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া নয় ভাই, আজ আমরা পরস্পর পরস্পরকে সমান ব্যথায় একই মায়ের পেটের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি। কাঁদিয়াছি— গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়াছি। আমাদের ভাইদের খুন মাখানো সমাধির উপর দাঁড়াইয়া আমরা এক ভাই অন্য ভাইকে চিনিয়াছি।' তিনি উদাত্ত আহ্বান জানালেন 'এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান। তোমার আমার উপর অনেক দু:খ ক্লেশ, অনেক ব্যথা বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, আমাদের এ বঞ্চিত মিলন বড় দুঃখের। বড় কষ্টের ভাই।' প্রবন্ধে নজরুল রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী রচনার উদ্ধৃতি দিলেন:

'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,
এমন ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।'

'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন আবুল মনসুর আহমদ। তাঁর 'আত্মকথা' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে নজরুল হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও অখণ্ডতাকে এতটাই মূল্য দিতেন যে পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি লেখায় মহম্মদ আলী জিন্নাকে 'কাফের' ও 'পাকিস্তান' এর স্বপ্নকে 'ফাঁকিস্তান' বলতেও দ্বিধা করেন নি। মুসলিম লীগ পন্থীরা অবশ্য নজরুল ইসলামকে প্রচণ্ড গালি গালাজ করে 'আজাদ' পত্রিকায় মাসের পর মাস লিখেছে।

'সংহতি', 'লাঙল' ও 'গণবানী' পত্রিকাতেও পর্যায়ক্রমে নজরুল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার বর্বরতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ এবং ঘৃণা তীব্রতম ভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক মিলন কামনায় তাঁর একাধিক রচনা নিবেদন করেছেন। ১৯২৬ এর ২রা এপ্রিল দেবী রাজরাজেশ্বরীর নিরঞ্জন শোভাযাত্রা নিয়ে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে যায়। দাঙ্গার ব্যাপকতায় বহু নির্দোষ প্রাণ বলি যায়। অমিয়া চৌধুরানী, যিনি পরবর্তী কালে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী হন, সে সময়ে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। রাজাবাজারের কাছাকাছি একটি ছাত্রীনিবাসে থেকে তিনি সেই দাঙ্গার যে ভয়াবহতা দেখেছিলেন তা তাঁর আত্মকথা 'দিদিমার যুগ ও জীবনে' লিখে গেছেন। ১৯২৬ এর দাঙ্গা নজরুলের চিত্তে [illegible] ভূমিকম্প নিয়ে আসে। তারই অভিঘাতে 'গণবাণী'র প্রথম বছরের তৃতীয় সংখ্যায় ২৬ শে আগস্ট ১৯২৬ তারিখে 'মন্দির ও মসজিদ' নামে নজরুল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজদের উল্লেখ করে তিনি লেখেন 'ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এল্‌কোহল পান করিয়াছে।' আপোষহীন ভাষায় মোল্লা ও পুরোহিততন্ত্রকে নজরুল ধিক্কার দিলেন 'যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দানখানায়, গির্জার চূড়ায় বন্দী। মোল্লা পুরুত পাদরী ভিক্ষু জেল ওয়ার্ডারের মত তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।' তিনি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন ঈশ্বরকে। 'মন্দিরের চূনা ভাঙিল, মসজিদের গম্বুজ টুটিল। আল্লার এবং কালীর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানদের শিরে, আবাবিলের প্রস্তর বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপর।' খালি ঘৃণা ক্ষোভ ও ধিক্কার নয়, দাঙ্গাদীর্ণ সাধারণ মানুষের দিন যাপনের বেদনায় ভেসে যায় নজরুলের হৃদয়। উদ্বারিত আবেগে অস্থির হয়ে তিনি লেখেন 'মন্দির-মসজিদের চূড়া আবার গড়িয়া উঠিবে এই মানুষের পায়ে দলা মাটি দিয়া, পবিত্র হইয়া উঠিবে এই মানুষেরই শ্রমের পবিত্রতা দিয়া ; শুধু তাহারাই আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা পাইল না একটু আলো, একটু বাতাস, এক ফোঁটা ওষুধ, দু চামচ জল বার্লি। যাহারা তিলে তিলে মরিয়া জাতির হৃদয়হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। যাহাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সমগ্র জাতি মরিতেছে তিলে তিলে। আমি ভাবি, যখন রোগ-শীর্ণ জরা-জীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভিখারীদের দশলক্ষ করিয়া লাশ দিনের পর দিন ধরিয়া ঐ মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন ধ্বসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ঐ নিরর্থক ভজনালয়গুলি ?' এ বিলাপ আমাদের বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। তাই তো ভাবি মন্দির মসজিদের পুরুত-মোল্লার মত তাঁর সমাধিতে পাশপোর্ট-ভিসার পাহারা থাকবে কেন ?

গ

কেবলমাত্র সংবাদপত্রের সীমানায় বা প্রবন্ধের পরিসরেই না। হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক ঐক্য, মানুষে মানুষে মিলন তাঁর অন্তরসাধনায় পরিণত হয়েছিল। মানুষের সত্য রূপ যেমন তার অখণ্ড সত্তায়, বাঙালির পূর্ণতা তেমন হিন্দু-মুসলমানের ভেদরেখাচিহ্নহীন, সংকীর্ণ ধর্মীয় উদ্বেলতা মুক্ত পরিপূর্ণ বাঙালিত্বে। গোধূলির রক্ত-আকাশে যেমন অপরাহ্নের আলোকে সন্ধ্যার ছায়া নিবিড়তা থেকে আলাদা

করে দেখা যায় না। দুয়ে মিলে মিশে একাকার। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবন চেতনাও নজরুলের কাছে প্রায় একই রকম ছিল। তাঁর অসংখ্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে একথা তিনি লিখেছেন, নানা জায়গায় ভাষণ দিতে গিয়েও বলেছেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে কাজী নজরুল একটি আবেগ মথিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতেও ছিল তাঁর একই ব্যথিত উচ্চারণ 'আপনারা বিশ্বাস করুন আমি নেতা হতে আসিনি, কবি হতে আসিনি, আমি এসেছিলাম হিন্দু মুসলমানের সাথে শেক্ হ্যাণ্ড করিয়ে দেবার জন্য।' আর একখানি অসাধারণ চিঠি লিখেছিলেন আনোয়ার হোসেনকে হুগলী থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ন। নিজের কবিতা সম্পর্কেই লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর ঝকঝকে মন মেঘভাঙা রোদ্দুরের মত উঁকি দিয়ে ওঠে চিঠির মধ্যে থেকে 'আমি মুসলমান— কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি মুসলমান-কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এতই ভুলের সৃষ্টি। আমি আপাতত: শুধু এইটুকুই বলে রাখি যে, আমি শরিয়তের বানী বলিনি— আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না।' এখন বুঝি চিঠিতে এত বেদনার কথা তাঁকে কেন লিখতে হয়েছিল। তাঁর সমস্ত জীবন জুড়ে এবং তাঁর কাব্যস্রোতে হিন্দু মুসলমানের যে মিলন গাথা রচিত হয়েছে তাকে এক শ্রেণীর মানুষ সব সময় নিন্দা ও সমালোচনা করে গেছে। 'নওবাহার' পত্রিকায় 'নজরুল কাব্যের অপর দিক' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন কবি গোলাম মোস্তাফা। তাঁর বক্তব্য 'তিনি (নজরুল) গাহিয়াছিলেন 'অখণ্ড ভারতের' গান, তিনি দেখিয়াছিলেন হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টির 'হরগৌরী রূপ'। ভারত জুড়িয়া হিন্দু স্বাধীনতার যে সাধনা চলিতেছিল নজরুল আসিয়া সেই সুরেই তাঁহার কণ্ঠ মিশাইয়া গান গাইয়াছিলেন।...মুসলিম জাতির জন্য তিনি নূতন করিয়া কিছু ভাবেন নাই।' নজরুল ইসলামকে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ একখানি খোলা চিঠি লেখেন, মূলত: কবির কাব্য বিচার ছিল সে চিঠির উদ্দেশ্য। 'নওরোজ' পত্রিকায় 'একখানি পত্র' নামে ১৩৩৪ এর ভাদ্র সংখ্যায় চিঠিখানি বেরোয়। প্রায় চার মাস পরে 'চিঠির উত্তরে' নামে নজরুলের একখানি দীর্ঘ উত্তর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'সওগাত' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। চিঠিটি সম্পর্কে নজরুল নিজেই লিখেছেন 'এ আমার চোখের জল মেশানো হাসির শিলাবৃষ্টি।' চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন কিভাবে মুসলিম এবং হিন্দু মৌলবাদীরা নিন্দার পাথর ছুঁড়ে তাঁকে রক্তাক্ত করেছেন প্রতিনিয়ত। তবু তাঁর কথা 'আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাই নি।....তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি।' নজরুল লিখছেন তিনি শুধু মানুষেরই গান করেন, হিন্দুর না, মুসলমানেরও না। কারণ 'এই ধুলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দু:খী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চির রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধুলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।' তাই এদের জন্যেই '...লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি।...হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না।' একাধিক চিঠিতে একই কথা বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে। এত উদাহরণ ও উদ্ধৃতির প্রয়োজনও হয়ত নেই।

ঘ

চিঠিপত্রের মত তাঁর ভাষণেও একই প্রসঙ্গ এসেছে। অবিরাম বর্ষণধারার মত হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনার কথা তিনি অক্লান্ত কণ্ঠে বলে গেছেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতি নজরুল 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা' বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা দেন। ভাষণ দিতে গিয়ে প্রসঙ্গান্তরে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কথায় তিনি চলে আসেন। বলেন 'ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি— শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটাও ভাঙছে— তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা।....সমস্ত

সাম্প্রদায়িকতার মাতলামির অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে।' চিরদিনের মত অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে নজরুল তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ দেন 'যদি আর বাঁশী না বাজে', কবি তাঁর দুঃখভারে অবনত হৃদয়কে উন্মোচিত করেন শ্রোতাদের সামনে। বাংলার সাহিত্যে ব্যক্তিগত অবদানের অকিঞ্চিৎকরত্বের কথা বলতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রসঙ্গ আবার চলে আসে 'যদি আর বাশী না বাজে — আমি কবি বলে বলছিনে--- আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি - আমায় ক্ষমা করবেন--- আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসি নি— আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম---সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম। হিন্দু মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য ঋণ, অভাব-অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মত জমা হয়ে আছে —এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম।'

ঙ

নজরুলের প্র[illegible] সমক তাঁর কবিতায় ও গানে। তাঁর সৃষ্টির শ্যামল প্রান্তরের অনেকটাই জুড়ে রেখেছে কবিতা এবং গান। কবিতা তাঁর তৃপ্তি, তাঁর দীর্ঘশ্বাস। কোন সম্প্রদায়ের নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্বের যে অন্তহীন ও অবিচলিত জয়যাত্রায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও অফুরন্ত অঙ্গীকার ছিল তার কথা তিনি তাঁর কবিতাতেও বলে গেছেন। সমকালের যন্ত্রণার উপশম খুজতে গিয়ে তাঁর সৃষ্টি চিরকালের হোল কিনা তা নিয়ে একবারও মাথা ঘামান নি। ঠিক এই কথাটিই উচ্চারিত হয়েছিল নজরুলের চুয়ান্নতম জন্মদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। সেদিন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে যে সভা হয়েছিল তার বিবরণ ১৯৪৩ সনের ২৬শে মে'র আনন্দবাজার পত্রিকায় এভাবে ছাপা হয় '....বাংলার জাতীয় জাগরণে ও হিন্দু-মুসলমান সংহতি প্রচেষ্টায় কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া নজরুলের অপরিমেয় অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী' পত্রিকা বাংলার সাহিত্য জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। সেই 'প্রবাসী' নজরুলকে অখণ্ড মানুষের কবি হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। তাঁর কবিতা 'বন্যাস্রোতের মতন প্রবল আগ্রহে, বলিবার শক্তিমান ভঙ্গীতে এবং হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম ও সভ্যতার ধারার ও চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে সুপরিচয়ে দুইয়ের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটাইবার অসাধারণ শক্তিতে ..' ভরপুর। কৃষ্ণনগরে ছাত্র সম্মেলন হচ্ছে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ। দেশজুড়ে তখন হানাহানি। বিদ্বেষ ও ঘৃণা। এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যেও দোদুল্যমানতা ও রেষারেষি। নজরুল নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারলেন না এই পরিস্থিতি থেকে। রচিত হোল তাঁর বিশ্বখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'

> 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন
> কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।'

এর আগেই ১৯২২ সালে হিন্দু-মুসলমানের ঐকান্তিক মিলনের স্বপ্ন চোখে নিয়ে তিনি 'মিলন গান' নামে একটি গানও লিখে ফেলেছিলেন। সুর দিয়ে সে গান গাওযাও শুরু হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গঞ্জে, হাটে মাঠে লোকে এ গান গাইবে।

> 'ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান
> (সেদিন) দুয়ার ভেঙ্গে আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান।'

রবীন্দ্রনাথ ধর্মকারার প্রাচীর ভাঙায় ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর 'ধর্মমোহ' কবিতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ধর্মদ্রোহীদের অন্তরেঃ

'যে পুজার বেদী রক্ত গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নি:শেষে
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।'

'সাম্যবাদী' কবিতায় নজরুলও রবীন্দ্রনাথের মত ভাঙার গান গাইলেন:

'তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী....
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা!
....চালা হাতুড়ি শাবল চালা।'

ঐ একই কবিতায়

'হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।
মানুষেরে ঘৃণা করি,
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
ও মুখ হইতে গ্রন্থ-কেতাব নাও জোর করে কেড়ে।
....মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।'

আশ্চর্যের কথা নয় দেশটা দুভাগ হযে যাওয়ার পরও নজরুল কাব্যের মূল সুর, অখণ্ড মানবিকতাবাদের, নিন্দা করার মত লোকের অভাব হয় নি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত 'নওবাহার' পত্রিকা দর্পভবে সম্পাদকীয় লিখছে 'নজরুল-কাব্যে সত্যই যদি এই মূল নীতিগুলির বিরোধী কথা থাকে, তবে তাহা আমাদিগকে বর্জন করিতেই হইবে। আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে নজরুল অপেক্ষা ইসলাম বড়।' কিন্তু নজরুল কোনদিন ভোলেন নি যে হিন্দুত্ব বা ইসলামের চেয়ে মানুষ বড়। একথাটিই জোরের সঙ্গে নজরুল মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলে গেছেন একালের এক অসাধারণ চিন্তাবিদ্ বিনয় সরকার। নজরুলের ধর্ম তাঁর অনন্যব্রত মানবনিষ্ঠা। 'মুসলমানরা বোধ হয় নজরুলকে হিন্দু-প্রেমিক বলে...। আর হিন্দুদের কোনো কোনো মহলে হয়ত নজরুলকে ইসলাম প্রেমিক বলা হয। আমার বিচারে নজরুল কোনো তথাকথিত ধর্মের তোযাক্কা রাখে না। সাধারণত: যাকে ধর্ম বলা হয় নজরুল তার বিরোধী। 'সর্বহারা'র কবিতাগুলিতে যে মানবনিষ্ঠা দেখতে পাই, তাই হচ্ছে নজরুলের আসল ধর্ম।'

যারা জাতপাত নিয়ে দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করছে তাদের বজ্জাতি সহ্য করার কথা নজরুল ভাবতে পারেন নি। টিকি এবং দাড়ির দৌরাত্ম্য তাঁকে পীড়িত করেছে বারম্বার। নানা কুসংস্কার, শুচি-অশুচির প্রশ্ন, ছুৎমার্গকে ব্যঙ্গ ও উপহাস করেছেন।

'বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন সে জাত?
কোন ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ?'

অথবা,

'বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান!...
ওরে মূর্খ, ওরে জড়, শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়....
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্মপর।'

উদার মানবতার জয়ধ্বনি ভারতবর্ষের চিন্তা ও চেতনাকে স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছে। ভারতবর্ষের মাটিতে সকলের মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়ার কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ তাই এত উচ্ছল। রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুলের

মত এত জোরালো ভাষায় মহামানবিকতার ঔদার্যকে আর কেউ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করেছেন বলে মনে হয় না। লক্ষ করার মত নজরুলের আত্মিক ব্যাকুলতা :

'সকল জাতি সকল ধর্ম পেয়েছে এখানে ঠাঁই
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে আজ সে স্বজন ভাই।
বিদেশীর বেশে আসিল যাহারা
মার কোলে আজ সন্তান তারা
তাই মার কোল নিয়ে করি কাড়াকাড়ি হিন্দু মুসলমান
জৈন পার্শী বৌদ্ধ শাক্ত খ্রীষ্টান বৈষ্ণব
মার মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
ভুলি বিভিন্ন ভাষা আর বেশ
গাহিছে সকলে আমার স্বদেশ।
শতদলে মিলি শতদল হয়ে করিছে অর্ঘ্যদান।'

নজরুল মানুষকে শতদলে মিলি শতদল করে তুলেছেন। কত উদ্ধৃতি দেব ? এমন অসংখ্য কথা তাঁর গানে ও কবিতায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তাদের উদ্ধার করতে কষ্ট হবে না। বিখ্যাত 'সওগাত' পত্রিকা ২৫ শে বৈশাখ ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ পালনের জন্য সম্মিলিত সাময়িকী প্রকাশ করেছিল ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে। সেই সাময়িকীতে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ছিল 'যেমন রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ বাংলার , ভারতের ও বিশ্বের তেমনি নজরুল ইসলাম যুগপৎ হিন্দুর, মুসলিমের ও কৃশ্চানের। ....নজরুল শিল্পী, মানবতা তাঁর ধর্ম। ...তিনি ধর্মকে মানবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাই শ্রেয় মনে করতেন।' এমন মানুষের শেষ শয্যার মাটি মুক্ত মনের মুক্তিতীর্থ ; দেশ-কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাকে বেঁধে রাখা অন্যায়। তাই স্বপ্ন দেখেছিলাম পাশপোর্ট-ভিসার উদ্ধত অমানবিক আস্ফালনহীন সবুজে দূর্বাদলে ঢাকা ভূমিখণ্ডের যেখানে দাঁড়ালে মনে হবে

"আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝরে।'

প্রসঙ্গ : নজরুল চর্চার ভিন্নরূপ

বাঁধন সেনগুপ্ত

নজরুল বিষয়ক বহুমুখী চর্চায় গত তিরিশ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদিত প্রাণ এক নজরুল অনুরাগী সম্প্রতি সংকটের শিকার হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি। আর এখনই চলেছে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উৎসব। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে সেই উৎসব শুরু হয়ে গেছে। এমন কি, রাষ্ট্রীয় স্তরে ভারত বাংলাদেশ এ বিষয়ে যোগাযোগ ও আলোচনাও শুরু করেছেন। এবং সে সংবাদ পত্রপত্রিকায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে এবার সমগ্র নজরুল রচনা প্রকাশিত হবার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। আন্তর্জাতিক এক চলচ্চিত্র পরিচালক কর্তৃক সমগ্র নজরুল জীবন কেন্দ্রিক দ্বিভাষিক বিশাল অর্থব্যয়ে নির্মিত একটি ছবিও তৈরি করার কাজ চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এর আগে কোনো বিদেশী বড় চিত্র পরিচালককে এত অর্থব্যয়ে কোনো কবিকে নিয়ে এত বিশাল মাপের ছবি তৈরির কাজে এগিয়ে আসতে শোনা যায়নি। 'গান্ধী' ছবির অ্যাটেনবরো সাহেবের কথা মনে রেখেই এসব কথা বলা হচ্ছে। না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও আন্তর্জাতিক স্তরে এত বড় জীবনীচিত্র তোলা হয়নি। জওহরলালের অনুরোধে রবীন্দ্র শতবর্ষে ভারত সরকার সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে তুলিয়েছিলেন ডকুমেণ্টারি ছবি 'রবীন্দ্রনাথ' যার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কবির অনুরাগী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। কিন্তু পরিকল্পিত কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ছবি যা নাকি অ্যাটেনবরোর ছবিকেও ছাপিয়ে যাবে বলে অনেকের ধারণা তা এই প্রথম একমাত্র কবি নজরুলকে নিয়েই তোলা হচ্ছে। গত তিরিশ বছরে নজরুলকে নিয়ে লেখা হয়েছে, প্রায় সাড়ে পৌনে পাঁচশত গ্রন্থ এই দুই বাংলায় ও অন্যান্য দেশে। আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রথম প্রকাশ করেছিলেন নজরুল রচনাবলী। সরকারী স্তরে পশ্চিমবাংলার রবীন্দ্ররচনাবলীও রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের (১৯৬১) আগে প্রকাশিত হয়নি। বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ অবশ্য তার আগে বিশাল মূল্যের রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। যাই হোক, নজরুলকে নিয়ে প্রথম গবেষণাও শুরু হয়েছিল ষাটের দশকের শেষ দিকে। তারপর থেকে এই দুই বাংলায় নজরুলকে নিয়ে বহুমুখী গবেষণা হয়েছে এবং এখনও তা হচ্ছে। এমন কি, রাশিয়া চীন, ভিয়েতনাম ও জাপানেও কবিকে নিয়ে চর্চা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। কবিকে নিয়ে দুই বাংলায় মোট চারটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে কলকাতায় ও ঢাকায়। স্বাধীন বাংলাদেশ জীবনের শেষ পর্বে কবিকে দান করেছেন রাষ্ট্রীয় সম্মান এবং সম্মানসুলভ নাগরিকত্ব। একমাত্র তাঁর গানই এদেশে সমর শিক্ষার্থীদের অন্যতম কুচকাওয়াজের গান হিসেবে স্বাধীন ভারতে স্বীকৃত। এ পর্যন্ত কবির লেখা প্রাপ্ত গানের সংখ্যা ৩২৪০। এর বাইরেও আরও গান হয়তো আছে। কিন্তু তা জনসমক্ষে এখনো পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে রেকর্ডে বিধৃত গানের সংখ্যা প্রায় ১৬৩৬। নজরুল সঙ্গীত বিষয়ক গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুর জানিয়েছিলেন, রেকর্ডে বাণীবদ্ধ নজরুলের গানের সংখ্যা ১৬৪৮ এবং নজরুল রচিত গানের মোট সংখ্যা তাঁর মতে ২৭১৫। এখনো বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথের মতোই নজরুলের জন্মদিন বা প্রয়াণতিথি দেশের সর্বত্র নিয়মিত পালন বা স্মরণ করেন দুই বাংলার অসংখ্য মানুষ। এখনো

আবৃত্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরই অন্যতম অবলম্বন নজরুলের কবিতা বা রচনা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কিন্তু কেন এই আয়োজন, এই উচ্ছ্বাস? কেন কবি নজরুল কোটি কোটি মানুষের অন্তরে আজও শ্রদ্ধার আসনে অটল?

সাধারণভাবে যে কটি কারণ মোটামুটিভাবে নজরুলকে এই উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা এই রকম:

১) নজরুলই এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা, ন্যায়, সংগ্রাম ও প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক।
২) এই দেশে তিনিই প্রথম কবি যিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ধিক্কার জানিয়ে এর বিরুদ্ধে মনে প্রাণে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।
৩) তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অন্যতম রূপকার যিনি ইংরেজ আমলে সর্বপ্রথম এক বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং জেলে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ৩৯ দিন অনশন করেছিলেন।
৪) তাঁর রচিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধ ছিল পরাধীন জাতির কাছে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের বিদ্যুৎ ছোঁয়া স্বরলিপি।
৫) রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, বারীন ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র বা চিত্তরঞ্জন দাশ সহ সমস্ত সুধীজনের প্রশংসা ও স্নেহধন্য এই কবি ছিলেন বাংলার আপামর মানুষের ভালবাসার জন।
৬) নজরুল শুধু গানের সংখ্যার দিক থেকেই প্রধান তা নয়, তাঁর বৈচিত্র্যে ভরা বিভিন্ন রাগরাগিনী তথা ভক্তি রসাশ্রিত গান আজও বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
৭) তাঁর ব্যক্তিজীবনের দারিদ্র্য, সংগ্রাম ও সাফল্য বাঙালির জীবনবোধের পরিচিত চিত্রলিপির বাস্তব প্রতিভাস।
৮) জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান আজও সর্বোচ্চ।
৯) তিনি মানবতার পূজারী যিনি বিদ্রোহী এবং প্রেমিক।
১০) তিনিই বাংলা সাহিত্যের ব্যাপকক্ষেত্রে ও গণজীবনে প্রথম গণচেতনার কবি।

অথচ ছোটবেলা থেকেই নজরুলের জীবনে প্রতি পদে লাঞ্ছনাই ছিল নিত্যসঙ্গী। কাজী পরিবারের মানুষ হয়েও অল্পবয়সে পিতৃহীন বালক নজরুল পেটের দায়ে কী না করেছেন সে বয়সে। বাধ্য হয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন লেটোর দলে। তার জন্যে কত না অপমান আর অবহেলা। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে পরে একবার একটি চিঠিতে দুঃখ করে কবি লিখেছিলেন, 'চুরুলিয়ার লেটোর দলের গান লিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কে-ই বা এক কানাকড়ি দাম দিয়েছে।' একদা বাধ্য হয়েই কবিকে বালক বয়সে রেলগার্ডের বাসায় বাবুর্চির কাজ, চা ও রুটির দোকানের কাজ করেও পেট চালাতে হয়েছে।

অথচ আজ কীভাবে এই কবির মূল্যায়ন শুরু হয়েছে? সে বিষয়ে নজরুল অনুরাগীদের আলোকপাত করার প্রয়োজন। পৌনে পাঁচ শতাধিক গ্রন্থে নজরুলের নানামুখী আলোচনায় মূলত কবির প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রতি গত পঞ্চাশ বছর ধরে শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হয়ে এসেছে। কিন্তু অন্যদিকে কবির শতবর্ষের প্রাক্কালে কবির মূল্যায়ন হচ্ছে, এইভাবে:

সেখানে একদিকে অবশ্য বলা হচ্ছে—
ক) (১) নজরুল এমনি সময়ে সামাজিক পীড়ন-দুর্নীতি, আর্থিক সঙ্কট এবং রাজনীতিক সমস্যা সচেতন রুণ কবি রূপেই লেখনী ধারণ করেন। বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তিনিই প্রথম পুরোপুরি কবি, রাজনীতিক, সংগ্রামী, গণবাদী ও সাম্যবাদী। সাহিত্য, শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কারমূলক রচনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য বা ব্রত। অতএব কবিতাকে ও গানকে তথা রচনাকে বাস্তব জীবনের, সমস্যা ও লক্ষ্যের অনুগত করে সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে ঐকান্তিক প্রয়োগের গৌরব নজরুল ইসলামেরই প্রাপ্য।

এই বক্তব্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু পাশাপাশি কী লেখা হচ্ছে? একই লেখক একটু পরেই বলছেন,

১) সমকালীন জনসমাজ মানসের অস্থিরতা, উন্মাদনা, স্ববিরোধ আর অতৃপ্তিও নজরুল সাহিত্যে সুপ্রকট।

আবার এ-ও সত্য যে নজরুল যতই বিপ্লবের, সংগ্রামের, দ্রোহের, সংস্কারের, শোধনের কথা বলুন, 'ধূমকেতু' ও 'লাঙ্গল' প্রকাশিত করুন, তাঁর সবটাই ছিল উচ্চারিত বাণীর সীমায় নিবদ্ধ। সংগঠনের মাধ্যমে প্রথাসিদ্ধ নিয়মে সিদ্ধিলক্ষ্যে আন্দোলনের মন, মেজাজ কিংবা যোগ্যতা তাঁর ছিল না।

২) দরিদ্র-সুলভ প্রয়োজন বুদ্ধিই নজরুলকে বাল্যেই কিছুটা বেপরোয়া বাউণ্ডুলে কবে তোলে।... রেলগার্ডের বাসায় বাবুর্চির কাজে নিযুক্ত হয়ে লঙ্ঘন করলেন আচরণের ও অধিকারের সীমা, ফলে পালাতে হল তাঁকে। চায়ের ও রুটির দোকানেও টেকেননি বেশি দিন।

৩) গোড়া থেকেই তিনি রোমান্টিক, আবেগ চালিত, ধীরবুদ্ধির কিংবা স্থিরচিন্তার মানুষ তিনি কখনো ছিলেন না। ফলে কবিতা ক্ষেত্রে তাঁর তীব্র আবেগ ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি ফলপ্রসূ হলেও আধুনিক মননশীল কবির গৌরব তাঁর প্রাপ্য হল না। আর গদ্যরচনায় — প্রবন্ধে নাটকে গল্পে উপন্যাসে আবেগবাহুল্যই তাঁর রচনাকে করেছে ব্যর্থ, ভাষাকে করেছে প্রমূর্ত উচ্ছ্বাস। এ জন্যেই তাঁর রচনা হৃদয়ের অকৃত্রিম উৎসার হলেও মনীষার প্রসূন নয়।

পুনরায একদিকে লেখা হচ্ছে:

খ. (১) গোড়া থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে হিন্দু মুসলিম দুই পৃথক ধর্মসংস্কৃতির বাহক বটে, কিন্তু পরস্পর কেবল প্রতিবেশী নয়। হাটে মাঠে তারা সহযাত্রী সহকর্মীও। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাই তাঁর এ অসাম্প্রদায়িক মৈত্রীকামী চেতনা সক্রিয় ছিল গোড়া থেকেই। নজরুল ইসলাম সারা জীবন প্রায সতর্কভাবেই চেতনায় চিন্তায় কথায় কাজে ও আচরণে এ অসাম্প্রদায়িকতা বজায় রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেও বলা যায় এ ক্ষেত্রে সেদিন তিনি ছিলেন একক ও অনন্য।

পাশাপাশি প্রচারের সুরে লেখা হচ্ছে ব্যক্তি নজরুলের বিরুদ্ধে কুৎসা:

১) কাজী নজরুল ইসলাম দৈহিক রূপচর্চায আসক্ত ছিলেন, স্নো, ক্রিম, পাউডার, সেন্ট প্রভৃতি প্রসাধনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল, হয়তো রমনীবল্লভ হওয়ার বাসনাই অঙ্গসজ্জায দিত প্রণোদনা।...

কবি ভোগ বিলাসী ছিলেন, দরিদ্র সন্তান গান বেঁধে ও গেয়ে টাকার মুখ দেখেই (১৯৩২-৪২) ধনীলোকের মতো জীবনযাপনে হলেন আগ্রহী। তখন তাঁর বাড়ির গেটে নেপালি দারোয়ান, গ্যারেজে গাড়ি, বারান্দায় শোফার, ঘরে গৃহভৃত্য। স্বভাবে বেপরোয়া, বেহিসেবী উদ্দামতা ছিল বলেই অর্থের অপচয়ে, ব্যয়বাহুল্যে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। পরিণাম চেতনার অভাবে শেষে দারিদ্র্য পুনরায় তাঁর সঙ্গী হল।

২) নজরুল ইসলামের নৈতিক সাহস যে অকৃত্রিম অপরিমেয় ছিল তা অস্বীকার করবার কারণ নেই। কিন্তু বাস্তবে তাঁর দৈহিক সাহস ও নির্ভীকতার প্রমাণ দুর্লভ: এ মানুষ কারো সঙ্গে বনিবনা না হলেই চটাচটি করে ঘুষাঘুষি শুরু করার কথা। কিন্তু তেমন নজির পাওয়া যায় না, বরং প্রাপ্য অর্থের অনাদায়ে তেমন ক্ষেত্রে অভিমান করার, ক্ষোভ প্রকাশ করার ক্ষমা করাব এমন কি অনুনয় করার বৃত্তান্তই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সৌজন্য, বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশে নজরুল সাধারণত চাটুকারের

মতো আবেগবহুল তোয়াজের, তোষামোদের ভাষাই প্রয়োগ করতেন গদ্যে পদ্যে ও পত্রে ভাষণে।....'

অবাক লাগে যখন সেই আলোচক একই সঙ্গে লেখেন, 'নজরুল ছিলেন জীবনের, যৌবনের, মর্ত্যের, মাটির, মানুষের, ভোগের, কামের, প্রেমের এবং সংগ্রামের কবি। আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি একই গ্রন্থে নজরুলের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, নজরুলের কবিতা ও গান জনগণ মন জয় করল, হল জনপ্রিয়। তাঁর এ কালোচিত ভূমিকাই তাঁকে ইতিহাসে করল অমর, জাতিকে করল কৃতজ্ঞ, সাহিত্যকে করল গণসাহিত্যমুখী, সাহিত্য যে আকাশচারিতা নয়— বাস্তব জীবনসমস্যাসম্পৃক্ত হাতিয়ারও, তা নজরুল সাহিত্যই বাংলা ভাষায় বাঙালির কাছে নতুন করে প্রমাণ করে দিল। কাজেই সাধারণ অর্থে জীবনতাত্ত্বিক মহৎ কবি না হলেও নজরুল ইসলাম যুগের কবি দেশকালের প্রয়োজন চেতনার কবি, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখের, আনন্দ-বেদনার সহমর্মী কবি। তাঁর কাব্যের আবেদন ইন্দ্রিয়ের কাছে, হৃদয়ের কাছে —— মস্তিষ্কের কাছে নয়।' এই প্রশস্তির সঙ্গে যুক্ত হয় আরো কয়েকটি চরণ। লেখক বলেন, বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আজও নজরুল ইসলাম এক প্রচণ্ড প্রাণ প্রবল শক্তিধর অনন্য পুরুষ। আমোঘ নিয়তির মতো, কালবৈশাখীর প্রয়লঙ্কর ঝড়ের মতো, জনপদ প্লাবী পার্বত্য বন্যার মতো, মহাসমুদ্রের গর্জনমুখর জলোচ্ছ্বাসের মতো তরুণ কবি নজরুল ইসলামের আকস্মিক আবির্ভাব তাক লাগানো এক অসামান্য স্মরণীয় ঘটনা।

ঠিকই লিখেছেন লেখক। কিন্তু বিস্ময় জাগে যখন অন্যত্র দেখি,

গ. ১) তাঁর মধ্যে ছিল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও। এবং তা ছিল দাম্ভিকতার জনকও। এটি প্রায় অশালীন ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

২) নজরুল ইসলাম প্রেমে বা কোনো বিশেষ নারী প্রেমে নিষ্ঠ ছিলেন না। রূপবতী ও যৌবনবতী নারী তাঁকে আকৃষ্ট করত। অথবা নারীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণের শক্তি ছিল তাঁর। যুদ্ধে যাবার আগেই কোনো এক কিশোরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, এ অনামিকাকেই তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' উৎসর্গ করেছিলেন, দ্বিতীয়টির সন্ধান মেলে গার্ডের বাড়িতে, তৃতীয় জন নার্গিস, চতুর্থ জন দুলি ওরফে আশালতা প্রমীলা। ঢাকায় পঞ্চমজন ফজিলিযতুন্নেসা, হয়তো রানু সোমও, জাহনারা চৌধুরীর ও উমা মৈত্রের প্রতি গুণানুরাগ তো ছিলই, হযতো রূপানুরাগও ছিল। ঢাকায ইনি ঈর্ষ্যু তরুণদের হাতে মার খেয়েছিলেন। মেদিনীপুরেও এক বিমুগ্ধ কিশোরী আবেগ বশে গানের আসরেই কবিকে গলার হার উপহার দিয়ে স্ব-সমাজে পরিবারে গঞ্জনা পেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

৩) সঙ্গীত নজরুল অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন, তবে সঙ্গীত কালান্তরে টেকে না বলে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা নজরুলগীতিও জনপ্রিয়তা হারাবে। অতএব নজরুল গানের জগতে অমর হবেন— অনুরাগীদের এ প্রত্যাশা পূরণ না হবারই কথা।

৪) তিনি স্রষ্টা ছিলেন বটে। কিন্তু সুরুচিনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন না। স্রষ্টার আবেগের সঙ্গে শিল্পীর সংযম ও সুরুচি যুক্ত না হলে যা হয়। তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে নজরুল সাহিত্য।

৫) আমাদের ধারণায় কাজী নজরুল ইসলাম স্থিরবিশ্বাসের ও ধীরবুদ্ধির মানুষ ছিলেন না। উচ্ছ্বাসই নজরুলের পুঁজি। এ উচ্ছ্বাস তাঁকে আধুনিক কবির গৌরব থেকে করেছে বঞ্চিত, আর তাঁর গদ্য শৈলীকে রেখেছে অনাদৃত।

এরকম অজস্র মন্তব্য ও উক্তির পসরা সাজিয়েছেন প্রখ্যাত এক নজরুল বিষয়ক গ্রন্থের লেখক। সুতরাং এমন আরও বিস্ফোরক উক্তির উল্লেখ করে রচনার আয়তন বৃদ্ধি নিরর্থক।

এবার নজরুলের বিরুদ্ধে আলোচনার দিকটি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা লেখকের অনেক উক্তিই নিজস্ব ভাবনার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ এবং পরিণতিতে সমগ্র বাঙালি মানসের প্রচলিত ধারণা ও ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বিরাট আঘাত স্বরূপ। তাছাড়া কবিকে নিয়ে এই কুৎসার সার্থকতাই বা কী?

প্রথমত নজরুলের সমকালীন জনমানসের অস্থিরতা বা অতৃপ্তি নজরুলের ওপর প্রভাব ফেলবে না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আর সংগঠনের মাধ্যমে প্রথাসিদ্ধ নিয়মে সিদ্ধিলক্ষ্যে আন্দোলনের মন মেজাজ বা যোগ্যতা কি একান্তই জরুরি? প্রথাসিদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়েও শেলি, র‍্যাঁবো, এঁরা পরিবর্তনের জয়ধ্বনি দিয়ে কি ব্যর্থ হয়েছিলেন? আধুনিক মননশীলতার গৌরব তাঁর প্রাপ্য হল না বলে লেখক দুঃখ করেছেন। আধুনিক মননশীলদের রচনা জনসংযোগ হারালে তার স্থান হয় স্কুলপাঠ্যে বা একাডেমিক আলোচনার বৈঠকখানায়। তার আয়ুমাত্র জীবিতাবস্থায়ই তখন কয়েক বছর থাকে। কল্লোল থেকে কালিকলম, প্রবাসী থেকে বিচিত্রা অথবা সবুজপত্র থেকে ভারতবর্ষের গণ্ডা গণ্ডা মননশীল কবিদের ঠিকানা এখন সময়ের ভারে কীটদষ্ট হয়ে আছে। অথচ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল নির্বাক ও প্রয়াণের কুড়ি বছর পরেও লেখকের ব্যাখ্যানুযায়ী আধুনিক কবির গৌরব থেকে বঞ্চিত কবির এখনও প্রধান পরিচয় আধুনিক মানসের অর্থাৎ সাম্য, মৈত্রী, মানবপ্রেমের তথা আন্তর্জাতিকতার অন্যতম প্রচারক হিসেবে। আর তাঁর গদ্য শৈলী এতে অনাদৃত হয়েছে কী করে তা টের পেলেন এই নজরুল গ্রন্থ প্রণেতা? কেন আজও সঙ্কটের মুহূর্তে দুই বাংলায় অসহায়, আক্রান্ত মানুষ সংহতির প্রশ্নে খুঁজে বেড়ায় তাঁর হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি বিষয়ক সেই সব মহার্ঘ প্রবন্ধ বা গদ্য রচনাগুলি? এছাড়া লেখক রোমান্টিক বা আবেগের শক্তি বা মূল্য সম্পর্ক বিষয়েও প্রকৃত অর্থে তেমন অবহিত নন। ধীরবুদ্ধির মানুষ অথবা স্থিরচিন্তার মানুষ ব্যাঙ্কে অর্থ জমাতেই সক্ষম। সে সৃষ্টি করতে চিরকালই অক্ষম। কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতা অন্তত তাঁর হয় না। প্রতিভার সঙ্গে বেহিসেবী মানসের কোথায় যেন একটা পরোক্ষ সংযোগ থাকে। তাই মাইকেল থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের অনিশ্চিত পথে স্বল্পকাল টালমাটাল পথ হেঁটেও এখনও বহু স্থিরচিন্তার অধ্যাপকীয় পণ্ডিতদের হিসেব নিকেশের বাইরে গিয়েও কালোত্তীর্ণের মুকুট মাথায় অর্জন করে তা বহন করে চলেছেন। চিরকাল নোট বুক মুখস্থ কবা মাস্টার মশাইদের ব্যাখ্যার বাইরে বিচরণ করেন মধুসূদন, মানিক, শিশিরকুমার প্রমথেশ, ঋত্বিক বা নজরুলের মত যুগন্ধর প্রতিভার অধিকারী মানুষেরা। অতলস্পর্শী সেই অসীম ক্ষমতাকে বিচার করবার জন্যে চাই ভাবনার নিবিড় অনুভব বা সংযোগ! নইলে কেবল বিভ্রান্তিই বাড়ে। তখন ব্যক্তিজীবনের কুৎসা, চরিত্রের বহুবিধ দিক বা ক্ষণিকের দুর্বলতা নিয়ে চরিত্রহননে মেতে ওঠেন দু-একজন স্ব-ঘোষিত বোদ্ধা। তাঁরা আসলে আপন গণ্ডীর সীমায় সংকীর্ণতা ও নীচতার ঘেরা টোপে বন্দী। নজরুলের জীবিতাবস্থায় যাঁরা তাঁর সামান্য অনুগ্রহের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাটুবৃত্তির কাজে ব্যস্ত ছিলেন পরবর্তীকালে এঁরাই অনেকে নজরুল চরিত্রের ছিদ্রান্বেষণে মগ্ন থেকে বস্তাপচা সব স্মৃতি চিত্রণ লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ নিরাপদে দুরে সরে গিয়ে অবশেষে স্মৃতিকথার নামে নজরুলের বিলাসিতা, অর্থব্যয়, নারীসঙ্গ বা চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে অজস্র রসালো কাহিনী ফেঁদেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেইসব স্মৃতিকথাই এখন অনেকের গ্রন্থ রচনার অন্যতম অবলম্বন। তখন প্রতিভার মূল্যায়নের চেয়ে প্রাধান্য পায় বেশি করে কবির স্নায়বিক দৌর্বল্যের তুচ্ছ ঘটনাবলী। কোন গানে অচরিতার্থ প্রেমিকের স্মৃতি ধরা পড়েছে সেটাও এই সব লেখকের অভিযোগের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সৃষ্টিশীল কোনো মহৎ কবির কাব্যে বা সঙ্গীত রচনার আড়ালে কোনো না কোনো অনুরাগী বা প্রেমিকের অদেখা স্পর্শের সংবাদ এইসব সমালোচকদের জানা না থাকায় এই বিভ্রাট। তাই পিকাসো বা রাসেল, রবীন্দ্রনাথ বা রবিশঙ্কর, মাও সে তুঙ বা সুভাষচন্দ্রের মনন বা সৃষ্টিতে প্রেরণার উৎস বিষয়ে এঁরা অবহিত হবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। লেখক যদি জীবনী লিখতেন সে ক্ষেত্রে তথ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তিজীবনের নানাদিক অর্থাৎ ভালমন্দ নিয়ে তা লিখতে পারতেন। কিন্তু একই রচনায় পাশাপাশি মন্তব্যের ক্ষেত্রে কী বিশাল ফারাক যা আসলে স্ব বিরোধিতায় পরিপূর্ণ।

বলা হয়েছে, কবির দৈহিক সাহস ও নির্ভীকতার প্রমাণ দুর্লভ। লেখক এই তথ্য কোথায় পেলেন? ঢাকায় তখন নজরুল প্রায়ই যেতেন। একবার ঢাকা থেকে ফেরার দিন দুই আগে রাণু সোম (অর্থাৎ

তিভা বসু) দের বাড়িতে গানের আসরে গিয়েছিলেন। সেবার বাড়ি ফিরে যাবার পথে নজরুল সে ড়ার গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। সেদিনের কথা সম্প্রতি লিখেছেন লেখিকা প্রতিভা বসু। তাঁর থায়, নজরুল যখন বনগ্রামের মোড় পেরিয়ে একটা আরও নির্জন রাস্তায় পৌঁছেছেন, বোধহয় সেটা টারি বাজারের মোড়, সেই মুখটাতে যেতেই জনা সাত আট ছেলে লাঠি দিয়ে পিছন থেকে প্রচণ্ড রে মাথায় আঘাত করতে করতে বলল, 'দিলীপ রায়ের টাক মাথাটা ফাটাতে পারিনি, এবার তোর বরিচুলের মাথাটা আর আস্ত রাখব না।'

নজরুল আচমকা আঘাত পেয়ে, মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন বটে, পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে কটা ছেলেকে ধরে ফেলে তার হাতের লাঠি দিয়েই তাকে ধরাশায়ী করে সামনে সেই লাঠি বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'কে আসবি আয়, ক'টা আসবি, আয়'। লাঠি খেলা ছোরা লায় দক্ষ মেরুদণ্ড সিধে একটা যুদ্ধফেরতা মানুষের সম্মুখে এই শৃগাল শূকরের দল কি কখনো ড়াতে পারে? তবু যতক্ষণে তিনি ঐ ছেলেটিকে পিটিয়ে হাতের সুখ করেছেন ততক্ষণে এরাও লোপাথাড়ি যে যেভাবে পারে মেরেছে তাঁকে। তারপর লাঠি ঘোরানো দেখে মাটিতে পড়ে থাকা লেটাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেছে ব্যাপারটা। বাবা গিয়ে যখন পৌঁচেছেন থন লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতেই পথ হাঁটছেন নজরুল। বর্ধমান হাউসে যাবেন। (জীবনের জলছবি— তিভা বসু, পৃ: ৫২)

ই বিবৃতি থেকে কি নজরুলের দৈহিক সাহস ও নির্ভীকতা দুর্লভ বলে মনে হয়?

ঠাকুর পরিবারের কবিবন্ধু সৌম্যেন্দ্রনাথের উক্তি: রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর াসেনি বাংলাদেশে, এমন সহজগতি আবেগের আগুনে ভরা কবিতা বাংলা সাহিত্যে বিরল। শরৎচন্দ্রও নুরূপ মত পোষণ করতেন। তাঁকে কবি হিসেবেই কলকাতার টাউন হলে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন কালের বিদগ্ধ সমাজ। সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র । রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গীতিনাট্য 'বসন্ত' উৎসর্গ করেছিলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, কে যেন কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানায় নিজের নাম দস্তখত করে আমার হাতে তুলে য়ে বললেন, তাকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না র। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন রণেই সে বন্ধ না করে। অথচ নজরুলের সম্পর্কে এই লেখকের সিদ্ধান্ত : উচ্ছ্বাসই নজরুলের জ। এ উচ্ছ্বাস তাঁকে আধুনিক কবির গৌরব থেকে নাকি বঞ্চিত করেছে আর তাঁর গদ্যশৈলীকে কে রেখেছে অনাদৃত করে। রবীন্দ্রনাথও তাহলে নজরুলের কাব্যবিচারে এত ভুল করেছিলেন?

মজার ব্যাপার হল, নজরুল বিষয়ক এই সব মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত যা আসলে নজরুলের স্বভাব চরিত্র প্রবণতার বিরুদ্ধে বিষোদগার মাত্র তা যে গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তার শিরোনাম 'একালে নজরুল'। খকঃ আহমদ শরীফ। প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানির ন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি নাকি লেখকের প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতার সংগ্রহ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখকের 'কাজী রুল ইসলাম অধ্যাপক' হিসেবেই নাকি ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে এই বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়েছিল। রুল প্রণামের এই অভিজ্ঞতা এই অধ্যাপকের রচনার মাধ্যমে আমাদের বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিতে ত। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও আশ্বস্ত হই যখন দেখি তিনি ঐ গ্রন্থেই সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতে লিখে লেন, 'তিনি (নজরুল) যুগপৎ দেশের বঞ্চিত দলিত জনগণের — গণমানুষের, দুঃস্থ মানবতার র্থিক সামাজিক মুক্তির সংগ্রামেও ছিলেন সমমাত্রায় উৎসাহী।'

দুঃখের বিষয়, শতবর্ষে অকস্মাৎ অনেকে এ জাতীয় নজরুল চর্চার কাজে উৎসাহী হয়ে রুচিহীন রচনার কাজেই ব্রতী হয়েছেন। এঁদের লক্ষ্য, শতবর্ষে কবির জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ঘোলা জলে ধরা। এঁরা কেউ কেউ নজরুল বিষয়ে গ্রন্থও রচনা করেছেন। এবং নজরুল চর্চার সময় সহস্র

সংশয়ে বিদ্ধ হয়েও উৎসাহ হারাননি। বরং রচনার ফাঁকে ফাঁকে এঁরাই নজরুলের ব্যক্তিচরিত্রের কুৎসা প্রচারের ইংগিত ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র। কেউ ব্যস্ত কবির প্রথম সন্তানের জন্মগ্রহণের সময় ও কবির বিবাহের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ের হিসেব নিয়ে, অথবা গিরিবালার নিরুদ্দিষ্টা হবার বদলে তাঁর মৃত্যুর অন্য সম্ভাব্য কারণের কল্পিত বর্ণনায়। আবার কেউ তার আলোচনার সময় গ্রন্থের শিরোনামায় নামকরণ করেছেন 'অসংযমের শিল্প' হিসেবে। নজরুল চর্চায় এ'ও এক রূপ যা অন্যত্রও দু একটি ব্যতিক্রমী অশোভন ইংগিতের স্পষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে। সুখের বিষয়, সহস্র প্ররোচনা ও উস্কানি সত্ত্বেও দেশের মানুষ এ জাতীয় প্রবণতায় আজ উৎসাহী নয়। স্ব-ঘোষিত বিশেষজ্ঞরা তাই এখন আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন। পাশাপাশি অনেকেই বিভিন্ন নজরুল বিষয়ক সংকলনে একাধিক রচনা লেখায় প্রয়াসী। এঁরা যে কোন বিষয়ে প্রস্তুত না হয়েও যে কোন কবি বা লেখক বিষয়েই বিশেষজ্ঞ সেজে রাতারাতি আসরে অবতীর্ণ হন। কবির জন্মশতবর্ষে এইসব রচনার প্রাধান্যও নজরে পড়ে। এঁরা নজরুলের আদর্শ ও বিশ্বাস বিষয়ে নীরবতার পক্ষপাতী। কেউ কেউ ছাত্রপাঠ্য আলোচনায় অধ্যাপকীয় নৈপুণ্যে ছাত্রদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আশার কথা, অনতিবিলম্বেই এই জাতীয় আলোচনার ইতি ঘটতে চলেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। শতবর্ষের উত্তেজনা শান্ত হলে পেশাদারী সেই আলোচনার লক্ষ্য ভিন্ন কারো প্রতি ধাবিত হতে অবশ্যই বাধ্য।

নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে লালফিতার বাধা বর্তমান এবং ব্যুরোক্রাটদের একাংশেও দীর্ঘকাল ধরে নজরুল বিরোধিতা সক্রিয়। এদের অশুভ তৎপরতায় তিন দশক আগে মহাকরণ থেকে নজরুল রচনাবলী প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। অনেকের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও নজরুল রচনা প্রকাশের পরিকল্পনা তৎকালে মাঠে মারা যায়। চুরি হয়ে যায় নজরুলের প্রথম সংস্করণ সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলীর কয়েকটি পাণ্ডুলিপির ফাইল যা আজও এক রহস্যের কারণ হয়ে আছে। কবির জন্মশতবর্ষে আন্তরিক উদ্যোগ সত্ত্বেও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রস্তাবিত ও ঘোষিত নজরুল রচনাবলীর কাজ কিছুটা থমকে রয়েছে। বন্ধ হয়ে আছে অন্যান্য পরিকল্পিত কর্মসূচি। কবিকে নিয়ে একটি ছবি নির্মাণের কাজ এখন বিশ বাঁও জলের তলায়। নজরুলের পূর্ণাবয়ব মূর্তি যা ভি.আই.পি রোডে বসানোর কথা ঘোষিত হয়েছিল তারও কোনো সাড়াশব্দ নেই। এখনো নজরুল ইসলামের জন্যে বরাদ্দ নজরুল সরণীর জমিতে বাস্তবে কোনো উদ্যোগ গড়ে ওঠেনি। প্রকাশিত হয়নি নজরুলের নির্বাচিত উজ্জীবনী গানের ক্যাসেট। বেসরকারী স্তরে অবশ্য অসংখ্য স্মরণ অনুষ্ঠান চলেছে দেশ জুড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ এই শতবর্ষে এখনও নজরে পড়েনি। বিলম্বে হলেও প্রকাশিত হয়েছে নজরুল জন্মশতবর্ষে প্রস্তাবিত ডাকটিকিট। কিন্তু সংসদে আজও নজরুলের তৈলচিত্র অনুপস্থিত। পার্লিয়ামেন্ট বা বিধানসভার বাগানে বা কোথাও বসানো হয়নি নজরুলের কোনো মর্মরমূর্তি। প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও চুরুলিয়ায় কবির জন্মভিটে পরিদর্শনের পরেও গৃহীত হয়নি নতুন কোনো কর্মসূচি। সর্বত্রই কেমন একটা গা ছাড়া ভাব। অজস্র উদ্যোগ বহুমুখী আশাভঙ্গের কারণে তাই এই শতবর্ষও আক্রান্ত। ফলে সুসম্পন্ন হয়নি তেমন কোনো উদ্যোগ যেখানে নজরুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে সক্ষম হত দীর্ঘস্থায়ী চর্চার ব্যাপক বিশ্বস্ত কর্মসূচি। সাহিত্য একাডেমি পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্রের সহযোগে কলকাতায় বাঙলা একাডেমির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা অবশ্যই আশাপ্রদ। পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা একাডেমি পরিকল্পিত শতবর্ষ স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ গ্রন্থটি এখন প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রকাশিত হতে চলেছে সেখান থেকে নজরুল বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থও। বিভিন্ন জেলায় একাধিক নজরুল বিষয়ক আলোচনা সহ কিছু অনুষ্ঠানও পাশাপাশি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কবির জন্মশতবর্ষে কোথায় কবির প্রার্থিত সৃষ্টি সংরক্ষণ অথবা গানের নির্ভুল প্রকাশ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন!

সুস্থাবস্থায় যেমন তিনি ব্যবসায়ীদের মূলধন হিসেবে যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়েছিলেন তেমনি আজও তাঁকে নিয়ে যথার্থ চর্চা ও বিশ্লেষণের অভাব সত্যি পীড়াদায়ক। রাজনীতিতে এখনও তাঁর চাহিদা অবশ্য

কমেনি। তাই তাঁকে নিয়ে যত না উদ্দেশ্য পূরণ সে তুলনায় প্রকৃত আগ্রহ বা আন্তরিকতা নিতান্তই কম। শতবর্ষেও সেই বিভ্রমও আমাদের নজর এড়ায় না।

তখন অস্বস্তি আর সংকট ঘিরে ফেলতে থাকে। প্রকৃত অনুরাগীর কাছে তখন বিস্ময়ের পাশাপাশি প্রশ্ন জাগে, তবে কি আজও চুরুলিয়ার সেই লেটো গাইয়েকে সত্যিই গ্রহণ করতে আমরা অক্ষম! আমাদের তথাকথিত মেকি শহুরে মধ্যবিত্তের দল আজও এই প্রতিবাদী কালোপাহাড়কে সম্ভবতঃ বরণ করতে ভয় পাই। পাছে অকস্মাৎ আমাদের মুখোশ যদি পুনরায় খসে যায়!

হায়, এ কি সমাপন!

অগ্নি-গিরি

বন্ধু আগুন আছে তোমাদের

তোমরা অগ্নি-গিরি

সে অগ্নি-শিখা ভীষণ আত্ম-বিস্মৃতি আছে ঢাকি

পাষাণ হইয়া আছে আজ চাপা।

হায় রে আত্ম-ভোলা,

তোমরা জাগিলে সারা দুনিয়াতে

উঠিবে তুফান দোলা।

কাজী নজরুল ইসলাম